মরিচঝাঁপি

ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস

মরিচঝাঁপি

ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস

মধুময় পাল
সম্পাদিত



গা ঙ চি ল

MARICHJHAPI
CHHINNA DESH, CHHINNA ITIHAS
Edited by Madhumay Pal

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০০

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১
যোগাযোগ (০৩৩) ২৫৫৩৮৫০২ ৯৪৩২৯৯১৫৩০
ই-মেল gangchil.books@gmail.com
বিক্রয়কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
হরফবিন্যাস
রচয়িতা ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১
মুদ্রক
টেকনো প্রসেস ১৭৫বি মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৪
প্রচ্ছদচিত্র
মরিচঝাঁপির শরণার্থী
পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
বিপুল গুহ

দেশভাগ যাঁদের দেশভিখারি করেছে

সূচিপত্র

'সত্যেরে লও সহজে'

সে মোহ-আবরণ

বিশ্বাস করা যায়নি সেদিন। মানুষের সরকার মানুষের ভালবাসার ওপর চড়াও হতে পারে। ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে। সেদিন হয়তো এরকম ভাবাও অন্যায় ছিল যে, বামপন্থী সরকার কোনও অন্যায় করতে পারে। সত্তর দশকের হাড়-হিম সন্ত্রাস ও প্রতিকারহীন নৈরাজ্যের ভেতর দিনাতিপাত-করা বাংলার মানুষ নিরুপায় স্পর্ধায় সাতাত্তরের পূর্বগগনে রচনা করেছে সূর্যোদয়ের রক্তিমপট। অন্ধকারের বিদায় ঘটিয়ে তুলতে পারার বাস্তবতা বাংলায় তখন জুড়ে দিয়েছে সুদিনের স্বপ্নঘোর। অন্ধকারের জন্য যারা দায়ী, রক্তস্রোতের জন্য যারা দায়ী, অসংখ্য মৃত্যু ও মানবসম্পদ বিনাশের জন্য যারা দায়ী, সেই সরকারি ও বেসরকারি অপরাধীদের বিচারের পক্ষে অহরহ বলছেন বাম নেতারা। কমিশন বসছে। সত্তরের ঘাতকরা, জল্লাদরা শাস্তি পাবে এরকম প্রত্যাশা সঙ্গত ভাবেই ডালপালা ছড়াচ্ছে। তখন চতুর্দিকে প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাস। সেই স্বপ্নঘোরের দিনে বামফ্রন্ট সম্পর্কে ন্যূনতম অবিশ্বাসও ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত ও চিহ্নিত হতে পারে।

প্রান্তিক সুন্দরবনের দুর্গম জনহীন দ্বীপ মরিচঝাঁপিতে দণ্ডকারণ্য থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বসতি গড়ার চেষ্টা ও সরকারের তরফে বিরোধিতার ঘটনা সেই পরিবেশে বাংলার নাগরিকসমাজকে ছুঁতে পারেনি। অন্যভাবেও বলা যায়, বাংলার নাগরিকসমাজ মরিচঝাঁপির ঘটনাকে এড়িয়ে গেছে। অনেকে অবিশ্বাস করেছেন। বামফ্রন্টকে বিব্রত করার চক্রান্তকে সমুচিত জবাব দেওয়ার সরকারি প্রচারে ভেসে গেছেন অনেকে। কেউ কেউ ভেবেছেন, কিছু একটা হচ্ছে হয়তো, মিটে যাবে। সরকারের সুনজর থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় সব জেনে-বুঝে চুপ ছিলেন এমন নাগরিকের সংখ্যাও কম নয়। মরিচঝাঁপির ঘটনা নিয়ে খবরের কাগজে একটা সময় পর্যন্ত লেখালেখি হয়েছে, বিধানসভায় হইচই হয়েছে, কলকাতায় দু-চারটে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল হয়েছে। কিন্তু সাড়া মেলেনি। মেলেনি যে তার বড় একটা কারণ, ওঁরা ছিলেন প্রান্তজন। মূলস্রোতের বাইরের জনসমাজ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, ওঁরা 'ঘুঁটেকুড়ুনির ছানা', ওঁদের 'পাথরচাপা কপাল'। ওঁদের যখন তাড়ানো হল 'ভালোমানুষের ছা'যেরা কেউ রা কাড়েনি। ওঁরা 'সুয়োরানির রাজ্যে' হানা দিয়েছিলেন।

আমরা, সুয়োরানির মোহ-আবরণে ঘেরা প্রজারা সুয়োরানির সুখের সুরক্ষায় যত্নবান থেকেছি। সুয়োরানি যেমন ভাবিয়েছেন, তেমন ভেবেছি। অন্য ভাবনার মানুষ সেদিনও নিশ্চয় ছিলেন। তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন মরিচঝাঁপিতে আসা উদ্বাস্তুদের বিপন্নতার কথা বলতে। কিন্তু তাঁরা ছিলেন অতি-সংখ্যালঘু। আমাদের মোহে চিড় ধরানোর পক্ষে বড় যুক্তিনম্র ছিল তাঁদের কণ্ঠস্বর। আজ, তিরিশ বছর পর, সেই অন্য ভাবুকদের প্রতিবেদন বিবরণ বিশ্লেষণ খুঁজে খুঁজে পড়তে পড়তে মনে হয় সেদিন চুপ থাকাটা ছিল পাপ।

মরিচঝাঁপির খোঁজে

'দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ' এই শিরোনামের একটি প্রকল্পে আমরা কাজ শুরু করি ২০০৫-এর গোড়ায়। ঠিক হয়, দু' ভাগে বিষয়টি গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। এক ভাগে থাকবে বিশ্লেষণমূলক লেখা— ইতিহাস থেকে পুনরুদ্ধার, ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নও। অন্য ভাগে স্মৃতিকথা, শিল্পে-সাহিত্যে দেশভাগের কথা। এ সময় প্রশ্ন তোলেন আমাদের এক বন্ধু। কেন থাকবে না মরিচঝাঁপির কথা? দেশভাগের সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক মরিচঝাঁপির। যদি আন্দামানের কথা থাকে, দণ্ডকারণ্যের কথা থাকে, বাংলার কুপার্স ক্যাম্প এবং আরও অনেক ক্যাম্প ও কলোনির, কেন থাকবে না মরিচঝাঁপি?

২০০৫-এ আঠাশ বছর আগেকার মোহ-আবরণ ঘুচে গেছে। সাদাকে সাদা দেখা যাচ্ছে, কালোকে কালো। মরিচঝাঁপিতে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের আনা হয়েছিল, তাঁরা আহূত, আগন্তুক বা বহিরাগত নন, তাঁরা সঙ্গত কারণে এসেছিলেন, অসঙ্গত ভাবে তাঁদের তাড়ানো হয়েছে— এটা পরিষ্কার। দেশভাগ যদি আমাদের অনুসন্ধান হয়, বিনাশের মুখ থেকে বাঙালির ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা যদি আমাদের খোঁজ হয়, মরিচঝাঁপিকে বাদ দেওয়া যায় না।

একজনের খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি গিয়েছিলেন, সেখানে ছিলেন, উৎখাতের সময় পুলিশি পাহারা এড়িয়ে বাংলার ভিড়ে মিশে যান, দণ্ডকে ফেরেননি। তাঁর সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক একটি লেখা তৈরির কথা ভাবা হল। ভদ্রলোক প্রস্তাব শুনে প্রবল হাতনেড়ে বলে উঠলেন, 'আমি না, আমি না। আমার বাবা। তিনি মারা গেছেন।' তাঁর চোখে-মুখে আতঙ্ক। মরিচঝাঁপি নিয়ে একটা জেদ পেয়ে বসে এরকম কয়েকটা অভিজ্ঞতার পরই।

২০০৬-এর শেষের দিকে 'সিঙ্গুরের ডায়েরি' কাজটা করার সময় স্বাভাবিকভাবেই মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গ এসে পড়ে। রাষ্ট্রীয় পীড়নের সূত্রে। সংক্ষেপে এই কথাটা বলার চেষ্টা ছিল সেখানে যে, বাম জমানায় রাষ্ট্রীয় পীড়নের শুরু মরিচঝাঁপিতে। লেখাটি পড়ে কয়েকজন তরুণ বন্ধু জানতে চান, মরিচঝাঁপিতে কী হয়েছিল? আগে শুনিনি তো? কেউ বলেনি। পড়িনি কোথাও। বুঝতে অসুবিধে হয় না, মরিচঝাঁপির ঘটনা ভুলিয়ে দেওয়া গেছে। নৈঃশব্দ্যের অস্ত্রে ছিন্ন করা হয়েছে ইতিহাস।

তখনই ঠিক হয়, মরিচঝাঁপি নিয়ে স্বতন্ত্র সঙ্কলন করা হবে।

'দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ' প্রকল্পের জন্য প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর 'লাস্ট ট্রেন ফ্রম খুলনা' লেখাটি আমরা আনতে গিয়েছিলাম। কথায়-কথায় মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গ ওঠে। জানতে পারি, তিনিই প্রথম সাংবাদিক, মরিচঝাঁপি দ্বীপে হাজির হয়েছিলেন। ১৯৭৮-এর ২ মে। দেখেছিলেন, হাজার হাজার মানুষ— শিশু-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দলে দলে— নৌকায় ডিঙিতে ভেসে, নদীর তীর ধরে প্রায় ছোটার গতিতে হেঁটে ওই দ্বীপের দিকে চলেছেন। বাংলার বুকে, স্বদেশের মাটিতে ওই উদ্বাস্তু বাঙালিদের বাঁচার

আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছিলেন তিনি প্রথম অভিজ্ঞতাতেই। আবারও গিয়েছেন, পুলিশি পাহারা এড়িয়ে, অবরোধ এড়িয়ে। দেখেছেন, হাজার প্রতিকূলতা— গ্রীষ্মদাহ ও শৈত্যপ্রবাহ, ঝড় ও প্লাবন, আধিব্যাধি, সাপের কামড়, প্রশাসনের শাসানি ও মৃত্যুর অহরহ আনাগোনা, দিনের পর দিন এক ফোঁটা পানীয় জল ও দু' মুঠো অন্নের অভাব— সহ্য করে, কাদামাটির বাস-অযোগ্য দ্বীপভূমিকে বাসভূমি করে তুলছেন হাঘরের দল, শ্রম ও স্বপ্নের জোর ছাড়া যাঁদের অন্য সামর্থ্য নেই। স্বপ্নের দেশ গড়ছেন দেশহারানো বাঙালি। সে সব লিখেছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। আবার লিখলেন নতুন করে, পরবর্তী সময়ের পর্যবেক্ষণ জুড়ে। মরিচঝাঁপির জন্ম ও মৃত্যু দেখেছেন সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত। দণ্ডকারণ্য ঘুরেছেন। দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সমস্যাটা জেনেছেন ভেতর থেকে। মরিচঝাঁপি থেকে 'আগন্তুক'দের 'সাগ্রহে ও নির্বিঘ্নে বিদায়'-এর নমুনা হিসেবে তিনি দুধকুণ্ডি ক্যাম্পে খুঁজে বের করেছেন অগ্নিদগ্ধ ফণীবালা মণ্ডলকে। বিবরণ দিয়েছেন মে মাসের দুপুরে ১১৫-১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় বম্বে রোড ধরে খোলা ট্রাকে উদ্বাস্তু চালানের।

সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর নিবন্ধটি সামনে রেখে এগোতে থাকি।

দেশভাগের অপরিণামদর্শিতার গর্ভের সন্তান দণ্ডকারণ্য, আর দণ্ডকারণ্যের সীমাহীন অন্যায় ও অবিচারের গর্ভে জন্ম মরিচঝাঁপির। দেশভাগ যদি হয় অখণ্ড ভারতের রাজনীতিবিদদের পাপ, মরিচঝাঁপি বাংলার বাম জমানার আদি পাপ। এখানে একটা কথা বলা দরকার, প্রাক বাম জমানার উদ্বাস্তু নীতিতে বিবেকের স্পর্শ কম ছিল। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে সেই সময়ের শাসকশ্রেণির হৃদয়হীনতা হাজার হাজার মানুষকে মনুষ্যেতর জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। এর কারণ. কংগ্রেস প্রশাসনে এলিট আধিপত্য। তাই, পরবর্তী সময়ে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের দুর্দশায় সেই এলিট প্রতিনিধিদের উদ্বেগ ও কাতরতা স্ট্র্যাটেজিক মায়াকান্না বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু বিমর্ষ হতে হয় এটা বুঝে যে, বামশাসনেও সেই এলিট বা 'ভদ্রলোক'দের আধিপত্যই আরেকটা পাপ ঘটাতে পারল। ক্ষমতার হাতবদলে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলায় না, বোঝা গেল।

পুরনো কাগজ, নতুন লেখা

১৯৭৮-এর মার্চে এসেছিলেন ওঁরা। ১৯৭৯-র মে মাসে ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছিল মরিচঝাঁপি। কিছু কমবেশি এই পনেরো মাসের ঘটনাপ্রবাহ সময়ক্রমে ধরে রাখার চেষ্টা আছে সংকলনে।

প্রখ্যাত আই সি এস অফিসার ও দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কিছুকালের চেয়ারম্যান শৈবালকুমার গুপ্তর লেখা প্রথমে রাখা হয়েছে সমস্যাটি সামগ্রিকভাবে বোঝার জন্য। দণ্ডকারণ্যে বাঙালি উদ্বাস্তুদের মানুষের মতো বাঁচার প্রশ্নটি বিশদে বিচার করেছেন লেখক। এর পর হাসনাবাদকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তুদের জমায়েতের খবর।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উদ্বাস্তুদের বলেন দণ্ডকে ফিরে যেতে। বরুণ সেনগুপ্ত প্রশ্ন করলেন, দণ্ডক থেকে ওঁরা কেন বার বার আসার চেষ্টা করছেন? এবারের চেষ্টাকে কেন ষড়যন্ত্র বলা হচ্ছে? বড় আশা করে আসা উদ্বাস্তুদের একটি অংশ সরকার ও বাংলার সাধারণ মানুষের হৃদয়হীনতায় ফিরে গেলেন দণ্ডকে হৃতসর্বস্ব হয়ে। ফিরে গিয়ে তাঁরা পড়লেন আর এক দুঃসহ পরিস্থিতিতে। সেখানে গিয়ে তাঁদের বিপন্ন দশা দেখলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবী পান্নালাল দাশগুপ্ত। বললেন, ধোঁকা দিয়ে এই মানুষগুলোকে চরম বিপদে ফেলা হয়েছে। যাঁরা ফিরে যাননি, তাঁদের একটি অংশ মরিচঝাঁপিতে বসতি নির্মাণের কর্মযজ্ঞ শুরু করলেন। দ্বীপে গিয়ে দেখে লিখলেন সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত। সেই কর্মযজ্ঞ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের অসম যুদ্ধের কথা লিখলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৯ মরিচঝাঁপিতে অবরোধ জারি করে প্রশাসন। জল, খাদ্য, ওষুধপত্র থেকে শুরু করে সাংবাদিকদেরও ওই দ্বীপে যাওয়া নিষিদ্ধ হল, নিষিদ্ধ হল ওই দ্বীপ থেকে বেরনো। ৭ ফেব্রুয়ারি এই অবরোধের বিরুদ্ধে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানালেন, মরিচঝাঁপিতে নৈরাজ্য কায়েম করা হচ্ছে। ইন্ধন দিচ্ছে স্বার্থান্বেষী মহল ও রাজনৈতিক কুচক্রীরা। এসইউসি বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকার মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে সত্যের অভাব চিহ্নিত করলেন। অবরোধে উপবাসী মরিচঝাঁপিতে গেলেন জ্যোতির্ময় দত্ত ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। সেদিন দ্বীপের ঘরে ঘরে ভাত রান্না হচ্ছে। এই মানুষদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে স্নেহের সুরে কথা বলার অনুরোধ জানালেন বিশিষ্ট সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শৈবালকুমার গুপ্ত সরকারের প্রচার ও যুক্তি খণ্ডন করে বললেন, মরিচঝাঁপিতে পুনর্বাসন সম্ভব। ১৭ মে ১৯৭৯ উদ্বাস্তুহীন করা হল দ্বীপভূমি। পান্নালাল দাশগুপ্ত তাঁর কাগজ 'কম্পাস'-এ এই অপারেশনকে ধিক্কার জানালেন এই বলে যে, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কর্তব্য শেষ করলেন, কিন্তু কত মূল্যে, কত রক্তে, কত অর্থে তার প্রকৃত হিসাব পাওয়া যাবে না।'

এ পর্যন্ত লেখাগুলো, পুরনো কাগজ— প্রতিবেদন, আবেদন ইত্যাদি থেকে নেওয়া। এর পর নতুন লেখা, নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, আরএসপি নেতা মনোজ ভট্টাচার্য, তুষার ভট্টাচার্যের। প্রফুল্ল মণ্ডলের সাক্ষাৎকার সাম্প্রতিক। অনু জালের অনুবাদটি বেরিয়েছিল একটি ছোট পত্রিকায়। গ্রন্থভুক্ত হল এই প্রথম। মৃদুল দাশগুপ্তর লেখা অবশ্য ১৯৮২ সালের। মরিচঝাঁপি থেকে ফেরত যাওয়া উদ্বাস্তুদের বেদনা অভিযোগ অভিমান শুনেছিলেন দণ্ডকে গিয়ে।

ইতিহাসের সন্ধানে সব স্বরকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সংকলনে। যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য স্থান পেয়েছে, বামফ্রন্ট সরকারেব সাবেক অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রর মরিচঝাঁপি বিষয়ে স্মৃতিচারণা, তর্কের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও (বসতিহীন দ্বীপে জোতদার-জমিদারদের অস্তিত্ব!), অনুরূপ মর্যাদায় রাখা হয়েছে। সরকার পক্ষের সেদিনের প্রচারের রেশ রয়ে গেছে লেখাটিতে। অবিভক্ত ২৪ পরগনার তৎকালীন পুলিশ সুপার অমিয়কুমার সামন্তর কাছে একটি লেখা চাওয়া হয় আমাদের তরফে। মরিচঝাঁপির ঘটনার সঙ্গে প্রশাসনিক

যোগ সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ছিল তাঁরই। তিনি লেখা দিতে সম্মত হন এবং যথাসময়ে দেন। নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ ও তার ভিত্তিতে ঘটনার বিশ্লেষণ আছে লেখাটিতে। মরিচঝাঁপি নিয়ে বিভিন্ন লেখায় 'পুলিশি নির্যাতন' সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তাঁর মতে, সে-সব 'মিথ্যাচার'। হতে পারে, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কোনও লেখায় অতিরেক থাকতে পারে। নানা রকমের অবরোধ জারি করে দ্বীপের সত্য চাপা দিতে সেদিনের চেষ্টাটাই হয়তো 'মিথ্যা'র দরজা খুলে দিয়েছে। যাঁরা অবরোধের দেওয়াল খাড়া করেন, সত্য বলার এক্তিয়ার তাঁদের থাকে না। সরকারের তরফেও সেদিন 'গল্প' কম খাড়া হয়নি। আমরা কোনও কণ্ঠস্বরের ওপর অবরোধ জারি করা ভুল পথ বলে মনে করেছি।

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে। ১৩২৪-এর অগ্রহায়ণে লেখা। ৯২ বছর পরও প্রায় একই রকম প্রাসঙ্গিক মনে হয়। তিনি লিখেছেন, 'পুলিশ একবার যে-চারায় অল্পমাত্র দাঁত বসাইয়াছে, সে-চারায় কোনোকালে ফুল ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে।... পুলিশের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক।... উহাদের (পুলিশের) খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল।' (ছোট ও বড়, কালান্তর)

ভরসা রাখি, মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তু বিদায়ের 'গুপ্ত খাতা' ও 'গুপ্ত চাল' একদিন প্রকাশ পাবে।

তুমি আর নেই সে তুমি

শৈবালকুমার গুপ্তর লেখা নিবন্ধ 'মরিচঝাঁপি কি মরীচিকা'য় রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন দেখে সমস্যায় পড়তে হয়। লাইন দুটি হল: 'নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়/ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।' প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চয় আছে, একটা আভাস আসছে, কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। যোগাযোগ করি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে। উত্তর পেয়ে যাই। লাইন দুটি 'চিরদিনের দাগা' নামের কবিতায় আছে। 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থে। নিজের মনের বিকার থেকে শৈলকে ওর জনক-জননী মন্দ বলছে, আপদ ভাবছে। 'বিধির শৈল' মানে আসল শৈল, তা নয়। শৈলবালা স্বেচ্ছায় আসেনি পৃথিবীতে। তাকে আনা হয়েছিল। সেটা ভুল না ঠিক তার দায় বা রায় শৈলবালার ওপর বর্তায় না। অথচ তাকেই খেসারত গুনতে হল। 'একে একে তিনটি মেয়ের পরে/শৈল যখন জন্মাল তার বাপের ঘরে/জননী তার লজ্জা পেল; ভাবল কোথা থেকে/অবাঞ্ছিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে।' 'বিনা-দোষের অপরাধে' শৈলর জীবন শুরু হল। পদে পদে অপবাদ, অপমান, অনাদর। মা বলে 'পোড়ারমুখী', বাবা বলে 'হতভাগী'। যারা ওকে ডেকে এনেছে, তারাই নিজেদের মনের কালি মাখিয়ে মেয়েটিকে গাল পাড়ে।

স্পষ্ট হয়ে যায় প্রাসঙ্গিকতা। মরিচঝাঁপিতে যে উদ্বাস্তুরা এসেছেন, তাঁরা নির্দোষ। তাঁদের ডেকে আনা হয়েছে। ডেকে এনেছেন যাঁরা, এখন তাঁরাই তাড়াতে নানা অপবাদ রটাচ্ছেন। একদিন যাঁরা দেখভাগ সমর্থন করেছেন, উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন,

তাঁদের নিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক লাভ ফলিয়ে তুলেছেন, বিরোধিতা করেছেন আন্দামান ও দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের উদ্যোগের, জোর দিয়ে বলেছেন যে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সম্ভব, নির্দিষ্ট ভাবে একাধিক প্রকল্পের কথা বলেছেন, এমনও বলেছেন যে বাইরে পাঠানোর চেয়ে অনেক কম খরচে ও অনেক কম সময়ে বাংলার ভেতরে অনেক ভাল পুনর্বাসন হতে পারে, তাঁদের কেউ কেউ দণ্ডকারণ্যে হাজির হয়ে বাংলায় স্থায়ী-ভাবে ফেরার ইচ্ছে জাগিয়ে রেখেছেন উদ্বাস্তুদের মধ্যে, এখন তাঁরাই ক্ষমতাসীন হয়ে দণ্ডকত্যাগী হাজার হাজার মানুষকে ঘাড়ে ধরে বাংলাছাড়া করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

শঙ্খ ঘোষ জানতে চান, মরিচঝাঁপি নিয়ে কোনও কাজ করতে চাইছি কি না এবং জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের 'মরিচঝাঁপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে' বইটি দেখেছি কি না। ২০০৭-এ লেখা অশোক মিত্রের স্মৃতিচারণরার সংবাদ তিনিই দিলেন। শঙ্খ ঘোষের কাছেই জানা গেল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ঠাকুরমার ঝুলি' কবিতাটির কথা। বললেন, ১৯৭৮-এ 'দেশ'-এ বেরিয়েছিল। উদ্বাস্তুরা তখন লাঞ্ছনা সয়ে, রক্ত ঝরিয়ে, প্রিয়জনদের হারিয়ে শোকসর্বস্ব হয়ে ফিরে যাচ্ছেন সেই নির্মম দণ্ডকে। প্রতারণা আর অত্যাচারের কাহিনিতে তাঁদের ঝুলি ঠাকুরমার ঝুলির মতো চিরকালের হয়ে থাকল। কবিতাটি পড়ে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছিলেন, এই কবিতার জন্য সুভাষকে সোনার কলম দেওয়া উচিত।

এই ফিরে যেতে বাধ্য-হওয়াদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ। 'উলটোরথ'। দণ্ডকের নিরুপায়তায় থাকা হাজার হাজার মানুষকে ভাবানো হয়েছিল বাংলায় তাঁদের স্থায়ী ঘর হবে। পালাবদলের পথে বাংলায় প্রগতিপন্থীরা আগের চেয়ে ঢের প্রত্যয় নিয়ে ক্ষমতায় এলে তাঁরা স্থায়ী ঘরের টানে বেরিয়ে পড়েন। 'কিন্তু সব কিছু নিয়ে এখানে পৌঁছে তারা দেখে, তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে শুধু পুলিশের লাঠি। নতুন তাণ্ডবে নতুন করে উৎখাত হল সবাই, প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত হল, আবার তাদের ধরতে হবে ফেরার পথ।' (কবিতার মুহূর্ত) কবিতার ভাষায়, 'সবার কাছে লাথি খাবার পদ্মবুকে/দেশ নেই যার এইভাবে দেশ খুঁজে বেড়ায়।' দেশভিখারিদের উৎখাত করার শাসানি-দেওয়া বামশাসকের হিটলারি-ভঙ্গি দেখে শঙ্খ ঘোষ লেখেন, 'তুমি আর নেই সে তুমি'। তার কয়েকটা লাইন: 'তুমি বললে দণ্ডকে নয়/আপন ভূমিই চাই/আমি বললে ভণ্ড/কেবল লোক খেপাবার চাঁই।/চোখের সামনে ধুঁকলে মানুষ/উড়িয়ে দেবে টিয়া/তুমি বললে বিপ্লব, আব/আমি প্রতিক্রিয়া।'

•

কলম, কাঁচি, কম্প্রোমাইজ

সংকলনে নানা লেখায় কয়েকটি বিষয় বার বার এসেছে। যেমন, কংগ্রেস আমলের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতি ও বামপন্থীদের বিরোধিতা, দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের গোড়ায় গলদ ও চলমান অব্যবস্থা, উদ্বাস্তুরা কেন বাংলায় আসার চেষ্টা করে এবং প্রতারিত প্রতিহত হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে ফিরে যেতে থাকে. ক্ষমতায় বসে উদ্বাস্তুদের প্রতি বামপন্থীদের মমতার

বিলোপ ইত্যাদি। লেখাগুলোর অর্ধেকেরও বেশি সেই সময়ের। শৈবালকুমার গুপ্ত, পান্নালাল দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়রা যে তথ্যের ওপর নিজেদের কথা দাঁড় করিয়েছেন, সেখানে এই প্রসঙ্গগুলো অপরিহার্য। কাঁচি চালালে স্বতন্ত্রভাবে এক একটি লেখাকে খুন করা হবে। আর, এই সংকলন তো সে-সব কথাই বলতে চেয়েছে ইতিহাসের দায়ে। একটু বেশি বলা হলে ক্ষতি কী? কলমকে কাঁচির ভূমিকা থেকে নিবৃত্ত রাখা গেছে এই যুক্তিতে।

কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে কলম বন্ধ রাখাটাই কাঁচির ভূমিকা নিল। যেমন, মরিচঝাঁপি সম্পর্কে বহু লেখা খবরের কাগজ, সাময়িকীর পাতায় ছড়িয়ে আছে। ধরে রাখা গেলে ভাল হত। মরিচঝাঁপির শিক্ষক নির্মলেন্দু ঢালির ডায়েরির খবর পাওয়া গেল। সেটা ছাপা জরুরি। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নেতারা স্বদেশি ও বিদেশি প্রচুর মুদ্রা উপার্জন করেছেন বলে প্রচার হয়েছে। এই নেতাদের ও তাঁদের উত্তরপুরুষকে ভ্যান ঠেলে, কয়লার গুল বেচে, জোগাড়ের কাজ করে এবং এইরকম 'ছোটলোক'-সাধ্য আরও জীবিকায় যুক্ত থেকে দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে হয়েছে ও হচ্ছে। এঁদের কথা যত বেশি সম্ভব লিখে রাখা দরকার। অনেকেই জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেছেন। দরকার ভাল ভাবে জানা ও লেখা এক পুলিশ অফিসারের রহস্যময় মৃত্যুর নেপথ্য-কথা, যিনি নাকি মরিচঝাঁপি অপারেশনে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। হতে পারে এটা রটনা। আমরা সত্যটা জানতে চাই। আপাতত কাঁচির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা হল, বর্তমান খণ্ডের আয়তনের কথা ভেবে, পরে আরেকটি খণ্ড করা যাবে মাথায় রেখে।

মরিচঝাঁপিতে পুলিশ নেমেছিল ১৪ মে ১৯৭৯, ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ। তৎকালীন ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের অধিকর্তা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানাচ্ছেন, পুলিশ কোনও ঘরে আগুন লাগায়নি। উদ্বাস্তু নেতাদের তৈরি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কয়েক জন পালিয়ে যাওয়ার আগে হতাশা থেকে আগুন লাগায়। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ [সম্ভবত ২৮/২৯ মে ১৯৭৯] তারিখে প্রকাশিত 'মরিচঝাঁপি বুলেটিন' নম্বর ১-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'তিনি (জ্যোতি বসু) জেনে রাখুন যে ১৪ মে তারিখে মরিচঝাঁপি দ্বীপে যে আগুন তিনি জ্বালিয়েছেন, সে শিখা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হতে হতে একদিন সারা বাংলায় আলোকস্তম্ভে পরিণত হবে।' সংখ্যাটির সম্পাদক ছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত, সহ-সম্পাদক রঙ্গলাল গোলদার। সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল 'যুদ্ধের ঘোষণা'। মরিচঝাঁপির ঘরে ঘরে আগুন যে-ই লাগাক, লেগেছিল। সে-আগুন আলোকস্তম্ভ হতে পারেনি। আজ যুদ্ধ বা প্রতিশোধ নয়, যা ঘটেছিল তা যেন জানতে পারি তার জন্য তিরিশ বছরের নৈঃশব্দ্য ভেঙে, আপসের উদাস দূরবর্তিতা ভেঙে আলোকবৃত্তে এসে দাঁড়াতে পারেন সেদিনের ভুক্তভোগীরা।

শেষের আগে

মরিচঝাঁপিতে বসতি নির্মাণের নেতৃত্বে ছিল উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি। সংগঠনের

সাধারণ সম্পাদক রাইহরণ বাড়ৈ অবরোধ জারির পর থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ পর্যন্ত অনাহারে মৃত, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত, ধর্ষিত, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ থেকে নিখোঁজ ও নিহত, আলিপুর ও বসিরহাট এবং অন্যান্য জেলে বন্দি উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ও নামের তালিকা, বাজেয়াপ্ত করা নৌকার সংখ্যা ও তাদের মালিকের নাম, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তির পরিমাণ ইত্যাদি জানিয়েছেন লিখিতভাবে। সেটি ছাপা হয়েছে জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের 'মরিচঝাঁপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে' বইটিতে। এই তালিকা যদি সত্য হয়, ভাবা যায় না পুলিশি নিগ্রহ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তালিকার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়। হয়তো এর বিরুদ্ধে বলারও আছে। কিন্তু ১৯৭৯-র ২৩ বছর পর আবার আর এক রকম অবরোধ! ২০০২-এ বইটির আলোচনা বেরোয় পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'পুস্তকমেলা'য় (ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৯)। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলা হয় পত্রিকার প্রায় সব কপি। অঘোষিত কারণে ওই আলোচনা বাদ দিয়ে তার জায়গায় অন্য লেখা ছেপে পত্রিকা বের করা হয়। কেন এই সেন্সর? নৈঃশব্দ্যের ষড়যন্ত্র? ইতিহাসকে ছিন্ন রাখার প্রয়াস!

'নিষিদ্ধ' আলোচনাটি আমরা এখানে প্রকাশ করলাম।

আমরা চেয়েছি এবং চাই, মরিচঝাঁপির সত্য জানা যাক, ভালমন্দ যা-ই হোক।

কাজটি হয়ে উঠতে পারল যে সহযোগী সহমর্মীদের জন্য, তাঁদের প্রথমে আছেন নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। সব সময় পাশে থেকেছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র গ্রন্থাগারিক শক্তিদাস রায় আমাদের দ্রুত এগোতে অনুপ্রাণিত করেছেন। নানা ভাবে সঙ্গে পেয়েছি অজয় বসুরায়, সুনীতা দে, মানব চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল মজুমদার, এসইউসিআই নেতা রণজিৎ ধর ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, সিপিআইএমএল লিবারেশন-এর বন্ধুদের এবং অধীর বিশ্বাস ও তাঁর আবেগ-অধীরতাকে। প্রতিপদে শরণ নিতে হয়েছে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র। চিরকৃতজ্ঞ থাকব 'কম্পাস' পত্রিকা ও ন্যাশনাল লাইব্রেরির এসপ্ল্যানেড ইস্ট শাখার কর্মীদের কাছে। সেদিনের একটা ছবি বিপুল গুহর রূপায়ণে কালের সীমা পেরিয়ে অনেক-কথা-বলতে-চাওয়া প্রচ্ছদ হয়ে উঠেছে। ভুলত্রুটি যা আছে, এককভাবে আমার। নিবন্ধ ও প্রতিবেদনগুলি বিভিন্ন সময়ের লেখা বলে বানানে কিছু বিশৃঙ্খলা রয়ে গেল।

উদ্বাস্তু সমস্যা একটা মানবিক সমস্যা। একে রাজনৈতিক দাবা খেলায় পরিণত করলে শুধু ভুল নয়, অন্যায় হবে এবং সেই অন্যায়ের কোনও মার্জনা নেই। আর, বাঙালি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সেই অন্যায়টাই করে গেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুরা বার বার চলে এসেছে কেন? খাদ্যাভাবে, অর্থাভাবে। অনাহারে মৃত্যু থেকে, দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা পেতে। নিদেনপক্ষে দেশের মাটিতে শেষ নিশ্বাস ফেলতে।

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু

শৈবালকুমার গুপ্ত

কেন এরা আসছে? খোঁজ নিন!

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু সমস্যা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং বন্যার স্রোতের মতো দলে দলে বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীর ভিড়ে শিয়ালদহ, হাওড়া, খড়্গপুর, বার্নপুর প্রভৃতি রেলওয়ে স্টেশন এবং হাসনাবাদ ও আরও কয়েকটা অঞ্চল গিস্‌গিস্ করছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন যাঁরা প্রশাসনের কর্ণধার তাঁরা যদি মনে করেন, এটা কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের কারসাজি তবে সেটা হবে নিছক আত্মপ্রতারণা এবং উদ্বাস্তুদের গলাধাক্কা দিয়ে ফেরত পাঠাবার অজুহাত। দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের কোনও মুখপাত্র নাকি বলেছেন, এই চলে আসবার পেছনে আছে উদ্বাস্তুদের শ্রমবিমুখতা এবং কিছু কিছু গ্রামসেবকের উসকানি। এ দুয়ের কোনওটাই ঠিক নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়। উদ্বাস্তুরা যে শ্রমবিমুখ নয় সেটা দণ্ডকারণ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসকের জবানিতেই প্রমাণ করা যাবে। আর গ্রামসেবকদের প্ররোচনা? উদ্বাস্তুরা ফিরে এলে তাদের কী স্বার্থ? গ্রাম উজাড় হয়ে গেলে তারাও তো বেকার হবে— এমন আত্মঘাতী কাজ করে তাদের লাভ? আর রাজনৈতিক দলের কথাই

যদি ওঠে তবে এটা কি ঠিক নয় যে এতদিন বামপন্থী দলগুলোই ছিল আন্দামান বা বাংলার বাইরে অন্য রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং সেজন্য তাদের সর্বাধিক আস্থাভাজন? যাদের কাছে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়ার বিশেষ কোনও কারণ নেই, এক কালে ক্ষমতাসীন কিন্তু বর্তমানে গদিচ্যুত দল বা দলগুলোর উসকানিতে স্থায়ী ঘরবাড়ি জমিজমা ছেড়ে তারা অনিশ্চিতের পিছনে ছুটবে তাদের প্রাক্তন সুহৃদদের বিব্রত করবার জন্যে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। হতে পারে যে বামপন্থী দলগুলোর পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে তাদের আশা হয়েছিল যে এবার হয়তো তাদের অবস্থাটা একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হবে। কিন্তু আসল কারণ কারও উসকানি বা প্ররোচনা নয়, সুষ্ঠু জীবনযাপন ও অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের তাগিদ। সে সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান না করেই যদি বর্তমান সরকার প্রত্যাগত শরণার্থীদের পত্রপাঠ বিদায় করেন তবে এই কথাই প্রমাণ হবে যে ক্ষমতা পেলে কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট দলে কোনও তফাত থাকে না। দু-পক্ষই ঘাড় থেকে আপদ বিদায় করতে পারলে বাঁচেন। ১৯৬৪ সালে যখন পূর্ববঙ্গ থেকে সদ্য আগত অগণিত হিন্দু-বৌদ্ধ বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক বা শিশু দণ্ডকারণ্যের প্রবেশদ্বারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তখনও প্রশাসনের এই চেহারাই দেখেছি। আমি সবে দণ্ডকারণ্যের ভার নিয়ে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ফিরছি, পথে এই ব্যাপার দেখে টেলিফোনে বলেছিলাম আমাকে অন্তত এক সপ্তাহের সময় দেওয়া হোক, যাতে এই জনস্রোত সামলাবার জন্য শিবির ও রসদ সংগ্রহ করতে পারি। তদানীন্তন সরকার আমার এই সামান্য অনুরোধও রাখেননি, তারা হয়তো ভেবেছিলেন যা শত্রু পরে পরে, আপাতত তো এই আপদ ঘাড় থেকে নামুক। বর্তমান প্রশাসনও কি সেই পন্থাই অবলম্বন করবেন? একবারও কি সরেজমিনে তদন্ত করে জানবার চেষ্টা করবেন না কেন এত লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসে? সে জাতীয় তদন্ত এক বা একাধিক মন্ত্রীর ভূপাল বা রায়পুর বা কোরাপুটে গিয়ে সেখানকার মন্ত্রী-মণ্ডলী বা উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের সঙ্গে আলাপ করে হবে না। তার জন্য চাই প্রশাসনে অভিজ্ঞতা, সংবেদনশীল মানবতাবোধ এবং সত্যসন্ধিৎসু মানসিকতা। এই সব গুণ যাঁর আছে তেমন একজন বা দুজন ব্যক্তি যদি মাসাধিককাল ধরে সমস্ত পুনর্বাসিত অঞ্চল ও উদ্বাস্তু শিবির পর্যটন করে, দণ্ডকারণ্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে ও তাদের কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তথ্যসংগ্রহ করেন তবে সে তদন্ত হবে বাস্তবধর্মী এবং ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী স্থির করবার সহায়ক। তা না করে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গতানুগতিকতার আশ্রয় নেন তবে উদ্বাস্তুরা যে তিমিরে আছে সে তিমিরেই থাকবে, তাদের সমস্যার কোনও সুরাহা হবে না এবং হয়তো কয়েক দশকের মধ্যে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উদ্বাস্তু

সমস্যা একটা মানবিক সমস্যা, একে রাজনৈতিক দাবাখেলায় পরিণত করলে শুধু ভুল নয়, অন্যায় হবে এবং সেই অন্যায়ের কোনও মার্জনা নেই।

২

দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা প্রথম কার মাথায় এসেছিল সেটা ঠিক করে বলা শক্ত। মনে হয় এটা বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট চিন্তাধারার সম্মিলিত ফল, এবং সে চিন্তাধারার মধ্যে উদ্বাস্তুদের সত্যিকারের পুনর্বাসনের ইচ্ছা যতটুকু জায়গা জুড়ে ছিল, তার চেয়ে বেশি জুড়ে ছিল অন্যান্য স্বার্থ, যেটা এখন পশ্চাদ্দৃষ্টির সাহায্যে ক্রমশ উদ্ঘাটিত হচ্ছে। জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে আর তিলধারণের স্থান নেই, অথচ বিভিন্ন ক্যাম্পে ডোলের উপর নির্ভর করে যারা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য একটা বন্দোবস্ত করা দরকার এবং সেটা হবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, এই ছিল বাংলা সরকারের এবং খুব সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারেরও মনোভাব। হঠাৎ কোনও উচ্চপদস্থ আমলার দৃষ্টি পড়ল এই ভূখণ্ডের উপর। কিন্তু আগে থেকেই এএমপিও নাম নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার অন্তর্গত ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ এলাকার খনিজ ও বনসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও শিল্পায়নের পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু বাধা ছিল বিস্তর। বিরলবসতি অঞ্চলে শ্রমিক জোটে না, আদিবাসীরা সংখ্যায় অল্প এবং ওদের জীবনযাত্রার ধরন ও নিয়মশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত শ্রমশিল্পের অনুকূল নয়। অনগ্রসর অঞ্চলে পায়ে চলার পথ আছে, পাকা সড়ক নেই, যন্ত্রচালিত যানবাহন তো দূরের কথা। যদি যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বাস্তুদের এখানে এনে বসানো যায় তবে এক ঢিলে অনেক পাখি মরে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করা হল বলে দাবি করা চলে, পরিকল্পনার রূপায়ণে রাস্তাঘাট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, শ্রমিক সমস্যার সমাধান হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের যে বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাদের পুনর্বাসনেরও একটা সুরাহা হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নার এটাই ছিল সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা। পশ্চিম পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য অকৃপণহস্তে অর্থব্যয় করার কাজে যারা ছিল তাঁর প্রধান সহায়, হঠাৎ দণ্ডকারণ্যের মতো একটা নতুন পরিকল্পনার সাহায্যে তাদের চাকুরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার সম্ভাবনায় তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। খুঁটিয়ে দেখা হল না, যাদের এখানে এনে ফেলা হবে, এখানকার আবহাওয়া তাদের সইবে কি না, যে বৃত্তি দ্বারা তাদেরকে জীবিকা অর্জন করতে বলা হবে সেই কৃষির

পক্ষে এখানকার মাটি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল কি না, যে ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে তাদের নতুন জীবনযাত্রা শুরু হবে সেখানে তারা অবাঞ্ছিত বা অপাংক্তেয় কি না। তা ছাড়া আরও একটা নিগূঢ় মতলব যে অন্তত কারও কারও মনে ছিল না একথা জোর করে বলা যায় না। দণ্ডকারণ্যের যে কাল্পনিক সীমারেখা টানা হল, তার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ বাদে আছে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের দু-তিনটি অনগ্রসর থানা। যেসব জায়গায় জমি উচ্চাবচ অনুর্বর ও বিরলবসতি সেখানে এই দুটি প্রাদেশিক সরকার দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জন্য কিছু জায়গা বিনামূল্যে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন এই শর্তে যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ যোগাযোগের পাকা রাস্তা তৈরি করার দায়িত্ব, সেচের দায়িত্ব এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দণ্ডকারণ্য প্রকল্প নিজ ব্যয়ে বহন করবে। এবং উন্নয়নের পর সিকি ভাগ জমি আদিবাসীদের স্বার্থে প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেবে। আপাতদৃষ্টিতে এতে আপত্তি করার কিছু নেই, জমি যখন বিনামূল্যে পাওয়া গেছে এবং রাস্তাঘাট যখন নিজের প্রয়োজনেই করতে হবে। কিন্তু ওড়িশা সরকারের নিগূঢ় মতলব ধরা পড়ল যখন দেখা গেল যে ছেড়ে দেওয়া জমিগুলো খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে বহু দূরে দূরে ছড়ানো। ওড়িশা সরকারের এই চালে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হল। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের মাথায় হাত বুলিয়ে বহু ব্যয়সাধ্য রাস্তঘাট তৈরি করিয়ে গোটা এলাকাটাই সহজগম্য করা হল অথচ ঘন-সন্নিবিষ্ট উদ্বাস্তু বসতির সম্ভাবনার গোড়ায় কুঠারাঘাত করে স্থানীয় রাজনৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে দেওয়া হল না। পরে দেখা যাবে যে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ বিপুল অর্থব্যয়ে যে দুটি সেচ পরিকল্পনার বাঁধ ও তার অববাহিকা তৈরি করেছেন তার প্রায় সমস্ত সুবিধাই স্থানীয় অধিবাসীদের ভাগে পড়েছে, উদ্বাস্তুদের জন্য যে ছিটেফোঁটা বরাদ্দ ছিল তাও প্রায় যাবার মুখে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার এমন চমৎকার উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়। আশ্চর্য এই যে, উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ অর্থের বিপুল একটা অংশের এইভাবে উদ্বাস্তু বহির্ভূত স্বার্থে বিনিয়োগ কারুর চোখে বিসদৃশ ঠেকেনি। ষষ্ঠ প্ল্যান কমিশনের নোটে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, দণ্ডকারণ্য প্রকল্পটি একটি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, পুনর্বাসন প্ল্যান নয়।

৩

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিবিরে অবস্থানকারী ডোল-নির্ভর উদ্বাস্তুদের শিবির থিকে সরিয়ে এনে তাদের কোনও বৃত্তিতে স্বনির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছায়। পুনর্বাসন মন্ত্রকের ধারণা ছিল এইসব শিবিরে অধিবাসীদের মধ্যে অন্তত শতকরা নব্বই জন কৃষিজীবী, বড়জোর দশজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা ক্ষুদ্র

শিল্পী। পরিকল্পনার কাঠামোও সেইভাবে তৈরি হল— ক্ষুদ্রশিল্প বা ব্যবসায়ের জন্য বরাদ্দ হল যৎসামান্য টাকা, বাকিটা চাষি পরিবারের জন্য। যেখানে যেখানে যখনই একলপ্তে কিছুটা জমি পাওয়া গেছে, তখনই সেখানে গাছ উপড়ে জঙ্গল কেটে জমিটা চাষের উপযুক্ত মনে করে গ্রাম পত্তন করা হয়েছে এবং ৩০ থেকে ৫০টি পরিবার সেখানে পাঠিয়ে জমিতে বসিয়ে বলা হয়েছে যে তিন বৎসর তারা জীবনধারণের জন্য সামান্য কিছু ডোল পাবে, হাল-লাঙ্গল-বলদের জন্য লোন পাবে এবং তিন বৎসরের মধ্যে স্বনির্ভর হতে হবে কারণ তার পরে আর ডোল মিলবে না। শিল্প বা ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ব্যবস্থায় কার্পণ্য আরও বেশি। তাদের বেলায় ডোলের মেয়াদ মাত্র তিন মাস। একথা কারও মনে হল না যে, যে গ্রামের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে নীচের ধাপে সেখানে কাদের এমন ক্রয়ক্ষমতা আছে যাদের উপর নির্ভর করে একজন ব্যবসায়ী দোকান খুলতে পারে বা একজন শিল্পী নিজের শিল্পনৈপুণ্যের বলে জীবিকা অর্জন করতে পারে। পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের বেলায় কিন্তু এ রকম করা হয়নি, বলা হয়নি যে 'once an agriculturist, always an agriculturist'.

যে যেখানে যেভাবে পেরেছে পুরনো বা নতুন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার জন্য প্রাপ্য সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবার প্রশ্নই ওঠেনি। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে এই কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবীর জাতিভেদে অনড় হয়ে থাকার দরুন পুনর্বাসন বিঘ্নিত হয়েছে, ক্রমবর্ধমান দুর্দশার দরুন অসন্তোষ বেড়েছে, এই অসন্তোষের প্রকাশ হয়েছে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা প্রধান তাদের মুখে। দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ মনে করেন এই সব স্থানীয় নেতারাই যত অশান্তি আন্দোলনের মূলে। সেটা অসম্ভব নয়, কিন্তু গোড়ায় যেখানে গলদ, পুনর্বাসন যেখানে কাগজে কলমে কিন্তু কাজে নয়, সেখানে অসন্তোষের মূলোচ্ছেদ না করলে এরকম পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না যদি ফ্লেচার বা সুকুমার সেনের পরামর্শ শুনতেন তবে অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াত। পাঞ্জাব কেডারের করিতকর্মা অফিসার ফ্লেচার খুব সুনামের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ করেছিলেন এবং এখানে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুনর্বাসনের কাঠামোটা খাড়া করবার কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর একটা মস্ত বড় দোষ ছিল, সব সময়ে Yes Sir বলতে জানতেন না— সুতরাং তাঁকে যেতে হল। কিছুদিন পরে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের চাপে পড়ে শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না সুকুমার সেনকে চেয়ারম্যান করে নিতে বাধ্য হলেন কিন্তু নানাদিকে তার ক্ষমতা সীমিত করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে বার বার রুদ্ধ দেওয়ালে মাথা ঠোকাই তাঁর সার হল, শ্রীখান্নাকে দিয়ে কিছুতেই একথা মানাতে পারলেন না যে, একান্তভাবে কৃষিনির্ভর দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, দ্রুত শিল্পায়ন

ছাড়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের আর কোনও পথ নেই। এই শ্রীখান্নাই কিন্তু ১৯৬৪ সনের বিপুল উদ্বাস্তু আগমনে ভড়কে গিয়ে আমাকে SOS পাঠিয়েছিলেন, বহু শিল্প প্রস্তাব নিয়ে আমার সঙ্গে রায়পুরে দেখা কর। যেন বিভিন্ন শিল্পের পরিকল্পনা ও প্ল্যান এতই সহজ যে ম্যাজিসিয়ানের খরগোশের মতো তা টুপি থেকে বার করা যায়।

৪

আমি মোট দশ মাস দণ্ডকারণ্যে ছিলাম। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ পদত্যাগ করি। এই সময়ের মধ্যে পুনর্বাসনের যে চেহারা আমার চোখে পড়েছে সেটা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। তার বিস্তৃত বিবরণ বোম্বে Economic Weekly-র সম্পাদক শচীন চৌধুরীর অনুরোধে ওর কাগজে প্রকাশের জন্য লিখে পাঠাই এবং ১৯৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে পর পর তিনটি সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। তার খানিকটা চুম্বক নীচে তুলে দিচ্ছি।

১৯৬৪ সনের জুন পর্যন্ত পুরাতন শরণার্থী পরিবারের সংখ্যা ছিল ৭৫০০। যার মধ্যে ৭২৬১টি পরিবারকে তথাকথিত কৃষি জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যিই কি এদের সকলে একান্তভাবে স্বনির্ভর হয়ে পুনর্বাসিত হয়েছিল? চাষের জমির উপর যাদের নির্ভর সে সব পরিবারের লোকসংখ্যা যদি ৪$^{১}/_{২}$ বলে ধরা হয় তবে হিসাব করে দেখা গেছে যে জীবিকার প্রয়োজনে অন্তত ৬০ মণ ধান জমি থেকে তুলতে না পারলে জীবিকা নির্বাহ কঠিন— ৩৫ মণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজনে, ৭ মণ বীজ ধানের জন্য ও ১৮ মণ ধান বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য। একর পিছু ১৫ মণ ধান না হলেও অন্তত ১১ কি ১২ মণ ধান হওয়া দরকার। যদিও সমস্ত ৬ কি ৬$^{১}/_{২}$ একর জমিই ধান চাষযোগ্য ছিল না। একটু খতিয়ে দেখা যাক, ১৯৬৪ সনের মাঝামাঝি যে ৭৫০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয় (কৃষি জমিতে ৭২৬১, বাদবাকি ক্ষুদ্র শিল্প) তার মধ্যে কত অংশ এই অবস্থায় পৌঁছেছিল।

(১) প্রথম যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হল সেটা ১৯৫৯ সনে ফরাসগাঁও অঞ্চলের তিনটি গ্রামে— কৃষিতে ২০৫টি পরিবার, ক্ষুদ্রশিল্পে ৪৬টি। জমি অনুর্বর, সুতরাং এক বছর প্রচুর রাসায়নিক সার সংযোগে ফলন ভাল হলেও গড়ে একর পিছু ৪/৫ মণের বেশি ফলন হয়নি। সর্বশেষ হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ৩২টি পরিবারের ভূমি একেবারে নিষ্ফলা, ১৩১টি পরিবারের ভাগ্যে জুটেছে সর্বসাকুল্যে ৩০ মণ ধান, ১৬টি পরিবারের ৩১ থেকে ৪০, ৫টি পরিবারের ৪১ থেকে ৫০ এবং ২১টি পরিবারের ৫০ মণের উপর। এরা যে তবু বেঁচে ছিল সেটা পুনর্বাসনলব্ধ কৃষিজমি

বা ক্ষুদ্রশিল্পের জোরে নয়, বোরগাঁও গ্রামে দণ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত দারুশিল্পের দৌলতে, সেখানে চাকুরি করে, অথবা দিনমজুরি খেটে অথবা অন্যত্র ফালতু কাজ জোগাড় করে। ছেচল্লিশটি শিল্পী পরিবারের অবস্থাও তথৈবচ— ১২টি পরিবার শিল্প থেকেই কোনও রকমে টিকে আছে, বাকি সব শিল্পগুলিই মুমূর্ষু অথবা মৃত। ওদের বেলাতেই দণ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত দারুশিল্পই ভরসা।

(২) তার পর পত্তন হয় ওড়িশার উমরকোট অঞ্চলের উমরকোট ও তার কাছে বা দূরের ২৪টি গ্রাম এবং বহু দূরে বিশ্লিষ্ট রায়গড় ও তৎসন্নিহিত বিভিন্ন স্থানে আরও ২৪টি গ্রাম। উমরকোটে ১২৪০টি পরিবার বসানো হয়েছিল, আর রায়গড়ে ২৫৪৬টি। উমরকোট অঞ্চলের গ্রামগুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত ছিল এই যে, ১৭৬টি পরিবারের জমি একেবারেই ধান চাষের অনুপযুক্ত, ৫১টি পরিবারের জমির মধ্যে এক একর মাত্র এই চাষোপযোগী, ১০৭টি পরিবারের ২ একর, ১৭৬টি পরিবারের ৩ একর ইত্যাদি। যদি একর পিছু ফলন ১০ মণই ধরা যায় (যদিও সেটা দুষ্প্রাপ্য) তবে অন্তত ৪ একরে ধান না হলে একটি পরিবারের গ্রাসই চলে না, আচ্ছাদন তো দূরের কথা। ১৯৬৪ সনের জানুয়ারিতে যখন পরিবার পিছু কত খাদ্যশস্য মজুত আছে তার হিসাব নেওয়া হল, তখন দেখা গেল ১২১টি পরিবারের হাতে আছে ৫০ মণ, ১০৮টি পরিবারের ৪০ থেকে ৫০ মণ, ২১৯টি পরিবারের আছে ৩০ থেকে ৪০ এবং ৪৫২ পরিবারের ৩০ মণের নীচে। তার মধ্যেও ১২১টি পরিবারের ভাঁড়ার একেবারে শূন্য এবং ১১১টি পরিবারের হাতে ১০ মণেরও কম। উমরকোটকে তখনকার মতো বাঁচিয়ে রেখেছে ভুট্টা, মুগ, মেস্তা প্রভৃতি বিকল্প শস্যের চাষ এবং বিশেষ করে ভাস্কল বাঁধে মাটি কাটার দিনমজুরি কাজ; কিন্তু শেষেরটা তো চিরস্থায়ী নয়। এই ভাস্কল বাঁধ শেষ হয় আমি চলে আসবার কিছু পরে, কিন্তু এর সম্বন্ধে একটা জিনিস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং ওড়িশার পুনর্বাসন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বাঁধটা করা হচ্ছিল বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে, দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন প্রকল্পের বাজেট থেকে। আশা করা অন্যায় নয় যে, এর বেশির ভাগ সেচের সুবিধাই পাবে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত গ্রামগুলি, যদিও স্থানীয় অধিবাসীরাও বঞ্চিত হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা গোড়া থেকেই ছিল অন্যরকম— সেচ প্রকল্প তৈরিই হয়েছিল এমনভাবে যে এর জল দ্বারা সিঞ্চিত ১১০০০ একর জমির মধ্যে মোটে ১১০০ একর জমি ছিল উদ্বাস্তুদের, বাকি সবটা স্থানীয় অধিবাসীর। অর্থাৎ গোড়া থেকেই সেচ প্রকল্পের এক-দশমাংশ জল উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ ছিল, বাকিটা অন্যের। যারা এই প্রকল্পের জন্মদাতা তারা দণ্ডকারণ্য প্রশাসনের অফিসার, ওড়িশা সরকারের নয়, কিন্তু পরিকল্পনা দেখে সে কথা মনে করা শক্ত। কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়, আর একটু পরিশিষ্ট আছে। ভাস্কল বাঁধের

নির্মাণ শেষ হলে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ তার পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিলেন ওড়িশা সরকারের হাতে এবং তারাও সে সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েননি। সর্বশেষ সংবাদ এই যে, ছিঁটেফোঁটা যেটুকু জল উদ্বাস্তুদের জমির ভাগ্যে জুটেছিল, খালের মুখ বন্ধ করে ওড়িশা সরকার সেটুকু থেকেও তাদের বঞ্চিত করেছেন। শুধু উমরকোট দণ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত Experimental Farm-এর জন্য যতটুকু জল দরকার সেটা বাদ দিয়ে। রায়গড়ের গ্রামগুলোর অবস্থা আরও খারাপ বলে আমার শোনা ছিল, কিন্তু তার সঠিক তথ্য আমার কাছে নেই।

(৩) উমরকোটের পর মধ্যপ্রদেশের পারলকোট অঞ্চলে বসতি হয়। এখানকার জমি মোটের উপর ভাল, মধ্যপ্রদেশ সরকারের ব্যবহারে দু-মুখী নীতি নেই এবং দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের অর্থে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার প্রবৃত্তিও দেখা যায়নি। আমি যখন ছিলাম তখন সম্প্রতি ৪৫টি গ্রামে ২২৩৯টি পরিবার বসানো হয়েছে তার মধ্যে সে বছর ৫১১টি পরিবার ৩০ মণের ঊর্ধ্বে ধান পায়। বাকিরা পায় তার কম। আঞ্চলিক প্রশাসন এটাকে নৈরাশ্যজনক মনে করেননি এবং বলেছিলেন, ওখানকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভাল, গ্রামগুলো খুব দূরে দূরে নয় এবং যে ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প সবে আরম্ভ হয়েছিল তার বারো-আনা সুবিধাই পাবে উদ্বাস্তু জমিগুলি।

(৪) সকলের শেষে পত্তন হয় মালকানগিরি অঞ্চল এবং এখানেই যত গোলমালের সূত্রপাত। এই স্থানটির নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে এবং ওড়িশা সরকার দণ্ডকারণ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে এই দূরবর্তী এবং একান্ত অনগ্রসর প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চলকে উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। আমার সময়ে (১৯৬৪) মোট ১০২৩টি পরিবার ২৩টি নব প্রতিষ্ঠিত গ্রামে ছড়িয়েছিল এবং তাদের যোগাযোগের জন্য রাস্তাঘাট ইত্যাদির কোনও বালাই ছিল না। পাথুরে জমিতে নলকূপ বসে না, উচ্চাবচ জমিতে বর্ষার জল গড়িয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে উপরের মাটির আস্তরণের গভীরতাও হ্রাস পেয়ে চাষের অনুপযোগী হয়। তখন সবেমাত্র গ্রামগুলির পত্তন হয়েছিল, পরিবার পিছু জমি বিভাগ সম্পূর্ণ হয়নি, এক একটা গ্রাম যৌথভাবে চাষ করে যে ফসল পেয়েছিল, তার একটা হিসাব আমি করেছিলাম। সেটা এই রকম— ৬৩৯টি পরিবারের উৎপাদন পরিবার পিছু অনধিক ২০ মণ এবং ৪০টি পরিবারের উৎপাদন ২০ থেকে ৩০ মণ। ৩১ থেকে ৫০ মণ উৎপাদনকারীর সংখ্যা ১৮০। অর্থাৎ পরিবার পিছু ৬০ মণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলে মানকানগিরির শতকরা ৮৫টি পরিবারে সেই সংস্থান ছিল না। মালকানগিরি সম্পর্কে পরে আরও কিছু বক্তব্য আছে— কিন্তু সেটা বর্তমান অথবা প্রাক্-বর্তমান সময়ের কথা।

৫

কেন পুনর্বাসন হতে পারল না?

কৃষি ভিন্ন পুনর্বাসনের অন্য ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন ক্ষুদ্রশিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ অথবা দণ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে দিনমজুরি বা বেতনভুক কাজ। বোরাগাঁও, জগদলপুর (ধরমপুরা), উমরকোট, আম্বাগুদা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের নিজস্ব ছোট বড় কয়েকটি যন্ত্রচালিত কারখানা ছিল, কিন্তু তাদের উৎপাদন যৎসামান্য ও বরাবর ক্ষতির অঙ্কটা বেড়ে যাচ্ছিল বলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাতে যে সব উদ্বাস্তু কাজ পেয়েছিল তাদের সংখ্যা যৎসামান্য এবং তাদের মজুরিও আইনে বেঁধে দেওয়া রেটেরও কম। বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, শুধু এইটুকু বলা দরকার যে, বছরের পর বছর ক্ষতিস্বীকার করে এই যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো চালনা হচ্ছিল, সেখানে কাজ নেওয়াকে আর যাই হোক, পুনর্বাসন বলা চলে না। যেদিন দণ্ডকারণ্য প্রকল্প গুটিয়ে ফেলা হবে অথবা তারও আগে যেদিন ক্ষতির পরিমাণে ভয় পেয়ে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুটিয়ে ফেলবেন, সেদিন এরাও বেকার হয়ে পড়বে।

আর যেভাবে পুনর্বাসন হতে পারত এবং হওয়া উচিত ছিল, দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ তার ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। সে হল দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের মধ্যেই যে সব চাকুরি আছে বা খালি হয় বা নতুন সৃষ্টি হয়, তাতে উদ্বাস্তুদের বা তাদের পরিবারভুক্ত লোকদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের পূর্ত কার্যগুলি ঠিকাদারদের হাতে না দিয়ে একটা রেট অনুসারে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বণ্টন করা। শেষের পদ্ধতি, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় যত দিন চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, ততদিন চলেছিল। তিনি চলে আসবার পর বন্ধ হয়ে যায়। প্রকল্পের চাকুরিতে অগ্রাধিকার কোনও কালেই মানা হয়নি এবং এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আসতে হবে এই ছুতো দেখিয়ে তাদের চেষ্টা করে বাদ দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোনো কর্মখালি বা নতুন নিয়োগের সম্ভাবনা থাকলে ভিতরের খবর যারা জানেন, সেই সব অফিসার সুদূর প্রত্যন্তপ্রদেশ থেকে নিজেদের কোনও আত্মীয়কে আনিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে রাখেন এবং কলকাঠি এমন করে নাড়েন যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসার তারই নাম সুপারিশ করে পাঠান। সুদূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেরা না করতে পারে নাম রেজেস্ট্রি, না পারে জানতে কোথায় নতুন নিয়োগ হবে।

গোড়া থেকেই দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। তার প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিমাতৃসুলভ মনোভাব এবং সহানুভূতির অভাব। অফিসারদের মধ্যে অনেকেই এটাকে অন্য সাধারণ কাজের মতোই গ্রহণ করেছেন,

মানবিকতাবোধ থেকে করেননি। অনেক অফিসার নিজেদের প্রাদেশিক সরকারে অবাঞ্ছিত হয়ে এইখানে আশ্রয় পেয়েছিল, সুতরাং টিকে থাকবার তাগিদে তাদের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। দরদ যে কোথাও ছিল না তা নয়, কিন্তু সেটা বেশির ভাগ নীচের ধাপে, উপরতলায় নয়। উদ্বাস্তু বাঙালির ভাষা ও ধাত বোঝে এমন বেশি বাঙালি অফিসার দণ্ডকারণ্যে নির্বাসনে যেতে চাননি। প্রায় সর্বোচ্চ স্তরে যে দুজন বাঙালি অফিসার সেখানে গিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করবার সাহস দেখিয়েছিলেন, সেই নির্মল সেনগুপ্ত ও শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হল এবং বশংবদ অন্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। সবচেয়ে মর্মান্তিক হল ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের তিরোভাব এবং সুকুমার সেনের অকালমৃত্যু। ডা. রায় যদি বেঁচে থাকতেন, তবে মেহেরচাঁদ খান্না সুকুমার সেনকে ঠুঁটো জগন্নাথ করবার সাহস পেতেন না এবং পদে পদে তাঁর প্রস্তাবগুলো উপেক্ষা করতে পারতেন না। সুকুমার সেন বা আমি যদি ডা. রায়কে বোঝাতে পারতাম, কোথায় গলদ এবং কী তার প্রতিকার, তবে তার মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের কাছে শ্রীখান্না কি ত্যাগী [মহাবীর] মাথা তুলতে পারতেন না! দুঃখের বিষয় তাঁর স্থলাভিষিক্ত যাঁরা হলেন, তাঁদের প্রথম ও প্রধান চিন্তা হল কী করে উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব এড়ানো যায়। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের একবার ঘাড় থেকে নামিয়ে তারা আর সেদিকে নাক গলাতে চাইলেন না, মানবিকতাবোধের জন্যও না। আর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ভারপ্রাপ্ত প্রাদেশিক সচিব বা মুখ্য সচিবের কথা না বলাই ভাল— তারা দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে এতখানি নিস্পৃহ হয়ে উঠলেন যে, ত্রৈমাসিক মিটিংগুলোতে যোগদান অনাবশ্যক মনে করে হাত গুটিয়ে রইলেন।

৬

১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে আমি পদত্যাগ করে দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসি এবং তারপর থেকে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। বর্তমান পরিস্থিতি ও তার কারণ সম্বন্ধে নীচে যা লিখছি সেটা কতক সরকারি নথিপত্র ও রিপোর্টের নকলের উপর ভিত্তি করে লেখা, যার সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। সেগুলি বেশির ভাগই মুখ্য প্রশাসকের নোট যা তিনি বিভিন্ন সময়ে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের ত্রৈমাসিক অধিবেশনের সময় পেশ করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চান, তবে সবচেয়ে ভাল হয় যদি তাঁরা অভিজ্ঞ, দরদি ও সত্যসন্ধিৎসু কোনও অফিসার পাঠিয়ে আসল ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা করেন।

দলে দলে গ্রাম বা শিবির ছেড়ে এই যে উদ্বাস্তুদের পলায়ন এটা কিছু নতুন নয়। প্রতি বছরই এরকম হয়, কখনও কম কখনও বেশি। ষষ্ঠ প্ল্যানিং কমিশনের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আজ পর্যন্ত ৪২,২১৩টি উদ্বাস্তু পরিবার দণ্ডকারণ্যে এসেছিল এবং তার মধ্যে ৩০,১৫৯টিকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই কিঞ্চিদধিক ত্রিশ হাজার পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৮৮৩৬টি পরিবার পলাতক এবং যে প্রায় বারো হাজার পরিবার শিবিরে পুনর্বাসনের প্রত্যাশায় দিন গুনছিল, তাদের মধ্যেও ৭০৭৫টি পরিবার শিবির ছেড়ে চলে গেছে। কোথা থেকে এবং কখন গেছে, তার একটা গাণিতিক হিসাব নীচে দিচ্ছি, যা থেকে বোঝা যাবে কেন এই প্রবণতা।

১৯৬৫ সনের শেষ তিন মাসে পলাতকের সংখ্যা ১৪০০, যার মধ্যে শিবিরত্যাগী ১৬৩ জন, উমরকোট থেকে পলাতক ২৫৬ জন এবং মালকানগিরি থেকে পলাতক ৯৫৭ জন। কোণ্ডাগাঁও এবং পারলকোট থেকে পলাতকের সংখ্যা নগণ্য।

১৯৬৬-এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পলাতকের সংখ্যা ২১৭০। যার মধ্যে শিবিরবাসী ২৩৩, উমরকোট থেকে পলাতক ৩৮৪ এবং মালকানগিরি থেকে পলাতক ১৪৮২। এ সময়েও কোণ্ডাগাঁও ও পারলকোটের পলাতকের সংখ্যা নগণ্য।

১৯৬৭-র প্রথম তিন মাসে পলাতকের সংখ্যা বেশি নয়— মোটে ৩৭৩। শিবির থেকে কেউ পালায়নি, কিন্তু উমরকোট থেকে পালিয়েছে ১২৩ এবং মালকানগিরি থেকে পালিয়েছে ১৮৯টি পরিবার। এবারও কোণ্ডাগাঁও ও পারলকোটের রেকর্ড ভাল।

অর্থাৎ ওড়িশার অন্তর্গত যে দুটো অঞ্চলে বেশি পরিমাণে উদ্বাস্তু বসানো হয়েছিল, পলায়নের হিড়িক সেখানেই বেশি, আর মধ্যপ্রদেশের দুটো অঞ্চল থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি খুব স্তিমিত। এর কারণ অনুসন্ধান করা দরকার।

এর পেছনে রাজনৈতিক দলবাজি আছে বা গ্রামসেবকদের উসকানি আছে, সেটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রকল্পের কোনও একজন অফিসার নাকি বলেছেন, উদ্বাস্তুরা শ্রমবিমুখ তাই পালায়। একথাও যে অবিশ্বাস্য তা মুখ্য-প্রশাসকের বিভিন্ন সময়ের উক্তি থেকেই প্রমাণ করা যায়। ১৯৬৬ সনের ১৫ আগস্টের নোটে তিনি স্বীকার করেছেন, "The settlers are putting in excellent efforts in all zones".

এবং যে বোরগাঁও ও যুগানী অঞ্চলে ধান চাষ বিফল হয়েছে, সেখানে দো-আঁশলা ভুট্টা বুনে প্রচুর ফসল ফলিয়েছে। তার আগের আগের বছরগুলিতে অজন্মার দরুন যখন ফসল ফলল না বললেই চলে, তখনও উদ্বাস্তুরা যে যেখানে পারে শ্রমের কাজ জুটিয়ে নিয়েছে এবং প্রকল্পের পাথরভাঙা, মাটিকাটা ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজে ৫০০০ থেকে ৮০০০ উদ্বাস্তু হাড়ভাঙা খাটনি খেটেছে, যার বাজার মূল্য অন্তত কুড়ি লক্ষ টাকা (২০.১.৬৬ তারিখের নোট)।

তাহলে এখন করণীয় কী?

তাহলে কেন এই গৃহত্যাগ? উত্তর অতি সোজা এবং মুখ্য-প্রশাসকের বিভিন্ন সময়ের নোট থেকেই তা প্রমাণিত হয়। পলায়নের কারণ অজন্মা, খাদ্যাভাব, অর্থাভাব ও অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা, নিদেনপক্ষে দেশের মাটিতে শেষ নিশ্বাস ফেলার ইচ্ছা।

বিভিন্ন উদ্বাস্তু অধ্যুষিত গ্রামে এবং অনুর্বর জমিতে উৎপন্ন ফসল যে কী রকম অপ্রচুর এবং অভাব কী রকম নিদারুণ তা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৬৪ সনে একটি গ্রামের বধূ আমাকে বলেছিল, "খিদে কাকে বলে, ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় ছটফট করলে কী রকম লাগে, তা আপনারা জানেন না, আমরা জানি।" ১৯৬৫ সনের একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট উল্লেখ করে মুখ্য-প্রশাসক লিখছেন যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ পুরুষের ওজন যেখানে ১৩১ পাউন্ড, একজন উদ্বাস্তু পুরুষের ওজন সেখানে মাত্র ৮৩ পাউন্ড। সাধারণ মেয়েদের বেলায় ওজন যেখানে ১২০ পাউন্ড, উদ্বাস্তু মহিলার ওজন সেখানে ৭৪ পাউন্ড। ১৯৬৬ সনের জুন মাসে অন্নাভাব সত্ত্বেও আগে গোলমাল হয়নি, বিক্ষোভ হল তখন যখন শোনা গেল যে, জগদলপুরে অনাহারে একটি মৃত্যু ঘটেছে।

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের কৃষিজমির উপর আগে থেকেই শনির দৃষ্টি ছিল এবং কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের জন্য যা করেছেন, তা অপ্রচুর এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিপরীত-ফলপ্রসূ। বর্ষানির্ভর জমিতে ধান ফলে না, চাই তার জন্য সেচের জল এবং জমির অম্লতা নিবারণের জন্য রাসায়নিক সার। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি সুকুমার সেনের চেষ্টায় সমস্ত এলাকা সার্ভে করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তাতে তারা স্পষ্ট চেয়েছিলেন বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা না ফেঁদে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত প্রত্যেকটি বিভিন্ন গ্রামে ক্ষুদ্রসেচ পরিকল্পনার প্রবর্তন। তাতে সেচের সমস্ত জলটাই উদ্বাস্তু গ্রাম পাবে এবং সময় ও অর্থ দুই-ই সংক্ষেপিত হবে। কিন্তু দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের ঝোঁক grandiose scheme-এর দিকে— যিনি সেচ বিশেষজ্ঞ তাঁর অভিজ্ঞতা বড় বড় বাঁধ তৈরি করানো, সুতরাং ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা বানচাল হল। বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা যায়, কিন্তু ভাস্কল বাঁধের বেলায় দেখা গেছে, ষোল আনা সুবিধাই গেছে স্থানীয় অধিবাসীদের অনুকূলে।

সুকুমার সেনের সময় থেকে ঠিক ছিল যে, প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবার ৭ একর জমি পাবে। ৬$^{১}/_{২}$ একর চাষের জমি ও $^{১}/_{২}$ একর ঘরবাড়ি তৈরি ও সবজিবাগান করার জন্যে। সেচের জল পেলে এই পরিমাণ জমিতে গ্রাসাচ্ছাদন ভালভাবেই চলতে পারে, কিন্তু আমি যখন চলে আসি, তখন শোনা গেল কর্তৃপক্ষ ভাবছেন ৭

একরকে কমিয়ে ৫ একরে দাঁড় করানো যায় কি না, কারণ তাহলে সমপরিমাণ জমিতে বেশি করে উদ্বাস্তু বসানো যাবে। শেষে তাই হল। সর্বশেষ খবর এই যে, পাঁচ একরও বড় বেশি। ওটা কমানো দরকার, তা না হলে নবাগত উদ্বাস্তুদের জায়গা দেওয়া যাবে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল যে, যে সব জায়গায় সেচের জল পাওয়া যাবে সেখানে পরিবার পিছু তিন একরের বেশি জমি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়', সুতরাং মালকানগিরিতে কবে পাঁচ-ছয় বৎসর পরে, পটেরু বাঁধের জল পাওয়া যাবে, সেটা অনুমান করে তখন থেকেই সেই ভবিষ্যৎ সেচ খালের আওতায় পড়ে এমন সব জায়গায় উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট হল মাত্র তিন একর জমি এবং সেখানেই তাদের বসানো হল।

অভাব এবং অজন্মা যে কী রকম নিদারুণ সেটা বার বার মুখ্য-প্রশাসকের নোটে প্রতিফলিত হচ্ছে, কিন্তু তার প্রতিকারে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব নির্ধারিত হস্ত-সঙ্কোচনের নীতি শিথিল করে যে অপেক্ষাকৃত উদার হস্তে সাহায্য দেওয়া দরকার, সেটা করতে অনেকদিন তাঁর সাহস হয়নি। ১৯৬৬-এর ২৬ জানুয়ারি তিনি স্বীকার করেছেন যে, খাদ্য-পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক এবং সেটাই উদ্বাস্তু পলায়নের প্রধান কারণ। সাত মাস পরে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে বলা হল, যেহেতু দণ্ডক ত্যাগের পিছনে দুই-তৃতীয়াংশই হল ক্ষুধার তাড়না, সেহেতু মুখ্য-প্রশাসক চেষ্টা করুন, যাতে উদ্বাস্তুরা সেচের জল পান। কোত্থেকে জল আসবে সে প্রশ্নের ধার কাছ দিয়েও তাঁরা গেলেন না। তখন পর্যন্ত পটেরু সেচ পরিকল্পনা ভবিষ্যতের গর্ভে এবং শক্তিগুদা ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা সবে শুরু হয়েছে!

দশ বছর পরেও অবস্থা যথাপূর্বং। ১৯৭৭-এর ১৯ আগস্ট মুখ্য-প্রশাসক লিখছেন, '১৯৭৬ সনে অনাবৃষ্টিতে মালকানগিরি অঞ্চলের দুর্দশার সীমা ছিল না। কাগজে কলমে ৩৩৮৩৮ একর জমি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য দেওয়ার কথা থাকলেও অনাবৃষ্টির দরুন এর সিকি ভাগে আদৌ চাষ হয়নি এবং বাদবাকি যেটুকু চাষ হয়েছে, সেটা প্রায় না হওয়ারই সামিল। যেখানে ১৯৭৫ সালে একর পিছু ৫.১৮ কুইন্টাল ধান পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে ১৯৭৬ সালে পাওয়া গেল মাত্র ১.৯৫ কুইন্টাল। অন্যান্য আয়ও এমনভাবে হ্রাস পেয়েছে, একটি পরিবারের বার্ষিক আয় ২৬৩৫ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১৪৪১ টাকা। এদিকে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বমুখী, বিশেষ করে চাল ও গমের দাম।'

আর পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই, কারণ তাতে একই কথার পুনরাবৃত্তি হবে। দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে, বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত মালকানগিরির বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যে অনাবৃষ্টি ও অজন্মা প্রায় নিত্যসাথী হয়ে দাঁড়িয়েছিল উদ্বাস্তুদের দলে দলে গ্রাম ও শিবির ত্যাগের সেইটেই হচ্ছে আসল কারণ। কিন্তু আরও একটা

কথা বলা দরকার, কারণ 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'র মতো এখানে রাজনীতি এসে মাথা গলিয়েছে।

উদ্বাস্তুদের মালকানগিরি ত্যাগের আর একটা প্রধান কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের প্রকাশ্যে-ঘোষিত আপত্তি এবং জোর করে জমি বেদখল। উমরকোটের ভাস্কল বাঁধের কথা আগেই বলেছি আর পুনরাবৃত্তি করব না। মালকানগিরিতে ওড়িশা সরকার তার চেয়েও এক ধাপ উপরে উঠেছেন। ক্ষুদ্র শক্তিগুদা বাঁধ দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে থাকুক, বৃহত্তর পটেরু সেচ পরিকল্পনার রূপায়ণ পুরোপুরিভাবে ওড়িশা সরকারের হাতে থাকবে এবং তার ৩০ কি ৪০ কোটি টাকার ব্যয়ভার সম্পূর্ণ বহন করবেন দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ।

বশংবদ দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ তাতেই রাজি হলেন, শুধু বললেন, সেচলব্ধ উপকারের ছিটেফোঁটা যেন তাদের ভাগ্যে জোটে এবং হাজার চল্লিশেক একর জমি উদ্বাস্তুদের জন্য দেওয়া হয়। ওড়িশা সরকার বললেন, 'তথাস্তু' কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল, তার বিপরীত। ৪০,০০০ একরের প্রথম কিস্তি জমির দখল নিতে গিয়ে দেখা গেল যে, আগে থেকেই আদিবাসী ও স্থানীয় অধিবাসীরা লাঙ্গলের দাগ কেটে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলে গেছে। সত্য-মিথ্যা জানি না, ওড়িশার প্রথম সারির একজন লোকবিশ্রুত নেতা ১৯৭৪ সনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, কোরাপুট কুরুক্ষেত্র হবে যদি এখানে মানা শিবির থেকে কোনও উদ্বাস্তু পাঠানো হয়। মানা থেকে আসতে গররাজি উদ্বাস্তুদের ইমার্জেন্সির সুযোগে রাতের অন্ধকারে মালকানগিরিতে এনে ফেলা হল, কিন্তু তারা জমি পেলেন না, মাথা গোঁজবার সাহায্য যেটুকু পেলেন, সেটা নামমাত্র। ১৯৭৭ সনের অক্টোবর মাসে ওড়িশার রাজস্বমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করলেন যে, দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জমি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদিবাসী ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সমান সমান বণ্টন না করলে মালকানগিরি অঞ্চলে আর কোনও উদ্বাস্তুকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীও নাকি কেন্দ্রের কাছে এই সুপারিশ করেছেন। যে সব জমিতে লাঙ্গলের দাগ কেটে স্থানীয় লোকেরা উদ্বাস্তু জমির উপর অনধিকার প্রবেশ করেছিল সে সম্বন্ধে ওড়িশার চিফ সেক্রেটারি যদিও বলেছেন, তাদের তুলে দেওয়া হবে, তাঁর সহকর্মী রিলিফ সেক্রেটারি বলেছেন, 'তা কী করে হয়? জবরদখলকারীদের না হয় তুলে দিলাম কিন্তু আদিবাসীদের গায়ে হাত দিই কী করে?'

১৯৭৪ সালে কোরাপুটের জনসভায় বিষোদগারের পর এবং ১৯৭৫ সনের মন্ত্রীদের উক্তির পর উদ্বাস্তুরা যদি মালকানগিরিতে না যায় বা যারা গেছে তারা ফিরে আসে তবে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি?

৭

তাহলে করণীয় কি? দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের কি কোনও ভবিষ্যৎ আছে, না যদি থাকে, তবে যারা ফিরে এসেছে এবং যারা ভবিষ্যতে ফিরে আসতে পারে, তাদের বিকল্প ব্যবস্থা কী?

এর পরিষ্কার উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া শক্ত, কিন্তু দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার কয়েকটা কথা মনে হয়।

দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের গোড়াতেই যে গলদ ছিল, সেটা এখন স্বীকার করা উচিত। অহল্যাকে হলকর্ষণোপযুক্ত না করে এবং আর কৃষিজমি না বাড়িয়ে দেখা উচিত মানা, কাঁকেব, জগদলপুর, নারায়ণপুর, রাজোর, মাইনস প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শিল্পনগরী গড়ে তুলে উদ্বাস্তুদের অগ্রাধিকার দিয়ে সেই সেই শিল্পে নিয়োগ করা যায় কিনা। কিছু কিছু শিল্পের কাঁচামাল দণ্ডকারণ্যেই পাওয়া যাবে, বাকিটা আনতে হবে— কিন্তু এখন যাতায়াতের সড়ক ও রেলপথ তৈরি হওয়াতে অবস্থা আগের মতো সঙ্গীন হবে না। কিন্তু সেই শিল্পে উদ্বাস্তুরা হবে শ্রমিক বা বেতনভুক কর্মচারী— নিজেরা ইন্ডাস্ট্রি শুরু করবে এ মুরদ তাদের নেই, হবেও না, কারণ শিল্পে নৈপুণ্য আর শিল্পোদ্যোগের দক্ষতা আলাদা জিনিস। ওড়িশার কোনও স্থানেই যে উদ্বাস্তুরা টিকে থাকতে পারবে, তা আমার বিশ্বাস হয় না— কুড়ি বছর পরেও নানা রকম টালবাহানা করে তারা জমিতে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের পাট্টা দেয়নি, যদিও ১৯৬৪ সালে পাট্টা দেওয়ার বন্দোবস্ত প্রায় স্থির, শুধু সই করার অপেক্ষা। হিন্দি এবং ওড়িশা ভাষার উগ্র প্রচারে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন ক্রমশ লোপ পেতে পারে, এই আশঙ্কা অমূলক নয়। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে যত লোক নিয়োগ হবে, তার একটা বৃহৎ অংশ উদ্বাস্তুদের জন্য নির্ধারিত থাকা দরকার। কাগজে দেখলাম চিফ সেক্রেটারি দণ্ডকারণ্যের মুখ্য-প্রশাসকের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন, প্রত্যাগত উদ্বাস্তু পরিবারের একজনকে ওই প্রকল্পে চাকুরি দেওয়া হবে। এই সুবুদ্ধি আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু যারা ফিরে আসবে না, তাদের গতি কী? জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে কি তাদের জায়গা হবে? না হলে তারা কোথায় যাবে? বাংলাদেশের পশ্চিমাংশ থেকে খানিকটা অংশ আপোশে কেটে নিয়ে যারা একটা স্বতন্ত্র স্বপ্ন দেখেন ধারণায়, সেটা অবাস্তব কল্পনা। জায়গা আছে কি? হয়তো নেই, কিন্তু জনাব সিকান্দর বকতের কি এক্তিয়ার আছে বলবার যে, তিনি একটি উদ্বাস্তুকেও আন্দামানে যেতে দেবেন না। আন্দামান কি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি? উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া? সেই সঙ্গে এটাও জিজ্ঞাসা করা চলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কোন আইনের বলে

ফিরে-আসা উদ্বাস্তুদের জোর করে ট্রেনে তুলে পাঠান? তারা যদি বেআইনি কাজ করে বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে পরের জমিতে বা সরকারি জায়গায় আস্তানা গড়ে, তবে তারা দণ্ডার্হ। কিন্তু তা যদি না করে তবে অন্য সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদের মতো তাদেরও কি অধিকার নেই যেখানে খুশি যাবার, যেখানে খুশি থাকবার?

লেখাটি তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। ১২, ১৩ ও ১৪ এপ্রিল ১৯৭৯। লেখক দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব নেন ১৯৬৩-র মাঝামাঝি। পদত্যাগ করেন ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

চর হাসনাবাদে ৬০০০ উদ্বাস্তু

একশো চুয়াল্লিশ ধারা অগ্রাহ্য করে সকাল থেকে রাত দশটার মধ্যে ছ'হাজার উদ্বাস্তু ইছামতী নদী পেরিয়ে ওপারে চর হাসনাবাদে গিয়ে উঠেছেন। শনিবার ভোর চারটায় উদ্বাস্তুদের পারাপার বন্ধ করার জন্যই স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন। কিন্তু উদ্বাস্তুদের কঠোর মনোভাবের মুখোমুখি হয়ে কেউ আর বাধা দানের কথা ভাবেননি। মন্ত্রী, জেলা শাসক, এসপি, এসডিও (মলয় চ্যাটার্জি), এসডিপিও; জনা তিরিশেক অ্যাডিশনাল এসপি এবং কয়েক কোম্পানি রিজার্ভ পুলিশের চোখের সামনে ১৪৪ ধারার বিধিনিষেধ ইছামতীর জলে ভেসে যায়। উলুধ্বনিতে নদীর দু'পাড়ে তোলপাড় করে, ফলে উদ্বাস্তুরা সারাদিন ধরে নদী পার হন।

পুরো ব্যাপারটাই নিখুঁত প্ল্যান মাফিক এগোচ্ছে। ওপারে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা নদীর পাড়ে সিকি বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এরই মধ্যে বসতি গড়ে তুলেছেন। বাঁশের বাখারির চালা, ওপরে অয়েল পেপার ছাউনি।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ এপ্রিল ১৯৭৮

ইছামতী নদী পেরিয়ে ৯০০০ উদ্বাস্তু সুন্দরবনের দিকে

গত দু-দিন ইছামতী পেরিয়ে নয় হাজার দণ্ডকারণ্য ফেরত উদ্বাস্তু সুন্দরবনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। আরও উদ্বাস্তু সুন্দরবন যাবার জন্য তৈরি।

মুখ্যসচিব (অমিয়কুমার সেন) শনিবার মহাকরণে সাংবাদিকদের বলেছেন:

'পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনে কোথায় যাচ্ছেন দেখি, তারপর ব্যবস্থা নেব। এদের বাধা দিয়ে রাজ্য সরকার রক্তক্ষয় করতে চান না।'

মুখ্যসচিব বলেন, শুক্রবার থেকে বর্ধমান স্টেশনে ১২০০ উদ্বাস্তু বসে আছেন। তাঁরা কোনও প্রকার সরকারি সাহায্য চান না। তাঁরা হাসনাবাদ যেতে চান।

ট্রেনের জানলা-দরজা এঁটে দিয়ে ৫০০ উদ্বাস্তু শনিবার শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছেছেন। এঁরা কোনও আশ্রয় শিবিরে যেতে চাইছেন না।

হাসনাবাদের উদ্বাস্তুদের অকস্মাৎ নদী পেরিয়ে সুন্দরবন অভিমুখে যাত্রা করার ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যসচিব জানান, শুক্রবার প্রায় ৫০ জন সাঁতরে নদী পেরিয়ে ওপারে রাখা নৌকাগুলো দখল করেন এবং তারপর পারাপার শুরু হয়। পারাপার শনিবারও চলছে। উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনে কোথায় যাচ্ছেন এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যসচিব বলেন ওদের লক্ষ্য বাগনা এলাকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ এপ্রিল, ১৯৭৮

দুই উদ্বাস্তু নেতার সঙ্গে মহাকরণে আলোচনা

দুজন উদ্বাস্তু প্রতিনিধি অমল সরকার ও রঙ্গলাল গোলদারকে হাসনাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি। রামবাবু সাংবাদিকদের বলেন, হাসনাবাদের আট হাজার উদ্বাস্তুর সম্মতি নিয়েই তিনি ওই দুই প্রতিনিধিকে জ্যোতিবাবুর কাছে হাজির করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের বৈঠকের সময় রামবাবু ও উদ্বাস্তুমন্ত্রী [ত্রাণ ও পুনর্বাসন] রাধিকা ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন।

অমলবাবু ও রঙ্গলালবাবু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, তাঁরা ১৪ এপ্রিল, আবার কলকাতায় এসে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কী বলেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানান, দণ্ডকারণ্য ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের কোনও আলোচনা হয়নি। দণ্ডকারণ্যের অসুবিধাগুলো নিয়েই তাঁরা প্রধানত কথা বলেছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ এপ্রিল, ১৯৭৮

হাসনাবাদে জমায়েত দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু

দেশভাগ হওয়ার পর থেকে বারে বারে ঝাঁকে ঝাঁকে হিন্দু সমাজভুক্ত বাঙালির দল উদ্বাস্তু হয়ে প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) হতে এ রাজ্যে এসেছে আশ্রয় ও উপার্জনের খোঁজে। এ রকম অবস্থা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাবেও দেখা দিয়েছিল দেশভাগের যুগে। সেখানে পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের ভিড় অবশ্য এককালীন হয়েছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ভিড় কখনওই এককালীন ঘটেনি। এই এককালীন আসার মধ্যেই ভারতের পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের উদ্বাস্তু সমস্যা বিজড়িত।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে উদ্বাস্তু সমস্যা যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং প্রকারান্তরে ধর্মের নামে নরমেধ যজ্ঞের ভিত্তিভূমিতে লোক বিনিময় ঘটেছিল, তখন এ রাজ্যে ধর্মের নামে ব্যাপক ও সামগ্রিক ভাবে লোক বিনিময় ঘটেনি। তা হলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালি হিন্দুদের আসা বন্ধ হয়নি কখনও। বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমন-স্রোত ১৯৬১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও, এক সময় ১৯৭২ সালের দিকে মনে হয়েছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে বুঝি বা হিন্দু সমাজভুক্ত বাঙালিরা রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক দিক দিয়ে একটু প্রতিষ্ঠা পাবে। এই প্রতিষ্ঠা তারা পেয়েছে কি পায়নি তা ভবিষ্যতের ইতিহাসই নিরূপণ করবে।

তবে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম ধর্মাবলম্বী বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ওই দেশ থেকে যে এক কোটি উদ্বাস্তু এসেছিল, তাদের সবাই স্বাধীন বাংলাদেশ ফিরে গেলেও, ১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত যারা এ রাজ্যে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তাদের দায় বা দায়িত্ব নিয়ে যেমন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কিছু বলেননি, তেমনি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও কিছু করেননি।

ওই উদ্বাস্তুদের এক সময় আন্দামানে প্রতিষ্ঠা দেবার কথা উঠেছিল। সর্বপ্রথম ড. প্রফুল্ল ঘোষ এবং তাঁর পরে ডা. বিধানচন্দ্র রায় এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তেমনভাবে সাড়া দেননি। কী কারণে এবং কেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সরকার বাঙালি উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পুনর্বাসনের ব্যাপারে নীরব ছিলেন— তাও ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবেই থাকবে। অবশ্য এ ব্যাপারে তদানীন্তন ভারত সরকারের নীরবতার পরোক্ষ সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ রাজ্যের সব শ্রেণির ও দলের বামপন্থী নেতারাও। সে সময় বামপন্থী নেতারা এমন অভিমতও জনসভায় ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতিতে প্রকাশ করেছিলেন যে, পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনে পর্যাপ্ত জমি আছে— যেখানে কি না সব হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সম্ভব।

সেদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারে যাঁরা কর্ণধার ছিলেন, তাঁরা বামপন্থী নেতাদের ওই অভিমত সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণে উদ্বাস্তুদের সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যা হিসেবে বিচার ও বিবেচনার ওপরই জোর দিয়েছিলেন। তাঁরা উদ্বাস্তুদের দায়-দায়িত্ব বহন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ দিলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ কখনওই পরিলক্ষিত হয়নি।

শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮ সালের দিকে বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্য বেছে নেওয়া হল। সেখানে এ রাজ্যে অবস্থিত কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে পাঠানো হল। দণ্ডকারণ্য এমন একটা এলাকা— যার কিছুটা ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত, কিছুটা মধ্যপ্রদেশের, কিছুটা মহারাষ্ট্রের আর কিছুটা অন্ধ্রপ্রদেশের। দণ্ডকারণ্যের

'মানা' কেন্দ্র উদ্বাস্তুদের প্রধান শিবির হয়ে উঠল— সেখান থেকে তাদের পাঠানো হল মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দণ্ডকাঞ্চলে।

এই উদ্বাস্তুদের দেখাশোনার জন্য গঠিত হল দণ্ডক-প্রশাসন ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুধু উদ্বাস্তুদের জন্যই তৈরি হল না। ভারত সরকারের খেয়াল হল আদিবাসীদের কথাও (যাদের কথা ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র বা বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট রাজ্য কোনও দিনই ভাবেনি।)

যা হোক ১৯৫৮ থেকে এ পর্যন্ত কুড়ি বছর ধরে দণ্ডকবনে যে সব উদ্বাস্তু বসবাস করছিল, হঠাৎ এ বছরে প্রথম দিক থেকে তারা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে ধ্বনি উঠল— চলো সুন্দরবনে যাই। সুন্দরবনে যাওয়ার যে ধ্বনি তাদের মধ্যে উঠল তারও একটা ইতিহাস আছে।

গত বছরের (১৯৭৭) শেষ ভাগে দণ্ডকের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তুহারা উন্নয়নশীল সমিতির উদ্যোগে উদ্বাস্তুদের নিয়ে কয়েকটি সভা হয় এবং ওই সভাগুলোতে পশ্চিমবঙ্গের এক রাষ্ট্রমন্ত্রী (শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়) ও উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল ভাষণ দেন। ওই সভাগুলোতে উদ্বাস্তুদের তরফে তাদের অভাব অভিযোগকে কেন্দ্র করে স্মারকলিপিও পেশ করা হয়। ওই স্মারকলিপির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া না গেলেও, তাতে উদ্বাস্তুদের হয়রানি— বিশেষত ওড়িশা রাজ্যভুক্ত দণ্ডকাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত উদ্বাস্তুদের ওপর নানা অনাচার ও নির্যাতন ইত্যাদির কথা বর্ণিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় নাকি ওই স্মারকলিপি পেয়ে উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাদের দুঃখ নিরসনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

ওই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু নেতা শ্রীসতীশ মণ্ডল আর একটু এগিয়ে গেলেন। তিনি ধ্বনি তুললেন 'সুন্দরবন চলো'। তারপরই শুরু হল উদ্বাস্তুদের সুন্দরবন অভিযানের পালা। এ সবই অধুনা হাসনাবাদে জমায়েত হাজার হাজার উদ্বাস্তুর জানা। তাদের মধ্যে কারও কারও মুখ থেকে এ সব বিষয়ে শোনা কথা।

সুন্দরবন অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তুরা তাদের এতদিনকার ঘরবাড়ি, হাসিল করা জমি, ফসল, গোরু বাছুর বিক্রি করে বা ফেলে রেখে এসেছে ও আসছে এ রাজ্যে। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সন্ধানে ওই উদ্বাস্তুরা এলেও, যারা ওদের নেতৃত্ব দিয়েছে তারা বেশ সুসংগঠিত।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে উদ্বাস্তুরা হাসনাবাদে প্রথম ভিড় জমিয়েছিল গত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। তখন ওরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও, গত মার্চের মাঝামাঝি তারা সংখ্যায় বেশ ভারী হয়ে উঠল। তখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের এ ব্যাপারে টনক নড়েনি— কোনও বামপন্থী নেতাও সজাগ হননি।

উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও সেবার জন্য প্রথম এগিয়ে এল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। মার্চ মাসের ২১ তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের অনুমতিক্রমে ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিকল্পিত সাহায্য ও সেবার ভার নিয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে শুধু দশটি নলকূপ বসানো হয়েছে— তার মধ্যে চারটি নাকি বসাবার কয়েক দিনের মধ্যেই অকেজো হয়ে পড়েছে।

হাসনাবাদে জমায়েত উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ মাথাপিছু ২০০ গ্রাম আটা সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্য সরকারের তরফে সাহায্যের কোনও ব্যবস্থা এখনও হয়নি। তবে সব উদ্বাস্তুই সংঘের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছেন না। উদ্বাস্তুদের মধ্যে কেউ কেউ বাজারে বসছে— তাদের উদ্যোগে হাসনাবাদে এক বাজারও গঠিত হয়েছে। কেউ কেউ স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরবাড়িতে জন খাটছে। প্রত্যেকেই এ-বিষয়ে সুদৃঢ়, এবার তারা কোনও অবস্থাতেই দলছাড়া বা দলছুট হবে না। বাঁচতে যদি হয় এক সঙ্গে বাঁচবে, আর যদি মরতে হয় এক সঙ্গে মরবে।

ইতিমধ্যে অনেকেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ইছামতী নদী পেরিয়ে সুন্দরবনে আবাদ অঞ্চলে চলে গেছে। অনেকে বলছে, আমাদের সংখ্যানুপাতে জমি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেকে বলছে আমাদের পরিবার মতো জমি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেকে বলছে, এ দেশের বাবুরা যদি প্যালেস্তাইনের উদ্বাস্তুদের জন্য বাসভূমি আদায়ের ব্যাপারে সোচ্চার হতে পারেন, তা হলে আমাদের জন্য বাবুরাও কেন কিছু করবেন না। এ সবই উগ্রপন্থী উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে শোনা।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে যাঁরা একটু নরমপন্থী তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা ফিরে গেলেও কী নিয়ে থাকবেন? তাঁদের সন্তানাদির জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা নেই— নেই পাঠশালা বা বাংলা ভাষাভাষীর বিদ্যালয়। এমন অবস্থায় উদ্বাস্তুরা শঙ্কিত তাদের আগামী প্রজন্ম সব কিছুই ভুলে যাবে এবং দণ্ডকবনের আদিবাসীদের সগোত্র হয়ে চিরকালীন অত্যাচার ও অনাচারের সম্মুখীন হবে। কেউ কেউ বলছে, তারা শুনেছে পশ্চিমবাংলার বর্তমান সরকারে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁরা একদিন তাদের সুন্দরবনে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার দাবি করেছিলেন। এখন তাঁরাই তো সরকার গঠন করেছেন। তা হলে তারা (উদ্বাস্তুরা) দণ্ডক ছেড়ে এসে এমন কী অন্যায় করেছে।

বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পর্কেও উদ্বাস্তুরা সংশয়াকুল। তারা রাজ্যের উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীরাধিকামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনতে চায়নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নামে ২৭ মার্চ যে আবেদনপত্র উদ্বাস্তুদের মাঝে বিলির ব্যবস্থা হয়, তা হাসনাবাদে বিলি করা যায়নি। যাঁরা যাঁরা বিলি করতে গেছেন, উদ্বাস্তুরা তাঁদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছেন। উদ্বাস্তুদের মাঝে প্রস্তাব দেওয়া হয় অন্য শিবিরে যাওয়ার, তা তারা অগ্রাহ্য করেছে।

হাসনাবাদে আসার প্রথম দিকে উদ্বাস্তুরা একটু হতচকিত হলেও, এখন তারা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তাদের তৈরি বিভিন্ন ছপ্পড়ে অনেকে মরছে। এতেও তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের এক কথা— সুন্দরবন যাবই— যাব।

রাজ্য সরকারের তরফে উদ্বাস্তুদের বুঝাবার এবং আবার দণ্ডকবনে পাঠাবার প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ আয়োজন চালালেও, এখন পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হয়ে উঠেছে। সকলের নজর এড়িয়ে এতদিন তারা হাসনাবাদে জড়ো হলেও, এখন তারা টাকি, বসিরহাট প্রভৃতি স্থানেও ছড়িয়ে পড়ছে। ইছামতী নদীর ওপারে হাসনাবাদের অপরাংশেও তারা হাজির হয়েছে। সভা মিছিল ইত্যাদিও করছে। স্থানীয় টাকি সরকারি কলেজ, বসিরহাট কলেজের ও স্কুলের ছাত্র সমাজের কাছেও তারা হাজির হচ্ছে। তবে তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হয় তারা কোনও রাজনৈতিক দলের, রাজনৈতিক নেতাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীরা তাদের কাছে আস্থাভাজন হলেও, রাজনৈতিক নেতারা তাদের কাছে অনাদরণীয় হয়ে পড়েছেন।

একটা গোলমেলে অবস্থা চলছে হাসনাবাদ অঞ্চলে। এ অবস্থার এখনই সামাল না দিলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এমনকী সরকারি আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাও বিচিত্র হয়ে উঠবে না। শুধু রাজধানীতে বসে উদ্বাস্তুরা টাকা কোথায় পেল, কেমন করে বাস জোগাড় করল, কে তাদের পেছনে আছে এ সব বিষয় নিয়ে সরকারের তরফে গবেষণায় সময় নষ্ট না করে গঠনমূলক সমাধানে এখনই অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে যা সহজ ছিল, এখন তা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জট ভাল ভাবে বাঁধবার আগেই রাজ্য সরকারকে বেশ ভেবেচিন্তে কার্যকরী সমাধানে অগ্রণী হতে হবে। তা না হলে বিপদ শুধু উদ্বাস্তুদের নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গেরই।

সংবাদ-নিবন্ধটি ছাপা হয় 'কম্পাস' পত্রিকার ১৫ এপ্রিল ১৯৭৮ সংখ্যায়
লেখকের নাম ছিল না। পত্রিকার সম্পাদক পান্নালাল দাশগুপ্ত

সুন্দরবন: উদ্বাস্তুর স্রোত বিরামহীন

দণ্ডক উদ্বাস্তুরা দলে দলে বিনা বাধায় সুন্দরবনের বাগনা ও কুমিরমারি এলাকায় ঢুকছেন। মঙ্গলবার সেখানে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ হাজারেরও উপর। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে তাঁদের যাতে কোনও সংঘর্ষ না হয় এবং তাঁরা যাতে স্থানীয় লোকেদের জমি জবরদখল না করতে পারেন, তার জন্য কড়া পুলিশি নজর রাখা হচ্ছে। ২৪ পরগনার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার বাগনা চলে গিয়েছেন। তাঁরা সেখানে কয়েক দিন থাকবেন।

এদিকে পুনর্বাসন মন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি জানান, এই সব উদ্বাস্তুকে সাহায্য দেবার জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

হাসনাবাদে উদ্বাস্তুর সংখ্যা— ১১,১০৬

চর হাসনাবাদে উদ্বাস্তুর সংখ্যা— ১৬,৯২৯

কুমিরমারি ও বাগনায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা— ৫ হাজার

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮

'কিছু লোকের অসৎ পরামর্শ' এবং 'অসত্য তথ্য ও অমূলক আশ্বাসে' পশ্চিমবঙ্গে আসা উদ্বাস্তুদের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, দণ্ডকে ফিরে গেলে তাঁরা সুষ্ঠু পুনর্বাসন পাবেন, নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা পাবেন।

দণ্ডকারণ্য ফেরত উদ্বাস্তুদের প্রতি

জ্যোতি বসু

প্রিয় ভাইবোনেরা,

আপনাদের বর্তমান দুঃসহ অবস্থার জন্য আমি গভীর বেদনা বোধ করছি। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। ইতিমধ্যে আপনাদের মধ্যে কয়েকজন মারাও গেছেন। অনেকে অসুস্থ হয়েছেন, রোগাক্রান্ত হয়েছেন। এক অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে আপনারা একরকম খোলা আকাশের নিচেই আছেন।

আপনারা যেভাবে দণ্ডকারণ্য থেকে চলে এসেছেন তাতে বেশ বোঝা যায় যে ওখানে বসবাসে আপনাদের যথেষ্ট অসুবিধা ছিল বা আছে। কিছু লোকের অসৎ পরামর্শে এবং যে সমস্ত অসত্য তথ্য ও অমূলক আশ্বাস দিয়ে আপনাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তা যে সঠিক নয় এবং সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর, এই কয়েক দিনে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

এই কুচক্রীরা আপনাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে আপনাদের মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। সুন্দরবনে জমি আছে এবং ওখানেই আপনাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে যাঁরা আপনাদের মিথ্যে বুঝিয়ে নিয়ে এসেছেন আজ তাঁরা কোথায়? আপনাদের এই বিপথে এনে বিপদে ঠেলে দিয়ে এঁরা নিজেরা এখন আত্মগোপন করে সুখে আছেন। এঁদের চিনে রাখুন, এঁদের থেকে দূরে থাকুন।

আপনাদের হঠাৎ এই চলে আসা পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারকেও যথেষ্ট বিব্রত করছে; স্থানীয়ভাবে হাজার হাজার মানুষকেও অসুবিধায় ফেলেছে। অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে আপনাদের হাসনাবাদে নিয়ে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিরোধের মধ্যে আপনাদের ফেলে দেবার চক্রান্ত করা হচ্ছে।

আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে সুন্দরবনে নতুন করে কোনও বসতির সম্ভাবনা নেই। সেখানে স্থানীয় অসংখ্য ক্ষেতমজুর ও গরিব মানুষের জন্যও কোনও ব্যবস্থা করা যায়নি। প্রয়োজনীয় জমিও তাদের দেওয়া সম্ভব হয়নি। সুন্দরবনে বসবাসের উপযোগী অথবা চাষের যোগ্য আর কোনও জমি নেই। ওখানে নদীর জল লোনা, চাষ-আবাদ করে ফসল তৈরি করা খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। নিচু জমি, বাঁধ দিয়ে জল আটকাতে হয়। আপনারা বুঝতে পারছেন এমতাবস্থায় সুন্দরবনে নতুন করে লোকের পুনর্বসতি কোনও ক্রমেই সম্ভব নয়। সুন্দরবনে পুনর্বাসন সম্পর্কে আপনাদের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে তা একান্তভাবে উদ্দেশ্যমূলক। একথা আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের বর্তমান অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল মালকানগিরি অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। তাঁরা সরেজমিনে তদন্ত করে বুঝেছেন যে আগামী ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যেই অর্থাৎ আর দেড়-দু'বছরের ভেতরই ওখানে কৃষিজমিতে সেচের জল পাওয়া যাবে। জমি উর্বরা এবং দু'ফসলা/তিন-ফসলা হবে বলে আশা করা যায়। এতদিন ধরে কষ্ট সহ্য করে থাকবার পর ঠিক যখন কিছু সম্ভাবনা, কিছু আশার আলো দেখা দিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে আপনারা কুচক্রীদের প্ররোচনায় সেই জায়গাজমি ছেড়ে দিয়ে চলে এসে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করছেন, এক নিদারুণ অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছেন। আমবা আপনাদের এই অহেতুক দুর্দশা নিরসনে বদ্ধপরিকর। বামফ্রন্ট সরকার আপনাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। আমি নিজে আপনাদের সমস্যাবলী নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। আপনারা দণ্ডকারণ্যে ফিরে গেলে যাতে অন্তত আপনাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দেওয়া হয় ও কৃষিকাজের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া হয়, সেজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোরদার সুপারিশ করেছি। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার যা কিছু করবার সবই করবেন।

আপনারা ইতিমধ্যে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। হাসনাবাদ থেকে নদী পার হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আপনাদের আর এক বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। নদীর ওপারের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে রিলিফের কোনও ব্যবস্থা নেই। পানীয় জলেরও কোনও ব্যবস্থা নেই।

এপারে রিলিফের যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তা থেকেও যাতে আপনারা বঞ্চিত না হন এবং সে সুযোগ যাতে আপনারা প্রত্যেকেই নিতে পারেন সেই জন্য আপনাদের এপারেই ফিরে আসতে অনুরোধ করছি। দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাবার আগে আপনাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনারা সেখানে ফিরে আসুন। ছেলেমেয়ে এবং পরিবারের সকলকে নিয়ে ত্রাণ শিবিরের সাহায্য নিন।

দীর্ঘদিনের শ্রম ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যে ঘর-সংসার দণ্ডকারণ্যে আপনারা গড়ে তুলেছিলেন তা আবার স্থায়ী ও সুন্দরভাবে গড়বার জন্য আপনারা দৃঢ় সঙ্কল্প নেবেন বলে আমি আশা করি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের এই কথা বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ও সাহায্যে ওখানে যাতে আপনারা সুষ্ঠু পুনর্বাসন পান, নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা পান, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট পান, আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সমান সুযোগসুবিধে পান ও সম্মানের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে বসবাস করতে পারেন তার জন্য সব রকম চেষ্টা করা হবে।

আমি তাই আপনাদের কাছে আবার অনুরোধ করি আপনারা দণ্ডকারণ্যে ফিরে চলুন, সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুন। এই উদ্যমে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার আপনাদের সঙ্গে আছেন, আপনাদের সর্বতোভাবে সহায়তা করবেন।

'দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন' শিরোনামে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর স্বাক্ষরিত এই বিবৃতিটি লিফলেট আকারে প্রকাশ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৮ সালের ১১ এপ্রিল

দণ্ডকারণ্যে নিয়ে-যাওয়া শরণার্থী পরিবারগুলির এক-তৃতীয়াংশের বেশি পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে। কেন এসেছেন? সবাই জানতেন। ১৯৭৫ সালেও তাঁরা দল বেঁধে আসার চেষ্টা করেছেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পুলিশ বাংলার সীমানার বাইরে ট্রেন থেকে নামিয়ে পিটিয়ে তাঁদের ফেরত পাঠিয়েছে। তখন উসকানির অভিযোগ ওঠেনি!

দণ্ডকের উদ্বাস্তুর কথা কে ভেবেছি

বরুণ সেনগুপ্ত

কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্যি, দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুদের চলে আসা নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে এর জন্য কম বেশি আমরা প্রায় সবাই দায়ী। এই সমস্যা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের অনেকেরই অনেক অবদান আছে। এর জন্য দায়ী দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ, এর জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, এর জন্য দায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এর জন্য দায়ী ওড়িশা সরকার, এর জন্য দায়ী রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অতীত ও বর্তমান ক্রিয়াকলাপ এবং এর জন্য দায়ী আমরা সংবাদপত্রগুলিও।

সবচেয়ে দুঃখের ও মজার ব্যাপার হল, এ ব্যাপারে আমরা অনেকেই এখনও আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব স্বীকার করতে রাজি নই। আমরা কেউই বলতে রাজি নই, হাজার হাজার মানুষের এই শোচনীয় পরিণতির জন্য আমরাও দায়ী। উল্টে আমরা এর পেছনে 'চক্রান্ত' খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, আমরা 'উসকানিদাতাদের' উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছি এবং আমরা শুধু যে কোনও ভাবে এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চাইছি।

আমার প্রথম প্রশ্ন, আজ যারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন সেই দলগুলোই অর্থাৎ সেই সিপিআই(এম), ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-ই কি দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর ধরে বলে আসেননি যে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠাবার কোনও প্রয়োজন নেই? তাঁদের নেতারাই কি দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করেননি যে, পশ্চিমবঙ্গেই এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার মতো পর্যাপ্ত জমি আছে? তাঁরাই কি সর্বতোভাবে উদ্বাস্তুদের বোঝাবার চেষ্টা করেননি যে, আন্দামান বা দণ্ডকারণ্যে যাওয়া মানে তাঁদের সর্বনাশ হয়ে যাওয়া? আজ সতীশ মণ্ডল যখন সেই কথাই বলছেন তখন তাঁকে চক্রান্তকারী বলা হচ্ছে কেন? দণ্ডকারণ্যে নানা ভাবে লাঞ্ছিত, ব্যতিব্যস্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে কিছু শরণার্থী যদি মনে করে থাকেন যে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট জমি আছে বলে যাঁরা এতদিন বলে এসেছেন, তাঁরাই যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছেন, তখন ওখানে গেলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তাহলে কি খুব অন্যায় করেছেন?

রাজ্য সরকারের কেউ কেউ এমনও বলছেন যে, গোটা ব্যাপারটাই ফ্রন্ট সরকার বিরোধী একটা চক্রান্ত। ফ্রন্ট সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য কেউ চক্রান্ত করে ওদের এখানে নিয়ে আসছে।

কিন্তু এই এঁরাই তো ১৯৭৫ সালের জুন মাসেও দলবেঁধে পশ্চিমবঙ্গে আসছিলেন। তখন তো রাজ্যে কংগ্রেস সরকার, তখন কার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এঁদের নিয়ে আসা হচ্ছিল?

সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার জ্যোতিবাবুর সরকারের চেয়ে অনেক নির্দয়ভাবে এঁদের মোকাবিলা করেছিলেন। পশ্চিমবাংলার সীমানার বাইরেই ট্রেন থেকে নামিয়ে এঁদের পিটিয়ে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরই এসে গিয়েছিল জরুরি অবস্থা। সেই সুযোগে দণ্ডকারণ্যের নেতৃস্থানীয় উদ্বাস্তুদের সবাইকে মিসায় আটক করে রাখা হয়েছিল। মানা ক্যাম্প কার্যত ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তখন ব্যাপারটা নিয়ে কাগজেও তেমন কোনও হইচই হতে পারেনি।

কিন্তু কেন উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসতে চাইছেন। কেন তাঁরা ১৯৬৫ সালের পর থেকেই আর খুব বেশি দণ্ডকারণ্যে থাকতে আগ্রহী নন সেটা কি কেউ কখনও বুঝে দেখা প্রয়োজন মনে করেছেন?

সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার বা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কারণ, ওঁরা তো শুধু বুঝতেন মিসা আর ডাণ্ডা। কিন্তু ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে এবং পশ্চিমবঙ্গে জনতা ও বামফ্রন্ট সরকার আসার পরও কেন তাঁরা দণ্ডকারণ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন না? দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু প্রতিনিধিরা বার বার গিয়ে তাঁদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়েছেন। তাঁরা কেঁদে পায়ে ধরে ধরে

সবাইকে বলেছেন, ওখানে আর থাকা যাচ্ছে না। ওখানে কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না, ওখানে আমাদের মেয়েদের সম্ভ্রম পর্যন্ত থাকছে না। কিন্তু তবু কর্তৃপক্ষস্থানীয় সবাই এতদিন চুপ করে ছিলেন কেন? অসুবিধাগুলো দূর করার এবং অত্যাচার, অবিচার ও জুলুম বন্ধ করার কোনও চেষ্টা কোনও কর্তৃপক্ষ গত এক বছরেও করেননি কেন?

কেউ বলতে পারবেন না তাঁরা কিছু জানতেন না। তাঁরা সবাই জানতেন ১৯৬৫ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই দণ্ডকারণ্যে প্রচণ্ড খরা চলেছে। তাঁরা সবাই জানতেন দণ্ডকারণ্যের জন্য সরকারি হিসাব মতো প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচা হলেও কাজ ওখানে তেমন কিছুই হয়নি। তাঁরা সবাই জানতেন ওখানে নিয়ে গিয়েও অধিকাংশ পরিবারকে আট-দশ বছর করে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ফেলে রাখা হয়েছে। তাঁরা সবাই জানতেন শরণার্থীরা অশেষ আর্থিক কষ্টের মধ্যে আছে। তাঁরা সবাই জানতেন স্থানীয় উপজাতীয় লোকজন বাঙালি উদ্বাস্তুদের ভাল ভাবে নেয়নি। তাঁরা সবাই জানতেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যেই দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া শরণার্থী পরিবারগুলোর এক তৃতীয়াংশের বেশি (অর্থাৎ প্রায় ৮০,০০০ লোক বা ১৬,২১১টি পরিবার) দণ্ডকারণ্য ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছেন। সেকেন্দার বকত, জ্যোতিবাবু, নীলমণি রাউত রায় সবাই গত নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকেই জানতেন যে, দণ্ডকারণ্যের শরণার্থীরা বলছেন একটা সুরাহা না হলে এবার তাঁরা দলবেঁধে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবেনই।

কিন্তু তবু তাঁরা এতদিন চুপ করেছিলেন কেন? শরণার্থীরা দলবেঁধে পশ্চিমবঙ্গে হাজির হওয়ার আগে কারও চৈতন্য উদয় হয়নি কেন? তাঁদের অভাব-অভিযোগগুলি দূর করার কোনও ব্যবস্থা কেউ করেননি কেন? কেন দিল্লি, ভুবনেশ্বর এবং কলকাতা থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দণ্ডকারণ্যে ছুটে যাননি সময় মতো?

আমার বদ্ধমূল ধারণা, যদি কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা সময় মতো সচেতন হতেন, যদি এমপি, এমএলএ-রা (যাঁরা বিনা পয়সায় ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে সর্বত্র যেতে পারেন) মাঝে মধ্যে গিয়ে দণ্ডকারণ্যের অবস্থা দেখে আসতেন এবং তা নিয়ে যথাস্থানে বলতেন, যদি আমরা সংবাদপত্রগুলো নিয়মিত দণ্ডকারণ্যের খোঁজখবর নিতাম, তাহলে আজ এ অবস্থা দাঁড়াত না। তাহলে হাজার হাজার শরণার্থীকে এভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসত হত না। দুঃখের বিষয় আমরা প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুদের নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি— কিন্তু দণ্ডকারণ্যের শরণার্থীদের কথা ভাবিনি!

দণ্ডকারণ্যে মোট পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রায় ৪২ হাজার শরণার্থী পবিবারের। এর ভেতর ৭৭ সালের আগেই দণ্ডকারণ্য ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন ১৬,২১১ পরিবার। এর পর ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮ মার্চ পর্যন্ত চলে এসেছেন

আরও প্রায় ১০ হাজার পরিবার। দণ্ডকারণ্যে এখন রয়েছেন আর মাত্র ১৫ হাজার শরণার্থী পরিবার।

দণ্ডকারণ্যে মোট যে প্রায় সওয়া দু লক্ষ শরণার্থী গিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য কি পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না? ১০০ কোটি টাকা খরচ করলে তাঁদের জন্য কি পশ্চিমবাংলায়ই একটা ব্যবস্থা হতে পারত না; হয়তো পারত। কারণ, যে পশ্চিমবঙ্গে মোট লোকসংখ্যা পাঁচ কোটির বেশি সেখানে দু লক্ষ কতটুকু! কারণ যে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য থেকে ১ লক্ষ করে কর্মপ্রার্থী আসেন, সেখানে দু লক্ষ দরিদ্র বিপন্ন বঙ্গভাষাভাষী আর কত বড় বোঝা?

কিন্তু প্রশ্নটা এইখানেই শেষ নয়। ব্যাপারটা দু লক্ষেই ইতি নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আসা শেষ হয়ে গিয়েছে, আর কখনও পূর্ববঙ্গ থেকে এ রাজ্যে শরণার্থী আসবে না এটা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির পর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করা হল। প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী আসার পাকা ব্যবস্থা হল। এই অভিশাপ থেকে পশ্চিমবঙ্গ কবে মুক্তি পাবে কেউ তা জানে না।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও প্রতি বছর পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী আসছে এবং এসে পশ্চিমবঙ্গের জনারণ্যে মিশে যাচ্ছে। সরকারের কাছে এরা কোনও সাহায্য চাইছে না বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভূমির উপর, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর চাপটা ঠিকই পড়ছে।

মূল প্রশ্ন হল, দেশবিভাগের সব দায় পশ্চিমবঙ্গকেই নিতে হবে কেন, পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন জাতীয় দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে না কেন। পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীদের দণ্ডকারণ্য ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে কেন? পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের জন্য আন্দামান দুয়ার কেন খোলা হবে না? আন্দামানে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার দেবে না কেন?

দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে, পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের, পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকাকে আজ তাই দাবি তুলতে হবে: পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দায়িত্ব সমগ্র জাতিকে নিতে হবে। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের দণ্ডকারণ্য এবং আন্দামানে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা দিল্লিকে করতেই হবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ এপ্রিল ১৯৭৮

‘প্রকৃত-কল্পিত নানা অভিযোগের ভিত্তিতে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে— এই মারাত্মক ভ্রমে’ পড়ে এসে তাঁরা দেখলেন, পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে কেউ নেই। সেই প্রতারিত ও বিতাড়িত বাঙালিদের খোঁজে দণ্ডক সফর।

দণ্ডকারণ্য ঘুরে দুটি প্রতিবেদন

পান্নালাল দাশগুপ্ত

ক. প্রচণ্ড আঘাতে বিবশ উদ্বাস্তুদের মানসিক পুনর্বাসনের প্রশ্ন আগে

সোজা দণ্ডকারণ্যে যাবার আগে কটক ও ভুবনেশ্বর ঘুরে যাওয়া দরকার মনে করলাম। কেন না দণ্ডকারণ্য জায়গাটা বেশির ভাগ ওড়িশা, তার পর মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। অন্ধ্রপ্রদেশেও এই অরণ্যের ভাগ আছে। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বাঙালি শরণার্থীদের জন্য কোনও জায়গা দণ্ডকারণ্য অথরিটিকে বা কেন্দ্রীয় সরকারকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি। দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্রথমত তাদের সার্ভে টিম দিয়ে বিচার করে নেয়, এই বিশাল দণ্ডকারণ্যে কোথায় কোথায় চাষযোগ্য জমি পাওয়া যেতে পারে। তখন সেই এলাকাগুলোকে উদ্ধার অর্থাৎ রিক্লামেশন করা হয়, যান্ত্রিক ও কায়িক উপায়ে। এভাবে উদ্ধার করা জমির শতকরা পঁচিশ ভাগ স্থানীয় ভূমিহীন আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে ফেরত দেওয়া হয়। বাকিটাতে শরণার্থীদের বসানো হয়। বলা বাহুল্য ডিডিএ (দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) কোনও সরকার নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি মাত্র, এটা কোনও স্থায়ী সংস্থাও নয়, ১৯৬৫ সালেই তা গুটিয়ে নেবার কথা ছিল। কিন্তু কাজ অসমাপ্ত বলেই এখনও আছে, কবে কখন তা সমাপ্ত হবে জানে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এখনই গুটিয়ে নেবার কথা ভাবছেন

নাকি। মোট কথা দণ্ডকারণ্য রাজ্য সরকারগুলোর হাতেই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, কিন্তু ডিডিএ থাকবে না। অতএব শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলোর হাতেই শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এখনও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলোরই। ডিডিএ-র হাতে কোনও পুলিশ নেই। শরণার্থীরা ডিডিএ-র কাছে তাদের প্রতি আইনশৃঙ্খলাগত নালিশের প্রতিবিধান পেতে পারে না, স্থানীয় থানাতে দরবার করতে হবে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুনরাগত লক্ষাধিক শরণার্থীদের যেমন করেই হোক দণ্ডকারণ্যেই পাঠিয়ে দেবেন, এই সিদ্ধান্ত কলকাতা থেকে জেনে যাই। অনিচ্ছুক ও ভগ্নমনোরথ এবং যথাসর্বস্বহারা শরণার্থীদের তো আবার যথাস্থানে পাঠিয়েই দেওয়া হবে, কিন্তু পুনরাগত শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ সেখানে নিশ্চিত হতে পারে না।

ভুবনেশ্বরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনীলমণি রাউতরায়, কোরাপুট জেলার মন্ত্রী হরিশ্চন্দ্র বকসীপাত্র, হোম সেক্রেটারি শ্রীসীতাকান্ত মহাপাত্র, সাহিত্যিক গোপীনাথ মহান্তি, কানুচরণ মহান্তি এবং আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করি। কটকে 'সমাজ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধাকান্ত রথ, প্রবীণ রাজনৈতিক ও 'প্রজাতন্ত্র' কাগজের সম্পাদক ডা. হরেকৃষ্ণ মহাপাত্র, সিপিআই, সিপিএম পার্টির বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এবং আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করি। উদ্দেশ্য একই, যাতে ওড়িশাতে শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দিকে এঁরা সবাই একটু দৃষ্টি দেন। ভগ্নমনোরথ সর্বহারা শরণার্থীদের নৈতিক বল ও উৎসাহ ভিন্ন অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত সমস্ত দায়টা ছিল একমাত্র দণ্ডকারণ্য অথরিটি বা ডিডিএ-র ওপরেই, যার অফিসার ও কর্মচারীরা সাধারণত ভিন্ন প্রদেশবাসী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গের খবরের কাগজ ও জনসাধারণ যেমন দীর্ঘকাল ধরে শরণার্থীদের কোনও খবরাখবর রাখেনি, তেমনই ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সরকার ও খবরের কাগজ ও জনসাধারণ পূর্ববঙ্গাগত শরণার্থীদের কোন প্রত্যক্ষ দায়দায়িত্ব আছে বা ছিল বলে মনে করতেন না। যেন সবটাই ডিডিএ-র ব্যাপার। ডিডিএ-র হাতে টাকাপয়সা আছে, নানা কর্মচারী আছেন, বিশেষজ্ঞ আছেন, মেকানিকাল ডিভিশন আছে, তবে আবার কী? কিন্তু ব্যাপারটা তো কেবলই ফিজিক্যাল পুনর্বাসনই নয়, মানসিক পুনর্বাসনের প্রশ্নও আছে। তা ছাড়া আছে স্থানীয় আদিবাসী ও স্থানীয় অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সম্ভাব্য খিটিমিটি ব্যাপার, যেখানে প্রতি পদে পদে ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্র আছে, ভাষা আলাদা, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের এই সঙ্গমস্থলে, এই বিভিন্ন চরিত্রের লোকেদের মধ্যে সহযোগিতা হচ্ছে কিনা, ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিনা, মনের মিল হচ্ছে কিনা— এ সব মানসিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এরই জন্য এত বড় ডেজারসান

ও এক্সোডাস ঘটেছে। শতকরা ৭০ জনের ওপরে শরণার্থী দীর্ঘ পনেরো বছরে তিল তিল করে সঞ্চিত যাবতীয় সম্পত্তি ঘরবাড়ি গরু-ছাগল সব ফেলে দিয়ে অথবা জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে তথাকথিত দেশে মানে পশ্চিমবাংলায় হাজারে হাজারে গিয়ে উপস্থিত হয়, সুন্দরবনে ঢুকে পড়ে, পথেঘাটে পড়ে থাকে। ডিডিএ কর্তৃপক্ষ ছাড়া তাদের বারণ করার কেউ ছিল না। তা ছাড়া ডিডিএ কর্তৃপক্ষের ওপরে তাদের আস্থা ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। যদি ওখানে তখন বেসরকারি কোনও শুভবুদ্ধির নেতৃত্ব থাকত, যদি ওড়িশার ও মধ্যপ্রদেশের জনমত সজাগ থাকত, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আগের কোনও যোগাযোগ থাকত তবে এত বড় একটা নিষ্ঠুর ধোঁকা কার্যকর হতে পারত না।

মুখ্যমন্ত্রী নীলমণি রাউতরায়, মনে হল আমার কাছ থেকেই প্রথমে শুনতে পাচ্ছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবাইকে জোর করে হলেও আবার ফেরত পাঠিয়েছেন। তার মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একমাত্র ডিডিএ ছাড়া অপর কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ করেন না। অথচ সেখানে পুনরাগত শরণার্থীদের নিয়ে যদি একটা ল অ্যান্ড অর্ডার সমস্যা দাঁড়ায়, সেটার মোকাবিলা তো ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সরকারের দায়দায়িত্বেই পড়বে, যেমন অতীতে মানা ক্যাম্পে ও অন্যত্র এমনকী গুলিগোলা করার দায়দাযিত্বও নিতে হয়েছে— ডিডিএ তো কোনও গুলিগোলা চালায়নি। মুখ্যমন্ত্রীকে আমি তাই অনুরোধ করলাম, আরও একটু নজর রাখতে হবে রাজ্য সরকারকেও এই দণ্ডকারণ্যে কী হচ্ছে, হতে যাচ্ছে তার ওপর। আমি যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছি, তাঁদের সকলেরই শরণার্থীদের ওপর সহানুভূতি আছে বলে আমার মনে হল, কিন্তু সেই সহানুভূতিটা সক্রিয় ছিল না, সজাগ ছিল না, ছিল ঘুমন্ত। আজ যদি সেটা জাগ্রত হুঁশিয়ার হয়, তবে শরণার্থীদের ওখানে আবার ভালভাবে বসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়।

আবার এমন কিছু ওড়িশার নেতা আছেন, যাঁরা মনে করেন, বোধহয় কোনও কালেই বাঙালি শরণার্থী ওখানে স্থায়ীভাবে বসবে না। পূর্ববঙ্গের মতো নদী, জল, নরম মাটি ও আবহাওয়া ছাড়া বাঙালি উদ্বাস্তুরা কোথাও বসবে না, দণ্ডকারণ্য তাদের জন্য নয়, একথা নাকি বিজু পট্টনায়েক একদা পণ্ডিত নেহরুকে প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন এবং আজও তাই তাঁর মত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরি ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মালতী চৌধুরিও বলেন, এসব ব্যর্থ প্রচেষ্টা। আমি মনে করি, এই যদি তাঁদের সুনিশ্চিত মত হয়ে থাকে, তবে তা কেন্দ্রীয় সরকারকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সোজা বলে দেওয়া উচিত— বলা উচিত যে, তাদের অন্যত্র ঠাঁই করো। কিন্তু সেটাও তাঁরা করেন না, নরম মাটি, নদী-জলে লালিত-পালিত পূর্ববঙ্গের সন্তানেরা দণ্ডকারণ্যে চিরদিনের মতো বসতে পারবে না প্রকৃতির কারণে এ কথা

হয়তো ঠিক নয়। এত বছর পরে আজ যে নতুন প্রজন্ম হয়েছে, তাদের পূর্ববঙ্গের সঙ্গে কোনও পরিচয় অনেকেরই নেই। তারা জন্মেছে এই কঠিন দেশেই, বড় হচ্ছে বাংলার বাইরেই। তারা পূর্ববঙ্গের নদনদী, জল-মাটিতে বড় হয়নি। মানুষ হিসাবে অন্যেরা যা পারে, নতুন প্রজন্মের শরণার্থী সন্তানেরাও তা পারবে। তবে চাষি পরিবারের জন্য সেচের জল চাই-ই চাই। তার ব্যবস্থাও হয়েছে, যদিও আরও অনেক আগেই সেই সব সেচ প্রকল্পের দ্রুত সম্পাদন করার জোরদার প্রচেষ্টা থাকা উচিত ছিল। পটেরু ড্যাম চালু হলে সমস্ত মালকানগিরি সাব-ডিভিসনের সেচ সম্ভব হবে, কিন্তু তা হতে আরও ২-৩ বছর লাগতে পারে, যদি না ইতিমধ্যে কোনও তাড়া দেওয়া হয়। সতীগুদা ড্যাম এ বছরেই কার্যকর হবার কথা। ভস্কল ড্যাম থেকে ১৩,৭০০ একর জল এখনই পাচ্ছে। পটেরু থেকে দেড় লক্ষাধিক একরে বারো বছরে সেচ মিলবে। সতীগুদা থেকে ৩৭,০০০ একর। তাছাড়া পাখানজোর প্রজেক্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে ১০০০ একরে। কিন্তু এসব ড্যাম থেকে জল যা পাওয়া যাবে, তার শতকরা বিশ ভাগ মাত্র পাবে শরণার্থীরা, বাকিটা স্থানীয় আদিবাসী ও অন্যরাই পাবে। ইরিগেশনের নালা থেকে জল মুখ দেখে দেখে যেতে পারে না— সবচেয়ে উঁচু জমি দিয়ে যে রিজ পাওয়া যায় তার উপর দিয়েই যায়। ২৯টি মাইনর ইরিগেশন প্রজেক্ট করা হচ্ছে। ইন্দ্রাবতী প্রজেক্ট বড় ড্যাম, ওটা যেদিন কার্যকর হবে, কোরাপুট জেলার অনেকটাই তাতে লাভবান হবে। উঁচু-নিচু জমি, বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না। নইলে বৃষ্টিপাত ওখানে ৫৫ ইঞ্চির ওপর— যদিও দীর্ঘদিন ধরে বর্ষে না। দীর্ঘমেয়াদী ফসলের জায়গা ওটা নয়। স্বল্প মেয়াদী শস্য ২/৩টা করে নেওয়া সম্ভব হবে সেচসেবিত এলাকাতে। উঁচু-নিচু জমির মধ্য দিয়ে যে সমস্ত নালা নেমে গেছে, তাতে ঘন ঘন চেক-ড্যাম করে বৃষ্টির জল আটকে রাখা সম্ভব, তা আবার ডাগ-ওয়েল করে বাঁধতে সেচ করা সম্ভব। প্রায় সর্বত্রই, প্রত্যেকের জমিতেই একটা করে ডাগ-ওয়েল করে দেওয়া উচিত, যেখানে যেখানে ড্যামের থেকে সেচ মিলবে না। পূর্ববঙ্গের চাষিরা প্রয়োজনমত চাষ করতে চায় না, বা পারে না, একথা ঠিক নয়। মালকানগিরি এলাকাতেই গত বছর ত্রিশ লক্ষ টাকার মতো মেস্তা, পাট পেয়েছিলেন। তিল প্রচুর করেছিলেন। ওমরকোট এলাকাতে বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী ভাষ বা মকাই চাষ হচ্ছে দেখে এলাম। এসব চাষ আদিবাসীরা করত না. জানত না, তারাও শিখছে।

কোরাপুট জেলা ও দণ্ডকারণ্যের ভবিষ্যৎ খুবই ভাল হবে সন্দেহ নেই। সামনের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এর ওপরে ভরসা করে শরণার্থীরা হয়তো আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। প্রকৃত-কল্পিত নানা অভিযোগের ভিত্তিতে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে— এই মারাত্মক ভ্রমে তাঁরা পতিত হন। সেখানে ও

পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে তাঁদের হয়তো আজ সম্পূর্ণ চোখ খুলে যাবে— পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে কেউ নেই। কী ভয়াবহ এই অভিজ্ঞতা।

যে সমস্ত পরিবার আজ ওখানে ফিরে আসছে, তাদের প্রায় সকল পরিবার থেকে শিশু অথবা বৃদ্ধ অথবা দুইই তাঁরা পথে পথে চিরদিনের মতো হারিয়ে এসেছেন। তাঁদের শোক দুঃখ বোধও এই প্রচণ্ড আঘাতে ও প্রতারণায় আজ বিবশ। ফেরতগামী ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ২-৩ জন করে অফিসার পাঠানো হচ্ছে শরণার্থীদের তদারক করার জন্য। তাঁদেরই মুখে শুনলাম, ফিরবার পথে মৃত শিশু ও বৃদ্ধদের তারা ট্রেন থেকেই ফেলে দিয়েছে পরবর্তী কোনও স্টেশনে নেমে তাদের সদগতি করার অপেক্ষা রাখেনি। তাঁদের কিছু কিছু পরিবারের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, কী ভয়াবহ হতাশা, ভগ্ন মনোরথ, ভাগ্যনির্ভর হয়ে তাঁরা পড়েছেন যে দেখলে হতাশ হতে হয়। আবার কি তাঁরা বুক বেঁধে ঘর বাঁধার সংগ্রামে নামবার শক্তি পাবেন। মালকানগিরি ও পারলকোট এলাকা থেকেই বেশি চলে আসেন। মালকানগিরি শরণার্থী গ্রামগুলো এখনও প্রায় শূন্য, কিছু কিছু করে ফিরছে। খাঁ খাঁ করছে ঘরবাড়িগুলো। যে ২/১০ ঘর যায়নি তারাও এক পা তুলেই বসে ছিল যাবার জন্য। তাঁরাও গরু-বাছুর বিক্রি করে দিয়ে বসে আছেন। এবারে তাঁরা কোথাও চাষবাস করতে পারবেন না, এই বর্ষার ফসল তাঁরা পাবেন না, রবিতেও কিছু করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ডিডিএ অবশ্য বলছেন যে, যাঁরা চাষ করতে চান তাঁদের জন্য ডিডিএ থেকে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করে দেওয়া হবে, কিন্তু তা কতটুকু হবে জানি না। কেন না ডিডিএ সংগঠনটাও এই একসেডেলের চালে ডিমরালাইজড হয়ে পড়েছে, তাদেরকেও আবার চাঙ্গা করতে কম তেল পোড়াতে হবে না!

যুগান্তর, ২৫ জুলাই ১৯৭৮

খ. সিকান্দার বখতের মাথায়ও নেই দণ্ডক প্রকল্পের তাৎপর্য কী

কটক থেকে রায়গড়া হয়ে কোরাপুটে মোটরে যাই। সঙ্গে আমার দুজন ওড়িশি বন্ধু ও একজন বাঙালি বন্ধুকে কটক থেকে নিই। আমার ধারণা যত বেশি সম্ভব স্থানীয় লোকদের এই ব্যাপারে যুক্ত করতেই হবে। ব্যাপারটাকে নিছক বাঙালি বাঙালি করে রাখলে চলবে না। রায়গড়াতে এক রাত্রি কাটাই, কোরাপুট জেলা থেকে হরিশ্চন্দ্র বকসীপাত্র একজন মন্ত্রী, তাঁর সঙ্গে পূর্বেই ভুবনেশ্বরে কথা হয়েছিল। তাঁর বাড়িতেই রায়গড়ায় একটা ছোটখাটো বৈঠক করি, স্থানীয় ওড়িশি ভদ্রলোকদের

নিয়ে। তার পরদিন কোরাপুটে পৌঁছই। কোরাপুটেই ডিডিএ-র হেড কোয়ার্টার। মি. পুরি এখন ডিডিএ-র চেয়ারম্যান ও চিফ একজিকিউটিভ অফিসার। তিনি গত ৩-৪ মাস হল গিয়েছেন। বেশ উৎসাহী লোক বলেই মনে হল। তিনি নিজেও একদা শরণার্থী ছিলেন। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা। কেন্দ্রীয় সরকারের কুটির ও ছোট শিল্পের সেক্রেটারিয়েটে ছিলেন। তিনি মনে করেন, আবার মর‍্যাল ফিরিয়ে আনা যাবে। মালকানগিরি জোনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রীগৌতমবুদ্ধ মুখার্জি, আইএএস, ইনিও মাত্র এক মাস হল মালকান শিবিরের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। বেশ শান্ত প্রকৃতির লোক এবং উৎসাহ আছে বলেই মনে হল। তিনি প্রতিদিন শরণার্থী গ্রামে দৌড়চ্ছেন, কেবল অফিস আর ফাইলপত্র নিয়ে থাকেন না। তবে তিনিও নতুন। এখন ডেভেলপমেন্টের চেয়ে শরণার্থী রিসেপসন ও রিলিফ দেওয়াই কাজ— কিন্তু ডিডিএ রিলিফ সংগঠন নয়, ডেভেলপমেন্টের জন্য সংগঠন। যদি রিলিফ নিয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে ডেভেলপমেন্ট হবে না, শরণার্থীদেরও মনোবল সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

আমি একটা ছোট উদ্দেশ্য নিয়ে এবারে দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলাম। সেটা এখানে বলে দেওয়া দরকার। স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি সেবা ও গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দণ্ডকারণ্য এলাকাতে একটা ছোট পাইলট প্রোজেক্ট করা সম্ভব কিনা এটা দেখাই আমার লক্ষ্য ছিল। সব কাজ সরকারি কর্মচারী ও বুরোক্রেসি দিয়ে হয় না। নন-অফিসিয়াল এজেন্সি ও ভলান্টারি সংগঠনের এ ক্ষেত্রে অনেক কাজ আছে। অথচ এ জাতীয় কোনও প্রতিষ্ঠান দণ্ডকারণ্যে কোনও কিছু নেই। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সর্বভারতীয় চরিত্রের হওয়া দরকার, কেবল বাঙালি দিয়ে নয়।

এখানে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যটা আবার স্মরণ করা দরকার। দণ্ডকারণ্যে কোরাপুট জেলায় (সবচেয়ে বড় জেলা) শতকরা ৬৬ ভাগ লোক সিডিউলড ট্রাইব ও সিডিউলড কাস্ট। মালকানগিরি ওড়িশার সবচেয়ে বড় সাব-ডিভিসন সেখানে আদিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৭০ জন। সব বাঙালি শরণার্থীরাও যদি দণ্ডকারণ্যে বসে যান, তবে তাদের সংখ্যা শতকরা ১০-১২ এর বেশি হবে না। ডিডিএ বা দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাজ হল সমগ্র এলাকাটার উন্নয়ন, তার মধ্যে যাঁরাই আছেন তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন এটা কোনও বিশেষ কমিউনিটি উন্নয়ন প্রোগ্রাম নয়, এরিয়া বেসিসের প্রোগ্রাম। অতএব ডিডিএ যে কাজ করবে, তা সকলের জন্যই করবে। যদি জাতি বা উপজাতি বা কমিউনিটি হিসেবে কারা বেশি উপকৃত হবে প্রশ্ন করা যায়, তবে স্বভাবতই বলতে হবে যে যারা শতকরা ৭০, অর্থাৎ আদিবাসীরা, তাদেরই উন্নতি বা উন্নয়ন এর প্রধান বস্তু। তারপরে আসে বাঙালি উদ্বাস্তুদের কথা। এটা আগে পরের কথা নয়, একই সঙ্গে সকলের

উন্নতির প্রোগ্রাম। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে ডিডিএ হল বাঙালিদের প্রোগ্রাম তবে তা সত্য নয় এবং তা কখনও কার্যকর হতে পারে না। ডিডিএ জমি উদ্ধার করে আদিবাসীদের জন্যও দিয়ে দিচ্ছে, অবশ্য রাজ্য সরকারের হাত দিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে যারা ভূমিহীন তাদের জন্য এই জমি। আবার তাদের জন্য বাড়িঘর, চাষবাস ইত্যাদি করার জন্য যা করার দরকার বা ভাগ [?] তাও রাজ্য সরকারের হাতেই দিয়ে দিচ্ছে। শত-শত মাইল যে রাস্তা তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে, তাতে কেবল বাঙালিরাই হাঁটবে না, তাও সকলের জন্যই। তাও করে দিচ্ছে ডিডিএ। গোটা কয়েক বাঁধ তৈরি করার টাকাও ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের হাতে দিয়ে দিচ্ছে ডিডিএ। নতুন নতুন বন সৃষ্টি করার জন্য সরকারি বন বিভাগের হাতে টাকা তুলে দিচ্ছে ডিডিএ। অথচ ডিডিএ কী একমাত্র বাঙালিদের জন্যই? অথচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিকান্দার বখত সেদিন ঘোষণা করে দিলেন যে, তাঁরা শীঘ্রই পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় তুলে দেবেন। সরকার নাকি পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য এ যাবৎ ৪০ কোটি টাকা খরচ করেছে। একমাত্র ডিডিএ-ই খরচ করেছে ১১৫ কোটি টাকা। বছরের পর বছর কতদিন ধরে এই শরণার্থী সমস্যাকে জিইয়ে রাখা হবে? অতএব সব গুটিয়ে নেব। এই বিবৃতি আমি দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ শেষ করে দিল্লি যাবার পথে নাগপুর স্টেশনে পড়ি। পড়ে স্তম্ভিত ও অবাক হই! শরণার্থী পুনর্বাসন বিভাগ ও ডিডিএ যদি তুলে নেওয়া হচ্ছে এখন বলা হয়, তবে মি. পুরি ও তাঁর ডিডিএ সহকর্মীদের মনোবলটা কিছু থাকবে কী? শরণার্থীদের ভগ্ন মনোবল ফিরিয়ে আনার প্রাথমিক দায়িত্ব আজ ডিডিএ-র আর ডিডিএ-র অফিসার ও কর্মচারীদেরই। যদি বলা হয়, তোমাদেরও মেয়াদ বেশিদিন নেই, তবে ডিমরালাইজেশন তো মাথাতেই ঢুকে যাবে, এ যেন মাথার ওপরেই আঘাত। একটু হিসেব নেওয়া যাক।

মোট কত পরিবারকে এ যাবৎ দণ্ডকারণ্যে বসানো হয়েছিল বলে সরকারি বিবৃতিতে পাই। কোন্ডাগাঁও-১৯৮, মালকানগিরি-৮১৯২, পারলকোট-৭৪৫৪, ওমরকোট-৪২৫৭, মোট-২০,১০১ চাষি পরিবার। আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা এস-টি পরিবারের মোট সংখ্যা হল ১২০২; অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২১,৩০৩টি পরিবার। এই ২১-২২ হাজার পরিবারের জন্য যদি ১১৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়ে থাকে তবে প্রতি পরিবার পিছু খরচ হয়েছে প্রায় ৫৩ হাজার টাকা। এত টাকা খরচ করার পরেও শতকরা ৭০ শরণার্থী সেখান থেকে সব কিছু ফেলে দিয়ে চলে গেল সুন্দরবনের বাঘ-ভল্লুকের দেশে? এই ধরনের কথা বলার মানে একটা স্ক্যানডেলকে স্বীকার করে নেওয়া। স্বয়ং সিকান্দার বখতের মাথায়ও নেই, ডিডিএ-র প্রকৃত তাৎপর্য কী। ওটা নামেই মাত্র শরণার্থী প্রোগ্রাম, আসলে একটা প্রকাণ্ড ভূখণ্ডের উন্নতির প্রোগ্রাম— দণ্ডকারণ্যের এলাকা সারা পশ্চিমবাংলার প্রায় ডবল বা দ্বিগুণ।

নেংটি পরে প্রিমিটিভ অবস্থায় আধপেটা খেয়ে পরে থাকে যে আদিম জাতি তারাই সেখানে শতকরা ৭০ ভাগ। আর বিরাট ভবিষ্যৎ এই এলাকার। সেচ ব্যবস্থায় প্রায় সব জমিকেই সমৃদ্ধ করা চলে। প্রচুর মূল্যবান বনসম্পদ, খনিজ দ্রব্যের অভাব নেই, লৌহ আকর, বক্সাইট, লাইমস্টোন প্রচুর রয়েছে।

যদি আজ পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় তুলেই দেওয়া হয় তবে এ কাজ করবে কে? শরণার্থীরা না হয়, এমনিই মরে গেল বা হারিয়ে গেল, কিন্তু স্থানীয় আদিবাসীদের হবে কী? বিরাট কর্মকাণ্ডের যোজনার কী হবে? রাজ্য সরকারের হাতে ছেড়ে দিলেই হবে কি? রাজ্য সরকারের হাতে এত লোকজন ও রিসোর্স দেওয়া হবে কি? আদিবাসী বা উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের সে যোগ্যতা হয়েছে কি? যদি পুনর্বাসন বিভাগ তুলেও দেওয়া হয়, ডিডিএ-কে যেন তুলে দেওয়া নয় হয়, এমন আত্মঘাতী কাজ না করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রাইব্যাল উন্নতির বিভাগ ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট বিভাগ ও হোম ডিপার্টমেন্টকেই তবে ডিডিএ-র দায়িত্ব নিতে বলা হোক।

যাক এসব কথা। এখন ডিডিএ-র কর্মপন্থায়ও কীভাবে পক্ষপাত ঘটেছিল, তা একটু বলা দরকার। ডিডিএ কেমন করে শেষ পর্যন্ত একমাত্র শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আসলে এরিয়া ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্য থেকে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। আদিবাসীদের জন্য উদ্ধার করা জমির শতকরা ২৫ ভাগ ও অন্যান্য অর্থ রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিয়েই তারা খালাস, কিন্তু কেমন করে সে জমির ব্যবহার হচ্ছে, কেমন করে তাদের উন্নতি হচ্ছে, কেমন করে ও কতটা অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তা দেখার দায়িত্ব আর তাদের নেই। বন বিভাগের হাতে টাকা তুলে দিয়েই খালাস কিন্তু সেখানে বন সৃষ্টি হচ্ছে কি না, দেখবার দায়িত্ব নেই। এমনই করে দণ্ডকারণ্য একটা ডুয়েল কর্তৃত্বে ভাগ হয়ে গেছে, পরস্পরের সঙ্গে সামান্যই যোগাযোগ আছে। যে যার আপন মনে চলেছে। বহু শত মাইলে বিক্ষিপ্ত শরণার্থী গ্রামগুলোর পরিদর্শন করার জন্য পেট্রোল পুরিয়ে ডিডিএ অফিসারেরা ঘুরছেন, কিন্তু পথে যে অসংখ্য আদিবাসী গ্রাম আছে তাদের কী হচ্ছে তা দেখবার অবসরও নেই, দায়িত্বও নেই। আবার স্টেট গভর্নমেন্টের অফিসার ও কর্মচারীরা গাড়ি হাঁকিয়ে ডিডিএ-র তৈরি পথ দিয়ে আদিবাসী গ্রামের খবরাখবর করতে যাচ্ছেন, কিন্তু শরণার্থী গ্রামগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এভাবে যে কত পেট্রোলের অপচয় হচ্ছে অথচ যথাযথ কাজ হচ্ছে না, তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়।

এই পরিস্থিতিতে শরণার্থী ও আদিবাসীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি ও রেষারেষি তো হতেই পারে। একদল বলবে সবই শরণার্থীদের জন্য করা হচ্ছে আর একদল বলবে সব জল, সব সেচ, সব ভাল জমি তো আদিবাসীরাই পাচ্ছে, আর এই সুপ্ত

বিরোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য কায়েমি স্বার্থের বাহক ও সাহুকার ব্যবসায়ী শ্রেণিদের পরোক্ষ উসকানি থাকতেই পারে। কোথাও ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্য নেই। বাঙালি ও আদিবাসীদের মধ্যে সংস্কার ও সংস্কৃতিগত এবং ভাষাগত কত পার্থক্য। এই বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও বন্ধন সৃষ্টি করার জন্য কোনও সংগঠন নেই। সকলেই সকলকে ভুল বোঝেন এবং ভুল বোঝাতে সাহায্য করছেন।

এখানে একটা বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া দরকার। ওড়িশিরা বাঙালি শরণার্থীদের ওখান থেকে ভাগিয়ে দিয়ে ডিডিএ রচিত উন্নত সেচসেবিত জমিগুলো তারা ভোগ করবার উদ্দেশ্যে ঝগড়াঝাঁটি উসকে দিচ্ছে। এ জাতীয় কথাবার্তা একদম দায়িত্বহীন। মালকানগিরি জোনে শতকরা ৫ ভাগ লোকও ওড়িশি নন। বরং তেলেগুরা সীমান্তের অপর পার থেকে ক্রমশ এসব অঞ্চলে ঢোকবার চেষ্টা করতে পারে। কোরাপুটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এটাও আশঙ্কা করেন। তিনি একজন ওড়িশি। তিনি মনে করেন যদি শরণার্থীরা এক্ষুনি ফিরে এসে তাদের জায়গা দখল না করেন, তবে তেলেঙ্গিরা এসে জোর করে বসে পড়বে, তখন প্রশাসনের পক্ষে একটা কঠিন সমস্যা হবে তেলুগুদের উৎখাত করা। আরও অনেক ওড়িশি অফিসার এ জাতীয় উৎকণ্ঠা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। অথচ এই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নামেই কলকাতার একটি ইংরেজি নামী সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি নাকি অনেক টিকিট কেটে শরণার্থীদের চলে যাওয়ার সুবিধা করে দিয়েছেন, কী দায়িত্বহীন এসব প্রচার। আমি তো লজ্জায় হেঁট, কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এতে কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেও বিশেষ ক্রুদ্ধ নন। আবার এমন সংবাদও কলকাতার খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে, স্থানীয় আদিবাসীরা শরণার্থীদের তাড়াতে সাহায্য করছে। আমি কয়েকজন আদিবাসী নেতারও দেখা পাই। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন, লক্ষ্মণ মারকানি— কয়া উপজাতি নেতা। মালকানগিরির বদিলি গ্রামের আদিবাসী ও পঞ্চায়েত প্রধান। তিনি নিজে হাসনাবাদ পর্যন্ত এসেছিলেন শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেবার জন্য। পারেননি। পরে তাঁর কাছে লেখা শরণার্থীদের কয়েকটি হৃদয়বিদারক চিঠিও আমি দেখি। লক্ষ্মণ কিছুটা শিক্ষিত, বাংলা বলতেও শিখেছেন, তিনি জনতা দলেরও সভ্য। তা ছাড়া আমি আদিবাসী দু-একটি গ্রামে গিয়ে শরণার্থীদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা কী বুঝতে চেষ্টা করেছি। সত্যিই তাদের সঙ্গে বড় ধরনের কোনও মনোমালিন্য ছিল না, উভয়ে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহায়ক হয়ে পড়েছিল। একটা পাগলা হাওয়া এসে হঠাৎ বাঙালি শরণার্থীদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে যায়। এমনই ছোটখাটো বিবাদ-বিসম্বাদ ভারতের সর্বত্রই আছে। তুলনায় এখানে অনেক কমই বলা যায়। আদিবাসীরা ওখানকার সত্যিই অনেক পেছনে। আমাদের

সাঁওতালরাও তার তুলনায় এখানে অনেক উন্নত। কিছু সাঁওতাল উদ্বাস্তু পরিবারও ওখানে এসেছে। তারা এক রকম ভালই আছে। তাদের কিছু কিছু অভিযোগ আছে আদিবাসীদের বিরুদ্ধেও, কিন্তু সে সব আদিবাসী কালাহান্ডি জেলা থেকে আগত। দরিদ্র কালাহান্ডি থেকে সরে আসা প্রায় যাযাবর জাতীয় আদিবাসী। তাদের মধ্যে কিছু চোর জাতীয় ব্যক্তি আছে— কিন্তু স্থানীয় আদিম আদিবাসী (কুয়া)দের বিরুদ্ধে সাঁওতালদেরও কোনও নালিশ নেই। এখানকার আদিবাসীরা সত্যিই খুব সরল। তারা না খেয়ে থাকলেও কখনও ভিক্ষে করবে না, চুরি করবে না, কেড়ে নেবে না। পরনে তাদের এক-দুই করে পট্টি মাত্র। শতকরা চারজনাও সাক্ষর নয়। ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে তাদের ছেলেমেয়েরা। আমি কয়েকটা গ্রামে গিয়েছি। প্রথমে কেউ আসে না। পরে একে একে ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়িরা উপস্থিত হয়েছে। ভাষা বোঝা ও বোঝানো শক্ত। ওড়িশি বন্ধুরা আমাকে কিছু কিছু বোঝাতে পারছেন। দেখলাম নতুন প্রজন্মের কিছু কিছু আদিবাসী তরুণ বা কিশোর বাংলা বোঝে, আমার কথার উত্তর ভাঙা-ভাঙা বাংলাতেই দিচ্ছে। সোজা সরল উত্তর। কোনও মারপ্যাঁচ নেই। ওরা এত সরল যে, সরকারি ঋণ নিতেও রাজি নয়, নয় ডিডিএ-র দেওয়া জমিরও দখল। বাঙালিদের কাছ থেকে নানা ধরনের চাষবাস একটু একটু শিখলেও শিখছে। বাঙালিরা হঠাৎ চলে যাওয়াতে ওরা দুঃখিত। একযোগে হঠাৎ চলে যাবার জন্য মালকানগিরি শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় শহরবাসীরাও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত, তারাও চায় বাঙালিরা ফিরে আসুন।

ওমরকোট এলাকার একটু খবর দিই। সেখানকার প্রায় সাড়ে চার হাজার বাঙালি শরণার্থী পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩-৪ শত পরিবার চলে গেছেন, বাকিরা কিন্তু এই হুজুগে কিছুতেই মাথা দেয়নি। সেখানকার জোনাল কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল ও সেক্রেটারি গৌরাঙ্গ শীলের মনোবল লক্ষ্য করে ভাল লাগল। তার মানে এই নয় যে তাদের কোনও অভিযোগ নেই বা নালিশ নেই। কিন্তু তার জন্য তাঁরা ওখানে বসেই লড়বেন, চলে যাবেন না। কাউকে চলে যেতে দেবেন না— বরং যারা চলে গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছে বা আসছে তাদের জন্য একটা আলাদা গ্রাম দেওয়া হোক— এমনই তাঁদের দাবি। ওমরকোট এলাকায় হাজার হাজার একরে ভুট্টা চাষ হচ্ছে দেখলাম। ভুট্টার বাজার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে তারা ২০ লক্ষ টাকা লোন পান, জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রী জে পি চৌধুরির কাছে শুনলাম যে লোন পরিশোধের হার ৯৫ শতাংশ। এটা যে কোনও ভারতীয় এলাকার পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত। ওখানে ওরা প্রত্যেকের জমিতে একটা করে ডাগ-ওয়েল চান। তাদের অভিযোগ প্রথমে প্রত্যেক পরিবারকে ৭ একর করে চাযের জমি দেওয়া হত। এখন তা থেকে নাকি দু একর কেটে নেওয়া হচ্ছে।

সেচসেবিত এলাকা এটা নয়। একটা করে ইঁদারা দিয়ে যদি ৫ একর করে জমি দেওয়া যায়— তবে হয়তো চলে— কিন্তু সেচবিহীন ৫ একরে কোনও পরিবারের ভরণপোষণ চলা শক্ত। যাই হোক এসব অভিযোগ সত্ত্বেও ওই এলাকায় এখনও হাসি ও উৎসাহ দেখা যায়। পুলিশ সম্বন্ধে নানা অভিযোগ আছে। সাতটা খুন হয়েছে অথচ কাউকে ধরা যায়নি, বা ধরেনি। পুলিশের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক নালিশ শুনেছি দণ্ডকারণ্যের কর্তৃপক্ষের কাছেও। এ সম্বন্ধে পুলিশ সাহেবকেও বলেছি তাঁর পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের কথা।

যুগান্তর, ২৬ জুলাই ১৯৭৮

ক্ষুধার অস্ত্রে ঘায়েল করে দণ্ডকত্যাগীদের দণ্ডকে ফেরানো হচ্ছে। হাসনাবাদ স্টেশনে সার সার ঝুপড়ি, যা পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তায় বাঁচা ও না-খেতে পেয়ে মরে যাওয়ার অতুলনীয় আশ্রয়। হার-না-মানা অনেক মানুষ তখন মেতেছেন দ্বীপে আপন হাতে আপন বসতি নির্মাণে।

দশ হাজার রবিনসন ক্রুশো অবিকল খুলনা বানাচ্ছেন

জ্যোতির্ময় দত্ত

ক. মরিচঝাঁপির আড়ালে

হাসনাবাদ রেলস্টেশনের যে দিকেই তাকান, দেখবেন গরুরগাড়ির ছইয়ের মতো ঝুপড়ির পর ঝুপড়ি। যার মধ্যে হাজার ছয় কিংবা আট কিংবা নয়— সঠিক গণনা কেউ করেনি— ক্রুদ্ধ, অভুক্ত মানুষ অপেক্ষা করছে।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্পেশাল ট্রেন, যাতে উঠে পড়লেই পাওয়া যাবে খাবার এবং ওষুধ। প্ল্যাটফর্মের টিউবওয়েল থেকে জল নেওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ শরণার্থীদের সঙ্গে মিশে আমিও মাইকের ঘোষণা শুনি: এঁ্যাপনাঁরা ট্রেনে ওঠামাত্র এঁামাদের অফিসারেরা এঁ্যাপনাদের এঁ্যাবতীয় দরকার দ্যাঁকবেন। এঁ্যাপনাঁদের প্রত্যেকের খাবার ও নগদ টাকার ব্যাঁবস্থা করেঁ দেবেন। ট্রেন ছাড়তে এঁ্যার দেরি নেই।

গোটা কুড়ি উপবাসী পরিবার ট্রেনে উঠে গেছেন, কিন্তু আরও অনেক অনেক জায়গা পড়ে আছে। একদা খুলনা ও তৎপরে অন্ধ্রপ্রদেশবাসী বৈকুণ্ঠ মণ্ডল গভীর মনোযোগসহ রেলগাড়ির জানালায় ভেজা ধুতি শুকুতে মেলে দিচ্ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী কামরার ভেতরটায় ছেঁড়া কাঁথা ও এনামেলের বাসন বিছিয়ে আবার

একবার চেষ্টা করছিলেন একটু থিতু হয়ে বসার, এমন সময় আমি উঁকি দিলাম।

কী দেখতিছেন? আমি বললাম, আমি সাংবাদিক, জানতে এসেছি দণ্ডকারণ্যে ফেরার অসুবিধেটা কী? কেনই বা আপনারা এসেছিলেন?

'ইচ্ছা ছিল না ওই দেশে যাব, কিন্তু এ দেশে বান্ধব পালাম না। আজ ছয়দিন ভাত খাতি পারিনি। চলতিছি। আসতিও দিচ্ছে না।'

মণ্ডলমশাই কোনও জায়গা থেকে সহজে পালাবার লোক নন। উনি ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে যুঝেছেন এবং দণ্ডকারণ্যও ওঁদের এতদিনে কাবু করেনি।

'আপনারা তো দেখেন না কিসির জন্য আমরা আসছি। আজ তের বচ্ছর আমরা একটা কোথাও বসার চেষ্টা করতিছি, কিন্তু সে দেশে তের বচ্ছর বিষ্টি হয় না। আমরা গাছের মহুয়া ফল, তেঁতুল পাতা, বিচি গুঁড়া, খায়ে খায়ে কাটায়ে দিচ্ছি। আর আশা নাই।'

কলকাতার রাস্তায় যেহেতু এই দৃষ্টিকটু ও বিরক্তিকর মানুষদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি, বৈকুণ্ঠবাবুর উক্তি অনেকের অতিনাটকীয় মনে হবে। দণ্ডকারণ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এত শত কোটি টাকা ব্যয় করার পরও যদি সেখানে এঁরা বাঁচার মতো পরিবেশ না করে থাকতে পারেন, সেটা নিশ্চয় বাঙালি রিফিউজির আলস্য ও অপদার্থতার কারণে!

কেন এলেন আপনারা? কারও প্ররোচনায় কি আপনারা এসেছেন? কেন ফিরে যাচ্ছেন না? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের অন্বেষণে আমরা বসিরহাট থেকে হাসনাবাদ হয়ে সুন্দরবনের কুমিরমারি ছুঁয়ে সেই কাদার দ্বীপ মরিচঝাঁপি ঘুরে এলাম এবং মানুষের কষ্টের এবং মানুষের শক্তির এমন একটি উপলব্ধি এই চারদিনে নিয়ে ফিরলাম, যা না ভোলা পর্যন্ত সহজ ভাবে অন্ন গ্রহণ আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু শুরুতেই বসিরহাট স্টেশনেই কি স্পষ্ট ছিল না উত্তর? ওই 'ঝুপড়ি' হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা আস্তানা। কোনও খুঁটি নেই, কেবল কয়েকটি কাঠি ধনুকের মতো বেঁকিয়ে তার ওপর ক্যান্টিলিভার পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে অর্ধ-তাঁবু, অর্ধ-কুঁড়ে। না এস্কিমোর ইগলু, না রেড ইন্ডিয়ানের টোকি, এই আট আনা দামের 'ঝুপড়ি'র চেয়ে কম খরচে অধিক সংখ্যককে আশ্রয় দেয়।

এ রকম নিকৃষ্ট একটি আস্তানার মধ্যে কোনও বিচক্ষণ চাষি তাঁর দামী ছাগল কি মুরগী রাখবেন না। যদি এই 'ঝুপড়ি'র মধ্যে এই বর্ষায় তিন দিনে হয়তো একবার কিছু খেয়ে পাঁচজনের মধ্যে হয়তো দুজনই মরে গিয়ে, তবুও যদি এই পশ্চিমবঙ্গের কাদা আঁকড়ে ব্যতিক্রমহীন নির্বিশেষে সবাই পড়ে থাকতে চায়, তবে নিশ্চয় দণ্ডকারণ্যে কোনও অন্যায় ঘটেছে!

কেন আপনি দণ্ডকারণ্য ছেড়ে এলেন, এর উত্তর কেউ ব্যথিতভাবে দিয়েছেন, কেউ ফোঁস করে। মরিচঝাঁপির আরণ্যক উপনিবেশের একজন পৌরাণিক ভাষায় বললেন: ওই বনপ্রদেশ থেকে কেন যুধিষ্ঠির মহারাজ চলে এসেছিলেন? কেন রামচন্দ্র সেখানে থাকেননি? আমরা চৌদ্দ বৎসর বনবাসের পর নিজির দেশে, নিজির মাটিতে ফিরলাম। এতে আর বিস্ময় কী? কিন্তু তাঁর পাশেই বসেছিলেন যুবক পবিত্রকুমার বিশ্বাস, যিনি রাগে ঠিকরে উঠে, চোখেমুখে ফুলকি ছিটকে বললেন: 'কেন থাকব? আমাদের আপনারা বলছেন আমরা সুখে থাকতে হঠাৎ কারও কনস্পিরেসিতে চলে এসেছি। শুনুন। কারও কনস্পিরেসি নেই। কনস্পিরেটর হচ্ছে আমাদের পেট। যিনি আমাদের পটারু ড্যামের খবর দিচ্ছেন, তাঁকে আমি এই খবর দিচ্ছি: পটারু ড্যাম বলে কিছু নাই? ছত্রিশওড়া ড্যাম বলে কিছু নাই। আমি নিজে ছত্রিশওড়া স্কিমে মাটি কেটেছি। ওই ড্যামে জল ধরে চাষ শুরু হতে আরও কুড়ি বছর লাগতে পারে, থার্টি ইয়ার্স লাগতে পারে। কিন্তু এখন বাঙালি রিফিউজি কোথাও নাই যে কোনও স্কিমে জল পাচ্ছে, যে কারও কাছ থেকে গালাগালি আর মারধোর ছাড়া কিছু পাচ্ছে।'

মরিচঝাঁপি থেকে ফিরে কুমিরমারিতে রাত কাটাবার অবকাশে দেখা হল মালকানগিরি ড্যামসাইটের ৩নং ক্যাম্পের শ্রীনিখিল রায়ের সঙ্গে। ইনি সপরিবারে কুমিরমারির ইস্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। এঁরা দিনের বেলা নদীর ধারে বাঁধের ওপর ঘুরে বেড়ান, বিকেলে, ইস্কুল সাঙ্গ হলে, ভেতরে গিয়ে দর্জির কাজ করেন।

নিখিলবাবুরা পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন ১৯৭০-এ ম্যাট্রিক পাশের পর। দু-একটি শিবির ঘুরে প্রথমে যান মানা ক্যাম্পে। তারপর সোনাবেড়া ক্যাম্প (৯ মাস), মানভাটা ক্যাম্প (৩ বছর), এমার্জেন্সি জারির পর মালকানগিরি ক্যাম্প।

'ক্যাম্পে ক্যাম্পে শোনা হয়েছিল আমাদের মতো রিফিউজিদের সরকার দিতিছেন এই ঢের। ক্যাম্প কমান্ডান্ট কোনও কমপ্লেন শুনতি চাতেন না, বলতেন তোমাদের মতো রিফিউজি থাকলিও চলে, না থাকলিও চলে। আমাদের কাজ ছিল বাঁধ তৈরি, কালভার্ট তৈরি, মাটি কাটা, গাছকাটা। ক্যাম্পের বাইরি কোনও কাজ নেওয়ার অর্ডার ছিল না। যেখানি বলবেন, সেখানি গিয়ে মাটি কাটতি হবে। আমরা কতিম, দেশ বিভাগ না হলে বাঙালি রিফিউজি না আলি কি আপনাদের কোনও রাস্তা হত না? না জনমানবহীন জঙ্গলির মধ্যে সব গরু গাধার কাজ বাঙালি রিফিউজি করবে কিন্তু মানুষের মতো কোনও অধিকার পাবে না।' যে কাজ অপর কেউ করবে না সেখানে সেই কাজ এই ভারতবর্ষের এই অতিথিদের দ্বারা করিয়ে নেওয়া হত। এর জন্য দৈনিক মজুরি ১-৮০ থেকে ২-১০ পয়সা যা কন্ট্রাক্টরদের মজুরদের উপার্জনের এক-তৃতীয় থেকে এক-চতুর্থাংশ। আমরা এঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার

নামে ভারত বিভাগের এই জামিনদের কাছ থেকে সস্তা দামে আদায় করেছি।

এমন সময় মুকুন্দরাম সিকদার বলে আর একটি শরণার্থী এসে আমাদের কলকাতার লোকদের তাঁদের অবস্থার রগড় দেখতে আসার জন্য মহা চোটপাট শুরু করলেন। নিখিলবাবু তাঁকে শান্ত করে ধীর ভাবে দণ্ডকারণ্যে চাষের সমস্যাটা বোঝালেন। আমরা আট বছর ধরে শুধু ক্যাম্পেই আছি, আমরাও ভারত সরকারের চিপ লেবার। কিন্তু যাঁরা জমি পেয়েছেন, বারো-চোদ্দ বছর আছেন তাঁরা কেন থাকতে পারছেন না?

'বাঙালির জমি হচ্ছে পাথুরে পাহাড়ের ঢালুর জমি, যে জমি এমনকী আদিবাসীরা ছুঁয়ে দেখে না। বিষ্টি হয় না, হলেও দাঁড়ায় না। আর যদি বা বিষ্টি হল, কোন মতে ধান হল তো লোকালরা তা কেটে নিয়ে যাবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখতি হবে। কোনও বিচার নেই। সবার অধম হচ্ছে বাঙালি। একজন কেউ তো করার নেই। কারও কাছে নালিশ করার নেই।'

নিখিলের বয়স ৩০। সে অলস নয়, আট বছর সে মাটি কেটেছে। এখন এখানে এসে সপরিবারে দর্জির কাজ করছে। শ্রীপদ মণ্ডলের, যে শ্রীপদ মণ্ডলের মিষ্টির দোকানে বসে আমরা কথা বলছিলাম, তিনি নিজেও খুলনার লোক। কেবল তাঁর পরিবার পঞ্চাশ বছর আগে সুন্দরবনে এসেছেন এবং জঙ্গল সাফ করে বসবাস শুরু করেছেন। তখন তাঁরা গাছও কেটেছেন, বাঘও তাড়িয়েছেন, আর কুমীরকে যে কী করেছেন তা তো স্থানটির নামেই প্রকাশ। এমনি করেই সুন্দরবনের নোনা কাদামাটি মানুষের হাতে পড়ে মিষ্টি ও ফলদ হয়েছে।

সকলেই কতিছে বাঁচতি যদি পারো তো প্রতিবিশিতা পাবা। সেখানে সকলে তাকায় যেন কখন এ আপদ যাবে। এখানে তাকায় যেন মুখে না বলেও বলে, বাঁচতি পারবা ত?

খ. 'নিতাইচাঁদ কি জয়'

মরিচঝাঁপি হচ্ছে রায়মঙ্গল আর বাগনা নদীর সৃষ্ট একটি দ্বীপ যা কোটালের বানে প্লাবিত হয়ে যায়। এটা হল সুন্দরবনের চৌকাঠ। বাঘ এবং মানুষের জগতের মধ্যে এক বাফার এলাকা, যাতে বনবিভাগ ঝাউ এবং নারকেল রোপণের একটি অর্ধমনস্ক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। আগের দিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ, যখন হাসনাবাদ থেকে লঞ্চ রায়মঙ্গলে পড়ল, এক কিশোর মণ্ডল আমাদের আঙুল দিয়ে মরিচঝাঁপি দেখিয়ে দিলেন: 'এটাই হচ্ছে প্লান্টিশান। ওইখানে থেকেই সুন্দরবন শুরু। স্পষ্টতই,

যাঁরা জলময় সুন্দরবনের কুহকে সাড়া দিয়ে পাথুরে দণ্ডকারণ্য ফেলে চলে এসেছিলেন, তাঁরা দক্ষিণে যেতে যেতে এখানেই প্রথম বসতিহীন এক দ্বীপ পথে পেয়ে, তাঁদের অবসন্ন দেহ এই কাদামাটির ওপর ফেলে দিয়েছেন। আমরা রাতটা বাগনা ফরেস্ট অফিসের কাছে এক জেলে কুটিরে কাটিয়ে, পরের দিন সকালে এক আঁশটে ডিঙি নিয়ে মরিচঝাঁপি পৌঁছলাম। যখন নদী পার হচ্ছি, পাশ দিয়ে আট-দশটা বৈঠা ছপছপ করতে করতে একদল সহাস্য ও সকৌতুক শরণার্থী রমণী ওপারে জল আনতে ও কাঠ বেচতে চলে গেল। নৌকাটার মাঝিও দাঁড়ি সকলেই নারী। তাঁরা এমনভাবে পাশ দিয়ে চলে গেলেন, যে মনে হল তাঁরা বুঝি ইতিমধ্যে চৌদ্দ বছর দণ্ডকারণ্যে কাটাননি, তাঁরা বক কী মাছের মতোই জলেরই জীব।

বস্তুত, মরিচঝাঁপিতে নেমে— এর নতুন ঔপনিবেশিকেরা জায়গাটার নাম দিয়েছেন 'নিউ নেতাজিনগর'— প্রথমেই যেটা মুখে জল ঝাপটের মতো লাগে সেটা হচ্ছে এঁদের আনন্দ। এঁরা প্রত্যেকেই নিয়মিত অনাহারে আছেন। সারাক্ষণ পা দুটি কাদায় প্রোথিত। অমোঘ নিয়মে, একজন-দুজন করে মারা যাচ্ছেন। কিন্তু কারও মুখে দীনতা কী বিরক্তি নেই। আমরা নৌকা থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটি তরুণ কর্মী আমাদের ঘিরে নিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে নিলেন। এঁদের অনেককে গ্রেফতারের পর, এঁরা সর্বদাই সাদা পোশাকের পুলিশের আগমনের আশঙ্কায় আছেন। কিন্তু আমাদের ফটোগ্রাফার দিলীপ ঘোষ আগেই পথিকৃৎ রিপোর্টার অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে এ অঞ্চল ঘুরে যাওয়ায় সন্দেহ সহজেই ভেদ হল।

যে মুহূর্তে ওঁরা নিশ্চিত হলেন যে আমরা বন্ধু এবং তাঁদের জন্য কিছু খাদ্য ও ওষুধ নিয়ে এসেছি, তাঁরা সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠলেন, 'জয়, নিতাইচাঁদ কি জয়।'

এঁরা অধিকাংশই বৈষ্ণব। এবং 'নিতাইচাঁদ' হলেন গৌরাঙ্গের প্রিয় শিষ্য নিত্যানন্দ। এই ১৯৭৮ সালে, নিউট্রন বোমা এবং এলএসডি-র যুগে কোনও তীব্র ও গভীর বিশ্বাস বিনা এতগুলি মানুষ কি এত কষ্ট এমন হাস্যমুখে উপেক্ষা করতে পারত? এই হাজার দশেক মানুষ একটা বসতি গড়ার উৎসবে মেতেছে। প্রত্যেকে কাজ করছে। একটা চালার মধ্যে দেখলাম ডিঙি নৌকা তৈরি হচ্ছে। বসেছে কামারশালা ও হাঁপর। চেরাই হচ্ছে কাঠের গুঁড়ি। ছক কেটে বসানো হয়েছে বাজার। দেখলাম সোজা সড়ক, দেখলাম ইস্কুলের চালা, দেখলাম ভেরির জন্য ছেলেরা বানাচ্ছে বাকসো-কল, যেন দশ হাজার রবিনসন ক্রুশো জনহীন বাদার মধ্যে এক অবিকল খুলনা শহর রাতারাতি সৃষ্টি করবেনই, করবেন।

সেই মহাভারতের ঋষিদের মতো শ্মশ্রুল এক বৃদ্ধ বাঁধের ধারে বসে হাসি-হাসি মুখে সুতলি কাটছেন। এঁর নাম রতীশ মণ্ডল। বয়স বললেন ৫৫

বছর। 'একটু কমবেশি হতে পারে।' কিন্তু এখনও শুধু যে নিজে হাতে সুতো কেটে জাল বোনার সাধ আছে তাই নয়, নিজে হাতে কুঁড়েও বাঁধছেন, মাটিও কাটছেন। অথচ তিন দিন বাড়িতে উনুন জ্বলেনি।

তবু এখানে পড়ে থাকতে চান? এর উত্তরে এই শ্মশ্রুল রতীশ মণ্ডল যা বললেন তার সারাংশ হল যে, দণ্ডকারণ্যে বিশ বছর বেঁচে থাকলেও তা আশাহীন বাঁচা। যদি কোনও বছর ভাল বৃষ্টি হয় তো দু-মাসের মতো অন্ন জুটতেও পারে। এবং সেখানে তাঁরা ছিলেন সরকারি অফিসারের কৃপাহীন। 'আমরা ছিলাম পায়ের ফুটবল। যেখানে লাথাবে সেখানে যাতি হবেনে।' কিন্তু এই সুন্দরবনে যদি কোনও মতে তিন-চারটে মাস অনাহারে হলেও পার করে দিতে পারেন, তাহলে হয়তো চিরকালের মতো ডাঙা পাবেন। তাই না খেয়েই ত থাকি। দণ্ডকারণ্যে পেট ভরে ভাত খাতি পারিছি কদিন? বিশ বছর পার করতি পারলাম, তিন মাস পারবো না? কিন্তু এখন আমি আর রিফিউজি নই। আমার বাস্তুহারা দশা ঘুচিছে।' একটি নয়, দুটি নয়, এখানে দশ হাজারই রতীশ মণ্ডল। এঁরা যে রকম চওড়া করে সড়ক এবং বড় করে রাস্তা গড়ছেন তাতে মনে হয় এঁরা ভাবছেন, ওঁদের নাতনির নাতনিরাও এখানেই বুঝি বড় হবে।

প্রতিবেদন দুটি বেরোয় দৈনিক 'যুগান্তর'-এ ২৭ ও ৩০ জুলাই ১৯৭৮

তারিখটা ছিল সম্ভবত ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। বন্যার পর দুর্দান্ত রায়মঙ্গলে নৌযুদ্ধ। এক দিকে পুলিশবাহিনী, প্রত্যেকে স্বাস্থ্যবান এবং অন্য দিকে অসহায় বা স্বল্পাহারে দুর্বল খালি গা বাঙালি উদ্বাস্তুরা। লড়াই স্থলেও। কাদামাটির দ্বীপে বুড়োবুড়ি থেকে শিশুরা খাটছে দারুণভাবে। প্রাণের দায়ে। গড়ছে ঘর, স্কুল, পথ।

মরিচঝাঁপি সম্পর্কে জরুরি কথা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মরিচঝাঁপির কাছে নদীবক্ষে রীতিমতন একটা নৌযুদ্ধ হয়ে গেল। একদিকে পুলিশ বাহিনী যাঁদের কারুরই উচ্চতা পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চির কম নয় এবং তাঁরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান বলে ধরে নেওয়া যায়, আর অন্য দিকে অসহায় বা স্বল্পাহারে দুর্বল, খালি গা বাঙালি উদ্বাস্তুরা। পুলিশ পক্ষ ছিলেন মোটর লঞ্চে আর উদ্বাস্তুরা নিজেদের তৈরি করা নৌকোয়। এই সংঘর্ষে উদ্বাস্তুদেব মধ্যে কতজন হতাহত হয়েছেন তার কোনও বিবরণ সংবাদপত্রে বেরোয়নি, তবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ ন' জন পুলিশ আহত হয়েছেন জানা গেল। উদ্বাস্তুদের পঞ্চাশখানি নৌকো ডুবে যায়, তার আরোহীরাও নিশ্চয়ই ডুবে যায়নি, আশা করি। উদ্বাস্তুরাও সশস্ত্র ছিল। এই অসম যুদ্ধটি হল কেন? কিংবা এই যুদ্ধের কি কোনও প্রয়োজন ছিল? আমি সম্প্রতি মরিচঝাঁপি ঘুরে এসেছি, সুতরাং এ সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু জানাতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিরা উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে তিতিবিরক্ত। মোটামুটি কিছুটা সহানুভূতি যাঁদের আছে, তাঁরাও মনে করেন, উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নেবেন ভারত সরকার। ভারত বিভাগের ফলে বাঙালিরা উদ্বাস্তু হয়েছে বলে ভারতেরই বিভিন্ন প্রান্তে তাদের আশ্রয় দিতে হবে। সে রকম দেওয়াও হয়েছে। তবু সেই উদ্বাস্তুরা

কেন পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে সমস্যা বাড়াচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গে এমনিই তো সমস্যার অন্ত নেই। আমিও এরকম ভাবতাম।

কেন প্রায় সত্তর আশি হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলায় ফিরে এলো? একবার যারা ভিটেমাটি ছেড়ে দেশত্যাগী হয়েছে, তারা দ্বিতীয়বার আশ্রয় ত্যাগ করে কেন ফিরে এলো? সাধারণ নিরীহ মানুষ কি সহজে মোটামুটি একটা আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে এবং এরা সবাই ক্যাম্পবাসী নয়, অনেকেই জমি পেয়েছিল এবং হাল-গরু ছিল। জমি ছেড়ে, হাল গরু যা-তা দামে বিক্রি করে চলে এসেছে। ঠিক যেমন ভাবে এক সময় পাকিস্তান থেকে এসেছিল। কেন? উদ্বাস্তুদের মতে, দণ্ডকারণ্য পাকিস্তানের চেয়েও খারাপ। সেখানে তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকও নয়, চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণির কিছু। স্থানীয় লোকেরা বাঙালি এবং রিফিউজি শুনলেই ঘৃণায় নাক কুঁচকোয়। রিফিউজিরা দিন মজুরি করতে গেলে স্থানীয় লোকদের তুলনায় অর্ধেক মজুরি পায়। পুলিশ তাদের কেস নেয় না, ইত্যাদি। বিভিন্ন জায়গায় অন্তত পঞ্চাশজন উদ্বাস্তুর মুখে আমি এ কথা শুনেছি, এবং তাদের সকলকেই মিথ্যেবাদী ভাবার কোনও কারণ পাইনি। সেই জন্যই তারা 'মরি তো বাংলার মাটিতে মরব' এই শ্লোগান দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সব উদ্বাস্তুরই লক্ষ্য ছিল সুন্দরবন। এটা হঠাৎ কিছু নয়। অনেক দিন থেকেই ঠিক করা এবং গত তিন-চার বছরের মধ্যে উদ্বাস্তুদের কয়েকজন নাকি সুন্দরবন এলাকা ঘুরে সার্ভে করে গেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বাস্তুদের থামানো হয়েছে। তাদের অধিকাংশকেই বেশ সফলভাবে ফিরিয়ে দেওয়া গেছে। সে রকম একটি দলকে আমি হাসনাবাদ স্টেশনে দেখি, যারা ফেরৎ ট্রেনে ওঠবার জন্য সরকারি অফিসে লাইন দিয়েছে স্বেচ্ছায়। তারা প্রায় অনেকেই তিন চার দিন খায়নি, তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া গেছে স্রেফ ক্ষুধার অস্ত্রে। তারা গোটা পশ্চিমবাংলাকে অভিসম্পাত দিতে দিতে ফিরে গেল।

কয়েক হাজার উদ্বাস্তু এখনও রয়ে গেছে, তারা আশ্রয় নিয়েছে মরিচঝাঁপির মতন এক দুর্গম জায়গায়। আমি যেদিন যাই, সেদিন লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যেতে হয়েছিল ডিঙি নৌকোয়, দুর্দান্ত রায়মঙ্গল নদীর বুকের ওপর দিয়ে। মরিচঝাঁপিতে গিয়ে আমি অবাক। আমার ধারণা ছিল, বাঙালি উদ্বাস্তুরা অলস, কোনও কাজ করতে চায় না। কিন্তু মরিচঝাঁপি দ্বীপে জঙ্গল, জল কাদার মধ্যে বুড়ো-বুড়ি থেকে শিশুরা পর্যন্ত খাটাখাটনি করছে দারুণভাবে। খাটছে প্রাণের দায়ে। তারা খাটলে খেতে পাবে, নইলে পাবে না। তারা সরকারি কোনও সাহায্য পায় না, চায়ও না।

মরিচঝাঁপির এই লোকগুলো দুটি বে-আইনি কাজ করেছে। তারা সরকারি জমি জবরদখল করেছে এবং জঙ্গলের কাঠ কেটে বিক্রি করেছে। ওই জঙ্গল ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন। যতখানি এলাকায় ওরা আছে, ততখানি জঙ্গল মোটামুটি দুটি বাঘের জন্য বরাদ্দ।

পুলিশের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের যখন সংঘর্ষ হয় তখন উদ্বাস্তুরা পঞ্চাশখানা নৌকো বোঝাই কাঠ নিয়ে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। আগে তারা একলা একলা নদীর ওপারে গিয়ে কাঠ বিক্রি করে আসত। তাতে পুলিশের বাধা পেয়ে তারা বেরিয়েছিল দল বেঁধে, সশস্ত্র হয়ে। সব কটা নৌকো ডুবে গেছে। ওই কাঠ যদি তাদের বিক্রি করতে না দেওয়া হয়, তবে তাদের ওপর গুলি বা টিয়ার গ্যাস চালাবার কোনও দরকার নেই, এমনিতেই তারা না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

উদ্বাস্তুদের ওইখানে থাকতে দিলে ক্ষতি কী? এরা একবার প্রশ্রয় পেলে সারা ভারত থেকে আবার উদ্বাস্তুরা ছুটে আসবে? সরকারের ওপর নির্ভরশীল বাঙালি উদ্বাস্তু সারা ভারতে কত আছে? দু লাখ, আড়াই লাখ। তাদের পশ্চিমবঙ্গে বসতি দেওয়া যায় না? পশ্চিমবঙ্গেই ওদের স্থান দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ টাকার সদ্ব্যবহার করা যায় না? শুধু যদি সেই সব উদ্বাস্তুদেরই আহ্বান করা যায়, যারা কাজ করতে রাজি?

অনেকে বলেছেন, উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে তোলা মানেই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে অসুবিধেয় ফেলার চেষ্টা করা। আমি তা মনে করি না। খুব একটা বৈপ্লবিক কিছু না হলেও মোটামুটি ভালভাবেই বামফ্রন্ট এই সরকার চালাচ্ছেন। যতদূর জানি, বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে অসৎ নন, এবং সত্যিই তাঁরা গঠনমূলক কাজ করতে চান। বাঙালি উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবাংলায় স্থান দিতে পারলে বামফ্রন্ট সরকার একটা যথার্থ ভাল কাজ করবেন। এ রাজ্যে জবরদখল করা কত সরকারি বেসরকারি জায়গা এখনও তো আছে। কলকাতার ফুটপাথেই অন্তত এক লক্ষ লোক থাকে, যাদের অনেকেই বাঙালি নয়। আমি নিজে পূর্ববঙ্গের লোক বলেই বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য কষ্ট বোধ করি, এবং একথা স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জাবোধ নেই।

জেদ করে, মরিচঝাঁপির মানুষদের তাড়ানোর চেষ্টা না করে এদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা যায় না? এরা স্বাবলম্বী হতে চাইছে, সে কথা মনে রাখা দরকার, এরা জঙ্গলের কাঠ কেটে অন্যায় করেছে, যদি এরা আবার নতুন গাছ লাগিয়ে দিতেও রাজি হয়?

সারা রাজ্য জুড়ে এখন বন্যা। বন্যার্তদের সমস্যা এই মুহূর্তে এখন অনেক বড়। সব উদ্যম সেদিকেই এখন নিযুক্ত থাকা উচিত। এরই মধ্যে আবার পুলিশ

দিয়ে উদ্বাস্তুদের দমন করার চেষ্টা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাক না। এর মধ্যে দু-একটা বাঘ মরে তো মরুক, জঙ্গলের কিছু কাঠ কাটা যায় তো যাক, তবু মানুষগুলো বেঁচে থাক।

আনন্দবাজার পত্রিকার 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগ, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল, দণ্ডকারণ্যে নয়, পশ্চিমবঙ্গেই শরণার্থীদের পুনর্বাসন দিতে হবে। ১৯৭৮-এ সেই কথাটা ফের যাঁরা বললেন, শাসক কমিউনিস্টরা তাঁদের দাগিয়ে দিলেন 'লোক খেপাবার চাঁই' বলে।

তুমি আর নেই সে তুমি

শঙ্খ ঘোষ

তুমি বললে মানবতা
আমি বললে পাপ
বন্ধ করে দিয়েছে দেশ
সমস্ত তার ঝাঁপ।
তুমি বললে হিটলারি-ও
জনপ্রেমে ভরা
আমি বললে গজদন্ত
তুমি বললে ছড়া।

তুমি বললে বাঁচার দাবি
আমি বললে ছুতো
হামলে কেন এল সবাই
দিব্যি খেত শুত।
হোক না জীবন শুকনো খরা
বন্ধ্যা বা নিষ্ফলা।
আমি বললে সেপাই দিয়ে
উপড়ে নেবে গলা।

তুমি বললে দণ্ডকে নয়
আপন ভূমিই চাই
আমি বললে ভণ্ড, কেবল
লোক খেপাবার চাঁই।
চোখের সামনে ধুঁকলে মানুষ
উড়িয়ে দেবে টিয়া
তুমি বললে বিপ্লব, আর
আমি প্রতিক্রিয়া।

১৯৭৮

স্বদেশের টানে, স্বরাজের হাওয়ায় যেন,
দণ্ডক ছেড়ে বাংলার বুকে শরণার্থীর দল
এসেছিল যখন...

উলটোরথ

শঙ্খ ঘোষ

ট্রেনের থেকে ঝাঁপ দিয়েছে ধানশিয়রে
গলার কাছে পাথরবাঁধা বস্তামানুষ

মাটির থেকে উঠছিল তার মাতৃভূমি
বুকের নিচে রইল বিঁধে বৃহস্পতি

ইচ্ছে ছিল তমালছোঁয়া দুঃখ ছিল
কিন্তু হঠাৎ টান দিয়েছে উলটোরথে

এসেছিলাম আমরা সবাই এসেছিলাম
বলতে বলতে ঝাঁপ দিল তাই অন্ধকারে

কামরাজোড়া অন্য সবাই চমকে উঠে
অল্পমুখের কৌতূহলে দেখল শুধু

ছন্দ আছে আসাযাওয়ার ছন্দ আছে
আর তা ছাড়া ধ্বংস তো নয় বরং এ যে

সবার কাছে লাথি খাবার পদ্মবুকে
দেশ নেই যার এইভাবে দেশ খুঁজে বেড়ায়

উলটোরথের ভিখিরি দেশ খুঁজে বেড়ায়
গলায় পাথর বুকের নিচে বৃহস্পতি।

১৯৭৮

কবিতাটির জন্মবৃত্তান্ত

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে বর্ধমান স্টেশনে। দেখতে পাই, সমস্ত প্লাটফর্ম জুড়ে বসে আছে শুয়ে আছে মানুষ, সঙ্গে তাদের যৎসামান্য সম্বল, আর মাছি আর কুকুর আর জঞ্জাল। থিকথিকে তার পুঞ্জ দেখে মনে পড়ে যায় পুরনো শেয়ালদা স্টেশন, পঞ্চাশের শেয়ালদা, উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী সেই বাস্তুভূমি শেয়ালদা। স্বাভাবিকই ছিল মনে পড়া, কেননা এরাও তাদেরই সগোত্র, হয়তো-বা তাদের উত্তরপুরুষ, আজও এরা খুঁজে বেড়াচ্ছে পা রাখবার সামান্য একটু জায়গা।

পুববাংলা একদিন যখন উথ্‌লে এসে পড়ে এই বাংলায়, পুনর্বাসনে তার বড় একটা অংশকে তখন পাঠিয়ে দেওয়া হয় দণ্ডকারণ্যে, নতুন এক পত্তনের ভরসায়। কিন্তু সে কি পুনর্বাসন না নির্বাসন? এই প্রশ্ন সেদিন তুলেছিলেন প্রগতিভাবুক মানুষেরা, প্রগতিশীল দলগুলি। সে-প্রতিবাদ শোনেনি কেউ, সমস্ত বিক্ষোভের ব্যর্থতা মেনে নিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল দূরের দেশে, ভাষা আর সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে সরে গিয়ে নতুন জীবনের চেষ্টা করছিল তারা অবহেলার মাঝখানে।

যুগান্তর হয়ে গেছে তারপর। শুরু হয়ে গেছে পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল শাসন। দণ্ডকারণ্যের বিচ্ছিন্ন নিরুপায়তা থেকে এবার তবে হয়তো-বা ফিরে যাওয়া যাবে

দেশে, ভেবেছিল তারা অনেকে, কিংবা হয়তো ভাবানো হয়েছিল তাদের। বড় বড় ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা তো শুধু খড়, অবোধভাবে এপথে ওপথে উড়ে চলে যায়। হাজার হাজার মানুষ এবার তাই উড়তে লাগল দেশের মুখে, যেন তাদের স্বরাজ এল এতকাল পরে! নিজের দেশে নিজের ঘর হবে বলে কোথায় কোন উড়ো খবর পেল তারা! কিন্তু সব কিছু নিয়ে এখানে পৌঁছে তারা দেখে, তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে শুধু পুলিশের লাঠি। নতুন তাণ্ডবে নতুন করে উৎখাত হল সবাই, প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত হল, আবার তাদের ধরতে হবে ফেরার পথ।

বর্ধমানে এই তাদের সেই প্রতিহত হবার ছবি। এই পর্যন্ত, এর পর আর এগোতে দেওয়া হয়নি এই দলটিকে, নামিয়ে নেওয়া হয়েছে গাড়ি থেকে। এবার এইখানে, অনির্দেশ্য ফেরার জন্য অনিশ্চিত প্রতীক্ষা।

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে বর্ধমান স্টেশনে, বিকেল হয়ে আসছে তখন। মাছি আর কুকুর আর জঞ্জাল, আর সেই থিকথিকে ভিড়েরই মধ্যে নিজের অস্থায়ী ছোটো বৃত্তটিতে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, মুখের সামনে ভাঙা আয়না নিয়ে বিকেলের প্রসাধন করছে সে, মুখে ঈষৎ হাসি, চারপাশে কোথাও কিছু নেই বলে মনে হয় যেন। আদর নেই বলে, ফিরে যেতে হবে বলে যেন কিছুমাত্র ভাবনা নেই তার।

ছেড়ে দেয় ট্রেন। হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছি দরজায়, নিচের দিকে তাকিয়ে, পিছন দিকে ছুটতে থাকে লাইন। মনে পড়ে ক'দিন আগে, ওই রকমই এক বিরাট দলের ফিরে যাবার সময়ে, অবুঝ একজন কিছুতেই আর ফিরতে চায়নি বলে ঝাঁপ দিয়েছিল ট্রেনের দরজা থেকে। লাইনের নুড়িপাথরের পাশে ছুটন্ত ঘাসজমির ফালি দেখতে দেখতে মনে হল একবার, পড়বার পর বুকের খুব কাছে এই মাটির একটুখানি ছোঁয়া তো সে তবে পেয়েইছিল— তার নিজের দেশের মাটির? না কি কোনও পাথরকুচি তখন বিঁধে গিয়েছিল বুকে?

এই-যে আজ ট্রেনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, পুববাংলার সেই আমিও তো হতে পারতাম 'সে'? পিছনে তাকিয়েও বর্ধমান দেখা যায় না আর, দরজা ছেড়ে ভিতরে এসে বসি, মনের মধ্যে ভর করে থাকে শুধু এই-এক ফিরে যাবার ছবি, এই উলটোরথের টান।

কবিতার মুহূর্ত, অনুষ্টুপ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭

মরিচঝাঁপির ছিন্নমূলরা ছিল নিম্নবর্গীয়, নিম্নবর্ণীয়। এরা কোনও সহানুভূতি পায়নি। বুদ্ধিজীবী ভালমানুষরা মৌন পালন করেন। সংবাদপত্রগুলি দিনকয় চেঁচামেচি করে চুপ করে যায়। কলের ডুলি বা রেলগাড়িতে চেপে দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হয়, যারা পুলিশের নিগ্রহ, গুণ্ডার আক্রমণ, রোগ আর অনাহার যুঝে কোনওক্রমে বেঁচেছিল।

ঠাকুরমার ঝুলি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এ-দুয়োরে যায় : দূর-দূর!
ও-দুয়োরে যায় : ছেই-ছেই!

সুয়োরানী লো সুয়োরানী তোর
রাজ্যে দিল হানা
পাথরচাপা কপাল যার সেই
ঘুঁটেকুড়ুনির ছানা

ঘেন্নায় মরি, ছি!

মন্ত্রী বলল, দেখছি
কোটাল বলল, দেখছি

ঢোল ডগরে পড়ে কাঠি
রক্তে হয় রাঙা মাটি

কাড়ে না কেউ রা
ভালোমানুষের ছা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে
পারুল বোন রইল কাছে

দণ্ডকে যায় ধর্মরাজার
কলের ডুলি
এই গল্পে ভর্তি ক'রে
ঠাকুরমার ঝুলি ।।

১৯৭৮

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

মরিচঝাঁপিতে অবরোধ জারি হয় ২৪ জানুয়াররি [অন্য মতে, ২৬ জানুয়ারি] ১৯৭৯। অবরোধের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট রায় দেয় ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী আদালতের রায় সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে সরকারের তরফে জানানো হয়, অবরোধ চলবে।

মরিচঝাঁপির ব্যাপারে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা

আদালতের সংবাদদাতা: গোসাবা থানা এলাকায় মরিচঝাঁপির নেতাজী নগরের বাসিন্দা দেবব্রত বিশ্বাস ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীর তরফে এক আবেদন অনুসারে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আর এন পাইন [রবীন্দ্রনাথ পাইন] বুধবার অ্যাডভোকেট জেনারেলের উপস্থিতিতে এই মর্মে এক আদেশ দিয়েছেন যে, বিবাদী রাজ্য সরকার যেন আবেদনকারী ও মরিচঝাঁপির অন্যান্য অধিবাসীর পানীয় জল, দুধ, ওষুধপত্র ও খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি না করেন। বিচারপতি আবেদনকারী ও অন্যান্য বাসিন্দার মরিচঝাঁপি এলাকায় যাতায়াতে হস্তক্ষেপ না করারও নির্দেশ দিয়েছেন। কোনও রুল জারি না করেই বিচারপতি পাইন এই আদেশ জারি করেন।

বিচারপতি অবশ্য এ কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তাঁর এই আদেশের ফলে মরিচঝাঁপি ও সন্নিহিত এলাকায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সরকারের যাবতীয় সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য সরকার তরফে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে কোনও বাধা থাকবে না। যাঁরা স্বেচ্ছায় মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলে যেতে চান, তাঁদের জন্য সরকার তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনেও কোনও বাধা থাকবে না এবং আবেদনকারীরা এঁদের চলে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

বিচারপতি পাইন আরও বলেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে বৈধ ছাড়পত্র বা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতীয় এলাকায় যারা প্রবেশের চেষ্টা করবে এই আদেশের ফলে তাদের প্রতিরোধের জন্য সরকার তরফে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনে কোনও বাধা থাকবে না। এই আদেশ ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ দিন বহাল থাকবে। ২১ ফেব্রুয়ারি পুনরায় আদেশের জন্য বিষয়টি আবার হাইকোর্টে উঠবে এবং এই দিন বিচার্য মামলার তালিকায় শীর্ষস্থানে এটি থাকবে।

আবেদনকারীদের তরফে হাইকোর্টে আবেদন পেশ করে বলা হয় যে, তাঁরা ভারতীয় নাগরিক এবং ১৯৭৮-এর এপ্রিল থেকে তাঁরা মরিচঝাঁপিতে বসবাস করছেন। জীবিকা অর্জনের জন্য স্ব-নির্ভরতার ভিত্তিতে এবং সরকারি সাহায্য না নিয়ে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্ম চালাচ্ছেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার আবেদনকারী ও মরিচঝাঁপির অন্যান্য বাসিন্দার বিরুদ্ধে অবরোধ ও যুদ্ধের অনুরূপ অভিযান চালাচ্ছেন এবং আইন ও ন্যায় বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে পানীয় জল ও জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহে বাধা দিচ্ছেন।

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও এস সেন [শাক্য সেন] আবেদনকারীদের তরফে এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল, অরুণপ্রকাশ সরকার ও ইউ সি উকিল সরকার তরফে আদালতে হাজির ছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

'মরিচঝাঁপিতে অবরোধ অব্যাহত রাখা হবে'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতীয় বনসংরক্ষণ আইনের ২৪ নম্বর ধারায় মরিচঝাঁপিতে অবরোধ অবস্থা অব্যাহত রাখবেন বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার [৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯] বিধানসভায় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এ ব্যাপারে সরকারের নীতির ব্যাখ্যা করতে পারেন।

মরিচঝাঁপি সুরক্ষিত বনাঞ্চল। সেহেতু সরকার মনে করেন, ভারতীয় বন সংরক্ষণ আইনের ২৪ নম্বর ধারা মরিচঝাঁপিতে প্রযোজ্য। ওই ধারা অনুযায়ী বন দফতরের অনুমতি ছাড়া কেউ কোনও সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ ও অবস্থান করতে পারেন না। সুতরাং একজন লোকও যদি বিনা অনুমতিতে মরিচঝাঁপিতে ঘোরাফেরা করে, তাহলে বন সংরক্ষণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় তাকে গ্রেফতার করা যেতে পারে। ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকলে পাঁচজনের বেশি উদ্বাস্তুকেও তারা এক জায়গায় পেলে গ্রেফতার করতে পারেন।

শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দু ঘণ্টা সময় ধার্য করা হয়েছে। সেদিন সেই আলোচনার প্রারম্ভে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ওই প্রসঙ্গে বিবৃতি দেবেন।

বুধবার বামফ্রন্ট পরিষদ দলের বৈঠকের পর এই খবর জানা যায়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন মরিচঝাঁপি নিয়ে সাংবাদিকদের কিছু বলেননি। এমন কি এ ব্যাপারে হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিয়েও কোন মন্তব্য করেননি।

রাজ্য সরকার সরকারিভাবে মরিচঝাঁপির উপর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ এখনও পাননি। তবে তাদের উকিল মারফত নির্দেশের একট বয়ান পেয়েছেন।

জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার তাঁদের উকিল মারফত হাইকোর্টের নির্দেশের যে বয়ান পেয়েছেন, তা নিয়েই বৃহস্পতিবার উচ্চ সরকারি পর্যায়ে আলোচনা হবে। ওই আলোচনায় সরকারের পরবর্তী নীতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রবীণা বিপ্লবী বীণা ভৌমিক (দাস) ও কমলা বসু জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডির কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে বলেছেন, তাঁরা মরিচঝাঁপি গিয়ে নিজচক্ষে দেখেছেন যে, সেখানকার উদ্বাস্তু নরনারী ও শিশুদের জন্য পানীয় জল পর্যন্ত সরবরাহ করা পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে পুলিশের নির্মম অত্যাচার জালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁরা জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রাষ্ট্রপতির এই ব্যাপারে আশু হস্তক্ষেপ দাবি করেন। সারা ভারত ডি এস ও এক বিবৃতিতে মরিচঝাঁপিতে বামফ্রন্ট সরকারের অর্থনৈতিক অবরোধের তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে এর প্রত্যাহার দাবি করেছেন। প্রগ্রেসিভ পিপলস ফোরাম এক বিবৃতিতে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নরনারী শিশুদের প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের নীতির নিন্দা করেছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভায় মরিচঝাঁপি থেকে সত্বর পুলিশ বাহিনী তুলে নেবার দাবি করা হয়। সভায় গৃহীত পাঁচ দফা দাবিতে রয়েছে মরিচঝাঁপির লোকেদের অবাধ চলাফেরা ও জীবিকা বজায় রাখার অধিকার, আটক ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তি দান।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

মরিচঝাঁপিতে নির্বিচারে গাছ কাটা হতে থাকে। বেআইনি মাছের ভেড়ি তৈরির চেষ্টা হয়। অস্ত্র সংগ্রহ চলতে থাকে। এক স্বেচ্ছাচারী রাজত্ব কায়েম হয়। বহু অসাধু ব্যক্তি এখানে নিজেদের স্বার্থে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন।

বিধানসভায় বিবৃতি

জ্যোতি বসু

১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় ভাষণ

গত বৎসরের প্রথম দিকে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সংস্থা নানা ধরনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ও ভুল কথা বুঝিয়ে দণ্ডকারণ্য ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁদের পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলো থেকে ঘর-বাড়ি, জমি-জমা পরিত্যাগ করে নিয়ে আসার আগে তাঁদের তথাকথিত নেতারা ও এই কাজে উৎসাহদাতা ব্যক্তি ও সংস্থাগুলো রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনও রকম আলাপ-আলোচনা করেনি। এ কথা সুবিদিত যে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে নতুন করে কোনও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। একথা জানা সত্ত্বেও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এই লক্ষাধিক উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসা হয় ও তাঁদের অশেষ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা অসুবিধা সত্ত্বেও যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁদের জন্য সাময়িক আশ্রয় ও ত্রাণের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় এই বাবদে সরকারকে চার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। একই সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের বোঝানো হয় যে, এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা তাঁদের নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী। দণ্ডকারণ্য ও অন্যান্য পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে পুনর্বাসন ব্যবস্থা অপ্রতুল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং তার

জন্য সেখানকার উদ্বাস্তুদের মধ্যে ক্ষোভের কারণ আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃঢ় অভিমত যে, ওই পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার মধ্যেই উদ্বাস্তুদের সমস্যার প্রকৃত সমাধান করা সম্ভব। উদ্বাস্তুদের পক্ষে রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। তাঁদের ভুল বুঝিয়ে পশ্চিমবাংলায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁরা পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোতে ফিরে গেলে পুনরায় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবেন, এই প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়। একই সঙ্গে সেখানকার অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন এই উদ্বাস্তুদের ফিরে যাওয়ার আবেদন জানান ও আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব নেন, তখন তাঁরা এই আবেদনে সাড়া দেন। তাঁদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের সাহায্যে দণ্ডকারণ্য ও অন্যান্য কেন্দ্রে ফিরে যান, কিন্তু এঁদের একাংশ— যাঁরা সংখ্যায় কয়েক হাজারের বেশি নন, তাঁরা সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করেন এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলায় থেকে যাওয়ার একতরফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বস্তুত এঁরা উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি নামক একটা সংস্থা ও সরকার-বিরোধী কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনার শিকার হয়ে পড়েন। নানা ধরনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও বাগাড়ম্বরের জালে এঁদের জড়িয়ে ফেলে সুন্দরবন অঞ্চলের মরিচঝাঁপিতে এঁদের নিয়ে যাওয়া হয়। মরিচঝাঁপি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা সংরক্ষিত বন এলাকা এবং সুন্দরবন সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মরিচঝাঁপিতে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের তথাকথিত নেতারা ক্রমশ তাঁদের বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপে প্ররোচিত করেন। কিছু সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সংস্থা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেন ও তথাকথিত উদ্বাস্তু নেতাদের বেআইনি কার্যকলাপে সব রকম মদত দিতে থাকেন। মরিচঝাঁপিতে নির্বিচারে গাছকাটা ও বন সম্পদ নষ্ট করা চলতে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে বেআইনি মাছের ভেড়ি তৈরি করার চেষ্টা হয়। এই সব কাজে এই অঞ্চলের পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তথাকথিত উদ্বাস্তু নেতারা আইনের পরোয়া না করে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে টাকার বিনিময়ে সরকারের জমি বিলি করে দিতে থাকেন। সেই দলিল আমার কাছে আছে। জমি পেতে হলে সই করতে হবে ১০০ টাকা, ১৫০ টাকা দিয়ে। উদ্বাস্তু বা স্থায়ী অধিবাসী যাঁরা জমি পাবেন, সে বিষয়েও নানা ধরনের শর্ত তাঁরা নিজেরাই আরোপ করে দেন। এর মধ্যে একটি শর্ত যে, উন্নয়নশীল সমিতির সদস্য হতে হবে— অন্য কোনও সংস্থা বা রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া চলবে না। অর্থাৎ তাঁরা এক সমান্তরাল সরকার চালাতে চাইছেন। তাঁরা

ভলেন্টিয়ার তৈরি করেছেন। তাঁদের পারমিট ছাড়া কেউ যেতে পারবে না। পুলিশ পারবে না, বাইরের কেউ যেতে পারবে না, এই হচ্ছে সেখানকার নিয়ম। প্রশাসন ব্যবস্থাকে এ অঞ্চলে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের অনুমতি ছাড়া কোনও লোককে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না, এমনকী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে সেখানে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এই অবস্থানকারীদের বিরুদ্ধে কোনও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত উদ্বাস্তু নেতারা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানোর উসকানি দিতে থাকেন ও বেআইনি অস্ত্র সংগ্রহ চলতে থাকে। বহু অসাধু ব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থে এখানে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন।

এক কথায় মরিচঝাঁপিতে আইনের শাসনকে উপেক্ষা করে এক স্বেচ্ছাচারী রাজত্ব চালানোর চেষ্টা হয়। কোনও সরকারের পক্ষেই এই অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইসব বেআইনি কার্যকলাপের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মরিচঝাঁপিতে কয়েক মাস ধরে যে ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে তা উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানের পথ নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বার বার উদ্বাস্তুদের শুভবুদ্ধি ও সুবিবেচনার কাছে আবেদন করে তাঁদের বেআইনি কার্যকলাপের পথ ছেড়ে আসতে অনুরোধ করা হয। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী উদ্বাস্তুদের দুঃখকষ্ট নিয়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের খেলায় মেতে যান, তাঁরা উদ্বাস্তু সমস্যাগুলিকে সরকার-বিরোধী চক্রান্তের সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দৃঢ়ভাবে এই কথা বলতে চান যে, যাঁরা উদ্বাস্তুদের নিয়ে মরিচঝাঁপিতে বেআইনি কার্যকলাপ চালাচ্ছেন তাঁরা উদ্বাস্তুদের বন্ধু নন এবং উদ্বাস্তু সমস্যার সঠিক সমাধানে তাঁরা আগ্রহী নন।

বেআইনি কার্যকলাপ ও বিশৃঙ্খলা রোধ করবার জন্য এবং সরকারের সম্পত্তি ও মূল্যবান বনসম্পদ রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার দু'সপ্তাহ আগে মরিচঝাঁপি অঞ্চলে কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে কোনও অর্থনৈতিক অবরোধ পরিচালনা করছেন না বা ওই ধরনের অবরোধের কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধের উদ্দেশ্যে ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারীদের কাজে বাধা দেবার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি নিতে হয়েছে তার পিছনে পশ্চিমবাংলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থন রয়েছে। সম্প্রতি মরিচঝাঁপির নিকটে কুমিরমারিতে রাজ্য সরকারের তিন মন্ত্রী যে বিরাট জনসভা করেছেন, তা এর প্রমাণ।

এই প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকার ফলে পুলিশ ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ ও পুলিশের গুলি চালানোর দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সরকারের পক্ষ থেকে যে

দু'জনের মৃত্যু ঘটেছে তাঁরা অপরাধী হোন বা না হোন তাঁদের পরিবারবর্গকে কিছু টাকা দেব ঠিক করেছি এবং পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

মরিচঝাঁপির প্রশ্নে বিভিন্ন মহল থেকে মানবিকতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের মানবিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন ও সহানুভূতিশীল। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে ফিরে যাওয়া সাপেক্ষে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও ত্রাণের ব্যবস্থা রয়েছে। মরিচঝাঁপি থেকে ফিরে আসা উদ্বাস্তুরা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। যে সমস্ত স্বার্থান্বেষী মহল উদ্বাস্তুদের ভুল বুঝিয়ে এখানে নিয়ে এসে নানা বেআইনি কার্যকলাপে জড়িয়ে দিচ্ছে, তাঁরাই মানবিকতা বিরোধী কাজ করছেন, কারণ তাঁদের চক্রান্তের ফলেই মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা এক অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সমস্যার মোকাবিলা করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকার তা সমর্থন করেছেন। দণ্ডকারণ্য-আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন যে, উদ্বাস্তুরা আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে নিজ নিজ পুনর্বাসন কেন্দ্রে ফিরে না গেলে সমস্ত সুযোগ হারাবেন। রাজ্য সরকার উদ্বাস্তুদের বেআইনি কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত করতে চান, কিন্তু তাঁদের উপর বলপ্রয়োগ করতে চান না। ধৈর্যের সঙ্গে সব কথা বুঝিয়ে তাঁদের ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোনও কারণে যাঁদের ফিরে যেতে দেরি হবে, তাঁদের সমস্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এবং তা দেবার জন্য আমি সম্প্রতিকালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছি। প্রায় এক লাখ কয়েক হাজার এখানে থেকে গেলেন। যখন অধিকাংশ উদ্বাস্তু ফিরে যেতে পেরেছেন, তখন যাঁরা রয়ে গেলেন তাঁদেরও ফিরে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করার কোনও যৌক্তিকতা নেই।

একমাত্র যুক্তি হচ্ছে, সরকারের বিরুদ্ধে যেহেতু আর কোনও সমস্যা বার করতে পারছেন না, এই রকম রাজনৈতিক নেতা তাঁরা এই রকম ব্যবহার করবেন। আর আমরা ওখান থেকে যে সমস্ত কাগজপত্র জোগাড় করেছি, তাতে দেখছি ওখানে জমি বিলি হচ্ছে। এরকম আমি কখনও শুনিনি, হাজার, লাখ বাস্তুহারা এখানে আগেও এসেছে, তাদের জন্য একটা আলাদা সংস্থা তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের নেতারা ১০০ টাকা, ১৫০ টাকা, ৩০০ টাকা করে নিয়ে জমি বিলি করছেন, ১৫ বিঘা, ২৫ বিঘা, ৩০ বিঘা করে জমি। শুধু দণ্ডকারণ্যের নয়, ভূমিহীনদের একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাঁদের জমি দেবেন।

এই ভূমিহীনদের সংজ্ঞা তাঁরা দিয়েছেন। কিন্তু কাদের তাঁরা ভূমিহীন বলছেন? এঁদের মধ্যে পশ্চিমবাংলার লোক আছে, ৩০ বছর আগে এসেছেন এমন লোক আছে, পূর্ববাংলা এবং দণ্ডকারণ্য থেকে এসেছেন এমন লোক আছেন অর্থাৎ সেখানে নানা রকম শর্তাবলি আছে। কারা জমি বিতরণ করছে? এটা নাকি সমর্থন করতে হবে। ওই দিকে বাংলাদেশ, মাঝখানে আর একটা সরকার, এদিকে পশ্চিমবাংলায় আর একটা সরকার। এটা করা যায় না— কেউ একমত হবেন না— অবশ্য কিছু ওই কংগ্রেস নেতা ছাড়া। সুখের বিষয়, তাঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রায় ১ লক্ষের মতোকে আমরা ফেরত পাঠিয়েছি। আমরা এইসব বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের জনতা সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি। কাকে ক'টা বলদ দেওয়া হবে, কাকে কতটা জমি দেওয়া হবে, জল দেওয়া হবে কিনা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং তাঁরা সব মেনেও নিয়েছেন। তারপর কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সেটা আপনারা আমরা সবাই মিলে দেখব। এখানে আলাদা জনতা পার্টি কিনা তাই আপনারা আলাদা ব্যবস্থা করছেন। তাঁরা যা দিয়েছেন দেখছি তাতে আছে, উক্ত পরিবারগণ যাঁরা জমি পাবেন তাঁরা সমিতি ব্যতিরেকে অন্য কোনও রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক দল কেউ করতে পারবেন না এবং পূর্ব হতে জড়িত থাকলে স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ করতে হবে। এটা কোন রকম জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। উক্ত উন্নয়ন সমিতি বলছেন আবাব যে, ভলেন্টিয়ারদের অনুমতি ছাড়া এখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। এইসব দলিল আমার কাছে আছে। তাঁরা সেখানে পারমিট দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন কোনও অফিসারকে সেখানে নামতে দেবেন না। আমাদের জমি যা বনাঞ্চল আছে তা তাঁরাই বিলি করবেন। সরকার সেখানে বিলি করতে পারবেন না এবং এই বিলি করার বিনিময়ে তাঁরা টাকা নেবেন এই কথা বলেছেন। দণ্ডকারণ্য থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কথা বলছেন না, ফুটপাথেও যাঁরা আছেন তাঁদের কথাও বলছেন। অত্যন্ত দরদ মানুষের প্রতি। তাঁদের এইভাবে মিথ্যা বোঝানো হচ্ছে। এই উন্নয়ন সমিতির যাঁরা নেতা আছেন তাঁরা এইসব করছেন। আমাদের এখানের কিছু নেতা তাঁদের এই পশ্চিমবাংলার মাটিতে ফেলে দিয়েছেন এইভাবে। তাঁরা যে এলেন সে বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা করলেন না। ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার কিছু করেননি। একটা নতুন সরকার এসেছে তাদেরও তো একটু সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু আমরা সেখানে কী দেখছি, না বলা হচ্ছে কিছুই হল না— মানবিক অধিকার মেনে নিন। কিন্তু কী করা হচ্ছে? সেখানে তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, গরু বলদ তাঁদের দেওয়া হবে— যা বিক্রি করে ফেলেছেন তথাপি তার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তাঁরা বলছেন, জঙ্গলের মধ্যে থাকবেন, সেই জঙ্গল তাঁরা

ব্যবহার করবেন। সেখানে তাঁরা পুলিশ পাঠাতে দেবেন না। বন রক্ষা করতে দেবেন না। সংরক্ষিত এলাকায় পুলিশ বা অফিসার পাঠাতে দেবেন না। আবার বলা হচ্ছে যে সংবিধানে বলা আছে যে, যে যেখানে খুশি থাকবেন— যাবেন। না এইসব বাজে কথা সংবিধানে লেখা নেই। আমরা এইসব কথা শুনছি, কাগজে দেখছি ও বক্তৃতা করা হচ্ছে এইসব কথা বলে যে ফুটপাথে তো কত লোক আছে, কই তাদের তো পাঠাচ্ছেন না। কী চমৎকার যুক্তি। ওঁরা ওখানে থাকতে পারবেন না। আমি বলি, এখান থেকে একটা ব্যবস্থা করে সকলে মিলে এক হয়ে একটা ব্যবস্থা যদি করি তাহলে গোলমাল হবে না। আমি এ বিষয়ে দু-তিনটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলেছি— তাঁদের নেতাদের সঙ্গে। ফজলুর রহমান সাহেব এসেছিলেন— তিনি কাশীকান্ত মৈত্রর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন— তাঁর বোধহয় কাজ ছিল আসতে পারেননি। কংগ্রেস পক্ষ থেকেও এসেছিলেন, বলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যে এ জিনিস হবে, এই জিনিস তাঁরা করবেন। যাঁরা ওখানে আছেন তাঁদের জন্য অপর দিকে নতুন ক্যাম্প হচ্ছে— ওঁরা যে বলেছেন খাদ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। খাদ্য তো পাশেই আছে— তাঁরা সেখানে এলেই পাবেন। কিন্তু আমি তাঁদের সেখানে ফার্নিচারের দোকান করতে দেব না, আমি মেছো ভেড়িওয়ালাদের টাকা ঢালতে দেব না। তাই আমি আবেদন করছি যে বাস্তুহারাদের সর্বনাশ করবেন না। যে ১০/১২ হাজার লোক সেখানে আছে, তাদের সবাইকে যাতে আমরা পৌঁছে দিতে পারি তার ব্যবস্থা করবার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলছি— ব্যবস্থা করছি। আমরা সকলে মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বসে একটা কিছু ব্যবস্থা করা— যেটা আমরা করছি।

[এই বিবৃতির পর বিতর্ক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বসু যে জবাবি ভাষণ দেন তা এখানে সংকলিত হয়েছে।]

জ্যোতি বসু: মাননীয় স্পিকার মহাশয়, জবাব যেটুকু দেওয়ার আছে আমি যা বুঝতে পারছি এইসব আলোচনা থেকে তাতে কয়েকটা কথা আমি সংক্ষেপে বলতে চাই। প্রথমত, কতকগুলি অসত্য কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি। ভারত সেবাশ্রম এই রকম কোনও সংস্থার কাজে আমরা বাধা দিইনি। কেন বাধা দেব? কারণ, আমরা ৪ কোটি টাকার উপর খরচ করেছি বাস্তুহারাদের জন্য যাঁরা দণ্ডকারণ্য থেকে এসেছিলেন এই হল ১ নং। ২নং কথা হচ্ছে কাশীকান্ত মৈত্র বললেন যে, ওঁকে ডাকা হয়নি। আমি এই বিষয়ে ঠিক এখনই খোঁজ করতে পারিনি যে কার মাধ্যমে ওঁকে টেলিফোন করা হয়েছিল। আমার একটু তাড়া ছিল

বলে আমি টেলিফোনে দুই কংগ্রেস, জনতা এবং সিপিআই-কে আলোচনা করতে ডেকেছিলাম। তাঁরা এসেছিলেন, আর জনতা প্রেসিডেন্ট ফজলুর রহমান তিনিও এসেছিলেন। তিনি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন যদি কাশীবাবু আসেন। আমি বললাম, খবর পাননি, না কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। এখন বুঝলাম কী হয়েছিল। যাই হোক, ওঁর সঙ্গে আলোচনা হল, উনি একমত হয়ে বললেন, ওদের পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, তবে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। আমি তখন বললাম, আপনি দিল্লিতে যান, আমাদের হয়ে একটু সময় নিয়ে আসুন। তিনি দিল্লিতে গিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে আমি কাগজে দেখেছি, কিন্তু কী হয়েছে আমি জানি না। তৃতীয় কথা হচ্ছে, দিলীপ চক্রবর্তী নাকি বলেছেন ৭৭ জন ওখানে মরেছে। ৭৭ জন, কি ১০৭ জন, কি ১৮০ জন কেন হল না আমি জানি না, তবে আমরা বলেছি ২ জন ওখানে মারা গেছে। দিলীপবাবু আমার ঘরে এসেছিলেন, আমি বললাম, আপনি যে বললেন ৭৭ জন মরেছে, এটা কি আপনার কথা? তাদের নাম কী, তারা কোন এলাকার লোক, স্থানীয়, নাকি অন্য কোথাও থেকে এসেছে, এগুলি আমাদের জানান। তিনি বললেন, আমাকে একজন পুলিশ অফিসার বলেছেন, আমি সেই পুলিশ অফিসারকে বলেছি মুখ্যমন্ত্রীকে নামগুলি বলতে হবে, তবে নিশ্চয়ই এজন্য আপনার চাকরি যাবে না। আমি টেলিফোনে আবার রাত্রে ওঁকে ধরব। তিনি বলে চলে গেলেন আমার ঘর থেকে। আমি বললাম নামগুলো আমাকে বলে যান। তিনি বললেন, পরে বলব। তিনি নিজে কিছু জানেন না, এইরকম খবর পেয়েছেন। তার পরের কথা হচ্ছে, আমি নাকি সতীশ মণ্ডলকে বলেছিলাম ভিলাইতে কোন সালে যে আমাদের সরকার যখন হবে তখন আমি আপনাদের সব নিয়ে যাব। এইসব দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা কাশীবাবু বললেন। আমি যখন একবার মার্চ মাসে স্টিল কনফারেন্সে গিয়েছিলাম তখন আমার সঙ্গে কয়েকজন এসে দেখা করেন, তখন আমি বলেছিলাম আমাদের সমর মুখার্জি এম পি, তিনি আপনাদের সব কথা জানেন, আপনাদের উপর অন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে, দিল্লিতে এই নিয়ে ব্যবস্থা করার জন্য যাতে চাপ সৃষ্টি করতে পারি তার ব্যবস্থা করা হবে। সমরবাবু ২/৩ বার পার্লামেন্টে সেইসব কথা তুলেছেন। তিনি আজকে দণ্ডকারণ্যে গিয়েছেন আর একবার দেখবার জন্য, কাজেই এইরকম কথা কোনও দিন কাউকে আমি বলতে পারি না। এখন আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, আসল বক্তব্যের কোনও পরিষ্কার জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমরা এক হয়ে বলছি এঁরা যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সব চলে যেতে হবে দণ্ডকারণ্যে। সেখানে তাঁদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে, আরও ব্যবস্থা তাঁদের জন্য দ্বিতীয়বার হবে। কিন্তু এখানকার জনতা পার্টি তাঁরা আলাদা ধরনের, তাঁরা

পরিষ্কার কিছু বলছেন না, উল্টে চ্যালেঞ্জ করছেন আমরা মরিচঝাঁপিতে যাব, আমরা উদ্বিগ্ন। কেন চ্যালেঞ্জ করছেন? আপনাদের সঙ্গে কি ঝগড়া আছে? তাহলে আপনারা পরিষ্কার করে বলুন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, সেকেন্দার ভকতের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে এরা যাবে না, এরা কাঠ কাটবে, জমি বিলি করবে, নানা অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, সরকারি জঙ্গল কেটে সাফ করে দেবে। এটা যদি সাহস থাকে তো বলুন। সে সাহস নেই। সেজন্য আমি বলতে চাই আসল কথা পরিষ্কার করে বলুন। মানবিকতাবোধের প্রশ্ন উঠেছে— মানবিকতাবোধ আছে বলে আমরা অপেক্ষা করি তা না হলে আমরা তাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে দিতে পারতাম। তার মধ্যে আমরা যাব কেন? তারা শত শত মণ কাঠ কেটেছে। আমরা ঠিক করেছি সেগুলি সরকারের আওতায় এনে ডিসপোজ অফ করব। নৌকা বানিয়েছে সরকারি কাঠ নিয়ে, বলেছেন আত্মনির্ভরশীল। সরকারি জমি বিলি করবে, বলবেন আত্মনির্ভরশীল। আমাদের পুলিশকে নামতে দেবে না, প্রশাসনকে কাজ করতে দেবে না, হরিপদ ভারতী মহাশয় বলছেন উনি কিছু জানেন না। উনি গিয়েছেন ওখানে ওদের উস্কাবার জন্য। আমাদের তো আর কেউ সমর্থন করে না, তোমাদের নিয়ে যদি বাঁচতে পারি এই কথা ভাবছেন। তারপর এখানে জনতার কয়েকজন নেতা আছেন, তাঁরা প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াচ্ছেন যে, মাড়োয়ার থেকে এসেছে, ওখান থেকে এসেছে, অমুক জায়গা থেকে এসেছে। আপনাদের সরকার তো দিল্লিতে আছে, বলুন না তাঁদের গিয়ে। খুব ভালবাসেন ভারতবর্ষকে সবাই। কে মাড়োয়ার থেকে এসেছে, কে বিহার থেকে এসেছে, এইসব কথার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

এঁরা বলছিলেন সরকারি সাহায্য তো ওঁরা চাননি— কার জঙ্গল কাটছেন ওঁরা— সরকারি সাহায্য ওঁরা চাননি। কার জমি বিলি করছেন ওঁরা— সরকারি সাহায্য চাননি। আমরা যদি ইন্টারভেন করতাম— যে কোনও সরকারের করা দরকার— আমি বলছি, আমি স্বীকার করছি আমি অপারগ। কারও ছেলে, কারও মেয়ে গিয়েছে। আমরা এক লাখ লোক তো পাঠিয়ে দিয়েছি, এখানকার জনতা পার্টি তা বন্ধ করতে পারেননি। সেইজন্য আমরা চেষ্টা করছি। আর আমি এখানে বলছি এটাও দুঃখজনক যে বর্ধমানেও মারা গিয়েছিল। আমি বলছি যাঁরা ওঁদের এইভাবে সাহায্য করার কথা, বারবার করে যাঁরা বলছেন তাঁরাই এর জন্য রেসপনসিবল, তাঁরাই এর জন্য দায়ী এবং তাঁদের এই দায়িত্ব নিতে হবে। পুলিশকে মেরে ফেলল, কোন্ সাহসে তারা এইসব করতে পারে? এই রকম কিছু মানুষ যাঁরা এখানে আজ বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁরা তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এইভাবে সব ইনোসেন্ট লোকগুলিকে নিয়ে রাজনীতির খেলা হচ্ছে— এই জিনিস আমরা এখানে দেখছি,

বর্ধমানেও দেখেছি আর মরিচঝাঁপিতেও সেই একই জিনিস দেখছি। আমরা যদি একমত হতে পারতাম, এখানে নিশ্চয়ই আমরা যেতাম আপনাদের সঙ্গে, একই কথা যদি আমরা বলতে পারতাম যে আপনারা ৬ মাস সময় নিন, ওঁদের যদি বুঝিয়ে আমরা বলতাম— কিন্তু আপনাদের যেতে হবে, এই কথাটুকু তো আপনারা বলতে পারেন। আর অন্যায় কাজ চলবে না এই কথাটা আমরা বলতে পারি কিনা কিন্তু এখানে সে সব কথা কিছু শুনলাম না পরিষ্কারভাবে তাঁদের মুখে। এই জন্যই আমার মনে হয় এর ভিতর কিছু ষড়যন্ত্র আছে। তাঁরা মনে করছেন সব ভিত্তি শিথিল হয়ে যাচ্ছে তখন এটা ধরে যদি কিছু করা যায়। আমি বলছি, এইসব সুবিধা হয় না, এইসব রাজনীতি কেন করছেন— কত বিষয় তো আছে রাজনীতি করার। সেই জন্যই আমি বলছি এটা ঠিক পুলিশ তাদের তীর খেয়ে হাসপাতালে আছে। আচ্ছা থাক, দুই পক্ষেরই বিচার হবে কে কী করেছে। কে আগে মেরেছে, কে পরে মেরেছে— কেন মারতে হল সেই সব তদন্ত করা হচ্ছে। একবার আমরা তদন্ত করেছি, দরকার হলে দুইবার করব, আমরা তদন্ত করে দেখব। ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণ আমাদের দিতেই হবে, মানুষ মরে গেলে। হরিপদবাবু এখানে তিনি যেভাবে বক্তৃতা করেছেন সেটা খুব খারাপ লেগেছে। তিনি ভাবলেন এক লাখ আমাদের পক্ষে থাকবে কিন্তু তারা দণ্ডকারণ্যে চলে গেল। চমৎকার, সেখানে তিনি বললেন জোরজুলুম করে পাঠিয়েছেন— এই হচ্ছে ওনার রাজনীতি। আমি বলি, উনি তো রাজনীতি ছেড়েই দিয়েছিলেন, আবার কেন রাজনীতির মধ্যে এলেন। যাই হোক, আমি যেটা বলতে চাইছি যে, প্রধানমন্ত্রী আমাদের কী বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আমাদের বলেছিলেন, প্রথম দিকে যখন এঁরা দলে দলে আসছেন তখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আমি বললাম, মধ্যপ্রদেশ সরকার তো আপনাদের সরকার, ওড়িশার সরকার তো আপনার সরকার— আর বেশির ভাগ এল ওড়িশা থেকে, যেখানে সব থেকে সুবিধা ওদের পুনর্বাসনের, সেখান থেকেই ওরা এল। তা উনি বললেন, উই সেন্ট দেম, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই হেল্প আই উইল হেল্প ইউ। আমি বললাম, হোয়াট হেল্প ক্যান ইউ গিভ মি। উনি বললেন, আই শ্যাল সেন্ড দেম ব্যাক। আপনি কোনও রিলিফ ক্যাম্প খুলবেন না।

প্রধানমন্ত্রী আমাকে বললেন কোনও রিলিফ ক্যাম্প খুলবেন না। উনি তো গান্ধীবাদী জানি। আমি তাঁকে তখন বললাম, ১ লক্ষ লোক ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চলে এসেছে আমি কি তাদের অন্যভাবে পাঠাতে পারি? আমি তো পারি না। তাদের জন্য টাকা খরচ করে পাঠাতে হবে এবং পরে বিচার হবে এই টাকা কে দেবে। তাদের জন্য ১ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল। কৈ, প্রধানমন্ত্রীকে তো কিছু আপনারা বললেন না, সেই সাহস আপনাদের নেই, বললে দরজা থেকে বার করে

দেবে। আমি বলেছি বাস্তুহারাদের অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের চেয়ে বড় বন্ধু এই বাস্তুহারাদের আর কে আছে? গত ৩০ বছরে দেখেছি আমাদের চেয়ে বড় বন্ধু তাদের আর কেউ নেই। আমি দেখেছি ওখানে উন্নয়ন সমিতি বলে একটা সমিতি আছে এবং তার সঙ্গে রয়েছে জনতা দলের একটা অংশ এবং কংগ্রেস। কংগ্রেসের অবশ্য কোনও নীতির বালাই নেই। ১৯৭৪ সালে যখন তাদের তাড়ানো হল তখন তো কোনও অনশন দেখিনি। তখন পি সি সেন তো এখানেই ছিলেন, নাকি বিলেত গিয়েছিলেন? তারপর, ১৯৭৫ সালে যখন তাদের আবার তাড়ানো হল তখনও তো আপনারা কিছু বলেননি। আমরা বলেছি ওখানে যারা রয়েছে তাদের আমরা বেআইনি কাজ করতে দেব না। আমরা বলেছি, আপনারা চলে আসুন, আমরা আপনাদের খাদ্য দেব, ক্যাম্প তৈরি হয়েছে, ওষুধের ব্যবস্থা হয়েছে, ডাক্তার পাঠাচ্ছি। আমরা আরও বলেছি যে অন্তর্বর্তীকালীন সময়টা আপনারা এখানে থাকুন। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিচ্ছি। অনেকে আসতে চায় কিন্তু তাদের আসতে দিচ্ছে না। তারা তীর, ধনুক তৈরি করছে, নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করছে, পুলিশকে নামতে দিচ্ছে না। তারা কি এগুলি করতে পারে? তারা বলছে অমুক জায়গায় বাস্তুহারা বসেছে, তমুক জায়গায় বাস্তুহারা বসেছে। তারা যখন জবরদখল কলোনি করেছিল তখন তাদের পেছনে কে ছিল? তখন আমরা ছাড়া তাদের পেছনে আর কেউ ছিল না। তারা যখন দলে দলে পূর্ববাংলা থেকে এখানে এসেছিল, তখন তাদের পেছনে কারা ছিল? তারা যখন জোর করে জায়গা দখল করেছিল তখন তাদের পেছনে আমরা ছিলাম। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব বেশি রয়েছে এবং আমাদের সৌভাগ্য তাঁরা রাজি হয়েছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলেছি এবং তিনি সময় দিতে রাজি হয়েছেন। আমাদের বিরুদ্ধে তো রাজনীতি করবার অনেক কিছু রয়েছে, নাকি আমরা এতবড় হয়ে গেছি যে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। হরিপদবাবু বলেছেন, বাজেট আসুক তখন বলব। আমি একটা জিনিস সার্কুলেট করব, কেন না কোন ইংরেজির অর্থ কী হবে তা নিয়ে আবার হয়তো ডিকশনারি দেখতে হবে।

No. 30CM dated 24th January, 1979

My Dear Prime Minister,

As you are aware, in February and March, 1978, about 1 lakh 20 thousand refugees from former East Pakistan and now in rehabilitation and work site camps in Dandakaranya and other areas, deserted these camps and came to West Bengal. After good deal of efforts we repatriated all but about eight thousands of them who had taken shelter

in Marichjhanpi Reserve Forest area in Sunderbans. These deserters have felled forest trees extensively, have started fisheries and are distributing lands. They have created a sort of free zone for themselves in Marichjhanpi and have expressed their determination to resist by force any attempt to repatriate them.

Recently, it has come to our notice that new deserters are trickling to Marichjhanpi by circuitous routes to evade police vigilance. It has also been reported that some of the leaders of these refugees are trying to allure the families who had gone back to Dandakaranya by offering of land in the reserve forest area. Shri Satish Mondal, one of their leaders, has reportedly disclosed in a meeting recently that about 5,000 P.L. refugee family of Mana Camp (Madhya Pradesh) will be coming over to Marichjhanpi. The Madhya Pradesh Police has been requested to keep watch over these P.L. refugees and to inform us of the developments from time to time.

We have now decided to take action for containing the situation at Marichjhanpi and to make every effort to repatriate the deserters. However, a number of organisations like Unnayan (OXFAM), Nikhil Banga Nagarik Sangha, etc., are actively helping and instigating the deserters. We also have reports that some leaders of Janata Party, such as, Shri Sakti Sarkar, M.P., Shri Haripada Bharati, M.L.A., and Shri Kashi Kanta Maitra, M.L.A., are encouraging these deserters and collecting outside help for them. I should be grateful for your assistance at the political level to tackle this serious problem developing in the Sunderbans.

With kind regards,

Yours sincerely

এটা আমি ২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছি, গুলি তো তার পরে হয়েছে। আপনি লিখুন অ্যানসার পাবেন।

No. 392 P.M.O/79 dated 30th January, 1979, New Delhi

My Dear Jyoti Basu

Please refer to your letter No. 30 C.M. of the 24th January, 1979

regarding infiltration of refugees from Marichjhanpi and other camps, I agree with you in regard to the action that you have taken or prepared to take. None of the organisations nor any M.P. or M.L.A. has approached me and if they do I shall give them appropriate answer.

With kind regards.

Yours sincerely

Morarji Desai

এবং আমি এখানে আর একটি চিঠি পড়ে দিচ্ছি একই সময়ের, ইনিও আপনাদের একজন মন্ত্রী।

My Dear Basuji,

Thank you for your letter No. 13 C.M. dated 9th January, 1979 regarding the deserters returnee families.

2. Your observations about the complaints of D. P. families concerning the nature of work being provided to them are being brought to the notice of the Chairman and Chief Administrator of DNK Project for suitable action.

আমি লিখেছিলাম যে শুধু এদের দিয়ে কৃষিকাজ করাবেন কেন? এদের যে সেকেন্ড জেনারেশন, যারা এখানে জন্মেছে, তারা যদি অন্য কাজ করতে চায় সেটা দেওয়া উচিত। তাতে উনি বলেছেন যে সেটা উনি বিবেচনা করে দেখবেন।

I note that you have reiterated the firm resolve of the State Government ot return the remaining deserters families to their respective rehabilitation sites and Karmisibir soon. However, it is getting to be one year since these families deserted DNK and other rehabilitation sites. Next Khariff season is fast approaching. It is felt that these families should return at least 3 months in advance if they are to be in a position to take up Khariff cultivation by June, 1979. However, of keeping watch over the vacant land and homestead plots to which the deserters families have not yet returned. মানবতা মানে কী? বাড়ি-ঘর পড়ে আছে সেখানে যাওয়া, না, ওদের মানবতায় বলে গোলমাল বাধাও, জঙ্গল কাটো, আর যা খুশি করো।

If these lands are not allotted to others before June, 1979 the land will also go uncultivated leading to avoidable loss of production or

alternatively wil be encroached upon leading to other difficulties. Any temporary allotment of land to others as you would appreciate has its own problems. এগুলি ফেলে না রেখে যদি অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো ভয়ঙ্কর গোলমাল হবে।

3. Taking all these factors into consideration we feel it will be appropriate to fix a cut off date for return of the deserters families to DNK. I thought that 31st March, 1979 may be fixed as the cut off date for the return of the remaining deserters families having returned to this point those to fail to return by that date will stand finally debarred from getting back their lands and houses and from getting renewed relief and rehabilitation assistance sanctioned for the returnees. Return by 31st March, 1979 will help the settler families and such karmisibirs families as are on the basis of their priority entitled to settlement during the next season, do undertake Khariff cultivation in time by June, 1979.

I hope you would appreciate the very relevant consideration set out in para 3 and agree with this approach. On hearing from you we shall take decision and have it announced and you may like to publicise this in the areas in which the deserters are now staying in West Bengal.

I shall appreciate a line in reply.

আমি এটার উত্তরে লিখি, সময় নেই সব বলবার, আমি বলেছি এই যে অবস্থা সেখানে আর একটু সময় দিলে ভাল হয়। আমরা খবরও পাঠিয়েছি দেখি কী করতে পারি। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। সেই জন্য আমি মনে করি এইসব বড় বড় চ্যালেঞ্জ আমাকে করে লাভ নেই। তিনি চ্যালেঞ্জ করছেন? আমরা ৪ কোটি টাকা খরচ করেছি আর কিছু টাকা খরচ করতে পারতাম না ওদের খাওয়াতে? আমরা বলছি যে আমরা আর ওদের এখানে থাকতে দিতে পারি না। কেন? সেটা আমরা আলোচনা করেছি। এক লক্ষ লোক যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে আর কয়েক হাজার লোক যা অবশিষ্ট আছে তারাও যাবে। এখানে দুর্ভাগ্যবশত ওদের যারা নেতা তারা কিন্তু ওই এক লক্ষ লোকের মধ্যে যায়নি যারা তাদের ডেকে নিয়ে এসেছিল। তারা কাছাকাছিই আছে এবং তাদের পরিবার নিয়ে ভালভাবেই আছে তারা যাতে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে সেই জন্য এই রকম আট-দশ হাজার লোক ওদের দরকার।

আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষ তারা কি অপরাধ করবে? একজন বললেন অন্য জায়গায় বনজঙ্গল কাটছে। কাটতে দেবেন না, কোন অধিকারে কাটবে? সরকার যদি মনে করে কাটবেন, কাটা উচিত নয়? এর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে। আমি এসব কথার মধ্যে যাচ্ছি না। সেজন্য বলছি এক লক্ষ লোক যখন চলে গেল তখন আর আট-দশ হাজার লোক নিয়ে জল ঘোলা করবেন না। তাহলে এমন অবস্থায় যাবে যে ভারত সরকার বলবেন আমরা কিছু করতে পারব না, তোমরা তো পাঠাওনি, এদেরও এখানে অসুবিধা হবে, অসুবিধায় পড়তে হবে, আমাদের পক্ষেও অসুবিধা, পশ্চিমবাংলার মানুষের পক্ষেও অসুবিধা, অনেক জটিলতা আছে। আসুন সবাই মিলে কী করা যায় দেখি এবং একমত হয়ে যদি কাজ করি তো পনেরো দিনের বেশি সময় লাগবে না, সময় নিয়ে বাইরে দেখাশুনা করে এদের পাঠিয়ে দেব। আমি জানি না এদের শুভবুদ্ধি হবে কিনা নাকি চ্যালেঞ্জের মনোভাব থাকবে। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

জ্যোতি বসুর বিবৃতিতে অসত্য তথ্য, স্ববিরোধী বক্তব্য এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার যে নৃশংস অত্যাচারের পথ নিয়েছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজির নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি কাঁচা হাতের মক্‌সো

দেবপ্রসাদ সরকার

মরিচঝাঁপির ঘটনার ওপর সাফাই গাইতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু যে লিখিত বিবৃতিটি দিয়েছেন তা একটু কাঁচা হাতে মক্‌সো হয়ে গেছে। কারণ বিষয়টি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তা দূর করার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতি শুধু দুর্বলই নয়, এমনকী এর মধ্যে যে অসংখ্য অসত্য তথ্য, স্ববিরোধী বক্তব্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস রয়ে গিয়েছে একথা কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না। যেমন, উক্ত বিবৃতির প্রারম্ভে মুখ্যমন্ত্রী বলতে চেয়েছেন যে, দণ্ডকারণ্য থেকে লক্ষাধিক উদ্বাস্তু যারা পশ্চিমবাংলায় এসেছিল সেটা নাকি নিছক একটা চক্রান্তেরই ফল। অর্থাৎ তার এই যুক্তিতে বিষয়টা এমনই দাঁড়িয়ে যায় যে, দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের সমস্যা তেমন একটা কিছু মারাত্মক নয়, যার জন্য উদ্বাস্তুদের চলে আসতে হবে। ফলে একদিন তাঁরা এটাকে ভয়ানক সমস্যা বলে মনে করলেও আজ আর তা মনে করছেন না। জ্যোতিবাবুরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে ওটা এখন প্রায় শঙ্করাচার্যের মায়ায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। এখন তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে 'বামফ্রন্ট' সরকারকে হেনস্তা ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য এ রকম একটা চক্রান্ত চলছিল, সে ক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য দণ্ডকারণ্য থেকে এই বিপুল সংখ্যায় যাঁরা শরণার্থী হয়ে ফিরে আসছিলেন, তাঁরা যদি সেখানে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগও পেতেন তাহলে সেই আপেক্ষিক অর্থে

সুস্থ জীবন ছেড়ে ঐ রকম একটা চূড়ান্ত অনিশ্চয়তাময় জীবনের দিকে কোনও চক্রান্তকারীই কি তাঁদের টেনে আনতে পারত? যেমন, ত্রিপুরার 'বামফ্রন্ট' সরকারকে হেনস্তা করার জন্য কেউ কি আজ হাজার চক্রান্ত করেও পশ্চিমবাংলা থেকে যাদবপুর বা অন্যান্য জবরদখল কলোনিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরায় টেনে নিয়ে যেতে পারবেন? দ্বিতীয়ত, এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে এই সমস্ত শরণার্থীরা নাকি সব স্বেচ্ছায় দণ্ডকারণ্যে ফিরে যায় এবং শান্তিপূর্ণভাবেই নাকি তাদের পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। বস্তুত দণ্ডকারণ্যে এই সমস্ত শরণার্থী ফেরত পাঠাবার জন্য মাত্র কয়েক মাস আগে এই সরকার কী ধরনের পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, পুলিশের লাঠি, গুলি ও বেয়নেটের দাপটে কীভাবে এদের বিতাড়িত করেছিলেন সেই করুণ ও নিষ্ঠুর ইতিহাস পশ্চিমবাংলার মানুষ ভুলে যায়নি। বর্ধমানের কাশীপুর ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের গুলি করে হত্যা করার ঘটনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের ওপর বারংবার পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা তার নির্মম সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ফলে জ্যোতিবাবু কীভাবে আশা করলেন যে, পশ্চিমবাংলার মানুষ এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে তাঁর এত বড় অসত্য ভাষণ শিরোধার্য বলে গ্রহণ করবেন? তার পর তিনি বিবৃতিতে বলেছেন যে, মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু নেতারা নাকি মারাত্মক হিংসাত্মক কাজে উসকানি দিয়ে চলেছেন, সেখানে নাকি তারা একটা পাল্টা সরকার চালাচ্ছে— এসব অনেক কথা। এই সমস্ত অভিযোগ যে একেবারেই অর্থহীন এবং নিছক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এ কথা যে-কোনও যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ যে অসহায় মানুষগুলো এত নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার করে এতদিন পরে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মতো একটা অর্থনীতি গড়ে তুলেছে, তারা তো হিংসা ও অশান্তি সৃষ্টির জন্য এ কাজ করেনি। তারা চেয়েছে একটু নির্ঝঞ্ঝাটে শান্তিপূর্ণ ভাবে বাঁচতে। বিবৃতিতে এ রকম আরও অনেক অসত্য বক্তব্য রয়েছে। বাস্তবে মরিচঝাঁপিতে 'বামফ্রন্ট' সরকার যে নৃশংস অত্যাচারের পথ বেছে নিয়েছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোনও নজির আছে কি না আমাদের জানা নেই। তাই এমনকী 'বামফ্রন্ট'-এর অভ্যন্তরে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অংশের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, তাঁরা ভেবে দেখুন, মরিচঝাঁপির ব্যাপারে ফ্রন্ট সরকারের এই কার্যকলাপ কোনও দিক থেকে সমর্থনযোগ্য কি না। উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর কংগ্রেসি চক্রান্তের বিরুদ্ধে অতীতে যাঁরা বার বার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তাঁদের সেদিনের ভূমিকার সঙ্গে আজকের এই ভূমিকার কোনও সামঞ্জস্য খুঁজে পান কি না। 'বামফ্রন্ট' সরকার এই নিরীহ ও অসহায় মানুষগুলোকে কেন এ রকম শত্রু বলে মনে করছেন আমরা ভেবে উঠতে পারছি না। কী ওদের অপরাধ?

ওরা তো বাঁচতে চেয়েছিল। তাহলে এই বাঁচতে চাওয়াটাই কি ওদের অপরাধ? এই নিরীহ মানুষগুলো সরকারের কী এমন ক্ষতি করছিল? ওদের জন্য রাজ্যের অর্থনীতির এমনকী বিঘ্ন ঘটছিল যার ফলে 'বামফ্রন্ট' সরকার ওদের উৎখাত করতে এ রকম নৃশংস পথ বেছে নিলেন? আপনারা সকলেই জানেন ওরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেই মরিচঝাঁপি সুন্দরবন অঞ্চলে একটি অখ্যাত জনবসতিহীন ছোট্ট দ্বীপ। জোয়ারের জল যে দ্বীপকে বুক জলের নীচে ডুবিয়ে দিত, ভাটার সময় যা হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের বিচরণভূমি হয়ে উঠত। ওদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ তা জনপদে পরিণত হয়েছে। মানুষপ্রমাণ বাঁধ তুলে আজ ওরা সেখানে ফসল ফলাচ্ছে। মাছ চাষ করছে, নৌকা তৈরি করছে। ফলে অশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টায় যে মানুষগুলো দীর্ঘদিন পর একটু জীবনের আলো দেখার সুযোগ পেল তাদের উৎখাত করে নতুন করে উদ্বাস্তুতে পরিণত করার মতো হৃদয়হীন ও অমানবিক আচরণ আর কী থাকতে পারে? ওঁরা বলছেন, অর্থনীতি বিঘ্নিত হচ্ছে। যেখানে প্রতি বছর প্রায় দু' লক্ষ লোক ভারতের নানা অংশ থেকে কলকাতায় এসে থাকেন এবং নানাভাবে রুজিরোজগার করেন, তার ফলে যদি রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙে না পড়ে সেখানে মরিচঝাঁপির এই কয়েক হাজার মানুষ ছোট্ট একটা জনবিরল দ্বীপে ফসল ফলিয়ে তাকে বসতিযোগ্য জনপদে পরিণত করায় যত অর্থনীতির বিঘ্ন ঘটে গেল? ফলে এসব অভিযোগ যে দুরভিসন্ধিমূলক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এ কথা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় কি? বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ যদি মনে করে থাকেন যে, পুঁজিপতি শ্রেণির আস্থাভাজন হওয়ার হীন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য বাম মুখোশের আড়ালে জনগণের ওপর তাঁরা একের পর এক যেমন ইচ্ছে অত্যাচার চালিয়ে যাবেন আর দেশের মানুষ তা নির্বিবাদে সহ্য করে যাবে, তাহলে তাঁরা খুবই ভুল করবেন। এ কথা ঠিক যে ভেতর থেকে আঘাত করে গণ আন্দোলনের কোমর ভেঙে দেওয়ার জন্য তাঁরা যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন, তার দ্বারা তাঁরা দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতিনৈতিকতার অবনমন ঘটাতে অনেকখানি কৃতকার্য হয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও মানবিক মূল্যবোধগুলো আজও একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। সুতরাং তাঁরা জেনে রাখুন, রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের এই জঘন্য অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সংগঠিত আন্দোলনের পথে একে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসবে। 'চক্রান্তকারী' 'অশুভ আঁতাত', 'অপপ্রচার' এই সব কথা বলে এই রাজ্যের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষকে আর বেশি দিন ঠকাতে পারবেন না।

এসইউসিআই-এর মুখপত্র 'গণদাবি'-তে প্রকাশিত। ৩১ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

প্রশাসনের অবরোধ ভেঙে দিল হাইকোর্টের রায়। উপবাসী মরিচঝাঁপিতে শোনা গেল ভাত রান্নার টগবগ শব্দ। চাঁদের আলোয় দেখা গেল শরণার্থীদের শরীরে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন, মৃতদেহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত স্কুল, গ্রন্থাগার, রুটির কারখানা...

উপবাসী মরিচঝাঁপিতে

জ্যোতির্ময় দত্ত

পনেরো দিন নিশ্ছিদ্র অবরোধের পর গতকাল দুপুর দুটো থেকে কলকাতা হাইকোর্টের ৭ ফেব্রুয়ারির আদেশের ছত্রছায়ায় এই দ্বীপে খাবার আসতে শুরু করেছে। গতকাল সন্ধ্যায় অনেক কুঁড়েতেই ঈষৎ ভেজা কাঠে জ্বাল দেওয়ার গন্ধের সঙ্গে বাঙালির কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর শব্দ— ভাত রান্নার টগবগ শোনা যাচ্ছিল।

দুপুর দুটোয় টিনের দুধ, পাঁউরুটি, আলু এবং আটা নিয়ে একটি ডিঙি করে বাগনা পুলিশ ক্যাম্প থেকে এখানে এসে পৌঁছোন ৭ ফেব্রুয়ারির মামলার আবেদনকারী শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস। তিনি কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্টের আদেশের প্রতিলিপি দেখান এবং জানান যে, তিনি ডিঙি করে নদী পার হচ্ছেন এবং সেই সময় যদি সরকারি লঞ্চ তাঁর নৌকো ভেঙে দেয়, কী তাঁকে ডুবিয়ে মারে, তবে তা হাইকোর্টের ঘোরতর অবমাননা হবে। এবং এ পারে পৌঁছে শ্রীবিশ্বাস হাইকোর্টের আজ্ঞা দেখিয়ে অপর শরণার্থীদের খেয়া পারাপার আবার চালু করার ভরসা দেন। বিচারপতি পাইন তাঁর ৭ তারিখের আদেশে দ্বীপের বর্তমান অধিবাসীদের মরিচঝাঁপিতে প্রবেশ ও নির্গমনের অধিকার দিয়েছেন।

বিচারপতি পাইনের রায়কে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির প্রেসিডেন্ট [সতীশ মণ্ডল] রামায়ণের বিশল্যকরণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। গতকাল রাত্রে মেঘাবৃত

চাঁদের আবছা আলোয় নদী পার হয়ে যখন এখানে পৌঁছলাম, তখন নেতাদের অধিবেশন বসেছিল।

এই আদেশ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য চাইলে তিনি বললেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন বিশল্যকরণী ছিটোলি বানর-সৈন্য রাম-রাম করি জাগি উঠিছিল, আমরাও তিমনি আইন-আইন জিন্দাবাদ, ভারতের সংবিধান কি জয় বলি জাগি উঠিছি।' তাঁর মতে, 'ভারতীয় জাতি এক মহাপাপের ভাগীদার হতে উদ্যত হয়েছিল। হাইকোর্ট বাহাদুর ভারতবর্ষিরি বাঁচালেন।'

ওই ঘরে গোলদার [রঙ্গলাল], বারুই [রাইহরণ বাড়ৈ] ইত্যাদি বিবিধ ক্যাম্পে বহুবার গুলিখাওয়া প্রাচীন নেতাদের সঙ্গে তক্তপোশে সতীশবাবুর ঠিক পাশেই বসেছিলেন শীর্ণকায় তরুণ দেবব্রত বিশ্বাস। ঘরে অনেকেই আমাকে তাঁদের শরীরে গত চোদ্দোদিনের যুদ্ধের নানান বুলেট এবং আঘাতের চিহ্ন দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় দেবব্রতই ছিলেন হিরো।

ওঁদের একজন বললেন, 'আইন আমরা ভাঙতিছি, না পুলিশ ভাঙতিছে?' বৃহস্পতিবার, হাইকোর্টের রায় বেতার এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরও নাকি পুলিশ লঞ্চ পাড়িদানোদ্যত ডিঙি ভেঙেছে এবং গলুই দিয়ে চেপটে মানুষকে আঘাত করেছে। বস্তুত অবরোধ নাকি সেদিন এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে এমনকী কোনও গুপ্ত পথেও একদানা চাল পৌঁছতে পারেনি। সেদিন সাড়ে পাঁচ হাজারের একটি পরিবারেও ভাত হয়নি।

সমিতির হিসেব মতো ২৪ জানুয়ারি অবরোধ শুরু হওয়ার পর থেকে গতকাল পর্যন্ত দ্বীপে অনাহারে মৃতের সংখ্যা ১৭। তাঁদের নাম এবং বয়সের এক তালিকা সমিতি আমাকে দিলেন, যা এই প্রতিবেদনের শেষে দিচ্ছি। সেদিনও নাকি একজন আর সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়েছেন। কিন্তু যেটা বিস্ময়কর ঠেকল, সেটা হচ্ছে বুড়ো-শিশু নির্বিশেষে সকলের মনোবল।

তাঁরা নেতাজিনগরের ঘাটে মৃতদেহ সার সার সাজিয়ে রেখেছেন— সরকারের লঞ্চের জন্য পসরা। একমাত্র নাকি তাঁরা ওই ভাবেই দ্বীপ ত্যাগ করবেন। আমি পাড়ের কাদা ভেঙে লাশগুলি দেখতে গেলাম। একটি ছোট এক রত্তি শরীরের ওপর ন্যাতা জড়ানো দেখে প্রশ্ন করতেই একজন একপাক ঘুরিয়ে খুলে দিলেন। আমি বর্ণনা দেওয়া থেকে বিরত থাকছি, কিন্তু ক্ষতের নমুনা দেখে মনে হয় যে এ শিশু অনাহারে মরেনি, বুলেটে মরেছে।

চাঁদের আলোয় অবশ্য আমি ঘুরে ঘুরে এ রকম দৃশ্যই দেখিনি। সমিতির তরুণ কর্মীরা— মধু মালাকার, সুনীল বিশ্বাস, গৌর ইত্যাদিরা আমাকে তাঁদের নতুন স্কুল, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল এবং রুটির কারখানা দেখালেন। গত নভেম্বরে যা ছিল

খানাখন্দের মধ্যে একটি কুঁড়েঘর, তাই এখন হয়েছে সমতল বিশাল অঙ্গনের চার ধারে আলো-হাওয়াময় বিদ্যালয়। তাঁরা নিজেদের গড়া একটি সরস্বতী প্রতিমা দেখালেন, যার ওপর রং চড়ানো হয়নি, কারণ তখন অবরোধ শুরু হয়ে যায়। স্কুলের রেজিস্টার দেখলাম, এত গুলিচালনা ও অনাহারের মধ্যেও ক্লাস চলেছিল, চলছে। এই বিদ্যালয় দেখে বেড়া ডিঙিয়ে এখানে আসার শ্রম সার্থক হল।

শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস, ওই মামলার অন্যতম আবেদনকারী স্বপন দে এবং আমি ইংরেজি মতে ৯ তারিখ ভোর ৩টেয় একটা খোলা ডিঙিতে করে ন্যাজাট থেকে বাগনা পৌঁছই। শীতে কারওরই বিশেষ ঘুম হয়নি, আলো ফুটতেই আমরা বাগনা আপিসে গিয়ে আদালতের হুকুম দাখিল করি।

আটটার সময় টাইগার প্রজেক্টের অধ্যক্ষ শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, আদালতের হুকুম তাঁর বিভাগ শুধু আক্ষরিকভাবে নয়, আন্তরিকভাবে পালন করবেন। এবং আদেশ পড়ে তাঁরও ধারণা হল যে, ওষুধ ও খাদ্য পৌঁছোতে আমার দ্বীপে যাওয়ার কোনও বাধা থাকা উচিত নয়।

পুলিশ সুপার সামন্ত ছিলেন লঞ্চে। তাঁকে ঘনঘন বেতার বার্তা পাঠানো হচ্ছিল। দশটায়ও তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। কল্যাণবাবুকে তাঁর লঞ্চে ডেকে পাঠালেন এবং তারপর কল্যাণবাবুও হলেন অদৃশ্য।

আমরা বারবার সহকারী এস-পি, এ ডি এম ইত্যাদি অফিসারদের কাছে একটা দ্রুত সিদ্ধান্তের আবেদন জানালাম। সারা রাত একটা খোলা ডিঙিতে এই তীব্র শৈত্যপ্রবাহে বসে আমরা কেবল ভেবেছি, এখন থেকে মরিচঝাঁপির বাচ্চারা অন্তত দুধ পাবে। প্রতি ঘণ্টার দেরি তাই অসহনীয় লাগছিল।

সরকারি কর্তারা জানালেন: দেবব্রত একা, মরিচঝাঁপির অধিবাসী হিসাবে নদী পার হতে পারেন। কিন্তু অন্য কেউ নয়। আমি বললাম, আমি যে খাদ্য এবং ওষুধ এনেছি তা আমি কেবল বিশেষ ব্যক্তির হাতেই পৌঁছে দিতে চাই। এই অধিকার বিচারপতি পাইনের আদেশক্রমে আমার আছে। এ কথা বলে বেরিয়ে, বাগনা ক্যাম্পের আশপাশে একটিও ইচ্ছুক ডিঙি পেলাম না। আমি তাই আমার অনুসরণকারীদের দুপুর একটায় তিন মাইল ছুটিয়ে কুমিরমারি লঞ্চঘাটে নিয়ে যাই এবং দুপুরে বিশ্রাম করে, সন্ধ্যায় একটি জেলে ডিঙিতে চাঁদের আলোয় গতকাল এখানে এসেছি।

অনাহারে মৃত্যুর তালিকা:

১. রঞ্জন মণ্ডল, বয়স ১৮

২. সতীশ মণ্ডল, বয়স ৩৫

৩. হরিপদ কবিরাজ, বয়স ২

৪. খুকু পাল, বয়স ৩
৫. আশালতা মণ্ডল, বয়স ৩$^{১}/_{২}$
৬. কল্পনা মণ্ডল, বয়স ১$^{১}/_{২}$
৭. মনদেবী মণ্ডল, বয়স ৭
৮. কালিদাসী রায়, বয়স ৭
৯. সবিতা রায়, বয়স ৫
১০. তুলসী রাণী রায়, বয়স ২
১১. যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডল, বয়স ৩৬
১২. কালিদাসী মণ্ডল, বয়স ৬
১৩. ভগীরথ মণ্ডল, বয়স ১৪
১৪. অনিতা বিশ্বাস, বয়স ১
১৫. হারাধন সরকার, বয়স ৩
১৬. লক্ষ্মীরাণী সরকার, বয়স ৪
১৭. অঘোর মণ্ডল, বয়স ৪

নেতাজিনগর, মরিচঝাঁপি থেকে লেখা এই প্রতিবেদন ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, ২৮ মাঘ ১৩৮৫ রবিবার-এর 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল, 'আদালতের আদেশের ছত্রছায়ায় উপবাসী মরিচঝাঁপিতে'

মরিচঝাঁপির শরণার্থীদের সম্পর্কে সহানুভূতিসূচক কথা বলা মানে তখন বামফ্রন্ট সরকার-বিরোধী ষড়যন্ত্র। তবু প্রশ্ন করতে হয়, শরণার্থীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোনও মূল্য না দিয়ে, খাদ্য পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে এঁদের পশ্চিমবাংলা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া কি আইন, নীতি কিংবা বিবেকসম্মত?

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দণ্ডকারণ্য থেকে লক্ষাধিক মানুষ চলে এসেছিলেন পশ্চিমবাংলায়। অনাহার, রোগভোগ এবং এখানকার মানুষদের উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরে তাঁরা অনেকেই বাধ্য হয়ে ফিরে চলে গেছেন। দশ-বারো হাজার কিংবা তারও বেশি কিছু সংখ্যক, যাঁদের আমরা এখনও শরণার্থী কিংবা উদ্বাস্তু বলে অভিহিত করি, তাঁরা মরিয়া হয়ে রয়ে গেছেন মরিচঝাঁপিতে। সেখানে তাঁদেব উপনিবেশ গড়ায় গোড়ার দিকে আমি দু'বার গিয়ে দেখেছি, নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সকলেই দিনরাত খাটছেন বেঁচে থাকার জন্য। বাইরের কেউ কোনও সাহায্য করে না, তাঁরা সাহায্যেব প্রত্যাশাও করেন না, এক সঙ্গে এত মানুষকে আত্মসম্মানের সঙ্গে আপ্রাণ পরিশ্রম করতে আমি এদেশে দেখিনি।

মানুষকে সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা অমানবিক। দশ হাজার, কুড়ি হাজার বা এক লক্ষ দু'লক্ষ মানুষ কোথায় থাকবে, সে বিষয়ে তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও মূল্য না দিয়ে সরকারি অফিসের চেয়ার-টেবিলে বসে কয়েকজন তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করলে যে কত বিভ্রান্তি হয়, কত পরিবার ছন্নছাড়া ও বিনষ্ট হয় তা আমরা আগে কি অনেকবার দেখিনি? এই মানুষগুলোর কাছে দণ্ডকারণ্যের জীবন ও পরিবেশ অসহ্য বোধ হয়েছিল, তাই তাঁরা চলে এসেছেন। স্বেচ্ছায় কেউ নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছাড়ে না। অপরের কুপরামর্শে শত শত মা তাঁদের শিশুদের হাত ধরে ঘর ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় না। সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি অত্যন্ত দুর্গম

এবং মনুষ্য বসবাসের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়, তবু এঁরা মরণপণ করে বাংলার চেনা পরিবেশেই থাকতে চান। এঁদের এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির কারণটি খুব গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা উচিত।

আমি জানি পশ্চিমবাংলায় নতুন করে এঁদের বসতিস্থাপন করতে দিলে কিছু সমস্যা দেখা দেবেই। সারা ভারতবর্ষ থেকে বাঙালি শরণার্থী পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসতে চাইলে সে চাপ এই রাজ্য সহ্য করতে পারবে কি না— সে প্রশ্নও আছে। কিন্তু সব বাঙালি শরণার্থীরা ফিরে আসতে চাইবে কেন? তা হলে কি যেখানে তাঁদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, সে সব জায়গায় জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সুন্দরবনের চেয়েও ভয়াবহ? এবং এঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য না দিয়ে জোরজবরদস্তি করে, এঁদের খাদ্য পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে কোনও ক্রমে এঁদের পশ্চিমবাংলা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া কি আইন, নীতি কিংবা বিবেকসম্মত?

পশ্চিমবাংলার বর্তমান সরকার এবং তাদের সমর্থকরা মরিচঝাঁপি নিয়ে কেউ কোনও সহানুভূতিসূচক কথা বললেই তাঁদের সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী বলে আখ্যা দিচ্ছেন। এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মতন সময় আমার নেই। ভাল বা মন্দ কোনও উদ্দেশ্যে কোনও ষড়যন্ত্রকারীর ভূমিকা নেওয়া আমার পছন্দ নয়! বরং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রতি আমার আস্থা আছে, নিছক কানপাতলা লোকের মতন হঠকারী কোনও কাজ তিনি করেন না বলেই আমার ধারণা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ মরিচঝাঁপির মানুষগুলো কেন মরিয়া হয়ে, প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এখানেই থাকতে চাইছেন, তা আপনি স্বয়ং গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখুন। আপনি এখন একটি বৃহৎ পরিবারের প্রধান, আপনি আপনার নিজের ভাইবোনের মতন এই মানুষগুলোর সঙ্গে অন্তত কিছুটা স্নেহের সুরে কথা বলুন। শুধু পুলিশ দিয়ে এই অবস্থায় লোকগুলোকে ঘিরে রাখা কোনও সভ্য সরকারের যোগ্য কাজ নয়।

জঙ্গল জবরদখল সম্পর্কে আমি আগে দু-একবার লিখেছি। উত্তর বাংলায় এই বাঙালি শরণার্থীদের চেয়ে আরও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ জঙ্গল জবরদখল করে আছেন। গাছকাটার অভিযোগটিও কুযুক্তিপূর্ণ। পশ্চিমবাংলার এক-চতুর্থাংশ পরিবারও কয়লায় রান্না করে কি না সন্দেহ। গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে কাঠের জ্বালে রান্না হয়। সেই কাঠ আসে কোথা থেকে? এই শরণার্থীদের জোর করে তাড়িয়ে দিলেও সুন্দরবনের গাছকাটা চলতেই থাকবে। বাঁচার দাবিতে কিছু নির্দোষ মানুষের পরিবর্তে চোর এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা বৃক্ষবংশ নির্মূল করে চলবে।

লেখাটির তারিখ ৫ মে ১৯৭৯। পাওয়া গেছে 'মরিচঝাঁপি বুলেটিন'-এ।
প্রকাশের তারিখ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ [২৯ মে ১৯৭৯]

বাঙালি উদ্বাস্তুরা তখন বাম সরকারের আপদে পরিণত হয়েছে। এই আপদ বিদায়ে তঞ্চকতা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। সরকারের রটানো সব 'কুযুক্তি' খণ্ডন করে. সরকারি সন্ত্রাসের চেহারা ফাঁস করে লেখক তথ্য দিয়ে বুঝিয়েছেন দণ্ডকারণ্যে জীবনযাপন কতটা দুরূহ ও দুর্বিষহ এবং মরিচঝাঁপিতে জীবন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কত প্রবল।

মরিচঝাঁপি কি মরীচিকা

শৈবালকুমার গুপ্ত

মরিচঝাঁপিতে কয়েক হাজার দণ্ডকারণ্য-প্রত্যাগত উদ্বাস্তুর বসবাস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন যে এমন অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করলেন সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এ-বিষয় নিয়ে নির্লজ্জভাবে অসত্য প্রচারের অন্ত নেই, যেমন অন্ত নেই নির্বিচারে সব রকম রাজশক্তির নির্মম প্রয়োগের দ্বারা তাদের ওখান থেকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা।

কিছু দিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীরাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, তাঁদের সফল প্রচেষ্টার ফলে এখন মাত্র হাজার ছয়েক উদ্বাস্তু সেখানে আছে। তাই যদি হয় তবে এ ক'টি লোকের একটি জনহীন দ্বীপে বসতি নিয়ে এত মাথাব্যথা বা এত জলঘোলা করা কেন বোঝা শক্ত। বলা হয়েছে, উদ্বাস্তুরা এসেছে কোনও এক বিদেশি শক্তির অর্থ সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারকে বিব্রত করবার এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এ-সরকারের পতন ঘটাবার জন্য। অপপ্রচার এতদূর গড়িয়েছে যে সেদিন একজন উদীয়মান কবিযশঃপ্রার্থী

সাহিত্যিক যাঁর সঙ্গে রাজনীতির কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই— আমাকে বলেছিলেন যে তিনি শুনেছেন মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা বৈদেশিক সাহায্যে সমস্ত দ্বীপটাকেই রাতারাতি পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে তুলনীয় একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত করে তুলেছে— যার প্রশস্ত রাস্তাঘাট, বিরাট হাসপাতাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনা হয় না।

এমনকী শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসুর মতো বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিও বলেছেন যে, উদ্বাস্তুরা ওখানে একটা প্যারালাল বা পাল্টা গভর্নমেন্ট স্থাপন করেছে যেখানে the writ of the State government does not run. তারা বাংলাদেশের সঙ্গে যোগসাজশে বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও অগুন্তি মারাত্মক অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। এবং দিন কয়েক আগে, যখন বহু সরকারি লঞ্চ নিয়ে জনকয়েক উচ্চ রাজকর্মচারী হাজার-দেড় হাজার পুলিশ পরিবৃত হয়ে মরিচঝাঁপিতে পদার্পণ করলেন, তখন খবরের কাগজে প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি থেকে মনে হয় এই যেন প্রথম শত্রু কবলিত মরিচঝাঁপিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। আমরা মশা মারতে কামান দাগার কথা শুনেছিলাম, এবার তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলাম।

আমাদের মতো যারা মরিচঝাঁপির কিছু খবর রাখে তারা জানে এই ধরনের প্রচার কত দূর অসত্য। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার দুটো লাইন মনে পড়ে—

আপনমনের বিকারটারেই 'শৈল' ওরা কয়,
ওদের 'শৈল' বিধির 'শৈল' নয়।

এদের কল্পনার মরিচঝাঁপিও তেমনই এদের স্বেচ্ছাকৃত মনের বিকার, নইলে এতগুলি মানুষের এত বড় দুর্দশা দেখে এ রকম অসত্য প্রচারের চেষ্টা হত না। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা পাল্টা সরকার স্থাপন করা দূরে থাকুক, বর্তমান সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে জনবসতিহীন দ্বীপে— কোনও রকমে নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়— অপর সাধারণ ভারতীয়ের মতো ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন মেনে এবং উচিত খাজনা দিয়ে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত বা আশ্রয়চ্যুত উদ্বাস্তুর দল যে এখানে এসে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে গাঁঠছড়া বাঁধবে এবং ভারতে শত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটাবে এ কথা পাগল ছাড়া আর কেউ ভাবতে পারে না— কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি যে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি এ কথা আজ আর অজানা নয়। সুতরাং প্যারালাল গভর্নমেন্ট স্থাপন করার কথা কোনও উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা— সেটা শুনতে বা শোনাতে বেশ লাগে, তাতে political overtone আছে।

২

কেন যে এতদিন পরে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে এতগুলি উদ্বাস্তু চলে এল তার কারণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না, সম্প্রতি প্রকাশিত পার্লামেন্টের Estimates Committee-র রিপোর্ট থেকেই সেটা পরিষ্কার হবে। কমিটির সদস্যরা অন্তত ভাবের ঘরে চুরি করেননি, সত্য প্রকাশে কোনও পার্টির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে মনে করে পিছিয়ে যাননি, যদিও সমস্ত বিভিন্ন পার্টির লোকেরাই তার মেম্বার ছিলেন। আমি ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে বোম্বের Economic Weekly-তে তিনটি প্রবন্ধে দণ্ডকারণ্য প্রকল্প সম্পর্কে যে তথ্য উদঘাটিত করেছিলাম এবং এবারেও Estimates Committee-র সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে পরবর্তী ঘটনাবলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করে যেটা সমন্বিত করেছিলাম— এরাও সংযত, কিন্তু জোরালো ভাষায় ঠিক সেই কথাই বলেছেন। উদ্বাস্তুদের স্থান ত্যাগের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক— যেভাবে তাদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে তাতে বেশির ভাগ পরিবারেরই গ্রাসাচ্ছাদন চলা দুষ্কর। তার উপরে আছে আমলাতান্ত্রিক আত্মতুষ্টির (complacency) ভাব, উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতির অভাব, পরিকল্পনায় এবং তার রূপায়ণে ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রশাসনিক ব্যয়বাহুল্য— অথচ দু-তিন বৎসর উপর্যুপরি অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও পূর্ব নির্ধারিত নীতি বা অর্থ বিনিয়োগের সূক্ষ্ম বিধিনিষেধের দোহাই দিয়ে তাদেরকে কোনও রকম সাহায্য (তা সে খয়রাতি দানই হোক বা loan-ই হোক) দিতে অস্বীকার ইত্যাদি। তার ওপরে আছে স্থানীয় অধিবাসী ও স্থানীয় প্রশাসনের বিরূপ মনোভাব এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে নারীর সম্ভ্রমহানি। এই লেখাটির খসড়া শেষ করার পর মাত্র দু-তিন দিন আগে দণ্ডকারণ্যের একজন দায়িত্বশীল লোকের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিতে জানতে পারলাম, নারীঘটিত মামলায় উদ্বাস্তু অভিযোগকারীর যে মামলা দু' বছর আগে খারিজ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দু' বছর পরে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করবার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সহ্যেরও একটা সীমা আছে— সেটা যখন অতিক্রম করল তখন এখান ওখান থেকে স্থানত্যাগ যা বরাবরই কিছু না কিছু হয়ে আসছিল— তা আর বাধা মানল না, ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ একবারে বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে এল। তাও একদিনে হয়নি, হচ্ছিল ১৯৭২ সাল বা তার আগে থেকেই। কিন্তু দণ্ডকারণ্য প্রশাসনে যারা উঁচু পদে সমাসীন এ খবর হয় তাদের কাছে পৌঁছোয়নি, নয় পৌঁছলেও তারা তাতে কোনও গুরুত্ব আরোপ করেননি, কারণ দুশো, চারশো, পাঁচশো পরিবার চলে গেলেও তাদের চাকুরির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার কোনও আশঙ্কা ছিল না। 'দণ্ডকারণ্য দূর অস্‌ত্'— তার খবর রাজধানীতে পৌঁছোয় না, পৌঁছলেও আমল পায় না, যদি না

কোনও এমপি তা নিয়ে চেঁচামেচি করেন। এই যখন অবস্থা তখন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার একেবারে নির্বিকার। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর কোনও পুনর্বাসন সেক্রেটারি বা কমিশনার উদ্বাস্তুদের কী হাল, কী অবস্থায় তারা আছে বা তাদের কোথায় পাঠানো হবে তা জানবার চেষ্টা করেননি, দণ্ডকারণ্য অথরিটির ত্রৈমাসিক অধিবেশনে হাজিরা দেওয়া তারা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন ক্যাম্পগুলো খালি করছি, আপদ গেছে, এখন ওদের সম্বন্ধে যা কিছু ভাবনাচিন্তা সেটা ভারত সরকারের। এটা কারও মাথায় ঢুকল না যে, দণ্ডকারণ্য প্রকল্প যদি ব্যর্থ হয় তবে তার প্রথম ধাক্কা সামলাতে হবে পশ্চিমবঙ্গকেই। কারণ গৃহান্বেষী পারাবতের মতো বাঙালি উদ্বাস্তুরা এখানে ছুটে আসবে। আগেকার গাফিলতি বুমেরাং হয়ে বর্তমান শিরঃপীড়ার কারণ হবে।

৩

আমাদের এখন করণীয় কী? মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের পত্রপাঠ বিদায় দেওয়া, না তারা যাতে এখানে বেঁচে থাকতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করা? দেশ বিভাগের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল তার ধাক্কাটা সামলাবার দায়িত্ব কার— যারা অবিলম্বে স্বাধীনতা ও শাসনক্ষমতা হাতে পাবার লোভে গান্ধীজির পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তাড়াতাড়ি দেশবিভাগে রাজি হয়ে গেলেন এবং পরে গান্ধীজির বশংবদ শিষ্যের মতো লোকবিনিময়ের প্রস্তাব হেসেই উড়িয়ে দিলেন তাদের? না যারা এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের victim বা বলি তাদের? আমি লোকবিনিময় সমর্থন করি না, কারণ তাতে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল, কিন্তু কে কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী হবে অন্তত সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার স্বাধীনতা থাকার প্রয়োজন ছিল। পাবলিক স্মৃতিশক্তি স্বল্পায়ু হতে পারে, কিন্তু এতটা অল্প নয় যে তখনকার দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমরা এত শীঘ্র ভুলে যাব। একথা কি তখন বলা হয়নি যে দেশবিভাগের ফলে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সীমান্তের ওধারে থাকবে, অবস্থা অসহনীয় হলে এপারে তাদের জায়গা হবে? আইনে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দাবি বা অধিকারের তামাদি হয়ে যাওয়ার কথা শোনা যায়— এই রাজনৈতিক আশ্বাসেরও কি তামাদি আছে? থাকলে, কতদিন পরে সে তামাদি হয়, কার মর্জির ওপর সে তামাদি নির্ভর করে? দু' পক্ষের মধ্যে অলিখিত চুক্তির অংশীদার এক পক্ষের মর্জির ওপর কি? এটা আইনের প্রশ্ন ততটা নয়, যতটা ন্যায় ও নীতির প্রশ্ন। তখন তো বলা হয়নি যে এ-আশ্বাসের আয়ু মাত্র দশ বৎসর, কি কুড়ি বৎসর, কি ত্রিশ বৎসর— তার পরে সেটা বাতিল হয়ে যাবে। আশ্বাসের আয়ুসীমা

এই ভাবে unilaterally সীমিত করার ফল হল এই যে যাঁরা দূরদর্শিতার অভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে তখনকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা মেনে চলেছেন এবং প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও যতদিন সম্ভব সীমান্তের ওধারে থাকবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরাই হলেন বলি, আর যারা বুদ্ধিমানের মতো 'যঃ পলায়তে স জীবতি' নীতি অনুসরণ করে— তাড়াতাড়ি সীমানা অতিক্রম করে এলেন তাঁরা সকলেই, কেউ সুষ্ঠুভাবে কেউ বা কোনও রকমে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। এমনকী মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উৎখাত করতে যিনি বদ্ধপরিকর সেই পুনর্বাসন মন্ত্রীর অনতিপূর্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এই কথারই সত্যতা প্রমাণিত হবে; প্রমাণিত হবে কী করে জবরদখল কলোনি দীর্ঘদিন বাসের ফলে ও সরকারের আনুকূল্যে বিধিসম্মত স্বত্বস্বামিত্বে পরিণত হয়। মরিচঝাঁপির বেলায় তার ব্যতিক্রম কেন ঘটবে? বিগত ৮ মে তারিখে ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত গ্র্যান্ড হোটেলের ভোজসভায় শ্রীজ্যোতি বসু এই বলে গর্ব অনুভব করেছিলেন যে, দেশবিভাগের পর বহু মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করবার জন্য চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছেন এবং ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এটা সুখের কথা, কিন্তু যারা কোনও দিন স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেনি তারা যদি ভারতে চলে আসতে চায়, তবে তাদের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন?

৪

মরিচঝাঁপিতে যে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছেন এবং সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকেই কোনও রকমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন, তাদের উৎখাতের চেষ্টায় সরকার যেসব কঠোর (draconian) পন্থা অনুসরণ করেছেন সেটা সবাই জানেন এবং তার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একদিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এই বলে চাপ সৃষ্টি করেছেন যে একটা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ফিরে না গেলে সমস্ত সাহায্য বরবাদ হয়ে যাবে, অন্য দিকে প্রাদেশিক সরকার আরও একধাপ উপরে গিয়ে সামরিক অবরোধের (blockade) ধাঁচে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবনিতাকে অনশনে বা অর্ধাশনে জব্দ করে তাদের স্থানত্যাগে বাধ্য করবার চেষ্টা করছেন। আমরা জনতিনেক লোক খবরের কাগজের মাধ্যমে সরকারের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছিলাম তাঁরা যেন এই নিরুপায় নিরপরাধ উদ্বাস্তুদের ওপর থেকে তাঁদের উদ্যত অস্ত্র সংবরণ করেন। বলাবাহুল্য আমাদের আবেদনে কোনও সাড়া মেলেনি বরং চাপটা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল।

স্থানাভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবলম্বিত নীতির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, গোটা কয়েক ঘটনার কথা মাত্র উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকতে হবে। তাঁরা যে নিজেরা কোনও সাহায্য করেননি শুধু তাই নয়, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি যেসব বেসরকারি সংস্থা সাহায্য বিতরণ করছিল তাদেরকেও চলে যেতে বাধ্য করলেন। সহায়সম্বলহীন উদ্বাস্তুরা মাছ ধরে বা কাঠের রকমারি জিনিস তৈরি করে এবং অন্যান্য উপায়ে যে জীবিকার সংস্থান করছিল তাও বন্ধ করলেন, ভেড়ি কেটে এবং পুলিশ ও বন বিভাগের লঞ্চ লেলিয়ে মাছের নৌকা ভেঙে দিয়ে। তাতে যে নৌকারোহীদের প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে তাঁরা নির্বিকার। ১৯৭৮ সালের ১৯ আগস্ট বহু পুলিশ ও কুড়িটি লঞ্চের সাহায্যে সামরিক কায়দায় নদীপথ অবরোধ করা হল এবং উদ্বাস্তুরা তাতেও দমে না দেখে ৬ সেপ্টেম্বর সেই সব লঞ্চ চালিয়ে উদ্বাস্তুদের রসদ, জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বোঝাই করা ২০০টি নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হল। যখন 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে, বিচারের বাণী' একেবারে মূক হয়ে রইল না, হাইকোর্টের ইনজাংশন বেরোল যে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের 'ভাতে মারবার' অধিকার সরকারের নেই— তখন সেই আদেশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশবাহিনী স্থির করলেন, এই হুকুমে বাইরের কোনও লোককে মরিচঝাঁপিতে গিয়ে খাদ্যসরবরাহের অধিকার সাব্যস্ত হয়নি, শুধু মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের কুমিরমারি বা অন্যত্র এসে খাবার সংগ্রহ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ খাদ্যসংগ্রহ যদি একান্তই বন্ধ না করা যায় তবে সেটা যতদূর কষ্টসাধ্য করা যায় তারই চেষ্টা হল।

৫

এই সবই তাঁরা করেছেন বনসংরক্ষণের নাম করে এবং আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে আইনের সীমানা অতিক্রম করে গেছেন। কারণ Indian Forest Act-এ এমন কোনও ধারা নেই যার ফলে এমন সর্বগ্রাসী নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায়। কিন্তু আইনের কথাটা বিচার করবার আগে যে-মরিচঝাঁপির বনসম্পদের জন্য এত উৎকণ্ঠা এবং, যার দোহাই দিয়ে প্রশাসনযন্ত্র এমনই হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার।

দেশের ভূখণ্ডের কতটা অংশ বনাকীর্ণ রাখা দরকার সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ থাকলেও বেশ খানিকটা যে শুধু অর্থনৈতিক কারণেও দরকার সেটা অনস্বীকার্য— অন্তত ১৫ শতাংশের কম হলে ecological imbalance রোধ করা শক্ত, ২০ শতাংশ বনাকীর্ণ হলে ভাল হয় সেটা হল বিশেষজ্ঞদের ধারণা। দেশবিভাগের

ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে যে বনভূমি পড়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অল্প। বনভূমির অর্থনৈতিক প্রয়োজন প্রধানত চার রকমের। এক, ঊর্ধ্বশীর্ষ এবং ঘন সন্নিহিত বনবৃক্ষের সুবিস্তৃত সমাবেশে শীতাতপের মাত্রা এবং জলবৃষ্টির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত ও আমরা যাকে climate বলি তার প্রকৃতি অনেকাংশে নিরূপিত হয়; দুই, দীর্ঘমূল বনভূমির সাহায্যে ভূগর্ভে প্রবহমাণ ফল্গুধারা সঞ্চিত ও শিথিলবন্ধ ভূমিস্তর সংরক্ষিত হবার ফলে জলের অপচয় ও ভূমির অবক্ষয় (erosion) নিবারিত হয়; তিন, বনচর হিংস্র শ্বাপদ ও অন্যান্য পশুপাখিদের বৈচিত্র্য ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের সুবিধা হয়; এবং চার, বনভূমি থেকে আহরিত নানা রকম বনজসম্পদ— কাঠ, তক্তা, সমিধ, timber, orchid, মধু, মোম. নানা রকম ভেষজদ্রব্যের দ্বারা মানুষের অনেক রকম প্রয়োজন সাধিত হয়। মরিচঝাঁপির তথাকথিত বনভূমি এই প্রয়োজনের মধ্যে কোনটা মেটাতে সক্ষম?

মরিচঝাঁপি সুন্দরবন অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের একটি সাধারণ দ্বীপ, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের যে অংশ পড়েছে— তার প্রকৃতি এবং প্রভাব কী রকম সেটা জানলে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু বসতির ফলাফল নির্ধারণ করা সহজ হবে। ১৯৬৪ সালে বন বিভাগের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে তথ্যপূর্ণ স্মারকগ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল, নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সেখান থেকে সংকলিত হয়েছে। এই তথ্যগুলোর সঙ্গে পরিচয় থাকলে প্রাদেশিক সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ বা প্রশাসন বিভাগ বনসংরক্ষণের দোহাই দিয়ে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে এরকম কঠোর নীতি অবলম্বন করার আগে আর একবার বিবেচনা করে দেখতেন।

দেশবিভাগের ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের বেশির ভাগ এবং সব চেয়ে মূল্যবান বৃক্ষপরিপূর্ণ এলাকা পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জোটে মাত্র ১৮৭৫ বর্গমাইল, যার মধ্যে ২২৯ বর্গমাইল অনেক দিন আগে থেকেই চাষ-আবাদ হয়ে বনভূমির আওতার বাইরে চলে এসেছিল। বাকি ১৬৪৬ বর্গমাইলের মধ্যে অন্তত ৬৮৭ বর্গমাইল নদীনালায় জলে জলময়, সুতরাং ডাঙা জমির পরিমাণ ছিল অল্পাধিক ৯০০ বর্গমাইল। প্রাকৃতিক কারণেই যে জমি যত দক্ষিণে সে জমি তত অর্বাচীন। এইসব সদ্য জেগে ওঠা জমিতে প্রথমে জন্মায় ধান ঘাস, তার পরে বরুণা ঘাস, তার পর ক্রমে ক্রমে বাইন, কেওড়া, খলসি ইত্যাদি খর্বকায় কমজোরি গাছ। বেশ অনেক বৎসর পরে জমিটা যখন দানা বাঁধে ও ঘনসম্বদ্ধ হয়ে ওঠে, তখন আস্তে আস্তে জন্মাতে শুরু করে গরান, গেঙ্গোয়া প্রভৃতি গাছ, এবং তারও বেশি কিছু পরে দেখা দেয় কঙ্কবা, সুন্দরী এবং পাসুর জাতীয় গাছ। নদীর ধারে ধারে জন্মায় আরও দু-তিন ধরনের গাছ যেমন গর্জন, ধুন্ধুল এবং গোলপাতা। বলাবাহুল্য যে জমি যত প্রাচীন, তার গাছগুলোও তত বেশি শেষোক্ত ধরনের।

সুন্দরবনের যা প্রকৃতি তাতে বনভূমির পূর্বোক্ত প্রয়োজনের প্রথম দুটো একেবারেই বাতিল। এখানকার গাছের যা গড়ন তাতে বৃষ্টিপাতের বা শীতগ্রীষ্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এর কোনও ভূমিকা নেই। জমির অবক্ষয় নিরোধ সম্পর্কেও এটা অপ্রয়োজনীয়। কারণ এখানে অবক্ষয়টা সমস্যা নয়, বরং পলি পড়ে পড়ে কোথায় কোন চর মাথা তুলবে সেইটাই জানবার জিনিস।

মরিচঝাঁপিকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সংরক্ষিত ভূমি বলে এটাকে যে তৃতীয় প্রয়োজনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে সে কথাটা একবার তলিয়ে দেখা দরকার। যেখানে দ্বিপদ বা চতুষ্পদ শিকারের চিহ্নমাত্র নেই এবং ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল সমাকীর্ণ বড় বড় গাছের একান্ত অভাব, সেখানে যে ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল দিনের বেলায় আত্মগোপন করে নিদ্রা দেবেন এবং রাত্রিবেলা

রুদ্র মেঘ মন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের পর
বিদ্যুতের বেগে।

এ সম্ভাবনা নেই।

আসলে তথাকথিত রয়াল বেঙ্গল টাইগার সম্বন্ধে আমাদের বহু ভ্রান্তধারণা আছে। এরা সুন্দরবনের আদি অধিবাসী নয়. আগন্তুক এবং নদীনালা পূর্ণ সমতল বনভূমি অপেক্ষা ঝরনাবহুল উচ্চাবচ পার্বত্যভূমি এদের বসবাসের পক্ষে বেশি অনুকূল। এখনও মধ্যভারতের সাতপুরা পাহাড় অঞ্চলে এবং গোয়ালিয়রে স্থান বিশেষে বাঘের সংখ্যা সুন্দরবনের চেয়ে বেশি এবং বিচরণ স্থানও অপর্যাপ্ত। সুন্দরবনের যে অংশে এখন বাঘ আছে সেখানে সে বহাল তবিয়তে থাকুক এবং শিকারির আক্রমণ এড়িয়ে বংশবৃদ্ধি করতে থাকুক তাতে কারও আপত্তি হবার কথা নয়, কিন্তু যেখানে গাছপালা নেই এবং ষাট-সত্তর বৎসরের মধ্যেও এমন গহন বন গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা নেই, যেটা বাঘের ও তার আহার্য শিকারের বিচরণস্থান হতে পারে, সেখানে সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাঘ্র প্রজনন বৃদ্ধির অজুহাতে ছিন্নমূল মানুষের বর্তমান প্রয়োজন অগ্রাহ্য করা যায় কোন যুক্তিতে?

৬

তা হলে বাকি রইল শুধু একটি মাত্র প্রয়োজন, অর্থাৎ বনজসম্পদ ও তার যথাযোগ্য আহরণ ও প্রযুক্তি। মরিচঝাঁপির একমাত্র সম্ভাব্য বনজসম্পদ হল কাঠ এবং কাঠ যা পাওয়া যায় বা অদূর ভবিষ্যতে যাবে তাও অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের। স্মারক গ্রন্থ থেকে যে সব গাছের নাম উল্লেখ করেছি তার মধ্যে একমাত্র 'পাসুর' গাছের

বেড়ই চলনসই, ছ-ফুটের মতো এবং তা দিয়ে ঘরের থাম বা কড়ি বরগা তৈরি হতে পারে। কেওড়া, গেঙ্গোয়া ও সুন্দরীকে করাত দিয়ে চিরে তক্তা (timber) করা যেতে পারে বটে কিন্তু তার বেড় এত কম এবং বাইরের ভঙ্গুর খোলসটা এত পুরু যে সেগুলিকে চিরে তক্তা করলে কোনও কাজে লাগে না।

সুন্দরবনের গাছ যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরনের তার আর একটা প্রমাণ হচ্ছে, এখানকার উৎপাদন ও রাজস্বের পরিমাণের অল্পতা। কিন্তু সে সব কথা বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে, আসল কথা বলবার সময় হবে না; যেটা এখন বলছি।

৭

মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তু বিতাড়নের বিরুদ্ধে মোক্ষম যুক্তি ওই স্মারক গ্রন্থেই সুন্দরবন প্রসঙ্গে বলা আছে; যে-কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত আর একটি পুস্তিকা।

ডেপুটি কনসারভেটর স্মারকগ্রন্থে লিখেছেন: The low figure of revenue is mainly due to the fact the no industry has yet been developed to tap the small-sized wood of the forest. The growth of trees in these zones is quite slow due to the site factor and attack of insects and fungus to aging trees rules out the possibility of quality timber. Consequently the endeavour should be to grow industries which can utilize the smallsized timber for, say, particle board or paper industry in such eventuality, a lot of timber and firewood that are left by the present purchasers in the forest to waste as not worth the cost of carriage, can be exploited in full.

যদি এ কথাটি ঠিক হয় যে সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে একমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থার সাহায্যেই সে সব অঞ্চলের যা কিছু বনজসম্পদ তার যথাযোগ্য ব্যবহার হতে পারে, তবে মরিচঝাঁপির মতো দ্বীপে কেন তা হবে না। কাঁচা মাল যেখানে ওজনে ভারী এবং আয়তনে বৃহৎ সেখানে শিল্পসংস্থাকেই কাঁচা মালের কাছে নিয়ে আসা যুক্তিসিদ্ধ। তাতে পরিবহন ব্যয় হ্রাস পায়, এবং শিল্পসংস্থাগুলিও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে মরিচঝাঁপির মতো জায়গায় যেখানে মাছের চাষের মতো আর একটা ভিন্ন কিন্তু অবহেলিত শিল্প গড়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা আছে। সুতরাং বনভূমি সংরক্ষণের যুক্তি যদি অসার প্রতিপন্ন হয় তবে

মরিচঝাঁপিতে আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের এখানে বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত করলেই সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হবে।

৮

সরকারবিরোধী বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উপর সরকারি ব্যবহারের নিন্দা করেও একথা বলে থাকেন যে, এদের মরিচঝাঁপি ছেড়ে দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতেই হবে, তবে এক ধাক্কায় নয়, তাদেরকে অনাহারে বা অর্ধাহারে শুকিয়ে রেখে নয়— একটু রয়ে সয়ে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে। একজন শ্রদ্ধাভাজন প্রাক্তন বিপ্লবী নেতাও দণ্ডকারণ্যে ঝটিকা সফর করে এসে এই উপদেশই দিয়েছেন। এ-সম্পর্কে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের একজন সুদক্ষ উচ্চস্তরের কর্মচারী ১ মার্চ তারিখে আমাকে যে চিঠি লিখেছেন তার খানিকটা তুলে দিচ্ছি— "The condition of the Project is far from satisfactory. Further influx from Marichjhapi may create such conditions as have not been witnessed in the Project before. West Bengal seems to be keen on sending back the refugees from Marichjhapi but they do not seem to be keen on improving the management of the Project."

এই যদি অবস্থা হয়, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা যদি উত্তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিতে গররাজি হয় তবে তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় কি? তারা তো দেখেছে কেমন করে আশ্বাস দিয়ে যেসব নেতারা তাদের এখানে আসতে প্ররোচিত করেছিলেন এখন তাঁরা উল্টো সুরে গাইছেন। তারা এটাও দেখেছে সম্প্রতি যে মুখ্যপ্রশাসক চেয়ারম্যান (মি. পুরী) তাদের অবস্থার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন, তিনি সেই-কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হয়ে রাতারাতি সরে যেতে বাধ্য হলেন, এবং তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন বা শ্রীজ্যোতি বসুর অনুরোধও অগ্রাহ্য হল। Estimates Committee-র রিপোর্টেও তো এ ঘটনার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রক অনড় অটল।

আমার বক্তব্য এই নয় যে উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে আসুক। যারা আসেনি তারা সেখানে থাকুক, কিন্তু দণ্ডক প্রকল্পের কর্ণধারদের বাধ্য করতে হবে যাতে তারা সেখানে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার না পায়, খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারে, সসম্মানে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু যারা চলে এসেছে, তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ফিরে পাঠানো হবে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা। এ-ক'টি লোকের অন্নসংস্থান

কি পশ্চিমবঙ্গে হয় না, বিশেষ করে যখন তারা আর্থিক সাহায্য চাইছে না সরকারের কাছে, চাইছে শুধু থাকবার জায়গা, যে-জায়গা ছিল এতকাল জনবসতিহীন, যেখানে গাছপালা যা জন্মাচ্ছে বা জন্মাতে পারে তা অতি নিকৃষ্ট ধরনের গাছ— যার আর্থিক বা ভৌগোলিক কোনও মূল্য নেই এবং যেটা ব্যাঘ্রের বংশবৃদ্ধির অপেক্ষা মানুষের জীবনধারণের পক্ষেই বেশি অনুকূল।

লেখাটি ১১ মে ১৯৭৯ তারিখের। প্রকাশিত হয় 'মরিচঝাঁপি বুলেটিন'-এ
১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ [১৯ মে ১৯৭৯]

১৪ মে ১৯৭৯ পুলিশ নামল। ১৭ মে শুনশান। দেশভিখারিদের একজনও নেই, যাঁরা বহু কষ্ট সয়ে দেশের মাটিতে একটু বাসযোগ্য পৃথিবী রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন। বাঙালি সরকার, বাঙালি জনসাধারণের হৃদয়হীনতা ও ক্ষমতাগর্ব সেই দুর্গম দ্বীপভূমি উদ্বাস্তু-শূন্য করতে পারল বটে, একটা অবিস্মরণীয় ক্ষত থেকে গেল।

অপারেশন মরিচঝাঁপি

পান্নালাল দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মরিচঝাঁপি-অপারেশন কমপ্লিট! পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগ নাকি গর্ব করে বলেছেন যে এমন অপারেশন মিলিটারিও করতে পারত না। হাজার হাজার পুলিশ সহসা অবশিষ্ট উদ্বাস্তুদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোন পরিবারের লোক কারা তা দেখার তর সয় না, চোর ডাকাতকে যেমন কোলপাঁজা করে ধরে নিয়ে কালো ব্ল্যাক মারিয়া গাড়িতে ভরে নেয়, তেমনই নদীতে দণ্ডায়মান ৫০-৬০ খানা লঞ্চে তুলে নেয়। ঘরবাড়ি যা করেছিল তাও নাকি সঙ্গে সঙ্গে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। দোকানপাট লুঠ হয়। শ-দেড়েক উদ্বাস্তু নেতা ও কর্মীদের প্রথমে অতর্কিতে ধরে ফেলে। মাস্টারপ্ল্যানই বটে।

এখন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পে তাদের নেওয়া হয়ে গেছে। শীঘ্রই কয়েকখানা ট্রেনে তাদের দণ্ডকারণ্যে পার করে দিয়ে আসা হবে। এখন এদের খাইয়ে পরিয়ে রাখার দায়িত্ব দণ্ডকারণ্য অথরিটির। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কর্তব্য শেষ করলেন, কিন্তু কত মূল্যে, কত রক্তে, কত অর্থে তার প্রকৃত হিসাব পাওয়া যাবে না।

কিন্তু মানুষগুলো তো কয়েদি নয়। যেখানে ছেড়ে আসা হবে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য কী আয়োজন রয়েছে? সেই ডোল, সেই কর্মী শিবির, সেই পুরনো ব্যবস্থাই তো? দণ্ডকারণ্যের অন্যান্য উদ্বাস্তুদের মনের উপরে এর কী প্রতিক্রিয়া পড়বে, এ কথা রাজ্য সরকারের বোধ হয় ভাববার দরকার নেই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২-১ জন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী যাবেন নাকি! তারা যে কী করবেন, কী করতে পারেন, তার খবর জানা আছে। তাদের সঙ্গে ওড়িশা বা মধ্যপ্রদেশ সরকারের যথাযথ র‍্যাপোর্টও হবে না। বাঙালি অফিসার হলেই বাঙালির মঙ্গল হবে বা মুক্তি হবে, এ-জাতীয় বিশ্বাস আজ আর নির্বোধ বাঙালি উদ্বাস্তুরও নেই। বাঙালি সরকার, বাঙালি জনসাধারণ কত হৃদয়হীন হতে পারে, কত দাম্ভিক হতে পারে, কত ক্ষমতাগর্বী হতে পারে, কত স্বার্থপর হতে পারে— তার অবিস্মরণীয় পরিচয় এবারে পেয়ে গেলেন দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুরা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবহার ও দায়িত্বহীন কথাবার্তা মানুষের মনে একটা গভীর ক্ষত করে রাখবে বহু কাল পর্যন্ত। লক্ষ লক্ষ বাঙালি পরিবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে এসেছে— আজও সে আসার স্রোত বন্ধ হয়নি। গত এক মাসেও প্রায় ২ হাজারের মতো বাঙালি শরণার্থী বর্ডার অতিক্রম করে এসেছে, বলছেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। মরিচঝাঁপিতে মাত্র হাজার ৪-৫ লোক, বা হাজার খানেক পরিবার শেষ পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছিল। দেশবিভাগের ফলে যত শরণার্থী এদেশে এসেছে, তার এক শতাংশও তারা নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের ভাবখানা এই যেন ৯৯ শতাংশ শরণার্থীকেই তারা সুস্থ পুনর্বাসন দিয়ে দিয়েছেন, কেবল বাকি ছিল এই এক শতাংশ বেয়াড়া মরিচঝাঁপিরা। কতটুকু জমি তারা দখল করে বসেছিল এটা তাদের কাছে বড় কথা নয়, বড় কথা হল এমন বিশাল স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের মহান আইনকানুনকে তারা অমান্য করবার সাহস রাখে! আশ্চর্য এই স্পর্ধা? কাজেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনপ্রথায় রপ্ত তাদের রক্তে 'আইন ও শৃঙ্খলার অহঙ্কার' হুংকার দিয়ে উঠল। আমাদের সব সমস্যারই সমাধান করে ফেলেছি, বাকি ছিল এই মরিচঝাঁপিটা।

এই ফেরত পাঠানো লোকগুলিকে কীভাবে আবার পুনর্বাসন দেওয়া যাবে? এদের মনের ক্ষতটা কীভাবে শুকাবে? এ-কাজটা দুর্বল DDA সংস্থা পারবে তো? এর চেয়ে তাদের কোনও আইনভঙ্গের অপরাধী হিসেবে জেলে পুরে দিলে ভাল হত না? জ্যোতি ভাই ও মোরারজি ভাই মিলে এদের জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন তো। এই উদ্বাস্তুরা জঙ্গল আইন ভঙ্গ করেছে, পশ্চিমবাংলার সুখ নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে, সরকারি অর্থের অপচয় করেছে!

এই উপলক্ষে একটা কথাই মনে পড়ে, একদা স্বয়ং মাও সে তুং বলেছিলেন, "Chinese Communist Party could, in certain circumstances, develop into a 'fascist Party'— quoted by Charles Bettelheim". আশা করি ভারতীয় মার্ক্সিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সহচরেরা একথা জানেন বা পড়েছেন।

আজকের এই নিবন্ধ লিখতে বসে অনেক ভেবেছি। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলির সঙ্গে গলা মেলাতে নয়। এই বিরোধীরাও সরকারে থাকাকালীন এ জাতীয় ব্যবহার করেছেন, আবার আজ যারা গদিতে আছেন তাঁরা যদি কোনও দিন আবার গদিচ্যুত হন, তখন তাঁরাও এ-জাতীয় উদ্বাস্তু-বন্ধু হবেন। এটা তাঁদের রাজনৈতিক ব্যবসাদারি। যদিও আমাদের ক্ষোভটা সম্পূর্ণরূপে মানবিকতাবোধ থেকে— কোনও রাজনৈতিক মুনাফা লুটবার লোভ থেকে নয়। আমরা দেখছি আর ভাবছি যে আজ বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত চরিত্রের অধঃপতন কী হারে ঘটে যাচ্ছে। এতটুকু লজ্জাবোধও আজ অবশিষ্ট নেই।

এই উদ্বাস্তুদের আবার নাকি স্ক্রিনিং করা হবে? কী কারণে তাদের আবার স্ক্রিনিং করা হবে তার কারণ কিছু জানা যায়নি। আবার তারা আসলে দণ্ডকত্যাগী উদ্বাস্তু কি না তারই পরীক্ষাপর্ব এখন চলবে বোধহয়। যদি তাদের মধ্যে কিছু নতুন আগন্তুক ঢুকে থাকে, তাদের কী করা হবে? তাদের কি ট্রানজিট ক্যাম্পে পাঠানো হবে! এখনও ট্রানজিট ক্যাম্পে বেশ কিছু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁদের ভাগ্যে এখনও কোনও ভিলেজ এলটমেন্ট হয়নি। তার ওপর শোনা যাচ্ছে দণ্ডকারণ্যে আর নতুন করে কোনও বাঙালি উদ্বাস্তুর জায়গা দেওয়া হবে না। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও বাঙালি উদ্বাস্তু নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ উদ্বাস্তু আগমনের স্রোতে মোটেই ভাঁটা পড়েনি। এদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার কী চিন্তা করছেন! এখনও তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরটি লোপ পায়নি।

'কম্পাস' সাপ্তাহিকের ২৬ মে ১৯৭৯ সংখ্যায়, সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত

মরিচঝাঁপিতে পা রাখা প্রথম সাংবাদিক। পেশাদারি তীক্ষ্ণ সন্ধানে ও মানবিক অনুভবে তিনি দেখেছেন মরিচঝাঁপির জন্ম ও মৃত্যু, লিখলেন সেই বৃত্তান্ত। দ্বীপ থেকে 'স্বেচ্ছায় শান্তিতে চলে যাওয়া' ফণীবালাকে খুঁজে বের করেছেন দুধকুণ্ডিতে বুক-পোড়া অবস্থায়। দেখিয়েছেন মানুষকে মুছে ফেলার কত আয়োজন প্রশাসনের প্রতি স্তরে।

একালের কারবালা

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

পিছনে ফিরে তাকাই

১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাসের একটি দিন। বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের অবিশ্রান্ত স্রোত। কয়েক লাখ উদ্বাস্তুর মাঝখানে যশোর রোডের ওপর দাঁড়িয়ে জওহরলাল নেহরু। তাঁর একপাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কিন্তু অনেকটাই ক্রুদ্ধ মুখে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি; অন্যপাশে দাঁড়িয়ে সমান গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট ডা. বিধানচন্দ্র রায়। নেহরু এই আর্ত অত্যাচারিত মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে অতি বিষণ্ণ সুরে বলেছিলেন: ...the partition of the country brought many evils at its train...। কিন্তু দেশবিভাগের 'দুষ্টক্ষত' গত অর্ধশতাব্দী ধরে বাঙালির সমাজজীবনকে, তার মূল্যবোধ ও অনুভূতিকে কত ভাবে বিপর্যস্ত করেছে তা কিন্তু সেদিন নেহরু তাঁর অনুভূতি ও কল্পনায় ধরতে পারেননি। কিন্তু কেবল নেহরু কেন? আমরা নিজেরাই বা তার কতটুকু ধরতে পেরেছি? সেই বছরটাতেই উদ্বাস্তু স্রোতে বিপর্যস্ত ডা. বিধানচন্দ্র রায় আর একটা 'বাংলার' জন্য আন্দামানের কথা ভেবেছিলেন। কেবল তাই নয়, একটা বড় আশা নিয়ে পূর্ববাংলার মাটিতে জন্ম নেওয়া একজন বিখ্যাত আইসিএস অজয়কুমার ঘোষকে আন্দামানে পাঠালেন

চিফ কমিশনার করে। কিন্তু আন্দামানগামী জাহাজে 'বিদ্রোহ' ও 'কালাপানির দেশে' নামতে উদ্বাস্তুদের প্রবল আপত্তি ও বাধার ফলে বিধান রায়ের আর এক 'বাংলার' স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল। এর সাত বছর পর বিধান রায় একজন দক্ষিণ ভারতীয় আইসিএসের পরামর্শে দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল ঘুরে দেখলেন। দেশবিভাগ এবং বিশেষ করে ১৯৫০-এর হিন্দুবিরোধী দাঙ্গার পরিণতিতে বিধানবাবু এই বাস্তব সত্যটা বুঝে নিয়েছিলেন যে, পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুরা ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার দিকে আসবেই নিজেদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা ভেবে। কোনও অবস্থাতেই তা রোধ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং বাঙালির আর একটা 'বাংলা' অনিবার্যভাবেই দরকার। ১৯৫৮ সালে বিধানবাবুর তৎপরতায় কেন্দ্রীয় সরকার দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Dandakaranya Development Authority) গঠন করলেন এবং পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনকে (আইসিএস) এই কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হল। সুকুমারবাবু ভারতের অত্যন্ত নামকরা একজন সিভিল সার্ভেন্ট। ঢাকা শহরে তাঁদের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে আসতে হয়েছে। উদ্বাস্তুদের জন্য তাঁর ছিল অপরিসীম মমত্ববোধ। তিনি তাঁর সহযোগী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন পাঞ্জাবেব বিখ্যাত আইসিএস ফ্লেচার (Mr. Fletcher) সাহেবকে। এই ফ্লেচার ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় গড়ে ওঠা এশিয়ার বৃহত্তম উদ্বাস্তু শিবির 'কুরুক্ষেত্র' শিবিরের প্রশাসক ছিলেন। 'কুরুক্ষেত্র' শিবিরে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের হিন্দু ও শিখ মিলে প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুর আশ্রয়স্থল ছিল অন্তত পাঁচ বছর। ১৯৫৮ সালের শেষ দিক থেকে সুকুমার সেন, ফ্লেচার ও বিখ্যাত বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার 'ব্যান্ডো' অর্থাৎ 'বন্দ্যোপাধ্যায়'— শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি পশ্চিমবাংলা সরকারের কনস্ট্রাকশন বোর্ডের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন— এঁরা তিনজন রাতের পর রাত ক্যারাভানে (Caravan) কাটিয়ে মধ্যপ্রদেশের অরণ্য এলাকা ফরাসগাঁও, কোন্ডাগাঁও এবং ওড়িশার উমরকোটে বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রথম উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবাংলার বিসিএস অফিসার যশোদাকান্ত রায় ও ওড়িশার ডিরেক্টর অফ হেল্‌থ সার্ভিসেস কর্নেল ডা. বসু। তিনি ওড়িশা থেকে বেশ কয়েকশো ওড়িশি ও বাঙালি ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। এঁরাই কোন্ডাগাঁওতে উদ্বাস্তুদের জন্য গড়ে তুলেছিলেন সবচেয়ে বড়ো হাসপাতাল ও একটি প্রাইমারি স্কুল। ১৯৫৮ সালের শেষ দিক থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বলতে গেলে বিধানচন্দ্র রায়ের জীবদ্দশা পর্যন্ত দণ্ডকারণ্যে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ অনেকটাই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে সুকুমার সেন হঠাৎই মারা গেলেন এবং তাঁর আগে ফ্লেচার

সাহেব পাঞ্জাব সরকারের Financial Commissioner হয়ে চলে গেলেন। ফ্লেচার সাহেবকে আমি দেখিনি। কিন্তু পরবর্তী কালে ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি দণ্ডকারণ্যে গিয়ে উদ্বাস্তুদের বলতে শুনেছি আবেগের সঙ্গে 'আমাগো ভালোবাইস্যা গ্যাছে সুকুমার স্যান সাহেব, ফ্যালাচার সাহেব আর যশোদা রায় সাহেব...।' প্রকৃতই সুকুমার সেনের আকস্মিক মৃত্যু, ফ্লেচার ও যশোদাকান্ত রায়ের প্রমোশন পেয়ে নিজ নিজ রাজ্য সরকারে ফিরে যাওয়ায় দণ্ডকারণ্যের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের গতি একটা বড় ধাক্কা খেয়েছিল। এখানে যশোদাকান্ত রায় সম্পর্কে একটু অন্য কথা বলি। যশোদাবাবু ঢাকার লোক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। যুদ্ধের শুরুতেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। তিনি যখন চট্টগ্রামে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তখন পঞ্চাশের (ইংরেজি ১৯৪৩) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই সময়কার বাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনে এই যশোদাকান্ত রায়ই চট্টগ্রামের কক্সবাজারে প্রথম 'লঙ্গরখানা' চালু করেছিলেন। আর্ত ও দুঃস্থ মানুষদের জন্য যশোদাবাবুর এক অসাধারণ মমত্ববোধ ছিল। যাকে ইংরেজিতে Passion বলা যায়। যশোদাবাবুর কাছে পরে শুনেছি ওই Passion ফ্লেচার সাহেবের মধ্যেও ছিল। এর জন্য ফ্লেচার সাহেব যখন দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে যান, তখন উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তিনিও অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন। সুকুমার সেনের মৃত্যুর আগেই ফ্লেচার চলে যাওয়ার পর জনসন (Johnson) নামে আর একজন আইপিএস অফিসার দণ্ডকারণ্যের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হলেন। এই জনসন সাহেবও পাঞ্জাবের অফিসার এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে কুরুক্ষেত্র শিবিরে কাজ করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সুকুমার সেনের মৃত্যুর পর কয়েক মাস দণ্ডকারণ্য উন্নয়নের চেয়ারম্যানের পদটি খালি পড়েছিল। ফলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ বেশ কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে বিখ্যাত আইপিএস, বলতে গেলে একজন কিংবদন্তি বাঙালি অফিসার, শৈবালকুমার গুপ্তকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান করতে চেয়ে ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব দিলে ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে তা অনুমোদন করেন। শৈবালবাবুর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর প্রশাসনিক নির্ভীকতা তাঁকে এক ব্যতিক্রমী অফিসার হিসাবে চিহ্নিত করেছিল ইংরেজ আমল থেকেই। সমাজসেবামূলক কাজে বিশেষ করে মেয়েদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে তিনি এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন তীব্র আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন একজন আপসহীন অফিসার। তিনি দণ্ডকারণ্যের চেয়ারম্যান হওয়ায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের মন আরও শক্তিশালী হল, যা দুর্বল হয়ে পড়েছিল সুকুমার সেনের

মৃত্যুতে। তিনি যখন দণ্ডকারণ্যের দায়িত্বভার নিলেন তখন দু' আড়াই হাজার উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষা করছিল মানা ট্রানজিট শিবিরে। এ ছাড়া আরও কিছু পরিবার ফরাসগাঁও ও উমরকোটে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু অভাবিতভাবেই এক ভয়ানক বিপর্যয় নেমে এল ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে। পূর্ববাংলায় বা পূর্ব পাকিস্তানে আরম্ভ হল আবার হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা। ১৯৬৪-র জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পশ্চিমবাংলার ১৪শ' মাইল সীমান্ত দিয়ে আবার লক্ষ লক্ষ হিন্দু আশ্রয়ের জন্য আসতে লাগল। কিন্তু ১৯৫৮ সালের বিখ্যাত 'দার্জিলিং চুক্তি' অনুযায়ী পূর্ববাংলা থেকে আগত কোনও পরিবার ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরের পর ভারতে প্রবেশ করলে সাবেক ব্যবস্থার কোনও সুযোগসুবিধা পাবে না। অর্থাৎ এদের জন্য কোনও প্রকার সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন আর্তনাদ করে উঠলেন— কারণ ততক্ষণে বনগাঁ ও নদিয়া জেলায় দশ-বারো লক্ষ পূর্ববাংলার হিন্দু ঢুকে পড়েছে। হাজার দশ-বারো উদ্বাস্তু শিয়ালদা স্টেশন চত্বর দখল করে ফেলেছে। এই উদ্বাস্তুরা সকলেই 'পাকিস্তানের নাগরিক'— এরা ১৯৫০ সালের দাঙ্গার 'উদ্বাস্তু' নয়— কারণ পঞ্চাশের 'উদ্বাস্তুরা' আইনগত ভাবে ছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষের অর্থাৎ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার নাগরিক; কারণ তখন পর্যন্ত পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করে 'ভারতীয়' ও 'পাকিস্তানি' নাগরিক বলে এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানেরা চিহ্নিত ছিল না। কিন্তু ১৯৫২ সালের অক্টোবরে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও আইনগত পরিবর্তন হয়েছে! এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, মোরারজি দেশাই, টি টি কৃষ্ণমাচারিদের কলকাতা পাঠালেন অবস্থা দেখতে। এই প্রতিনিধি দলের পরামর্শ মতো কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণ ব্যবস্থার জন্য টাকা মঞ্জুর করল। কিন্তু পুনর্বাসন আদৌ পশ্চিমবাংলার মাটিতে নয়— পুনর্বাসন চাইলে দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে। বিভিন্ন রেল স্টেশনে, সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় খোলা আকাশের নীচে থাকা উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে যেতে রাজি হল। কিন্তু তখন দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান শৈবাল গুপ্তের মাথায় হাত। ঠিক হয়েছিল দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের গতিকে ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ককে নিয়ে ১৯৬৪-র জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে দণ্ডকারণ্যে হাজির হবেন। আমি সে সময় 'যুগান্তর' পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে উদ্বাস্তুদের অবস্থা রিপোর্ট করার জন্য দিনের পর দিন গেদে (নদিয়া) ও বনগাঁ (উত্তর চব্বিশ পরগনা) সীমান্তে রাত কাটিয়েছি জিপ গাড়িতে বসে। আমাকে চিফ রিপোর্টার অনিল ভট্টাচার্য দ্রুত কলকাতায় ফিরতে তলব করলেন নেহরুর সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে বলে। কিন্তু ভুবনেশ্বরে কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা করতে করতে

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন— বিজু পট্টনায়েক কোনও ক্রমে তাঁকে ধরে ফেলে মঞ্চে শুইয়ে দিলেন। নেহরুর দণ্ডকারণ্য সফর বাতিল হল। কিন্তু আমি এর এক বছর পরে ১৯৬৪-র ফেব্রুয়ারির শেষে দণ্ডকারণ্যে গেলাম আমার অন্তরঙ্গ আলোকচিত্রী বন্ধু গণেশ সিংহকে সঙ্গে নিয়ে।

দণ্ডকারণ্য: শৈবাল গুপ্ত ও কেন্দ্রীয় সরকার

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে নয়া উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে আরম্ভ করল পশ্চিমবাংলা ও কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু উদ্বাস্তুরা যাতে ট্রেন থেকে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য তাদের মালগাড়ির ওয়াগনে করে রায়পুরে পাঠানো চলতে থাকল। প্রথম যে ওয়াগনগুলিতে করে উদ্বাস্তুরা আসতে লাগল তাদের হাজার/বারোশো জনের মধ্যে ৭ থেকে ১০ জন করে মৃত উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের হাতে জমা পড়ত। এই মৃতদের তালিকায় বৃদ্ধ ও শিশুরাই বেশি ছিল। একদিন উদ্বাস্তুদের নিয়ে ওয়াগন রায়পুরে পৌঁছলে ৪৫/৫০টি মৃতদেহ পাওয়া গেল। এবার শৈবালবাবু প্রমাদ গনলেন। তিনি রেডিয়োগ্রামে পশ্চিমবাংলা ও কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছুদিনের জন্য উদ্বাস্তু পাঠানো বন্ধ রাখতে বললেন। তিনি স্ট্র্যাটেজি গোপন রেখে কলকাতা ছুটে এলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ঘটনাগুলো জানিয়ে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ট্রেনে চিকিৎসক দল এবং রেডক্রশের স্বেচ্ছাসেবক দল রাখতে বললেন রাজ্য ও কেন্দ্রকে। অনেক পরে শৈবাল গুপ্ত মহাশয় আমাকে বলেছিলেন 'তোমাদের ওই সব তখন বলিনি কারণ, তাহলে পশ্চিমবাংলায় এমন কাণ্ড ঘটত যার ফলে সামগ্রিক ভাবে দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন প্রকল্পের ক্ষতি হয়ে যেত।' কথাটা ঠিক। শৈবালবাবুর সতর্কতার ফলে অনেক বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছিল সেই সময়। যে সব উদ্বাস্তু ফরাসগাঁও, উমরকোট, আম্বাগুড়া ও জগদলপুর শহরের কাছাকাছি পুনর্বাসনেব জায়গা পেয়েছে তাদের আমি তখন বেশ ভালো থাকতে দেখেছি। আমার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল উমরকোট। এখানকার স্থানীয় লোকেরা ওড়িয়াভাষী ও অনেকে বাংলা বলতে পারার জন্য উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তাদের ভাবের আদানপ্রদান খুব সহজ ছিল। এই এলাকায় ভালো বর্ষার ফলে জমির উর্বরতাও উদ্বাস্তুদের পছন্দ ছিল। ঠিক ওই সময়টাতেই বয়লাডিলা-কিরিবুরুতে (Boiladila-Kiriburu) আকরিক লৌহখনির সন্ধান পাওয়ায় জেলায় নয়া রেল লাইনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ফলে এক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ উদ্বাস্তুদের সামনে এসে গিয়েছিল। সুতরাং উমরকোট থেকে আম্বাগুড়া পর্যন্ত ৫০/৬০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ভালো জায়গা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে তিনটি

রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে, ফলে ওই তিন রাজ্যের চিফ সেক্রেটারিরা এবং প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারি ওই কর্তৃপক্ষের বা অথরিটির পরিচালক। ফলে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিস্তৃত পরিকল্পনা ওই কর্তৃপক্ষের বৈঠকে অনুমোদন করতে হত। সেই সময় মধ্যপ্রদেশের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন আর পি নরোনহা (R P Noronha), ওড়িশার বি শিবরামণ (B Sivaraman). পশ্চিমবাংলার রণজিৎ গুপ্ত (R Gupta); তখন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারি ছিলেন বিখ্যাত আইপিএস ধর্ম বীর (Dharam Vira), যিনি এক সময় পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল হয়েছিলেন। এদিকে ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে নয়া উদ্বাস্তুদের উপস্থিতি এবং পঞ্চাশের যুগে এসেও পুনর্বাসন না-পাওয়া উদ্বাস্তুদের ভিড়ে মানা ট্রানজিট শিবিরে (Mana Transit Camp) এক ধরনের সামাজিক উত্তেজনা দেখা দিল। কেবলমাত্র দ্রুত পুনর্বাসনের জমি চিহ্নিত করা, পরিবার পিছু তা বণ্টন ও সেখানে ঘর-বাড়ি তোলার কাজ আরম্ভ করতে পারলেই ওই উত্তেজনার প্রশমন স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে শৈবাল গুপ্ত নিজেকে খুব অসহায় মনে করছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে সমাজকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্য চাইলেন। প্রবীণ বিপ্লবী ও আত্মত্যাগী সমাজকর্মী পান্নালাল দাশগুপ্ত দণ্ডকারণ্যে গেলেন এবং সেখানে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করলেন। শৈবাল গুপ্ত বুঝেছিলেন বর্ষা নামার আগেই পঞ্চাশের দাঙ্গায় আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদের মাটির ঘর বেঁধে দেওয়া দরকার। এতেই সামাজিক উত্তেজনা বহুলাংশে প্রশমিত হবে। কিন্তু তা হতে পারছিল না। তিনি দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এক বৈঠকে সরাসরি বলেছিলেন যে, তিনি এভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত নন। এটা এমনই একটি মানবিক সমস্যা যার দ্রুত মীমাংসা দরকার। কিন্তু চেয়ারম্যান শৈবালবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে, যে-রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা সরকার তাঁকে দণ্ডকারণ্যের দায়িত্ব দিয়েছিল সেই রাজ্যেরই চিফ সেক্রেটারি তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করছেন না। এর জন্য শৈবালবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পড়লেন। ১৯৬৪ সালের মার্চের গোড়ায় আমি দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে 'যুগান্তর' পত্রিকায় দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ কথা বলেছিলাম, 'দণ্ডকারণ্য থেকে যদি শৈবাল গুপ্ত বিদায় নেন, তাহলে সেখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সকল ব্যবস্থাই এক অচলাবস্থার মুখে দাঁড়াবে। দণ্ডকারণ্যের সাফল্যই যদি অগ্রাধিকার পায় তাহলে শৈবালবাবু আত্মমর্যাদাকে সবচেয়ে বড় মনে না করে উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎটাকেই যেন বেশি বড় করে দেখেন...।' শৈবালবাবু আমার লেখার এই অংশে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি আমাকে ফোন করে বলেছিলেন,

'...তুমি আমাকে আত্মমর্যাদার সঙ্গে আপস করতে কেন বললে? এ-কাজ আমি জীবনে কখনই করিনি...।' আমার আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শৈবাল গুপ্ত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দিলেন। সেদিনই আমার মতে দণ্ডকারণ্যের ভবিষ্যৎ কফিনবন্দি হয়েছিল। এই সময় পশ্চিমবাংলা সরকারের আচরণ ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন একবারও শৈবালবাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করেননি যে তিনি কেন পদত্যাগ করলেন, তাঁর কী কী অসুবিধা হচ্ছিল? তখন লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গে প্রফুল্লবাবুর সম্পর্ক খুব অন্তরঙ্গ ছিল। সুতরাং ইচ্ছা করলেই প্রফুল্লবাবু প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে দণ্ডকারণ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। কিন্তু তিনিও বললেন না। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকার যখন কেন্দ্রের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. মনমোহন দাশকে দণ্ডকারণ্যের 'পার্ট টাইম' চেয়ারম্যান করল, তখন প্রফুল্লবাবু বাধা দিতে পারতেন এই যুক্তিতে যে গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ডকারণ্যে পূর্ণ সময়ের চেয়ারম্যান দরকার এবং তিনি অনায়াসে আইপিএস হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ওই পদের জন্য প্রস্তাব করতে পারতেন। হিরণ্ময়বাবুও সুকুমার সেন ও শৈবাল গুপ্তের মতোই উদ্বাস্তুদের ভালোবেসেছেন। এ ছাড়া তিনি দীর্ঘ সময় পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশনার ছিলেন। পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু মানুষদের সম্পর্কে এমন দরদি ও ওয়াকিবহাল মানুষ পশ্চিমবাংলা সরকারের প্রশাসনে দুর্লভ (পরবর্তীকালে তিনি 'উদ্বাস্তু' নামে এক মূল্যবান গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন)। এখানেই ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীদের তফাত।

শৈবালকুমার গুপ্ত ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন। এর প্রায় দু' মাস পরে নভেম্বরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি তাঁর গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে। যদিও তিনি আমার দণ্ডকারণ্য সংক্রান্ত লেখায় আমার একটি অভিমতের জন্য আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসার ফলে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কফিনবন্দি হয়ে পড়বে। আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আমাকে প্রশ্ন করলেন 'তুমি কী করে বুঝলে যে আমি শেষ পর্যন্ত দণ্ডকারণ্য ছেড়ে দিতে পারি?' আমি জবাব দিয়েছিলাম 'বিধানবাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকলে আমি বোধহয় ও-কথা বলতাম না!' শৈবালবাবু এর কোনও জবাব দেননি। এর সম্ভবত বছরখানেক পরে মধ্যপ্রদেশের চিফ সেক্রেটারি আর পি নরোনহা কোনও এক সরকারি কাজে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তখনও দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি দণ্ডকারণ্যের ভবিষ্যতের কথা মাথায় নিয়েই। নরোনহা শৈবাল

গুপ্ত মহাশয়ের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্ষদের যে বৈঠকে শৈবাল গুপ্তের স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, সেখানে ওই পর্ষদের সদস্য হিসাবে পশ্চিমবাংলার চিফ সেক্রেটারি আর গুপ্ত তাঁর সরকারের মনোনীত চেয়ারম্যান শৈবাল গুপ্তের পক্ষে দাঁড়ালেন না! পশ্চিমবাংলার চিফ সেক্রেটারির এই মনোভাবে নরোনহা সাহেব খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে কতগুলি মৌলিক প্রশ্নে, বিশেষ করে জমি বাস উপযোগী ও বণ্টনের প্রশ্নে শৈবালবাবুর বক্তব্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু মধ্যপ্রদেশ সরকার শৈবাল গুপ্তের sponsor state নয়, সেক্ষেত্রে ওই রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি হিসাবে নরোনহা সাহেবের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা ছিল। ফলে তিনি শৈবাল গুপ্তের পক্ষে বেশি দূর সওয়াল করতে পারেননি। নরোনহা সাহেবের মনে হয়েছিল, যেহেতু কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের তখনকার সেক্রেটারি ধর্ম বীর পশ্চিমবাংলার চিফ সেক্রেটারি আর গুপ্তের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন, সেহেতু এই সম্পর্কটা শৈবাল গুপ্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। পরবর্তী ঘটনাবলিতে আমারও সেই ধারণা হয়েছে।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারির দশ-বারো দিন আগে মানা শিবিরে পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষমাণ উদ্বাস্তুরা রেশন ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য ঠিকমতো না পাওয়ার বিরুদ্ধে রায়পুরে এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে যান। (মানা শিবিরের উদ্বাস্তুদের রেশন ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ হলেও তা বণ্টিত হত রাজ্য সরকারের মাধ্যমে)। রায়পুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন একজন বাঙালি আইএএস অফিসার। কিন্তু যে কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে ৩/৪ জন উদ্বাস্তুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটি নিয়ে আমি শৈবাল গুপ্তের সঙ্গে দেখা করি। কারণ, আমি জানি, দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের কেউ কেউ তাঁদের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। শৈবাল গুপ্ত মহাশয় আমাকে তখন কয়েকটি কথা বলেছিলেন। সেগুলি ছিল: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের আগে সাবেক পূর্ববঙ্গ থেকে আসা আর এক দফা লোকদের কিছু সংখ্যক, পঁচিশ-ত্রিশ হাজার লোক সোভিয়েত বিমানে করে মানা শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই লোকদের 'উদ্বাস্তু' না বলে 'শরণার্থী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু এই শরণার্থীরা যেহেতু আন্তর্জাতিক সাহায্য পেত, সেহেতু তাঁদের সেভাবে রাখা হয়েছিল এবং ১৯৬৪ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতি আচরণের সাংঘাতিক বৈষম্য ছিল। অথচ ১৯৭১ সালে ওই সময় একটা সুযোগ ছিল যে, মানা শিবিরে অপেক্ষমাণ সাবেক উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। কিন্তু তা হল না। ফলে মানার উদ্বাস্তুরা সাংঘাতিকভাবে বিচলিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন।

কেবল তাই নয়— ওই সময়েই জানা গিয়েছিল রায়পুরে ও ভিলাইয়ে পতিতালয়-গুলিতে বাঙালি মেয়েদের উপস্থিতি!

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় অবিভক্ত বাংলার জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি পাঁচ কোটি। পূর্ববাংলা ওরফে পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পড়েছিল তিন কোটির কিছু বেশি লোক। বাকিটা অর্থাৎ প্রায় দু'কোটি ছিল পশ্চিমবাংলার ভূখণ্ডে। ওই জনসংখ্যার মধ্যে পূর্ববাংলার হিন্দুরা ছিল এক কোটির সামান্য বেশি। কিন্তু ১৯৫০-এর পূর্ববাংলায় হিন্দু বিরোধী দাঙ্গায় এক ধাক্কায় ২৮ থেকে ৩০ লাখ হিন্দু এদেশে এসে পড়ল উদ্বাস্তু হয়ে। তার ২৫ লাখের কাছাকাছি জনসংখ্যা বলতে গেলে দুটি প্রজন্ম কলোনির জীবনযাপন করেছে। এ ছাড়া ১৯৬১ সালে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার জলিরপাড়, বউলতলি, টুঙ্গি গ্রামগুলিতে দাঙ্গার ফলে প্রায় লাখ দেড়েক তপশিলি সম্প্রদায়ের হিন্দু এদেশে চলে আসে। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরবাংলার কয়েকটি জেলায় বিশেষ করে রাজশাহি ও রংপুরে সাঁওতাল ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলে প্রায় লাখখানেক লোক উদ্বাস্তু হয়ে মালদা জেলায় চলে আসে। ডা. বিধানচন্দ্র রায় এই উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এই ব্যাপারে বিধানবাবু প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে একটি চিঠি লেখেন। নেহরু ডা. রায়ের এই প্রস্তাবে তেমন সাড়া না দিয়ে লিখলেন যে, দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের দরজা এতটাই খুলে দিলে 'পূর্ববাংলার হিন্দুদের মধ্যে দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে যাবে এবং তারা দলে দলে এ দেশের দিকে পা বাড়াবে।' প্রধানমন্ত্রী নেহরুর এই মনোভাবের কারণে বিধানবাবু ১৯৬২ সালের ২১ জুন নেহরুকে একটি অসাধারণ চিঠি লেখেন। তিনি লিখলেন: 'I do not think that by giving place in Dandakaranya, we will call in or invite lakhs of people from East Pakistan, but in any case something must be done. On the otherhand, as you say, if they go to Dandakaranya and if the message goes to East Pakistan, the lakhs of people might be coming over home. I do not think one need by very particular about this matter. About seven to eight million (7 to 8 million) Hindus are still remaining in East Pakistan because they can not leave their hearth and home...'। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনের শেষ চিঠি (Dr. Bidhan Chandra Ray— his life and time by Dr. Nitish Sengupta)। নেহরুর মনোভাবের জবাবে বিধানবাবুর এই চিঠি প্রমাণ করে যে, বিধানচন্দ্র রায় যেভাবে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন চেয়েছিলেন, নেহরুর তথা ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ততখানি দরাজ ছিল না। বিধানবাবুর মৃত্যুর পর সেটা ধরা পড়েছিল,

সেটা শৈবালকুমার গুপ্ত দণ্ডকারণ্যের চেয়ারম্যান হিসাবে প্রথম বুঝতে পারেন। এটার আরও একটা প্রমাণ ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে অজয় মুখার্জি ও জ্যোতি বসু দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করেননি। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও দণ্ডকারণ্য নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। সুতরাং পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষমাণ ২৫ থেকে ৩০ হাজার মানা ট্রানজিট শিবিরের উদ্বাস্তু এবং দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের জায়গা পাওয়া প্রায় আড়াই লাখের মতো উদ্বাস্তুকে মূল ভূখণ্ডের সাত কোটি বাঙালিরা দেশবিভাগের বিস্মরণীর দরিয়ায় নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত ছিল। ব্যতিক্রম ছিলেন গুটিকতক রিপোর্টার এবং পান্নালাল দাশগুপ্ত ও শৈবালকুমার গুপ্ত।

এই বিস্মরণীর দরিয়ায় একেবারে অভাবিত ভাবেই ঢিল ছুড়ে দিলেন বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার এক ভয়ঙ্কর বিতর্কিত মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি। রাম চ্যাটার্জির পার্টি মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক হলেও তিনি আপাদমস্তক ছিলেন জ্যোতি বসুর অনুগত। আমি যে সময়টার কথা বলছি সে সময়ে রামবাবু সুভাষ চক্রবর্তীর চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি জ্যোতি বসুর অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। এই রাম চ্যাটার্জি ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় একদিন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী, বিখ্যাত রিপোর্টার 'হলধর পটল' (আসল নাম উমাশঙ্কর হালদার)। হলধর পটল রাম চ্যাটার্জির ব্যক্তিগত বন্ধুও বটে। হলধর তখন 'সত্যযুগ' পত্রিকার রিপোর্টার। সেই সময়ই হলধরের কাছে শুনেছি, রামবাবু কখনওই হলধরকে বলেননি যে, তিনি রায়পুরে যাচ্ছেন দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের সঙ্গে দেখা করতে। বোম্বাই মেল ট্রেনের একটি ফার্স্ট ক্লাস 'কুপে' পাঁচজন যাত্রী— রামবাবু, তাঁর সিকিউরিটি গার্ড, তার পি-এ, হলধর এবং একজন মহিলা সাংবাদিক। এই মহিলা তখন 'ফ্রিলান্স' সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি একটি পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে সিপিআইএমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এই লেখা লেখার সময়, যখন আজ আর হলধর বেঁচে নেই, তাঁকে দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করার জন্য ফোন করেছিলাম। ট্রেনে রামবাবুর সঙ্গী হিসাবে তাঁর কিছু মনে আছে কি না জানতে চাই। তিনি প্রথমে স্বীকার করেছিলেন, তিনি রামবাবুর সঙ্গে রায়পুর গিয়েছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি তা অস্বীকার করায় আমি মেয়েটির নাম উল্লেখ করছি না। যা হোক, রামবাবুর রায়পুরে পৌঁছনোর খবর মধ্যপ্রদেশ সরকারের পুলিশ পেয়েছিল। রায়পুর স্টেশনে মানা উদ্বাস্তু শিবিরের কয়েকজন নেতার সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ অফিসাররাও ছিলেন। রামবাবু পুলিশের গাড়িতে করেই মানা উদ্বাস্তু শিবিরে পৌঁছে তাঁদের এ ধরনের কথা বলেছিলেন— 'আমরা বামপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছি। আমরা তখনও বলেছি এখনও

বলছি পশ্চিমবাংলার মাটিতেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন চাই।' রামবাবু পুরো একটা দিন মানা শিবিরে ছিলেন। সেই সময় হলধর পটল 'সত্যযুগ' পত্রিকায় মানা শিবিরের পরিস্থিতি ও রামবাবুর বক্তৃতা নিয়ে দুটি বা তিনটি লেখা লিখেছিলেন। 'সত্যযুগ' পত্রিকায় ওই সব রিপোর্ট বের হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাম চ্যাটার্জির কৈফিয়ত তলব করেছিলেন কিংবা রাজ্য সরকারের বিনা অনুমতিতে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে আসতে উসকানি দেওয়ায় রামবাবুকে তিরস্কার করেছেন, এমন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। কেবল তাই নয়, জ্যোতিবাবু এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার, মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং রেলওয়ে প্রশাসনকে দণ্ডকারণ্য ছেড়ে আসা উদ্বাস্তুদের পথে আটকানোর আগাম ব্যবস্থা নিতে বলেননি। ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন ১৫/২০ হাজার উদ্বাস্তু হাওড়া স্টেশন, প্রিন্সেপ ঘাট ও ময়দানে এসে গিয়েছে তখন তিনি কেন্দ্র, মধ্যপ্রদেশ সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে বললেন। মার্চ ও এপ্রিলে কলকাতা শহরের বাইরে, বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগনার (তখন অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রশাসনিক ভাগ হয়নি) বারাসত, বসিরহাট ও হাসনাবাদে হাজার হাজার উদ্বাস্তু জড়ো হয়ে গেল। ওই দুটি মাসে বিভিন্ন সময়ে দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সে সব সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়। আমার নিজের ও অন্য সহকর্মীদের লেখা যে রিপোর্ট বের হয়েছিল, সেগুলির কিছু নমুনা বিক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হল।

১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারির একেবারে শেষে দণ্ডকারণ্যের মানা শিবির থেকে কয়েকশো উদ্বাস্তু বম্বে মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছয়। মার্চের গোড়া থেকে প্রায় প্রতিদিনই কম বেশি উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসতে থাকে। প্রথম দু' চারদিন ওরা হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় বসে পড়ে। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে এদের সরিয়ে দেন এবং রাজ্য সরকারকে বিষয়টি জানান। তখন ওই উদ্বাস্তুরা গঙ্গার পাড়ে বাবুঘাটে ও ময়দানে এসে জড়ো হয়। ইতিমধ্যে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্যারি মহাপাত্র (ওড়িশার নামকরা সিভিল সার্ভেন্ট) কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবাংলা সরকারকে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য ত্যাগের ঘটনা জানান। ততদিনে ১২ থেকে ১৫ হাজার উদ্বাস্তু এসে পড়েছে। কিন্তু তখনও পশ্চিমবাংলা সরকার মধ্যপ্রদেশ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা রেল কর্তৃপক্ষকে উদ্বাস্তুদের হাওড়ামুখী ট্রেনে আসতে না-দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করলেন না। এদিকে উদ্বাস্তুরা ময়দান দখল করায় ফোর্ট উইলিয়ামের সামরিক কর্তৃপক্ষ উদ্বাস্তুদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশের ওপর চাপ দেন। তখন একদিন পুলিশ অভিযান চালিয়ে কয়েক হাজার উদ্বাস্তুকে খড়্গপুরের

দিকে পাঠিয়ে দেয়। কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু বারাসত-বসিরহাট রোডের আশেপাশে এসে জড়ো হতে থাকে। কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু বাদুড়িয়া হাট সংলগ্ন ঘনবসতি এলাকায় রাজ্য সড়কের দু'পাশে আস্তানা পাতলে সামাজিক উত্তেজনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। কারণ, এই এলাকাগুলি মুসলমান-অধ্যুষিত। দেশবিভাগেব পর থেকে ঐতিহাসিক কারণে এবং বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রেক্ষাপটে এসব এলাকার স্থানীয় মুসলমানেরা উদ্বাস্তুদের 'আক্রমণকারী' হিসাবেই চিহ্নিত করে রেখেছে। তবুও পশ্চিমবাংলা সরকার উদ্বাস্তুদের গতি নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করল না। ততদিনে অর্থাৎ মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে এপ্রিলের গোড়ায় দণ্ডকারণ্যত্যাগী উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৪৫/৫০ হাজার দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এপ্রিলের শেষাশেষি বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু হাসনাবাদ রেল স্টেশন ও ইছামতী নদীর পাড়ে এসে জমায়েত হয়। এপ্রিলের (১৯৭৮) শেষ নাগাদ বনবিভাগের অফিসারেরা রাজ্য সরকারকে জানালেন যে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু বনবিভাগের বাগনা বিট্ অফিসের (Bagna Bit Office) উলটোদিকে মরিচঝাঁপি নামে চিহ্নিত বনাঞ্চলের নারিকেল কুঞ্জে (Coconut Plantation) জড়ো হয়ে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছে।

মরিচঝাঁপি জায়গাটি কোথায়? বন বিভাগের বাগনা বিট্ অফিস ও তারই পাশে তাঁবু-খাটানো ভারত সবকারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অর্থাৎ Border Security Force কিংবা সংক্ষেপে বিএসএফ জওয়ানদের সীমান্ত চৌকি (Border Out Post সংক্ষেপে BOP) স্থানটিকে কেন্দ্রবিন্দু ধরলে ঠিক তার বিপরীত দিকে বন বিভাগের সরকারি নারিকেল কুঞ্জ। মাঝখানে প্রায় আধ কিলোমিটার চওড়া একটি নদী। বন বিভাগের অফিসের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে নদীটিকে দেখলে দেখা যাবে যে নদীটি ডানদিকে অনেকটাই সরু হয়ে বাঁক নিয়েছে। কিন্তু বাঁ দিকে আরও চওড়া হয়ে আর একটি নদীর সঙ্গে মিশেছে। এখান থেকে সুন্দরবনের নদীর খাঁড়ি দিয়ে বাংলাদেশের খুলনা জেলার দূরত্ব কোথাও ১৮/২০ কিলোমিটার, আবার কোথাও ৪০/৫০ কিলোমিটার। ১৯৭১-সালে বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সময় বাগনার এই নদীতে ভারতের সামরিকবাহিনীর নৌ ও জল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। সে সময় আমি কয়েকবারই এই এলাকায় এসেছি সৈন্যদের সাঁতার মহড়া দেখতে। তখন অবশ্য 'মরিচঝাঁপি' কথাটি শুনিনি— কেবল 'বাগনা' নামেই এই জায়গাটি আমার কাছে পরিচিত ছিল। এখান দিয়ে কোনও যাত্রীবাহী লঞ্চ চলে না। যাত্রীবাহী লঞ্চের সবচেয়ে নিকটবর্তী জায়গা হল সন্দেশখালি, যেটা বাগনা থেকে জলপথে অন্তত ১৫ কিলোমিটার। নদীপথে ১৫ কিলোমিটার, বিশেষ করে উজান সময়ে এক বেলা বয়ে যায়। সুতরাং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর সম্পাদকীয় বৈঠকে যখন মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু বসতির নয়া উপনিবেশের রিপোর্ট করতে বলা হল, আমি

এটাকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিলাম। কিন্তু বাগনা তথা মরিচঝাঁপি পৌঁছব কী করে? প্রয়োজনে একটা রাত কাটাব কোথায়? পেশাগত কারণে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ সংগঠনটির জন্মলগ্ন থেকে তার সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। আমার ছাত্রজীবনের অনেক বন্ধু আইপিএস অফিসার হয়ে এই সংগঠনটির উচ্চপদে কাজ করেছেন। ফলে নীচের তলার অফিসার ও জওয়ানরা অনেকেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। ঠিক ওই সময়েই আমার ছাত্রজীবনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিকাশকলি বসু (যিনি পরবর্তীকালে কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন) বিএসএফ-এর ডিআইজি পদে ছিলেন। সম্পাদকের সিদ্ধান্ত ও চিফ রিপোর্টারের নির্দেশ পেয়েই আমি আমার বন্ধু ডিআইজি সাহেবের কাছে চলে গেলাম।

১৯৭৮ সালের ১ মে তারিখে কলকাতা থেকে বিএসএফ-এর গাড়িতে করেই সন্ধ্যায় হাসনাবাদে বিএসএফ জওয়ানদের ঘাঁটিতে পৌঁছলাম। আমার সঙ্গী ফটোগ্রাফার তপন দাস। অর্ধেক রাত জওয়ানদের ছাউনিতে কাটিয়ে, শেষ রাতে হাসনাবাদ জেটিতে গিয়ে 'গঙ্গালহরী' স্টিমারে উঠলাম। এই 'গঙ্গালহরী' স্টিমারটি ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে নদীপথে ভারতীয়বাহিনীর খুলনা শহর দখলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তখন আমি বেশ কয়েকবার এই 'গঙ্গালহরী'র খালাসি-জওয়ানদের বীরত্বের কথা লিখেছিলাম। ফলে এই লোকদের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। শেষ রাতে কেবিনে ঢুকেই শুয়ে পড়েছিলাম। পরদিন অর্থাৎ ২ মে (১৯৭৮) তারিখে ভোর হতেই ফটোগ্রাফার তপন ক্যামেরা নিয়ে ডেকের ওপর ছুটোছুটি শুরু করে। নদীতে মেয়ে-শিশু বোঝাই অসংখ্য নৌকা। স্টিমার থেকে দেখছি শ'য়ে শ'য়ে লোক পোঁটলা-বোঁচকা নিয়ে নদীর পাড় ধরে দৌড়নোর ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে। 'গঙ্গালহরী'-র ক্যাপ্টেন আমাকে জানালেন যে, হেঁটে-চলা লোকগুলিও আমাদের সঙ্গে বাগনার দিকে যাচ্ছে। বাগনার প্রায় মাইলখানেক দূর থেকে ওদের নদী পার হতে হবে। বেলা ন'টা নাগাদ, বাগনা বিএসএফ জেটিতে 'গঙ্গালহরী' এসে আমাদের দুজনকে নামাল। নামার সময় ক্যাপ্টেন আমাকে চুপি চুপি বললেন, ডিআইজি সাহেব বলে দিয়েছেন মরিচঝাঁপির পাড়ে নোঙর না ফেলতে। তাই এখান থেকে ওদের ভাড়া নৌকায় করে আমি মরিচঝাঁপি পৌঁছলাম। ভারতের যে কোনও খবরের কাগজের আমিই প্রথম রিপোর্টার (আমার সঙ্গী সহকর্মী তপন দাস-সহ) মরিচঝাঁপির মাটিতে পা রাখলুম বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ, ২ মে ১৯৭৮। আমি সেদিন মরিচঝাঁপিতে কী দেখেছিলাম, তা ৩ মে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' আমার লেখায় প্রকাশিত। সেই রিপোর্ট পুরোটা এখানে উদ্ধৃত করলাম।

ঘণ্টায় একশো উদ্বাস্তু চলে আসছেন
গভীর সুন্দরবনে নয়া উপনিবেশ

সুন্দরবনের গভীরে করানখালি নদীর ওপর মরিচঝাঁপি দ্বীপ এখন দণ্ডকত্যাগী উদ্বাস্তুদের নতুন আশ্রয়। সোমবার পর্যন্ত প্রায় তেরো হাজার উদ্বাস্তু মরিচঝাঁপি অরণ্যের নারকেল কুঞ্জ ও ঝাউবীথির আলে আলে নৌকায় ছই'র মতো বাসা বেঁধেছেন। এছাড়া প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে একশো করে উদ্বাস্তু বাগনা দ্বীপের মধ্য দিয়ে করানখালি অতিক্রম করে ওই দ্বীপে এসে পৌঁছচ্ছেন।

অরণ্যের আদিম সভ্যতাকে বুকে নিয়ে যে মরিচঝাঁপি এতদিন মনুষ্যবসতি এলাকার বাইরে ছিল, আজ সেখানে শিশুর কলরব, গোলপাতা ও গরানের ডাল কেটে ঘর তৈরির ব্যস্ততা, শুকনো কাঠ কুড়োবার ধুম এবং কখনও কখনও ঠাকুর, আর কত কষ্ট দেবে, এই ধ্বনি শোনা যাবে। যে বৃদ্ধা গোলপাতার বোঝা মাথায় নিয়ে অদৃষ্টের কাছে প্রশ্ন করছেন, তিনি জবাব পাচ্ছেন তাঁরই প্রজন্মের একজনের কাছ থেকে, যতদিন কপালে লেখা আছে।

গত শনিবার থেকে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের বসতি আরম্ভ হয়েছে। চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলার দোকানদারি চলছে। এগুলো তাঁরা হাসনাবাদ থেকে নৌকা বোঝাই করে এনেছেন। ক্রেতাদের মধ্যে স্থানীয় লোকেরাও আছেন। কারণ, এই পাঁচ-সাত মাইল এলাকার বড়গঞ্জ কুমিরমারি বাজারের চেয়ে উদ্বাস্তুদের বিক্রি করা জিনিসগুলোর দাম কিছুটা কম। স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ তরিতরকারি উদ্বাস্তুদের বাজারে বিক্রি করে যাচ্ছেন।

উদ্বাস্তুরা মাছ ধরছেন। প্রায় সবটাই নিজেদের খাওয়ার জন্য। যদি জালে বড় মাছ ধরা পড়ে, তাহলে সেটা বাগনার মাছের খুটিতে বড় ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে আসছেন। মাছের শ্রেণি হিসাবে দর পাচ্ছেন কিলোপ্রতি চার টাকা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত। কিন্তু এভাবে জীবন কত দিন চলে বা চলবে?

সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িগুলিতে তো জলের কমতি নেই। এমনকী জোয়ারের সময় কাটা মাটির ফাঁক দিয়ে জল উঠে আসে। কিন্তু সে জল নোনা ও ঘোলা। তিন-চার মাইল দূরে নদীর ওপারের টিউবওয়েল ও পুকুর থেকে হাঁড়ি, কলসি ভর্তি করে খাবার জল নৌকায় পার করা হচ্ছে।

সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলছে এই পারাপার। কিন্তু এভাবে তেরো হাজার মানুষের তৃষ্ণা মেটানো এক দুঃসহ ব্যাপার। উদ্বাস্তুরা ভাত চাইছেন না, ফ্যানও না, তাঁরা চাইছেন কেবল খাবার জল।

উদ্বাস্তুদের এই অবস্থা দেখতে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধিদের আগে আর কোনও সাংবাদিক আসেননি। সোমবার আমরা ওখানে থাকতে থাকতেই মরিচঝাঁপির অরণ্যে লঞ্চে করে নামলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব অমিয়কুমার সেন। তিনি উদ্বাস্তুদের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে এলেন। তিনি কয়েক হাজার উদ্বাস্তুর সমাবেশে বললেন, দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্বাস্তুদের যে সকল অভিযোগ আছে, তা যদি দূর হয় এবং স্থায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়, তাহলে উদ্বাস্তুরা কি দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়ার কথা নতুন করে ভাববেন? সঙ্গে সঙ্গে 'না-না-না' চিৎকার তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল। তিনি বললেন, অন্তত উদ্বাস্তুদের এক প্রতিনিধিদল সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে দণ্ডকারণ্য ঘুরে আসুক। এর জবাব দিলেন এক বৃদ্ধা খুব গুছিয়ে। বিধবা, মাথায় সাবেক কালের কদম ছাঁট চুল। দেশ ছিল খুলনায়, সেই দেশি ভাষাতেই তিনি দণ্ডকের মাটি, ফসলের চরিত্র ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু তিনি শেষ কথা বললেন, এরপর আমাদের দণ্ডকারণ্যে না পাঠিয়ে এই নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে দেন বাপু! মুখ্যসচিব যখন ওই অরণ্য ছেড়ে লঞ্চে উঠলেন, তখন উদ্বাস্তুরা পারে দাঁড়িয়ে তাঁকে কাতর কণ্ঠে বললেন, স্যার রিলিফ নাই বা দিলেন, খাবার জলের একটু ব্যবস্থা করে দেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপিতে থাকবেন না। তাঁরা বললেন, সরকার বহু টাকা খরচ করে এখানে নারকেলের বাগান ও ঝাউগাছের সারি তৈরি করেছেন। তাঁরা তার ক্ষতি করবেন না। মরিচঝাঁপির পাশে কাপুরা খাল ও সারসা নদীর মাঝে প্রায় ৫০ হাজার একর জমির একটি নিবিড় জঙ্গল আছে। এই জঙ্গলকে ঝুপি জঙ্গল বলা হয়। ওর অরণ্য নিবিড় হলেও গাছগুলি ছোট ও ঝোপের আকারের। অধিকাংশ গাছই হল গরান, পশুর ও বাইন। এই গাছগুলি বিশেষ অর্থকরী নয়। এই বন তাঁদের সার্ভে করা হয়েছে। সাফ করার কাজ চলছে। এখানেই তাঁরা ঘর তুলবেন। মরিচঝাঁপি তাঁদের ট্রানজিট ক্যাম্প। তবে ওই জঙ্গল সাফ না করা পর্যন্ত তাঁরা মরিচঝাঁপি থাকবেন। উদ্বাস্তু নেতারা কলকাতায় সার্ভে অফিস থেকে এই জঙ্গলের মানচিত্র সংগ্রহ করেছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা তাঁরা যাচাই করেছেন। সেখানে তাঁরা পুকুর কাটবেন বৃষ্টির মিষ্টি জল ধরে রাখবার জন্য।

> মরিচঝাঁপিতে রাতে উদ্বাস্তুরা শুকনো কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রাখছেন। উদ্দেশ্য হিংস্র জন্তুদের কাছে আসতে না দেওয়া। পালা করে নিজেরাই পাহারা দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে বহু কণ্ঠের মিলিত চিৎকার অরণ্যের আদিম বাসিন্দাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। উদ্বাস্তুদের নেতৃত্ব পোক্ত ও দৃঢ়। জঙ্গলে বসতি করলেও এখনও পর্যন্ত একটি নারকেল কিংবা ঝাউগাছের কেউ ক্ষতি করেননি। এমনকী ডাবের কাঁদি হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েও একটি ডাব কেউ পাড়েননি। জেলা কর্তৃপক্ষ থেকে বনবিভাগের কর্মীরা সকলেই উদ্বাস্তুদের এই শৃঙ্খলাবোধের প্রশংসা করছেন।

মরিচঝাঁপি দ্বীপের মাটি থেকে আমার প্রথম রিপোর্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশের পর পশ্চিমবাংলার লোকেরা জানতে পারল মরিচঝাঁপিতে কী হচ্ছে এবং কী হতে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর, আই বি, পুলিশ বিভাগ এবং বিশেষ করে অন্যান্য খবরের কাগজে আমার সাংবাদিক সহকর্মীরা বারংবার আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন আমি কীভাবে মরিচঝাঁপি গিয়ে পৌঁছলাম। আমি যে বানিয়ে 'গল্প' লিখিনি তার প্রমাণ কেবল প্রকাশিত ছবি নয়, তার চেয়ে বড় প্রমাণ, ২ মে ১৯৭৮ তারিখে আমি যখন মরিচঝাঁপির কাজ শেষ করে ফেলেছি, সেই সময় দুপুরবেলা প্রায় বারোটা নাগাদ তখনকার চিফ সেক্রেটারি অমিয়কুমার সেন রাজ্য সরকারের সবচেয়ে বড়ো লঞ্চ ESTHAR চেপে মরিচঝাঁপির মাটিতে নেমে আমাকে দেখতে পেয়ে খুবই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন '...তুমি এখানে? কী করে এলে?' আমি ওঁর প্রশ্ন এড়িয়ে জবাব দিয়েছিলাম, 'লোকগুলির খাবার জলের খুব অভাব!' চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে ছিলেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার পেন অ্যান্টনি ও একজন ইঞ্জিনিয়ার। চিফ সেক্রেটারি আমাকে তাঁদের সঙ্গে সরকারি লঞ্চে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি তাও করিনি— যদি কথায় কথায় বলে ফেলি মরিচঝাঁপি কী করে এলাম! আমার বন্ধু বিএসএফ-এর ডিআইজি বিকাশ বসু বাগনাতে বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বলেছিলেন 'ওরা ওদের রেশন থেকে তোকে খাওয়াবে। পয়সা দিয়ে খাতায় সই করে দিবি।' আমি তাই করেছিলাম, যাতে আমার মরিচঝাঁপি যাওয়ার খবরটা গোপন থাকে।

১৯৭৮ সালের জুন মাসের মধ্যে মরিচঝাঁপিতে দণ্ডকারণ্যত্যাগী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজারে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু ১৯৭৮-এর জুলাই মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মরিচঝাঁপিতে আর কোনও উদ্বাস্তু পরিবারকে ঢুকতে দেয়নি। ওই বছরের জুলাই মাসে রাজ্যের পুলিশ হাজারখানেক উদ্বাস্তু দলকে হাওড়া স্টেশনে আটকে

দেয়। তারা মরিচঝাঁপি যাবে বলে দণ্ডকারণ্য থেকে আসছিল। রাজ্য সরকার এই উদ্বাস্তুদের বর্ধমান শহরের কাছে কাশীপুর নামের একটি জায়গায় স্থানান্তরিত করে। সেখানে ২২ জুলাই (১৯৭৮) উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পুলিশের কথা কাটাকাটি থেকে সংঘর্ষ বেধে যায়। ওই জায়গাটি ছিল কংগ্রেস নেতা ভোলা সেনের নির্বাচন কেন্দ্রের অন্তর্গত। ২২ জুলাই (১৯৭৮) সন্ধ্যায় ভোলা সেন মহাশয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে ফোন করে জানান যে, বর্ধমানের কাশীপুরে উদ্বাস্তু শিবিরে পুলিশ গুলি চালিয়েছে। কিন্তু কলকাতায় সরকারিভাবে ওই খবরের সমর্থন পাওয়া যায় না। ফলে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' একজন রিপোর্টারকে দ্রুত বর্ধমানে পাঠিয়ে দেন। ২৩ জুলাই (১৯৭৮) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ওই ঘটনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল সেটি হল এই:

উদ্বাস্তু শিবিরে হাঙ্গামার জের:
টাঙির ঘায়ে পুলিশ নিহত, আট উদ্বাস্তুর মৃত্যুর অভিযোগ

কাল রাত্রে এখানে পুলিশ এবং দণ্ডকারণ্য আগত একদল উদ্বাস্তুর সংঘর্ষে ৯ জন মারা যান। এঁদের মধ্যে একজন পুলিশ কনস্টেবল— কুশধ্বজ মণ্ডল (৩৪)। তাঁকে টাঙির ঘায়ে মেরে ফেলা হয়েছে। বাকি সবাই উদ্বাস্তু। মরেছেন গুলিতে। তবে উদ্বাস্তুদের মৃত্যু সম্পর্কে অধিক রাত পর্যন্ত সরকারি সমর্থন মেলেনি। পুলিশ সবশুদ্ধ ১৫ রাউন্ড গুলি চালায়। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গোটা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

সংঘর্ষের শুরু যখন ওই ক্যাম্প থেকে ট্রাকে করে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে ফিরিয়ে দেবার জন্য বর্ধমান স্টেশনে আনা হচ্ছিল। উদ্বাস্তুরা অভিযোগ করেন, প্রচণ্ড জল-ঝড়ের মধ্যে তাদের জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পুলিশের অবশ্য পাল্টা অভিযোগ: বেশ কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু যখন স্বেচ্ছায় ট্রাকে উঠছিলেন তখন অন্য একদল তাদের বাধা দেন। টাঙি, বল্লম এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করেন। একটা পুলিশ ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ওই ভ্যানে ওই সময় ৩০ জন লাঠিধারী কনস্টেবল ছিলেন। তাঁদেরই একজনকে বাইরে এনে টাঙির আঘাতে মেরে ফেলা হয়। বাকিরা বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে উদ্বাস্তুরা দরজা বন্ধ করে অবরোধ সৃষ্টি করেন। ঠিক ওই সময়েই পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে।

পুলিশ সুপার অমিয় সামন্ত বলেন, তাঁরা ১৫ রাউন্ড গুলি চালিয়েছেন কিন্তু এতে কতজন হতাহত হয়েছেন তার সঠিক খবর পাননি। অবশ্য

একাধিক ব্যক্তি মরে থাকতে পারেন। উদ্বাস্তুদের তরফে বলা হয়— গুলিতে তাঁদেরই আটজন মারা গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে চারজনকে শনাক্ত করা গিয়েছে। তাঁরা হলেন: জগদীশ হালদার (মূলচোরা, মহারাষ্ট্র ক্যাম্প), পবিত্র সরকার (চাঁদাঘোট, একই ক্যাম্প), অঙ্কুর মণ্ডল (সুর গেজো, অম্বিকাপুর, মধ্যপ্রদেশ) এবং অমূল্য ঘরাপি। বাকি চারজনের পরিচয় জানা যায়নি। উদ্বাস্তুরা জানান তাঁরা কোনও মৃতদেহ পুলিশের হাতে তুলে দেননি। তাঁদের সকলকে ক্যাম্পের বাইরে পুঁতে ফেলা হয়েছে বলে তাঁরা জানান।

পুলিশের গুলিতে উদ্বাস্তুদের কেউ মারা গিয়েছেন কি না তা জানার জন্য পুলিশ এখন নানান কৌশল গ্রহণ করেছে। একজন বিডিও-কে রিপোর্টার সাজিয়ে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছিল। রিপোর্টার ভেবে উদ্বাস্তুরা তাঁকে শিবিরের কাছাকাছি একটি জায়গায় নিয়ে যান। উদ্দেশ্য একটি মৃতদেহ দেখানো। কিছু দূরে যাওয়ার পর একজন উদ্বাস্তু চিৎকার করে ওঠেন— আরে এ তো বিডিও সাহেব। ওঁকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? এর পর বিডিও ভদ্রলোক হতাশ হয়ে ফিরে আসেন।

বর্ধমান জেলাশাসক প্রসাদ রাও জানালেন, বড় বড় হাসপাতালে পুলিশের গুলিতে আহত কোনও উদ্বাস্তুকে পাওয়া যায়নি। এখন গ্রামের ভিতরে প্রাথমিক ও সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে খোঁজ করে দেখা হচ্ছে। শ্রী রাও বলেন, গ্রেফতারের ভয়ে গুলিতে আহত হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ আত্মগোপন করে থাকতে পারেন। আহতদের খুঁজে বার করার জন্য শুক্রবার রাত থেকেই নানান জায়গায় হানা দেওয়া হচ্ছে।

এস পি অমিয় সামন্ত জানালেন, গুলিতে তিনজন উদ্বাস্তু আহত হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

তখন বেলা ৩টা। প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে। আমরা যখন বর্ধমান টাউন থেকে ভাতার হয়ে কাশীপুরে গিয়ে পৌঁছলাম, গোটা ক্যাম্প ঘিরে যেন শ্মশানের শূন্যতা। আমাদের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ওই জল-ঝড়ের মধ্যে হোগলাচাটাই-এর ঘর থেকে মেয়ে-পুরুষরা উঁকি দিয়ে দেখছিলেন। এক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন ৩০ বছরের এক যুবক। তুষারকান্তি মণ্ডল। নিজেদের পরিচয় দিতে উনি চিৎকার করে কয়েকজনকে ডাকলেন। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। তুষারকান্তি বললেন, আপনাদের পুলিশের লোক ভেবে কেউ বাইরে আসতে চাইছিলেন না। শ'খানেক পুরুষ-মহিলা আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভিযোগের কথা জানাতে লাগলেন। কাছে-পিঠে তখন কোনও পুলিশ কিংবা পুলিশের ভ্যান নেই। দূরে ক্যাশ ক্যাম্পে

একটা বেতার ভ্যান দাঁড়িয়ে। ওয়ারলেসে খবরাখবর কন্ট্রোল রুমে জানাচ্ছে। তবে অদূরে পুড়িয়ে দেওয়া পুলিশ ভ্যান থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

উদ্বাস্তুরা খোলা মাঠের এখানে-সেখানে চাপ চাপ রক্তের দাগ আমাদের দেখালেন। আহত ব্যক্তিরা দেখালেন তাঁদের ক্ষতের চিহ্ন। প্রায় ৮০ বছরের বৃদ্ধ জিতেন বাড়ুই বললেন, জ্যোতিবাবু আমাদের দিয়ে নরকের যজ্ঞ করছেন। নেতা গোছের এক ব্যক্তি মধুসূদন গাইন বললেন, জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞেস করি কত গুলি তাঁর আছে। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনারা বলছেন ন'জন মারা গিয়েছেন। অথচ পুলিশ বলছে তাদের কাছে হতাহতের কোনও নাম নেই। উত্তরে উদ্বাস্তু নেতা তুষারকান্তি জানালেন— পুলিশ তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের মৃতদেহ নিয়ে কাটাছাঁটা করুন তা তাঁরা চান না। তাই তাঁরা নিজেরাই মৃতদেহগুলিকে মাটিতে পুঁতে ফেলেছেন। তিনি বলেন— কেউ যদি স্বেচ্ছায় দণ্ডকারণ্য ফিরে যেতে চান তাতে আমাদের কী আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু পুলিশের অত্যাচার, আমাদের প্রতি কুকুর-বেড়ালের মতো ব্যবহার আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়।

ওই ক্যাম্প চৌহদ্দির একদিকে কিছু মেয়ে-পুরুষ কেমন যেন এই ঘটনার ব্যাপারে এক রকম উদাসীন, যে যার আপন কাজে ব্যস্ত, অন্যদিকে এদিক-ওদিক আটচালার ঘরের ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ। শোক বিহ্বল চিত্তে মৃতের আত্মীয়স্বজনরা অনেকের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। ওরই মধ্যে কারও কারও অভিযোগ— কেউ তাঁর স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছেন না। কেউ পাচ্ছে না তার ভাইকে। ঘটনার পর থেকে ওই ক্যাম্পের প্রায় পঁচিশ জন যুবক নিখোঁজ। পুলিশ সুপারের বক্তব্য আবার অন্য রকম। তিনি জানালেন, ওইদিনই তাঁরা ওই ক্যাম্প থেকে ৮ ট্রাক বোঝাই করে উদ্বাস্তু নিয়ে গেছেন। সকলেই স্বেচ্ছায় যাওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু যখন ৯ নম্বর ট্রাক বোঝাই হচ্ছিল তখন কিছু স্থানীয় নবাবগঞ্জ ক্যাম্পের বাসিন্দা সেই ইচ্ছুক উদ্বাস্তুদের বাধা দেন! ফলে দু'দল উদ্বাস্তুর মধ্যেই সংঘর্ষ বাধে। পরে পুলিশ আক্রান্ত হলে তারা গুলি চালায়। গুলি চালানো না হলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া ভ্যানে তিরিশ জন পুলিশ কনস্টেবলকে হয়তো পুড়েই মরতে হত। তিনি বলেন, আজ রাত্রেই প্রায় দুশো উদ্বাস্তু পরিবার বর্ধমান থেকে দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশে যথারীতি যাত্রা করছেন।

ওই তারিখেই উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠানো নিয়ে এই সংবাদটি বের হয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়:

উদ্বাস্তু ফেরত পাঠানো বন্ধ হবে নাঃ মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শনিবার সাংবাদিকদের জানান যে, বর্ধমানের ঘটনার ফলে এই রাজ্য থেকে দণ্ডক উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠানো বন্ধ হবে না। তিনি বলেন, এই সব করে পাঠানো বন্ধ করা যাবে না। আমরা ওঁদের পাঠাবই।

জ্যোতিবাবু বলেন, এর মধ্যে ৩৭ হাজার দণ্ডক উদ্বাস্তুকে পাঠিয়েছি। আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজারকে পাঠাব। আজ শনিবার বর্ধমান থেকে স্পেশাল ট্রেনে নবাবনগর কাশীপুরের শিবির থেকে ওই সব উদ্বাস্তুদের যাওয়ার কথা। যেতে পেরেছেন কি না জানি না। ওই শিবিরের উদ্বাস্তুদের মধ্যে বেশির ভাগই পারলকোটের।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন মহাকরণে বর্ধমানের গুলিচালনার ঘটনা নিয়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী রাধিকারঞ্জন ব্যানার্জি, বিচারমন্ত্রী হালিমের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। মুখ্যসচিব, আই জি, স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গেও তিনি পৃথক ভাবে এ নিয়ে আলোচনা করেন। বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনার চিত্তরঞ্জন গুহ মজুমদার স্বরাষ্ট্র সচিব রথীন সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করে ওই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন।

বৈঠক শেষে হাতে ইংরেজিতে টাইপ করা পুলিশ রিপোর্টটি ধরে জ্যোতিবাবু বাংলায় তর্জমা করে ওই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সাংবাদিকদের জানান।

জ্যোতিবাবু বলেন, পুলিশ অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বসিরহাট বারাসতে একাধিকবার পুলিশের ওপর উদ্বাস্তুদের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশকে অবশ্য আরও ধৈর্য ধরে চলতে হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নিহত কনস্টেবলের পরিবারকে পনেরো হাজার টাকার সাহায্য দেওয়া হবে।

জ্যোতিবাবু জানান, কাশীপুর শিবির থেকে এগারোটি ট্রাকে করে শুক্রবার রাতে দণ্ডক উদ্বাস্তুদের বর্ধমান স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। তখন রাত সাড়ে সাতটা হবে। আটখানি ট্রাক উদ্বাস্তুদের নিয়ে রওনা হয়ে যায়। বাকি তিনটি ট্রাকের একটা অংশ বর্ধমানে যেতে আপত্তি জানায়। ওখানে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ ভিতরে বসেছিল।

পুলিশের হাতে ছিল লাঠি। ইতিমধ্যে উদ্বাস্তুরা পুলিশের ওই গাড়িখানিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ গাড়ি থেকে নামতে চেষ্টা করে। ওরা রাস্তা কেটে দেয়। ওই সময় উদ্বাস্তুদের ভিতর থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পাটকেল, লাঠি, লোহার রড ছোড়া হয়। একজন পুলিশকে ওরা পিটিয়ে ওখানেই মেরে ফেলে। কুড়িজন পুলিশ আহত হয়। দশজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে কিছু বন্দুকধারী পুলিশ আসে। এর মধ্যে ক্যাম্প গার্ড ছিল। উত্তেজনা বেড়েই চলে। গাড়িটি তখন পুড়ছে। সেখানে তিনজন সরকারি পুলিশ দু'রাউন্ড করে মোট ছ' রাউন্ড গুলি চালায়। তারপর আবার ওই তিনজনই তিন রাউন্ড করে ৯ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। অর্থাৎ মোট গুলি ছোড়া হয় পনেরো রাউন্ড। ওখানে পদস্থ অফিসারদের মধ্যে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং ডিএসপি। গুলিচালনার নির্দেশ দেন অতিরিক্ত জেলাশাসক।

জ্যোতিবাবু বলেন, গুলিতে উদ্বাস্তুদের কেউ নিহত হবার খবর পাওয়া যায়নি। সার্চ চলছে। বর্ধমানের জেলাশাসক প্রসাদ রাও, পুলিশ সুপার অমিয় সামন্ত ঘটনাস্থলে গতকালই (শুক্রবার) চলে যান। এখনও তাঁরা সেখানে আছেন।

তদন্ত দাবি: এদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং ভাতার কেন্দ্রের এমএলএ ভোলানাথ সেন বর্ধমানের উদ্বাস্তুদের ওপর পুলিশের গুলিচালনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। ভোলাবাবু বলেন: এটা বিস্ময়ের কথা যে পুলিশ এত গুলি চালাল কিন্তু কেউ মারা যাননি বলে সরকার ঘোষণা করছেন। তবে পুলিশ কি রসগোল্লার গুলি ছুড়েছে?

তিনি বলেন: এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, যারা আজ উদ্বাস্তুদের ওপর গুলি চালাচ্ছেন, এদের প্রতি অমানবিক, নির্দয় ব্যবহার করছেন, তাঁদের অনেকেই পূর্ববঙ্গের মানুষ, কেউ কেউ উদ্বাস্তু। রাজ্য ত্রাণমন্ত্রী রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিজেই একজন জবরদখলকারী।

ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও পুলিশের গুলিচালনার নিন্দা করেছেন। ভাতারে পুলিশের গুলিতে চারজন উদ্বাস্তু নিহত হয়েছেন। মৃতদেহগুলি পুলিশ গুম করেছে।

যুব কংগ্রেস (ই) সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন ভট্টাচার্য পুলিশের গুলিচালনার নিন্দা করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন।

১৯৭৮-এর আগস্ট ও পরে সেপ্টেম্বরে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে এক অভূতপূর্ব বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমনকী রাজধানী কলকাতা শহর পর্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা সংবাদ মাধ্যমের আড়ালে চলে যায়। কিন্তু বাঙালি সমাজজীবনের দুই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব শৈবালকুমার গুপ্ত ও প্রবীণ বিপ্লবী নেতা পান্নালাল দাশগুপ্ত মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ভুলে যাননি। শৈবালবাবু তাঁর আইপিএসের পেনশনের টাকার অর্ধেকেরও বেশি প্রতি মাসে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সাহায্যে দান করেছেন। পান্নালালবাবুও বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করে উদ্বাস্তুদের সাহায্য করেছেন। শৈবালবাবু ও পান্নালালবাবু একই সঙ্গে লঞ্চে ও পরে নৌকায় চেপে ওই বার্ধক্যের মধ্যেও মাসে দু'তিন বার করে মরিচঝাঁপিতে যাতায়াত করেছেন। এই উদ্বাস্তুদের কীভাবে একটি আর্থিক স্বনির্ভরতায় পৌঁছে দেওয়া যায় তার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। শৈবালবাবু ও পান্নালালবাবুর মরিচঝাঁপি যাতায়াত রাজ্যের সিপিআইএম নেতৃত্ব, বিশেষ করে জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত খুবই বিরূপভাবে দেখতে থাকলেন। তাঁদের উপর আই-বির নজরদারি আরোপ করা হল। তবে রাজ্যের আরএসপি নেতারা মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ওপর অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। কারণ সুন্দরবনের ওই অঞ্চলে আরএসপি'র জনপ্রিয়তা ও প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ভয়ানক অবস্থায় এই উদ্বাস্তুদের স্থানীয় আরএসপি কর্মীরা প্রভূত সাহায্য করেছেন। কিন্তু রাজ্যের সেচমন্ত্রী, যিনি জ্যোতি বসুর একান্ত অনুগত, যাঁর উসকানিতে উদ্বাস্তুরা মানা শিবির ও মূল দণ্ডকারণ্য থেকে দলে দলে এই রাজ্যে চলে এসে মরিচঝাঁপিতে বাসা বাঁধল, সেই রামবাবু কিন্তু একদিনের জন্যও মরিচঝাঁপিতে পা রাখেননি। তবে তাঁর দলের অর্থাৎ মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের বড় নেতা সুহৃদ মল্লিক চৌধুরি কয়েকবার মরিচঝাঁপি গিয়েছিলেন এবং উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাজনৈতিকভাবে এ সময় জনতা পার্টি প্রকাশ্যে রাজ্যস্তরে ও জাতীয়স্তরে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু উপনিবেশ নিয়ে ঝড় তুলেছিল। এই ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তখনকার রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কাশীকান্ত মৈত্র। ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সুন্দরবন এলাকার আরএসপি কর্মীরা মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করায় স্থানীয়ভাবে ওই পার্টির সঙ্গে উদ্বাস্তুদের প্রধানত মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ক সিপিআইএমের আদৌ পছন্দের ছিল না। এদিকে জ্যোতি বসু মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজ্য জনতা পার্টির বিশেষ করে বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা কাশীকান্ত মৈত্রকে নিরস্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের দ্বারস্থ হন। মোরারজি দেশাই

এই ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে (রাজ্য জনতা পার্টির সভাপতি) মধ্যস্থতা করতে বলেন। প্রফুল্লবাবু জ্যোতি বসুকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, জ্যোতিবাবু যেন কাশীবাবুর সঙ্গে কথা বলেন উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে। কিন্তু জ্যোতিবাবু চাতুরির আশ্রয় নিলেন। তিনি জনতা পার্টির অন্যতম সহ-সভাপতি ফজলুর রহমানের সঙ্গে কয়েকবার বৈঠক করলেন। ফজলুর রহমান সাবেক কংগ্রেস দলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নেতা ও প্রফুল্ল সেনের খুবই কাছের লোক। ফজলুর রহমানও কাশীবাবুর সঙ্গে বৈঠকের জন্য জ্যোতিবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু জ্যোতিবাবু ওই প্রস্তাব এড়িয়ে বলেছিলেন, 'কাশীবাবুর সঙ্গে তো বিধানসভাতেই কথা হয়েছে।' আমি এই বিষয়ে ফজলুর রহমানকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। প্রশ্নটির আগে একটা কথা বলে নিতে চাই। ফজলুর রহমানকে বলতে গেলে একটা প্রজন্ম ধরে আমি 'দাদা' বলে ডেকে এসেছি। আমি সরাসরি ফজলুরদা'কে প্রশ্ন করেছিলাম 'জ্যোতিবাবু কি আপনি 'মুসলমান' বলে আপনার মুখ থেকে উদ্বাস্তু বিরোধী কোনও মন্তব্য বের করতে চেয়েছিলেন? যেহেতু নদিয়া জেলায় কংগ্রেস বিরোধী সব আন্দোলন উদ্বাস্তুদের নিয়ে করা হয়েছে এবং যেহেতু ১৯৬৬ সালের ৫ মার্চ কৃষ্ণনগরে আপনার তিনতলা অত বড় বাড়ি উদ্বাস্তু আন্দোলনকারীরা পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল, সেহেতু কি জ্যোতিবাবু আপনার ক্ষোভ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে?' ফজলুরদা আমাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'ওই দুঃখ আমি ভুলে গিয়েছি। আর ওই দৃশ্য সবটাই তুমি দেখেছিলে— আমি কিছুই দেখিনি। তবে জ্যোতিবাবুর একটা উদ্দেশ্য ছিল আমাকে দিয়ে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে কিছু একটা কথা বলানো। আমি জ্যোতিবাবুকে বলেছিলাম, 'তিনি যেন নিজে একবার প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে যান উদ্বাস্তুদের অসুবিধাগুলি স্বচক্ষে দেখতে। তাতে মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নিতে সুবিধা হবে। কিন্তু সেটা জ্যোতিবাবুর মনঃপূত নয়।' তবে এ কথাটা তিক্ত হলেও অগ্রাহ্য করা যাবে না যে, চব্বিশ পরগনা ও নদিয়া জেলায় সিপিআইএমের যে শক্তিশালী 'মুসলমান লবি' ১৯৭৭-এর ভোটের পরে গড়ে উঠেছে সেই 'লবি' বিশেষ করে বসিরহাট-হাসনাবাদ অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানেরা মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের বসতির প্রতি সাংঘাতিক বিরূপ ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে।

১৯৭৮-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা মরিচঝাঁপির আশেপাশের কয়েকটি গ্রামে, বিশেষ করে কুমিরমারিতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা নৌকার মাঝিদের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কিত খবরাখবর জোগান দেওয়ার কাজে লাগাতে থাকে। উদ্বাস্তুদের গতিবিধি, যার ওপর তাদের রুজিরোজগার চলছে তা বন্ধ করার জন্য

রাজ্য সরকার আইনগত পথ খুঁজছে— এমন একটা খবর আমার কাছে ছিল। আমি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিএসএফ-এর স্টিমারের সাহায্য নিয়ে বাগনাতে ওই বাহিনীর আউটপোস্ট ঘাঁটিতে (যেটা মরিচঝাঁপির বিপরীত দিকে) পৌঁছলাম। কিন্তু আমি দিনের আলোয় মরিচঝাঁপিতে ঢুকলাম না। সন্ধে হলে বিএসএফ-এর নৌকার মাঝিকে নিয়ে নদী পাড়ি দিয়ে মরিচঝাঁপিতে উঠলাম। উদ্বাস্তুদের প্রহরাবাহিনীর লোকেরা কেউ কেউ আমাকে চিনতেন। পরিচয় দেওয়াতে ওরা আমাকে স্কুল বাড়িটাতে নিয়ে গেলেন। ওখানেই সতীশ মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হতেই আমি তাঁকে আলাপ করে ডেকে নিয়ে বললাম, "সরকার কিন্তু সাংঘাতিক কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে পারে খুব তাড়াতাড়ি।" সতীশবাবুরাও এরকম একটা আশঙ্কা করছেন। পান্নালাল দাশগুপ্ত ও শৈবাল গুপ্ত মহাশয়েরা তাঁদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। ফেরার পথে উদ্বাস্তু নেতারা নদীর একপাশে নিয়ে আমাকে যা দেখালেন তা আমাকে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিষাদগ্রস্ত করে দিল। উদ্বাস্তু মিস্ত্রিরা নৌকা তৈরির একটা গ্রাম্য বন্দর গড়ে তুলেছে। নদী থেকে একটা খাল কেটে খানিকটা ভিতরে নিয়ে তার কিনারে ১৫/১৬টি নৌকা তৈরি চলছে। ১০/১২টি নৌকা তৈরি প্রায় শেষ। একটি হাজারমণি নৌকার ওপরের দিকের গলুই-সহ পেটের দিকের অর্ধেক কাজ শেষ। আমার সঙ্গী ফটোগ্রাফার দেবীপ্রসাদ সিংহ ছবি তুলতে চাইল। তিন-চারটে হ্যাজাক জ্বেলে জায়গাটিকে আলোকিত করে দেবী 'ফ্লপি' দিয়ে ছবি তুলেছিল। উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নমুনা হিসাবে ওই ছবি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ছাপা হয়েছিল আমার রিপোর্টের সঙ্গে।

যা আশঙ্কা করেছিলাম, সে রকম একটি রিপোর্ট পাওয়া গেল। বনভূমি ও বনাঞ্চল রক্ষা করার যে কেন্দ্রীয় আইন আছে, তা মরিচঝাঁপির ক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবাংলা সরকার। ১৯৭৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ওই আইন মোতাবেক জলপথে মরিচঝাঁপিতে যাতে কেউ খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল, ঔষধপত্রাদি পাঠাতে কিংবা নিয়ে যেতে না পারে সে জন্য শ'খানেক লঞ্চ ও নৌকা দিয়ে পুলিশ মরিচঝাঁপি ঘিরে ফেলল। এ সম্পর্কে ২৯ জানুয়ারি (১৯৭৯) তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই সংবাদটি প্রকাশিত হল:

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের অবাধ গতিবিধি প্রায় বন্ধ

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের জীবিকা বন্ধের প্রথম পর্যায়ে সরকারি অভিযান আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র রবিবার সন্ধ্যায় মহাকরণে বলেন, মরিচঝাঁপি দ্বীপ সংলগ্ন নদীগুলোতে উদ্বাস্তুদের অবাধ গতিবিধি ওইদিন থেকে এক প্রকার বন্ধ।

এক সরকারি মুখপাত্র জানান, ১৪৪ ধারা জারি করার পর শনিবার নদী থেকে উদ্বাস্তুদের ছ'টা নৌকা আটক ও সাতজন উদ্বাস্তুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনার পর রবিবার সকাল পর্যন্ত ওই এলাকায় আর কোনও ঘটনা ঘটেনি এবং উদ্বাস্তুরাও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হননি। তিনি জানান, মরিচঝাঁপির উত্তরে করানখালি নদীর পাড়ে বাগনাতে স্থাপিত রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র ব্যাটেলিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার বাগনা এলাকায় রয়েছেন।

জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার বাইরে থেকে মরিচঝাঁপিতে লোকেদের প্রবেশ ও উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনের অন্যান্য আবাদ এলাকায় যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেহেতু মরিচঝাঁপি সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চল, সেহেতু বন দফতরের অনুমতি ছাড়া ওই এলাকার নদীগুলোতে অবাধ বিচরণ বেআইনি। তার ওপর ১৪৪ ধারা জারি করে আইনের খুঁটি আরও শক্ত করা হয়েছে। শনিবার নৌকা-সহ যে সকল উদ্বাস্তুকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সে সম্পর্কে সরকারি অভিযোগ হল, ওই লোকেরা সরকারের বনসম্পদ কেটে নিয়ে যাচ্ছিল এবং ওই এলাকায় বিচরণ করার বৈধ পারমিট তাঁদের ছিল না।

মরিচঝাঁপিতে এখন যে দশ থেকে বারো হাজার উদ্বাস্তু বসবাস করছেন, তাঁদের প্রধান জীবিকা হল সংলগ্ন নদী ও খাঁড়িগুলো থেকে মাছ, কাঁকড়া, কচ্ছপ ধরা ও কাঠের ব্যাবসা-বাণিজ্য। মাটির হাঁড়ি, কলসি ও কাঠের আসবাবপত্রও তাঁরা তৈরি করছেন। ওগুলো কেনাকাটা করতে ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দ্বীপের উৎপন্ন শাকসবজি বিক্রি করতে মরিচঝাঁপিতে বাইরের লোকদের আসা-যাওয়া চলে। মরিচঝাঁপিতে যাতায়াত করতে গেলে রায়মঙ্গল, ঝিল্লা ও করানখালি এই তিনটি নদী ব্যবহার করতে হবেই। শনিবার থেকে এই নদীগুলোতে বহু পুলিশ লঞ্চ, বন বিভাগের লঞ্চ ও মোটরবোট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে টহলদারি করছে। এই দ্বীপে এখন অবশ্য পানীয় জলের সমস্যা নেই। ন'টি নলকূপের মিঠে জল সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। তবে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের অন্যান্য আবাদ এলাকায় গিয়ে চাল আনতে হয়। সুতরাং উদ্বাস্তুদের দ্বীপের বাইরে বের হতে না দিলে ও অন্যান্য লোকদের সেখানে এসে বেচাকেনা বন্ধ করে দিলে উদ্বাস্তুদের খাদ্যসংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে।

উৎখাত রোধে সত্যাগ্রহ করব: প্রফুল্ল সেন

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনতা নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের উৎখাত প্রতিরোধ করার জন্য সত্যাগ্রহ করার কথা ঘোষণা করেছেন। রবিবার তিনি হাওড়ায় জনতা দলের কর্মী-সম্মেলনে বলেন, বামফ্রন্ট সরকার অন্যায়ভাবে মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের উৎখাত করার চেষ্টা করছে। প্রয়োজন হলে তিনি মরিঝাঁপি থেকে দণ্ডকাগত উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ রুখতে সেখানে গিয়ে সত্যাগ্রহ করবেন। তিনি বলেন, সিপিআইএম নেতা জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অন্যায়ভাবে মরিচঝাঁপি থেকে দণ্ডকাগত উদ্বাস্তুদের জোর করে উৎখাত করার চেষ্টা করছে। এত বড় অন্যায় বরদাস্ত করা যায় না। জনতা পার্টির কর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দরকার হলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মরিচঝাঁপিতে গিয়েই সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করা হবে। রাজ্য জনতা দলের সভাপতি ফজলুর রহমানও ভাষণ দেন। তিনি বলেন, দলের কর্মীদের এখন সব থেকে বড় কাজ হচ্ছে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের স্বৈরতন্ত্রী মনোভাব ও কাজকর্মের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গড়ে তোলা।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি মরিচঝাঁপি নিয়ে রাজ্যের সমস্ত দলের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। রবিবার তিনি কলকাতায় একথা জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার মরিচঝাঁপি সমস্যা সম্পর্কে সরকার-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কোনও পরামর্শই করছেন না। সবাইকে অন্ধকারে রেখে একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। অথচ এই সমস্যা খুবই গুরুতর। সকলে মিলে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত।

মরিচঝাঁপিতে যখন পশ্চিমবাংলার সিপিআইএম সরকার 'বনভূমি রক্ষা'র কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগ করে প্রায় ৪০ হাজার উদ্বাস্তু মানুষের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করল সেই সময় সেই দ্বীপে আড়াই থেকে তিন হাজার শিশুর বাসভূমি ছিল। রাষ্ট্রসংঘ বা ইউএনও ১৯৭৯-কে 'শিশুবর্ষ' অর্থাৎ Year for the Children হিসাবে ঘোষণা করেছিল। অথচ জ্যোতি বসু ওই তিন হাজার শিশুর মুখের খাদ্য কেড়ে নিতে সামান্যতম দ্বিধা দেখাননি। এই অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে *সানডে*-র (আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর ইংরেজি সাপ্তাহিক) সম্পাদক এম জে আকবর কয়েকটি লেখা লিখেছিলেন। তার মধ্যে আমার লেখাটিকে তিনি কভার

স্টোরি করে ছেপেছিলেন। পশ্চিমবাংলা সরকারের ওই অবরোধের বিরুদ্ধে পান্নালাল দাশগুপ্ত ও শৈবাল গুপ্ত নিজেরা পয়সা খরচ করে উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের দিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন। হাইকোর্ট সরকারকে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ নির্দেশ দিল 'পানীয় জল, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি, ওষুধপত্র ও চিকিৎসকদের অবাধ চলাচল করতে দিতে হবে মরিচঝাঁপিতে। মরিচঝাঁপি থেকে যাওয়া-আসায় বাধা দেওয়া যাবে না।' যেদিন হাইকোর্টের নির্দেশ ঘোষিত হল তার পরদিন একদল স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে লেখক ও সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত মরিচঝাঁপিতে পৌঁছেছিলেন। তার দু'দিন পরে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ 'যুগান্তর' পত্রিকায় জ্যোতির্ময়ের একটি অনবদ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি ছিল এরকম— সপ্তাহ দুয়েক পরে ভাতের হাঁড়ি চড়ানো হয়েছে উনুনে। উনুনের চারপাশে মাকে ঘিরে সন্তানেরা বসে আছে ভাত খাবে বলে। হাঁড়িতে টগবগ করে ভাত ফুটছে। সেই টগবগ শব্দ শিশুরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে— যেন ওই টগবগ শব্দ শত্রু দলনে ছুটে চলা শত সহস্র অশ্বখুরের ধ্বনি।

আমি প্রায় এক বছর ধরে মরিচঝাঁপির ওপর অসংখ্য রিপোর্ট লিখে অসংখ্য লোকের অবিমিশ্র প্রশংসা কুড়িয়েছি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে জড়িয়ে গালে গাল ঘষে অভিনন্দন জানিয়েছে। জ্যোতির্ময়ও আমাকে অনেক অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু জ্যোতির্ময়ের ভাত ফোটার শব্দের ওই লেখাটি তুলনাহীন। লেখাটি পড়তে পড়তে আমার চোখ দিয়ে অবিরলধারায় জল পড়েছে।

১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি মরিচঝাঁপিতে গুলি চলল। ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এ সম্পর্কে যে রিপোর্টটি ছাপা হয়েছিল, সেটি হল:

মরিচঝাঁপিতে গুলি· নিহত ৬, আহত ৫

স্টাফ রিপোর্টার: বুধবার বিকেলে উদ্বাস্তু ও পুলিশের সংঘর্ষের জেরে মরিচঝাঁপির উলটো দিকে কুমিরমারি পুলিশ ক্যাম্পে জনৈক কনস্টেবল আহত হন। উদ্বাস্তুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। বেসরকারি সুত্রে জানা যায়, ওই গুলি চালনার ফলে ছ'জন উদ্বাস্তু নিহত এবং পাঁচজন আহত হন।

গভীর রাতে রাজ্য পুলিশের ডিআইজি হেড কোয়ার্টার রমেন ভট্টাচার্য এই সংঘর্ষের কথা স্বীকার করেন, তবে বলেন, উদ্বাস্তুদের আক্রমণেই ছ'জন কনস্টেবল আহত হয়েছেন আর পুলিশের গুলি চালনায় একজন উদ্বাস্তু মারা গিয়েছেন।

কুমিরমারি পুলিশ ক্যাম্প থেকে রাত সাড়ে আটটায় চব্বিশ পরগনা পুলিশ সুপারের যে মেসেজ কলকাতায় আসে তাতে বলা হয়েছে, অফিসার ও কনস্টেবল-সহ মোট দশজন পুলিশ আহত হয়েছেন। উদ্বাস্তু মারা গিয়েছেন একজন।

আরও জানা যায়, প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের ডিআইজি সাধনজ্যোতি বর্মন বৃহস্পতিবার সকালেই মরিচঝাঁপি যাচ্ছেন।

ঘটনার সূত্রপাত হয় এদিন বিকেল চারটায়। কুমিরমারি পুলিশ ক্যাম্প করানখালি নদীর অপর পাড়ে। মরিচঝাঁপি থেকে একশো মিটার দূরে। গত তিন দিনে একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করার অভিযোগে প্রায় দেড়শো উদ্বাস্তুকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত উদ্বাস্তুদের রাখা হয়েছে ওই পুলিশ ক্যাম্পের একাংশে। এদিন বিকেলে কয়েকশো নৌকায় প্রায় তিন হাজার উদ্বাস্তু তির-ধনুক ও রামদা নিয়ে নদী পেরিয়ে চড়াও হন ওই পুলিশ ক্যাম্পে। উদ্দেশ্য ধৃত উদ্বাস্তুদের মুক্ত করা। উদ্বাস্তুদের আক্রমণে পুলিশ ক্যাম্পের জনৈক কনস্টেবল আহত হন। তারপরই পুলিশ গুলি চালায়। গুলির মুখে পড়ে উদ্বাস্তুরা দিশেহারা হয়ে যান। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যান মরিচঝাঁপিতে।

ঘটনার অব্যবহিত পরেই চব্বিশ পরগনার পুলিশ সুপার ওই পুলিশ ক্যাম্পে এসে হাজির হন। সন্ধ্যার মুখে টহলদারি পঁচিশটি পুলিশ লঞ্চ এসে জড়ো হয় ওই ক্যাম্পের সামনে। মরিচঝাঁপি অপারেশনের জন্য আটশো পুলিশ ওই এলাকায় বর্তমানে নিযুক্ত।

রাত একটা পর্যন্ত বিভিন্ন মহলে খোঁজ নিয়েও নিহত ও আহতদের নাম জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে বলা হয়, তাঁরা পরবর্তী মেসেজের অপেক্ষায় রয়েছেন।

ইতিমধ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশ করানখালি নদীতে লঞ্চ থেকে উদ্বাস্তুদের ওপর কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। এ ছাড়া চাল বোঝাই কয়েকটি নৌকাও পুলিশ আটক করেছে। ওই চাল মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের কাছে যাচ্ছিল। সরকার আর একটি সংবাদ পেয়েছেন তা হল: মরিচঝাঁপি দ্বীপের একাত্তরটি উদ্বাস্তু পরিবারের প্রায় তিন হাজার লোক দণ্ডকারণ্যে ফেরত যেতে চেয়ে পুলিশের কাছে এক প্রস্তাব দিয়েছেন। ওই প্রস্তাবে তাঁরা বলেছেন, পুলিশ সুপারকে তাঁরা দ্বীপে নামতে দেবেন ও তাঁকে নিরাপত্তা দেবেন এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। পুলিশ সুপার পাল্টা প্রস্তাবে ওই পরিবারগুলির নেতাদের পুলিশ লঞ্চে এসে আলোচনা করতে বলেছেন।

কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের কোনও জবাব উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে আসেনি।

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মরিচঝাঁপি দ্বীপের তীরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ও বুধবার পুলিশ এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ সংঘর্ষ হয়। উদ্বাস্তুরা পুলিশের লঞ্চে তির ছুড়ে আক্রমণ চালায়। লঞ্চ থেকে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। পুলিশ শেষে মরিচঝাঁপির কূল থেকে দূরে সরে যায়। পরে আরও বেশি সশস্ত্র পুলিশবাহিনী বোঝাই লঞ্চ গিয়ে ওই এলাকায় নদীপথে মরিচঝাঁপি ও বাগনার দরিয়ায় টহল দিতে শুরু করে। পুলিশের খবর, বুধবার সকালে হাজার হাজার উদ্বাস্তু মরিচঝাঁপির পাড়ে জমায়েত হন এবং সরকার-বিরোধী নানা স্লোগান দেন।

এই তারিখেই আনন্দবাজার পত্রিকায় আর একটি খবর বেরোয়:

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চান

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু সমস্যার স্থায়ী শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনতা নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়েছেন। জ্যোতিবাবু বুধবার রাজ্য জনতা পার্টির সভাপতি ফজলুর রহমানের সঙ্গে মহাকরণে এই ব্যাপারে আলোচনার সময় তাঁর ওই আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

রহমান সাহেব মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের বলেন, জ্যোতিবাবুর অনুরোধেই তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করতে মহাকরণে আসেন। তিনি নদিয়ায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে খবর পাঠান এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য।

তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মরিচঝাঁপিতে এক শ্রেণির উদ্বাস্তুদের বসবাস করার অনুমতি কেন রাজ্য সরকার দিতে পারেন না, তা ব্যাখ্যা করেন। উদ্বাস্তুদের অনেক আগেই দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু আগস্ট-সেপ্টেম্বরে প্রবল বন্যার ফলে রাজ্য সরকার এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা মরিচঝাঁপির দিকে নজর দিতে পারেননি। এখন কেন্দ্রীয় সরকার ওই উদ্বাস্তুদের ফেরার শেষ তারিখ ৩১ মার্চ স্থির করে দেওয়ায় রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। তবে কোনও অবস্থাতেই তাঁরা হিংসাত্মক পন্থা নিতে চান না। তাঁরা চান মরিচঝাঁপির ব্যাপারটা শান্তিতে মিটে যাক। যেহেতু রাজ্য জনতা পার্টি এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, সেহেতু সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে।

প্রফুল্লবাবু একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ নেতা, তিনিই বলুন কী উপায়ে শান্তিতে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। রাজ্য সরকার সব সময়ই এই উদ্বাস্তুদের পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসন চান।

রহমান সাহেব জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন, উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে ফিরে গেলে জনতা পার্টির কোনও আপত্তি নেই। তবে তাঁদের ওপর হিংসাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাঁদের জোর করে পাঠানোতে তাঁদের আপত্তি আছে। যা হোক, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে যেসব কথা বলেছেন তা তিনি প্রফুল্লবাবুকে জানাবেন এবং এই নিয়ে জনতা পার্টিতে আলোচনা হবে।

৩১ জানুয়ারির গুলিবর্ষণের পর জ্যোতিবাবু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত মরিচঝাঁপিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন রকমের 'চক্রান্তের' গন্ধ পেলেন। প্রমোদবাবু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পান্নালাল দাশগুপ্তের যোগাযোগকে গোড়া থেকে বিষনজরে দেখে আসছিলেন। রাজনৈতিকভাবে প্রমোদবাবু ও পান্নাবাবু স্বাধীনতার আগে থেকেই, বিশেষ করে ১৯৪২ সাল থেকেই দুই মেরুতে। অথচ দুজনে একই পরিবারের জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই। পান্নাবাবু একটু বড়। একান্নবর্তী পরিবারে দুজনে শৈশব থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছেন। প্রমোদবাবু শৈশবে মাতৃহারা এবং বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করায় প্রমোদবাবু তাঁর জ্যাঠাইমা অর্থাৎ পান্নাবাবুর মায়ের কাছে মানুষ। পান্নাবাবু ও প্রমোদবাবু দুজনেই একসঙ্গে বরিশালের 'শঙ্কর মঠে' বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বলতে গেলে দুজনে প্রায় একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে গান্ধীজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এই দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ এনে দেয়। পান্নাবাবু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পার্টি ছেড়ে দিয়ে। এই রাজনৈতিক বিচ্ছেদ দুজনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ককে এক তিক্ততম জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। মরিচঝাঁপিতেও এই দুজনের লড়াই ছিল সম্ভবত তাঁদের শেষ লড়াই। ৩১ জানুয়ারির গুলিবর্ষণের পর ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯৭৯) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই সংবাদটি বের হল:

'মরিচঝাঁপি কেন্দ্র করে গোপন চক্রান্ত চলছে'

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়: ছোট মোল্লাখালি (সুন্দরবন, ২১ ফেব্রুয়ারি): আজ বিকেলে স্থানীয় এম সি বিদ্যাপীঠ ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, মরিচঝাঁপিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার এক গোপন চক্রান্ত ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে। এর পেছনে দেশি ও বিদেশি নানা অশুভ শক্তির হাত রয়েছে।

ওই অশুভ শক্তিধররা চায় না যে বামফ্রন্ট সরকার শান্তিতে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে ছত্রিশ দফা কর্মসূচি সফল করে তুলুন। কারণ ওই সাফল্য তাহলে দেশের এক-আধটি রাজ্যে নয়, তামাম ভারতবর্ষে গরিবের রাজত্ব কায়েম করতে সক্ষম হবে।

আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ, তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, আরএসপি নেতা নিখিল দাস এবং চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার প্রমুখ পদস্থ অফিসার ও সাংবাদিকদের একটি দল নিয়ে পাঁচটি লঞ্চ ন্যাজাট থেকে ছোট মোল্লাখালির দিকে রওনা দেয়। লঞ্চে সকলের জন্য চা-জল-খাবার ছাড়াও দুপুরে ভাত, ডাল, ভাজা, মাছের ঝোল, চাটনি, দই ও মিষ্টির বন্দোবস্ত ছিল। বেলা দুটো নাগাদ করানখালি নদীতে ঢুকতেই আরও প্রায় এক ডজন পুলিশ লঞ্চ এসে পড়ে। নদীর এক পাড়ে কুমিরমারি গ্রাম নীরব নিস্তব্ধ। অন্য পাড়ে মরিচঝাঁপি। ঝাউ ও নারকেল বাগানের ফাঁকে ফাঁকে মাটি ও গোলপাতায় ছাওয়া ঘরগুলো বাঁধের সমান্তরাল রেখায় দাঁড়িয়ে। আর ওই বাঁধের ওপর সার দিয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক হাজার শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, তরুণ ও তরুণী। এরাই দণ্ডকফেরত উদ্বাস্তু। এদেরই দণ্ডকারণ্যে ফেরত যাওয়ার জন্য আশপাশের গাঁ-গঞ্জের মানুষজনকে অনুরোধ জানাতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এসেছেন ছোট মোল্লাখালিতে মিটিং করতে।

গোসাবার আরএসপি এমএলএ গণেশ মণ্ডলের সভাপতিত্বে সভা শুরু হতেই দেখা গেল, সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় বাঁশের বেড়া টপকে ওড়নাপরা এক বুড়ি এক মুঠো শাক নিয়ে মঞ্চের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। দুজন আরএসপি ভলান্টিয়ার গিয়ে তাঁকে জাপটে ধরলেন। বুড়ির বক্তব্য মঞ্চে উঠে জ্যোতিবাবুকে দেখাবেন তাঁরা কী খেয়ে বেঁচে আছেন। হাতের শাক হল যদুপালং।

জ্যোতিবাবু তাঁর ভাষণে বললেন, একেই পশ্চিমবঙ্গে হাজারো সমস্যা। সবে ক্ষমতায় এসে তাঁরা যখন ওই সব সমস্যার মোকাবিলা শুরু করেছেন, তখন হঠাৎ বন্যার স্রোতের মতো লাখের ওপর উদ্বাস্তু ফিরে এলেন দণ্ডকারণ্য থেকে। বলে-কয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক লাখ লোককে বামফ্রন্ট সরকার ফেরত পাঠাতে পেরেছেন। কিন্তু বেঁকে দাঁড়িয়েছেন শুধু মরিচঝাঁপির দশ হাজার। উনি বললেন, ইচ্ছা করলেই একদিনে সবাইকে ফেরত পাঠাতে পারেন। তা করবেন না। জোর জুলুম বামফ্রন্ট সরকারের নীতি নয়। তবে তাঁদের যেতেই হবে। বন সম্পদ ধ্বংস করা চলবে না। সরকারি জমি

নিজেদের ইচ্ছামতো বিলি বন্দোবস্ত করা চলতে পারে না। মরিচঝাঁপি কি একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র যে সেখানে রাজ্য সরকারের পুলিশ যেতে পারবে না?

জ্যোতিবাবু বলেন, বিরোধী দলনেতা কাশীকান্ত মৈত্র ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নিয়ে এক নোংরা রাজনীতির খেলা শুরু করেছেন। আর সেই খেলার উদ্দেশ্য বামফ্রন্ট সরকারকে হটানো। অথচ কেন্দ্রের জনতা সরকার তাঁকে বারবার বলছেন উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাতে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশাই মশাই এঁদের অবিলম্বে ফেরত পাঠাতে বলেছেন। বারণ করছেন এঁদের জন্য রিলিফ ক্যাম্প খুলতে বা সাহায্য দিতে। কিন্তু তিনি তো আর অমানুষ নন। তাই বসিরহাটে নতুন করে ক্যাম্প বসানোর ব্যবস্থা করছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তাঁর বক্তব্য প্রতিবেশী উদ্বাস্তুদের বুঝিয়ে বলুন দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে। যদি সেখানে তাঁদের কোনও কষ্ট হয় তাহলে বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।

উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষ বললেন, বামফ্রন্ট সরকারের কোনও ত্রুটি খুঁজে না পেয়ে বিরোধী দলগুলি মরিচঝাঁপি নিয়ে সরকার-বিরোধী চক্রান্ত শুরু করেছে।

নিখিল দাস বলেন, আনন্দবাজার ও অন্যান্য বড় কাগজগুলো বড়লোকের স্বার্থবাহী মিথ্যার বেসাতিতে ব্যস্ত। মরিচঝাঁপির ব্যাপারে তিনি শ্রোতাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, খবরের কাগজ মানেই বেদবাক্য নয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন, বিচারবিভাগীয় তদন্ত নয়, জনতার প্রকৃত প্রতিনিধি বামফ্রন্টের মন্ত্রীদের দিয়ে মরিচঝাঁপির গুলি চালনার তদন্ত করতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়োজন হলে তাই করা হবে। সেই সঙ্গে জ্যোতি বসু ঘোষণা করেন, ওই গুলিচালনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি পরিবারকে পাঁচ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে। নিখিলবাবুর বক্তৃতার পর যখন জ্যোতিবাবু বলতে ওঠেন, তখন ছোট ছোট দলে কিছু কিছু লোক সভা ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেন। ঠিক পৌনে পাঁচটায় সভা শেষ হয়। পাঁচটা নাগাদ লঞ্চগুলো আবার ন্যাজাটের দিকে যাত্রা শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা যায় কাঠ কাটা, মাছ মারা বন্ধ হওয়ার ফলে মরিচঝাঁপির দশ হাজার মানুষের অর্ধেক এখন যদুপালং শাক আর ধুনো কেওড়া ফল সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। লঞ্চে সাংবাদিক ও পদস্থ অফিসার ও মন্ত্রীদের বৈকালিক জলখাবারের ব্যবস্থাও ছিল।

ওই একই তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মরিচঝাঁপি নিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়:

> তোহার লোক মরিচঝাঁপি যাতায়াত করছে: প্রমোদবাবু
>
> স্টাফ রিপোর্টার: সিপিআই(এম) নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত বুধবার কলকাতায় অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের উগ্রপন্থী নেতা তোহার লোকেরা মরিচঝাঁপিতে যাওয়া-আসা করছে। তিনি বলেন, মরিচঝাঁপি বাংলাদেশের খুলনার সীমান্তে। খুলনায় উগ্রপন্থীদের একটা বড় ঘাঁটি রয়েছে।
>
> প্রমোদবাবু বলেন, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইও নিশ্চয় রাজি হবেন না যে উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপিতেই থাকুক এবং সুন্দরবন ধ্বংস করে সেখানে বসবাস করুক। প্রফুল্ল সেন তো একবারও বলছেন না যে, 'ওহে তোমরা মরিচঝাঁপি ছাড়ো। তোমাদের যাতে দণ্ডকারণ্যে বসবাসের সুব্যবস্থা হয় তা দেখব।'
>
> প্রমোদবাবু স্পষ্টই বলেন, মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুরা গাছ কেটে বাইরে কাঠ বিক্রি করবে। সীমান্ত এলাকায় একটা আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করবে। এটা রাজ্য সরকার কিছুতেই মেনে নেবে না।
>
> পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম) হিংসার রাজত্ব চালাচ্ছে বলে মঙ্গলবার দিল্লিতে জনতা পার্টির তিন এম পি— বিজয়সিং নাহার, শক্তিকুমার সরকার এবং এম. এ. হান্নান যে অভিযোগ করেছেন সে সম্পর্কে প্রমোদবাবুর অভিমত চাইলে তিনি বলেন, প্রত্যেকেরই কথা বলার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে।
>
> দণ্ডকারণ্যের যে উদ্বাস্তুরা গত দশ মাস ধরে মরিচঝাঁপিতে বসবাস করছেন, সে সম্পর্কে সীমান্তরক্ষীবাহিনী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে তাঁদের রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। তাঁরা উল্লেখ করেছেন, মরিচঝাঁপি থেকে খুলনা জেলার সীমান্তের দূরত্ব সরলরেখা অনুযায়ী আট থেকে দশ মাইল। গত এপ্রিল মাসে হাসনাবাদ থেকে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে খুলনা জেলায় প্রবেশ করার চেষ্টা করলে বাংলাদেশ রাইফেলস তাঁদের আটকান এবং সীমান্তরক্ষীবাহিনীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে উভয় বাহিনীর লোকেরা ওই উদ্বাস্তুদের বুঝিয়ে আবার হাসনাবাদে পাঠিয়ে দেন।

মরিচঝাঁপিতে অর্থনৈতিক অবরোধ ও 'বনভূমি রক্ষা' আইন প্রয়োগের ফলে উদ্বাস্তুদের একাংশের মনোবল ভেঙে পড়ে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে,

দণ্ডকারণ্যে যারা পুনর্বাসন পেয়েছে, বিশেষ করে ফরাসগাঁও, উমরকোট এলাকায় যে সব উদ্বাস্তুর বসতি রয়েছে তারা অনেকেই দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে আরম্ভ করল। তবে এই উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবাংলার সিপিআইএম ও সরকারের প্রতি এতখানি ঘৃণা পোষণ করছিল যে তারা ট্রেনের টিকিট কেটে ফিরে গিয়েছে। এই উদ্বাস্তুদের সংখ্যা কত তার হিসাব রাজ্য সরকারের কাছে ছিল না। একমাত্র দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে এই পরিসংখ্যান ছিল। তবে সাধারণভাবে একটা 'শেষ লড়াই' চালিয়ে যাওয়ার মনোবল উদ্বাস্তু নেতাদের মধ্যে ছিল। এই মানসিক দিক বিচার করে উদ্বাস্তু নেতাদের মনোভাব ৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি হল:

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা 'আত্মসমর্পণ' করেননি

স্টাফ রিপোর্টার: মরিচঝাঁপিতে বসবাসকারী দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুরা কেউ আত্মসমর্পণ করেননি। তাঁরা কেউই মরিচঝাঁপির মাটি ছেড়ে কুমিরমারির পুলিশ শিবিরে আশ্রয় নেননি। যে ২১টি পরিবারের প্রায় একশো লোক কুমিরমারির পুলিশ শিবিরে আশ্রয় নেওয়ার পর মঙ্গলবার হাসনাবাদের শিবিরে স্থানান্তরিত হয়েছেন, তাঁদের দণ্ডকারণ্যে বসতি ছিল কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া মেদিনীপুর জেলার দুধকুণ্ডি শিবিরে যে মাত্র ৮৩ জন উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁরাও আদৌ দণ্ডকারণ্যে ছিলেন কি না তা যাচাই করা চলছে।

ইতিমধ্যে চব্বিশ পরগনার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে মরিচঝাঁপিতে পুলিশের তাঁবু পড়ার পরও মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়নি। সরকারি কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, বুধবারের মধ্যে ওই রূপ যোগাযোগ সম্ভবত হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় দু-হাজার শিশু ও অল্পবয়সি ছেলে-মেয়ে এবং হাজার তিনেক মহিলা রয়েছেন।

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে জনতা পার্টি আগামীকাল বৃহস্পতিবার কলকাতা শহিদ মিনার ময়দানে একটি জনসভা করছেন। বিকেল ৩টেয় এই জনসভায় বক্তৃতা করবেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং কাশীকান্ত মৈত্র-সহ কয়েকজন নেতা।

মরিচঝাঁপি থেকে অবিলম্বে পুলিশি অবরোধ তুলে নিয়ে দণ্ডকাগত উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতেই পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতে 'আমরা বাঙালি' সংস্থা সারা বাংলা জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবেন। মঙ্গলবার ওই

সংস্থার সাংগঠনিক সম্পাদক অমলেশ ভট্টাচার্য এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান। তিনি বলেন, মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের জন্য গুলি চালানো হয়েছে। বেআইনি অবরোধ চলছে। ত্রিপুরায়ও জমি থেকে বাঙালিদের উচ্ছেদের জন্য চক্রান্ত চলছে। এসবের প্রতিবাদে আজ বুধবার বিকেল পাঁচটায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সমাবেশ হবে।

অমলেশবাবু অভিযোগ করেন, মরিচঝাঁপির চারদিকে অবরোধ সৃষ্টি করে যেমন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না, সেখানকার প্রকৃত অবস্থা জানতে দেওয়া হচ্ছে না, ত্রিপুরায়ও বাঙালি উচ্ছেদের প্রতিবাদে যে সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে ফ্যাসিস্ট কায়দায় সেগুলি দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক অবরোধের ব্যাপারে হাইকোর্টে মামলা লড়ার সময় বিশিষ্ট আইনজীবী হিসাবে কাশীকান্ত মৈত্র এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা জনতা পার্টির নেতাদের সেখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা কাশীকান্ত মৈত্রের নেতৃত্বে এমএলএ-দের একটি দল সেখানে যাবেন। রাজ্য সরকার জেলা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয় যে, জনতা পার্টির নেতাদের যেন কিছুতেই মরিচঝাঁপিতে ঢুকতে দেওয়া না হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) কাশীবাবুর নেতৃত্বে সাত জন এমএলএ-র একটি দল এবং তাঁদের সঙ্গে চার জন সাংবাদিক ক্যানিং থেকে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চে রওনা হন। ওই দলে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রিপোর্টার হিসাবে আমি ছিলাম। ক্যানিং লঞ্চঘাটে সুন্দরবন 'টাইগার প্রজেক্ট'-এর ডিরেক্টর ড. কল্যাণ চক্রবর্তী আমাকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বললেন, "আপনাদের ঢুকতে না দেওয়ার জন্য মরিচঝাঁপির নদীতে অহর্নিশি পুলিশের টহলদারি চলছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার তাঁদের ISTHAR লঞ্চ মরিচঝাঁপির কাছে নোঙর করেছে। এখন কীভাবে ঢুকবেন ভাবুন...।" আমি কাশীবাবুকে এই কথা জানিয়ে দিলাম। বিকেল থেকে আমাদের লঞ্চের পিছনে একটি পুলিশের লঞ্চ নজরদারি করে যাচ্ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের লঞ্চটি সাধারণ যাত্রীবাহী লঞ্চ, সেহেতু তার যাত্রী ওঠানো-নামানোতে অনেকটাই দেরি হচ্ছিল। ফলে একটা সময়, সন্ধ্যার পর পুলিশের লঞ্চ আমাদের ছাড়িয়ে অনেকটা দূর এগিয়ে গেল। এই সময় জনতা পার্টির 'গাইড' লঞ্চের সারেংকে অনুরোধ করলেন লঞ্চটিকে একটু পিছিয়ে নিয়ে একটা ঘাটে আমাদের সকলকে নামিয়ে দিতে। রাত তখন আটটা বেজে গিয়েছে। আমরা লঞ্চ

থেকে নেমে ফসল উঠে-যাওয়া খেতের আল ধরে হেঁটে চলেছি। ওইভাবে হাঁটতে অনেকেরই কষ্ট হচ্ছিল। মাইলখানেক হাঁটার পর একটা স্কুলবাড়িতে এসে পৌঁছলাম। পাশেই হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। 'গাইড' সেই বাড়িতে ছুটে গেলেন। হেডমাস্টারমশাই তাঁর লোকজন নিয়ে বেরিয়ে এলেন। হেডমাস্টারমশাইয়ের সহায়তা স্মরণীয়। স্কুলটি 'কো-এডুকেশন' হওয়ার ফলে কয়েকজন শিক্ষিকাকেও ডেকে আনা হল। রাত তখন প্রায় দশটা। ওই রাতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের ১২/১৩ জন লোকের খাওয়া, থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরদিন অর্থাৎ ১১ ফেব্রুয়ারি ভোর ছ'টায় আমরা স্কুলবাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা হেঁটে মরিচঝাঁপি দ্বীপের এক প্রান্তের বিপরীতে কুমিরমারি দ্বীপের একটি বাড়িতে উঠলাম সকাল আটটা নাগাদ। বাড়িটি একেবারে নদীর পাড়ে। নদীর পাড়ে ২/৩টি নৌকা বাঁধা রয়েছে। এই সময় একটা লঞ্চের শব্দ কানে আসতেই আমরা সকলেই বাড়ির আড়ালে লুকিয়ে গেলাম। লঞ্চের গতি দেখে মনে হল যে ভাটার টানে দ্রুত চলেছে। সুতরাং লঞ্চটির ঘুরে আসার বেলায় তাকে উজানে আসতে হবে। ফলে সময় লাগবে বেশি। আমি কাশীবাবুকে বললাম, এখনই নদী পাড়ি দিতে হবে পুলিশের লঞ্চ ফিরে আসার আগে। আমার কথামতো সবাই রাজি হলেন। দুটো নৌকায় আমরা মিনিট দশেকের মধ্যে মরিচঝাঁপির দিকে পৌঁছলাম। আমাদের একটু বেশি হাঁটতে হল। কিন্তু বিনা বাধায় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু উপনিবেশে পৌঁছতে পারলাম। উপনিবেশের কাছে উদ্বাস্তুদের প্রহরীরা কাশীবাবু ও স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্যকে চিনতে পারায় তাঁরা দৌড়ে গিয়ে নেতাদের খবর দিলেন। নেতারা ছুটে এলেন। আরম্ভ হল শঙ্খধ্বনি ও স্লোগান। পুলিশের টহলদারি লঞ্চগুলো বুঝে নিল কিছু 'বহিরাগত' লোক 'আইন ভেঙে' মরিচঝাঁপিতে ঢুকে পড়েছে। পুলিশ তাদের আটকাতে পারেনি। দশ-বারোটি লঞ্চ নদীর মাঝখানে থেমে বুঝতে চেষ্টা করল যে উদ্বাস্তু উপনিবেশের ভিতর কী হচ্ছে। আমি বুঝে নিলাম যে, মরিচঝাঁপি থেকে ফেরার পথ মোটেই নিষ্কণ্টক হবে না। কাশীকান্ত মৈত্র উদ্বাস্তুদের সামনে বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা দিলেন স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য, যিনি পঞ্চাশের (১৯৫০) যুগ থেকে উদ্বাস্তু আন্দোলনের একজন স্বীকৃত নেতা। বরিশালের লোক, বাচনভঙ্গিতে তিনি তা কখনও গোপন করতে পারতেন না। উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল জনতা পার্টির নেতাদের এবং রিপোর্টারদের তথ্য ও পরিসংখ্যানযুক্ত একটি সুলিখিত স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। সতীশবাবু জানিয়েছিলেন যে, মাত্র দিনচারেক আগে পান্নালাল দাশগুপ্ত ও শৈবাল গুপ্ত মশাইকে তাঁরা লুকিয়ে মরিচঝাঁপি এনেছিলেন। ঠিক ছিল পরের দিন ফিরে যাবেন। কিন্তু সতীশবাবুরা রাতে খবর পেলেন যে পান্নাবাবু ও শৈবালবাবুকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন জ্যোতিবাবু। গভীর রাতে উদ্বাস্তু নেতারা

তাঁদের জানালেন, তিন-চারটে বড় মাছধরার নৌকা জড়ো করে ওই দুই বৃদ্ধকে নৌকায় তুলে ভোরবেলা সন্দেশখালিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ওই সময়ে শৈবাল গুপ্তের বয়স ৭৭ বছর, আর পান্নালাল দাশগুপ্ত ৮০ পেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাঙালির সমাজজীবনের ওই দুই মহানুভব ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসুর সরকারের কাছে কতটা 'বিপজ্জনক' হয়ে পড়েছিলেন!

মরিচঝাঁপিতে ঘণ্টা দেড়েক থেকে আমরা যখন নৌকায় করে কুমিরমারির দিকে ফিরছি তখন পুলিশ লঞ্চগুলো মাঝদরিয়ায় আমাদের আটকে দিল। নৌকা থেকে আমাদের পাড়ে নামিয়ে বাগনা ফরেস্ট অফিসে নিয়ে আসা হল। বন বিভাগের অফিসটি ছিল 'Operation Marichjhanpi'-র কন্ট্রোল রুম। সেখানে একজন পুলিশ অফিসার আমাদের নাম, বাপের নাম, পেশা, বয়স, ঠিকানা এবং মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের কাছে যাওয়ার কী উদ্দেশ্য তা আমাদের কাছ থেকে শুনে লিখে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে ওই অফিসার কাশীকান্ত মৈত্রকে বললেন, "স্যার, এই লঞ্চ আপনাদের নেজাত নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আপনারা বাসে কলকাতা চলে যেতে পারবেন।" তখন বেলা বারোটা গড়িয়ে গিয়েছে। লঞ্চে উঠে প্রায় সকলেই ক্লান্ত দেহে বেঞ্চে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল যে, পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করেনি তো? পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করে লক আপে ঢোকাবার আগে সংশ্লিষ্ট লোক বা লোকদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো রেকর্ড করে, এখানে আমাদের ক্ষেত্রেও করেছে পুলিশ। আমি লঞ্চের ছাদে গিয়ে উঠলাম। সেখানে সারেঙের কেবিনে পুলিশের রেডিয়ো-টেলিফোন সেট নিয়ে একজন সাব-ইনস্পেক্টর ও একজন সহকারী পুলিশ রয়েছে। আমি উদাসীন ভাবে কেবিনের পাশ দিয়ে গিয়ে পিছনে লঞ্চের চালের উপর বসে পড়লাম। উদ্দেশ্য রেডিয়ো-টেলিফোনে কী ধরনের বার্তা বিনিময় হয় তা শুনে নেওয়া। কিছুক্ষণ পরেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। লঞ্চ থেকে পুলিশ অফিসার অন্যদিকে কাউকে জানাচ্ছেন, "স্যার, এখন আমরা উজানে যাচ্ছি।... কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছি?... বলছি স্যার...।" একথা বলে পুলিশ অফিসার সারেংকে নদীর পাড়ের এলাকার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি নীচে নেমে এসে ইঞ্জিনচালকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁর সঙ্গে ভাব করে জানতে চাইলাম, নেজাত পর্যন্ত সারাটা পথ কি আমাদের উজানেই যেতে হবে? ইঞ্জিনচালক সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, "...না, স্যার, একটু পরেই জোয়ার পেয়ে যাব... তখন হাওয়ার মতো ছুটবে...।" মিনিট পনেরো পরে লঞ্চের গতি দেখে বুঝলাম যে জোয়ার পেয়ে লঞ্চ দ্রুত ছুটছে। লঞ্চ যখন জোয়ারের ধাক্কায় জোরে ছুটে চলেছে, তখনই সারেঙের কেবিনে বসা পুলিশ অফিসার নীচে নেমে এসে কাশীবাবুকে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বলল, "স্যার, আপনাদের তো দুপুরে খাওয়া

হয়নি। সামনেই একটা বড় বাজারে লঞ্চ ভিড়িয়ে দিচ্ছি... আপনারা কিছু খাবার কিনে আনুন।' আমি আপত্তি করার আগেই স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য লাফিয়ে উঠলেন, "এইটা তো ভালো কথা।" লঞ্চ ভিড়ল। স্বরাজবাবু বাজারে ঢুকলেন সঙ্গে আর একজনকে নিয়ে।

আমি ছটফট করছি। আবার লঞ্চের ছাদে উঠলাম। যদি রেডিয়ো-টেলিফোনের কথাবার্তার কিছু শোনা যায়। উৎফুল্ল কণ্ঠে পুলিশের সেই লোকটি কাউকে বলছেন, "স্যার লঞ্চ বাইন্ধ্যা দিচ্ছি... চিন্তা নাই... ওভার...।" আমি লঞ্চ থেকে এক লাফে পাড়ে নেমে স্বরাজদা'র নাম ধরে চিৎকার করছি। স্বরাজদা খুব সরল মানুষ। আমি জোর দিয়ে বলি, "আর খাবারের দরকার নেই। চলুন তো...।" লঞ্চ ছেড়ে দিতেই আমি ইঞ্জিনচালকের কাছে গিয়ে মিনতি করে বললাম, "একটু বেশি জোরে চালিয়ে দিন।" এবার ইঞ্জিনচালক আমাকে ফিসফিস করে বললেন, "ব্যাপার কী? উপর থেকে পুলিশের লোকটা আস্তে চালাইতে কয়।" ইঞ্জিনচালক আমার কথা মেনে জোরে চালিয়ে দিল। পুলিশের সময়ের হিসাব বানচাল করে জোয়ার এবং ইঞ্জিনচালক অনেক আগেই আমাদের নিয়ে নেজাত চলে এল। লঞ্চ নেজাতের জেটিতে ভিড়তেই একজন পুলিশ অফিসার কাশীকান্ত মৈত্রের কাছে ছুটে এসে বললেন, "স্যার, আপনারা লঞ্চেই বিশ্রাম করুন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কলকাতার বাস আসতে এখনও অনেক দেরি।" আমি কাশীদাকে একটা চিমটি কেটে পুলিশ অফিসারের পাশ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়লাম। কাশীবাবুও পুলিশের অনুরোধ না শুনে জেটি থেকে নেমে পড়লেন। আমরা সকলে তখন ভাগ ভাগ হয়ে তিন-চারটে দোকানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি। আমার সঙ্গে 'হলধর পটল'— 'সত্যযুগ' কাগজের রিপোর্টার, আর ফটোগ্রাফার অশোক বসু। আমি হলধর ও অশোককে চুপিচুপি আমার আশঙ্কা বলে ফেললাম। মরিচঝাঁপিতে যেটা পুলিশ পারেনি সেটা এখানে করবে। আমাদের এখানে অ্যারেস্ট করতে পারে। আমাদের কলকাতার বাসে উঠতে দেবে কি না সন্দেহ। এখানে মাত্র একজন অফিসার ও একজন কনস্টেবল। এরা অতিরিক্ত বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছে। আমি ফটোগ্রাফার অশোকের কাছ থেকে মরিচঝাঁপির ছবির রোল আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। হলধরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বললাম, চেঁচিয়ে কিছু বলো না। এর মধ্যে কলকাতা থেকে সিএসটিসি'র বাস এসে গেল। আমি ছাড়া আর সকলেই সরকারি বাসে উঠে পড়লেন। আমি বাসটির চারপাশে ঘুরঘুর করছি। এই সময় পুলিশ কনস্টেবলটি বাসের ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে গেল সেই পুলিশ অফিসারের কাছে। ড্রাইভার ফিরে এসে কন্ডাক্টর দুজনকে চেঁচিয়েই বলে দিল, "পুলিশ এই বাস এখন ছাড়তে দেবে না। প্যাসেঞ্জারদের বলে দাও।" পাশে ওই চত্বরে বসিরহাট ও ইটিণ্ডা যাওয়ার দুটো

প্রাইভেট স্পেশ্যাল বাস দাঁড়িয়ে আছে। কাশীবাবুকে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতে বলে আমি তাঁকে বলে দিলাম, "আমাকে খুঁজবেন না।"

অতি দ্রুত একটা রিকশায় চেপে বসিরহাটের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। দু-তিন মিনিট পরেই পিছনে বাসের শব্দ শুনে রিকশা থেকে নেমে বসিরহাটগামী বাসে উঠে পড়লাম। প্রচণ্ড টেনশন থেকে অবশেষে রেহাই পেলাম। বসিরহাট-বারাসত রোডের মোড়ে এসে বাস থেকে নেমে বারাসতের বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমি বারাসত আসার বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, তখনই দু ট্রাক ভর্তি পুলিশ ও একটি পুলিশের জিপগাড়ি নেজাতের রাস্তায় বাঁক নিল। বুঝতে পারলাম, এই পুলিশবাহিনীই মরিচঝাঁপি-ফেরতা জনতা পার্টির এমএলএ ও রিপোর্টারদের গ্রেফতার করবে। সে দিনটা ছিল রবিবার (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯)। আমি বারাসত থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে অফিসে এলাম রাত প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ। অফিসের গেটে আমি যখন ট্যাক্সিওয়ালাকে অনেকগুলো টাকা দিচ্ছিলাম, তখন অভীক সরকার (যিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ বিভাগের সবটাই তদারকি করতেন) অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার? আমি সংক্ষেপে সামান্য একটু বলতেই তিনি আমার সঙ্গে আবার অফিসে ফিরে এলেন। সব শুনে তিনি আমাকে, আমার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, "আপনি পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে চলে এসে ঠিকই করেছেন। পাঠকদের কাছে আপনার দায়বদ্ধতা আছে।" পরের দিন ১২ ফেব্রুয়ারির 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় আমার এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল:

মরিচঝাঁপি থেকে ফেরার পথে সাত
এমএলএ ও সাংবাদিক ধৃত

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু উপনিবেশ সফর করে আসার পর রবিবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা কাশীকান্ত মৈত্র ও জনতা পার্টির আরও ছ'জন এমএলএ-কে বসিরহাটের কাছে একটি বাস থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ওই বাসে কলকাতার একদল সাংবাদিকও ছিলেন, তাঁদেরও এই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর রাতে তাঁদের বসিরহাট থানায় নিয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কাশীবাবু-সহ সাতজন এমএলএ ও জনতা পার্টির আরও বারোজন কর্মী আটক থাকেন। তাঁদের ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি নিতে বলা হলে তাঁরা অস্বীকার করেন।

রবিবার খুব ভোরে কাশীবাবু তাঁর দলের সহকর্মীদের নিয়ে কুমিরমারি দিয়ে করানখালি নদী অতিক্রম করে মরিচঝাঁপিতে প্রবেশ করেন। তারপর সাংবাদিকদের [সাংবাদিকরা] পৃথক ভাবে ওই একই পথে মরিচঝাঁপি দ্বীপে পৌঁছন। তখন কোনও পুলিশ লঞ্চ নদীর ওই প্রান্তে ছিল না। ফলে, তাঁরা পুলিশের বিনা বাধায় সেখানে যান। কিন্তু ফেরার সময় সাংবাদিকরা যখন আগে দুটি খেয়ায় নদী পার হচ্ছিলেন, তখন পুলিশ লঞ্চ তাঁদের কুমিরমারি চরে আটকায়। সেখান থেকে তাঁদের ফরেস্ট রেনজারের (বাগনার) অফিসে নিয়ে আসা হয়। এর প্রায় আধ ঘণ্টা পরে কাশীবাবু সহ অন্যান্যদের নিয়ে এসে বিভিন্ন রকম জেরা করা হয়। সাংবাদিকদের যে পুলিশ লঞ্চটি আটকায়, তার একজন অফিসার ফটোগ্রাফারদের ছবির রোল খুলে দিতে বলেন। কাশীবাবুকে জেরা করলে তিনি জবাব দেন, মানবতার খাতিরে তিনি মরিচঝাঁপি গিয়েছিলেন। তিনি যে সেখানে প্রবেশ করবেন তা তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন। সরকারের অবরোধ অবস্থার ফলে মরিচঝাঁপির নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষদের প্রতি সমবেদনা জানাতে তিনি গিয়েছিলেন। সুতরাং এর পর সরকার যা করতে চান তা করতে পারেন। তখন ওখানকার প্রশাসনিক ও পুলিশ অফিসাররা বলেন, আপনাদের গ্রেফতার করছি না। আমাদের লঞ্চ আপনাদের নেজাত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। ওই লঞ্চে তাঁরা বিকাল সাড়ে চারটায় নেজাত পৌঁছান। নেজাতে পৌঁছনোর পর তাঁরা যখন স্টেট ট্রান্সপোর্টের কলকাতামুখী বাসে উঠতে যাবেন তখন একজন পুলিশ অফিসার দৌড়ে এসে বলেন, "স্যার আপনারা এখন কেউ যেতে পারবেন না। আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের ওপরের নির্দেশ আছে।" কাশীবাবু ও অন্যরা বাস থেকে নামতে অস্বীকার করলে পুলিশ বাসচালককে বাস ছাড়তে নিষেধ করেন। বাসের পিছনে রাইফেলধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে যায়। এই সময় সংবাদ পাওয়া যায় যে কাশীবাবু ও সাংবাদিকদের কুমিরমারি পুলিশ ক্যাম্পে গ্রেফতার না করার জন্য স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সাসপেনশনের হুমকি দিলে ওই অফিসাররা ওয়ারলেসে নেজাতের পুলিশকে খবর দেন, ওঁদের আটকান, ওঁদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সংবাদ যাতে কলকাতায় পৌঁছে দেওয়া যায়, সেজন্য একজন সাংবাদিক পুলিশ কিছু বুঝতে পারার আগেই নেজাত থেকে বসিরহাটগামী একটি চলন্ত প্রাইভেট বাসে লাফিয়ে উঠে পড়েন। রাত সাতটার পর কাশীবাবু ও সাংবাদিকদের বসিরহাট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কাশীবাবু ক'দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তার ওপর তাঁরা

সকলেই অভুক্ত ও অস্নাত ছিলেন। আগে তাঁরা সকালে প্রায় আট মাইল পথ পায়ে হেঁটে দুটি নদী পার হয়ে মরিচঝাঁপি ঘুরে আসেন।

জনতা পার্টির নেতারা যাতে মরিচঝাঁপিতে প্রবেশ করতে না পারেন সেজন্য শনিবার রাত একটা পর্যন্ত কুমিরমারির দিকে প্রচুর পুলিশ ও পুলিশ লঞ্চ টহল দেয়। ওদিকে মরিচঝাঁপিতেও কয়েক হাজার উদ্বাস্তু তাঁদের অপেক্ষায় ছিলেন। সকালে কাশীবাবু ওখানে পৌঁছলে উদ্বাস্তুরা মিছিল করে তাঁদের নিয়ে যান। সেখানে উদ্বাস্তুদের সমাবেশে নেতারা বক্তৃতা করেন। কমপক্ষে প্রায় পনেরো হাজার উদ্বাস্তু সমাবেশে যোগ দেন।

সমাবেশ থেকে উদ্বাস্তু নেতারা পুলিশের বিরুদ্ধে বহু অত্যাচারের অভিযোগ করেন। প্রতিটি উদ্বাস্তু বক্তৃতা দিতে উঠে কাঁদতে থাকেন। পুলিশের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তু মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচারের দুটি নির্দিষ্ট অভিযোগ করা হয়। তাঁদের একটি হল— মরিচঝাঁপির কাঁকসা এলাকার সবিতা ঢালি সম্পর্কে (পিতার নাম যতীন ঢালি)। সবিতাকে তাঁর ঘর থেকে পুলিশ লঞ্চে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে এখনও ফেরত দেওয়া হয়নি। আর একজন হলেন বিশাখা মণ্ডল। বনবিবির মন্দির এলাকায়। তাঁকে গত মঙ্গলবার তাঁর বাড়ি থেকে মা-সহ নিয়ে যাওয়া হয়। বিশাখা শনিবার রাতে কুমিরমারির ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসেন। বিশাখা সকলের সামনে বলেন, ক্যাম্পে তাঁকে বিবস্ত্র করা হয়েছিল। তিনি আর কিছু বলতে পারেননি। তাঁর মাকে এখনও ক্যাম্পে ধরে রাখা হয়েছে। তাঁর বাবার নাম সতীশ মণ্ডল। তিনি সারাক্ষণ সমাবেশে কাশীবাবুর পায়ের কাছে বসে কাঁদছিলেন।

এই সমাবেশে অভিযোগ করা হয়, ৩১ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে ৩০ জন উদ্বাস্তু মারা গেছেন। তার মধ্যে ন'টি দেহ কলাগাছিয়ায় ভেসে ওঠে। বাকি ২০টি লাশ সন্দেশখালিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ওইদিন পুলিশের গুলিতে মেনি মুণ্ডা নামে স্থানীয় যে মহিলা মারা যান, তাঁর সঙ্গে তাঁর এক শিশু ছিল। সেও মার কোলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। মেনি মুণ্ডার প্রায় ন' বছর বয়সের একটি ছেলেকেও মা'র মৃতদেহের সঙ্গে পুলিশ লঞ্চে টেনে তোলা হয়। তাকে লঞ্চে একজন পুলিশ গুলি করতে উদ্যত হলে অন্য একজন পুলিশ বাধা দেয়। ফলে, তার প্রাণ রক্ষা পায়। কিন্তু তাকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দেওয়া হয়।

তাঁরা অভিযোগ করেন, অবরোধের ফলে অনাহারে ২৭ জন উদ্বাস্তু মারা গিয়েছেন। তার মধ্যে একজন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

৩১ জানুয়ারি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, গুলিবর্ষণের পর ১২৪ জন উদ্বাস্তু নিখোঁজ। বুলেটবিদ্ধ হয়ে একজন আর জি কর হাসপাতালে আছেন, তাঁর নাম সন্তোষ সরকার। হাসপাতালে তাঁর একটি পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। গুলিতে নিহত দুজনের নাম সংগ্রহ করা গিয়েছে। তাঁরা হলেন সমরেশ বিশ্বাস ও কালীপদ সর্দার।

১৬ দিনের অবরোধের ফলে উদ্বাস্তুরা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন। তাঁদের ওই সময়ে প্রধান খাদ্য ছিল যদুপালং শাক ও নারকেল গাছের নরম আগা ও অন্যান্য শাক পাতা। শিশুদের জন্য উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি প্রতি পরিবারকে দুশো গ্রাম করে চাল দিয়েছে। উদ্বাস্তুরা তাঁদের রান্না করা ওই পালং শাকের বড়া সাংবাদিকদের দেখান। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী মাত্র শুক্রবার থেকে উদ্বাস্তুদের কুমিরমারির বাজারে আসতে দেওয়া হয়। ফলে, ওইদিন থেকে সেখানে খাবার জিনিসপত্র যাচ্ছে।

ওই সমাবেশে উদ্বাস্তুরা সমস্বরে বলেন. তারা না খেয়ে মরবেন, তবু দণ্ডকারণ্যে যাবেন না। তাঁরা বলেন, দণ্ডকারণ্যে ওড়িশার পুলিশও তাঁদের ওপর অত্যাচার করেছিল। কিন্তু 'আমাগো নিজেগো পুলিশ যা করল তা আর কথা দিয়া কওয়া যায় না।'

কাশীবাবু সমাবেশে উদ্বাস্তুদের এই পরামর্শ দেন যে, যাঁরা এখন এত অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্যে এখানে আছেন, তাঁরা এখানে থাকুন। কিন্তু দণ্ডকারণ্য থেকে যেন আর লোক তাঁরা ডেকে না আনেন। তিনি উদ্বাস্তুদের গাছ কাটতে নিষেধ করে বলেন. গাছ মানুষের আশ্রয়দাতা। উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সভাপতি সতীশ মণ্ডল, রাইহরণ বাড়ুই ও অন্যরা কাশীবাবুকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা আর কাছ কাটবেন না। তবে ক্ষুধার জ্বালায় কিছু নারকেল গাছ তাঁরা নষ্ট করেছেন কিন্তু আর করবেন না। কাশীবাবু জনতা দলের পক্ষ থেকে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের কিছু প্রতীকী সাহায্য দেন।

আঠারো দিনের ব্যবধানে রবিবার মরিচঝাঁপিতে গিয়ে মনে হল, সেখানকার জনসংখ্যা তেমন কিছু কমেনি। জীবনযাত্রার গতি অবশ্য অনেকটা শ্লথ। আতঙ্কের ভাব সেখানে বিরাজ করছে। মরিচঝাঁপি দ্বীপে পুলিশের কোনও ক্যাম্প বসেনি। সতীশ মণ্ডল বলেন, আমরা কারও কোনও ক্ষতি করিনি। জঙ্গলের এক কোণে আমরা কেবল থাকতে চেয়েছি। রাইহরণ বাড়ুই বলেন, ২৯ জানুয়ারি থেকে পুলিশের টিয়ারগ্যাসে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা কাঠের টাঙ্গা ছুড়ে পুলিশ দলকে আক্রমণ করেছিলেন। কারণ, না করে উপায় ছিল না। কুমিরমারির ক্যাম্পে যাঁদের জোর করে ধরে নিয়ে

যাওয়া হয়েছে তাঁদের হাসনাবাদ ক্যাম্পে না গেলে খাবার বন্ধ করা হচ্ছে বলে নেতারা অভিযোগ করেন।

কাশীবাবুর সঙ্গে যাঁদের গ্রেফতার করা হয় তাঁরা হলেনঃ সন্দীপ দাস, কিরণময় নন্দ, প্রবোধ সিংহ, বলাইদাস মহাপাত্র, রবিশংকর পাণ্ডে, বীরেন মৈত্র। এঁরা সকলে জনতার এমএলএ। ধৃতদের মধ্যে ছিলেন পার্টির সম্পাদক অশোক মুখার্জি ও স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য। অন্যরা হলেন দলের কর্মী।

সাংবাদিক যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ অজিত চক্রবর্তী, উমাশংকর হালদার, রাজকিশোর, শম্ভুনাথ, বিমল নন্দী, দিলীপ ঘোষ ও অশোক বসু (প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক)। এঁদের সকলের বিরুদ্ধে ভারতীয় বন সংরক্ষণ আইনের ২৬খ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

১১ ফেব্রুয়ারি বেশ রাতে আমি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে হোম সেক্রেটারি রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে ফোন করেছিলাম কেবল এটুকু জানতে যে, পুলিশ মরিচঝাঁপি সম্পর্কে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরকে কী রিপোর্ট দিয়েছে। তিনি আমাকে সরাসরি বলেছিলেন, "না হে কাশীবাবুরা মরিচঝাঁপি ঢুকতে পারেননি। পুলিশ ওদের নদীর পাড়ে আটকে দিয়েছে। পরে ওদের লঞ্চে করে ফেরত পাঠিয়েছে।" আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনি কি জানেন, আমি কাশীবাবুদের সঙ্গে মরিচঝাঁপিতে গিয়েছিলাম? পুলিশ আমাদের মরিচঝাঁপি ঢোকা জানতেই পারেনি। ফেরার পথে মাঝদরিয়ায় নৌকায় আমাদের আটকেছে।" তারপর নেজাত পর্যন্ত আনা হয়েছে তা ওকে বললাম। তিনি সব শুনে সবিস্ময়ে বললেন, "সে কী হে!" এবার জ্যোতিবাবুর কথা শুনুন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘরভর্তি সাংবাদিকদের বললেন, "সুখরঞ্জনবাবুকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি 'পেচ্ছাপ' করতে যাব বলে পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে নেজাতের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যান।" হলধর পটল বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হলধর বলেছিলেন, "আপনার লজ্জা করল না জ্যোতিবাবু, এই ডাহা মিথ্যা কথা বলতে? সুখরঞ্জন আগে থেকেই অনুমান করেছিল নেজাতে আপনি কী করতে পারেন। তাই সে পুলিশকে আদৌ বুঝতে দেয়নি যে সে আমাদের সঙ্গের লোক। সুখরঞ্জনের সঙ্গে আপনার তো দিনে দু'বার দেখা হয়। আপনি তো তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন, আচ্ছা মশাই ব্যাপারটা কী ঘটেছিল?" জ্যোতি বসু খানিকক্ষণ হলধরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। সুতরাং পুলিশ মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আমাকে গ্রেফতারের 'রিপোর্ট' জ্যোতিবাবুকে দিয়েছে ও জ্যোতিবাবুও বিশ্বাস করেছেন। কেবলমাত্র

ডিআইজি, আইবি নিরুপম সেন ওই মিথ্যা পুলিশ রিপোর্টের জন্য আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) রাজ্য বিধানসভায় মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের এবং সেখানে বিরোধী দলের এমএলএদের গ্রেফতার নিয়ে ঝড় ওঠে। বিধানসভার ঘটনা ছিল এই:

মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গে আবার ঝড়, সভাত্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার: আগের দিনের জের টেনে মঙ্গলবারও রাজ্য বিধানসভায় মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গে আবার ঝড় ওঠে। সভাত্যাগও হয়। শুরুতেই মরিচঝাঁপি থেকে ফেরার পথে জনতা নেতাদের ও সাংবাদিকদের লাঞ্ছনা ও গ্রেফতার নিয়ে বিরোধী সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির দাবি তোলেন। এ নিয়ে সরকারপক্ষ ও বিরোধীপক্ষের চিৎকার, হইচই ও ঝাঁঝালো মন্তব্যে সভাকক্ষ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিবৃতি অসমাপ্ত রেখে চলে যান। পরে আর তিনি সভাকক্ষে আসেননি। তবে এদিনের লড়াইয়ে সরকার পক্ষের সদস্য ফরওয়ার্ড ব্লকের ছায়া ঘোষের জোরালো বক্তব্য বিরোধীদলের সদস্যদের বাড়তি শক্তি জুগিয়েছে।

ঝড়ের সূত্রপাত প্রশ্নোত্তর পবেই [পর্বেই]। জনতা সদস্য সন্দীপ দাস মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান কোন আইনে বিরোধী দলনেতা কাশীকান্ত মৈত্র-সহ সাতজন জনতা এমএলএ ও সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তখন মুখ্যমন্ত্রী সভায় ছিলেন না। সন্দীপবাবু উঁচু পর্দায় গলা চড়িয়ে স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমরা কোন আইন লঙ্ঘন করেছি? যদি ধরেও নিই যে বন আইন লঙ্ঘন করেছি তাহলেও সুন্দরবনে গ্রেফতার না করে বসিরহাটে কেন গ্রেফতার করা হল? সন্দীপবাবুর বাকি কথাগুলো সিপিএম সদস্যদের পাল্টা চিৎকারে ডুবে যায়। সিপিএম-এর অশোক বসু, শচীন সেন, পতিতপাবন পাঠক ও কমল ভট্টাচার্য এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। প্রায় দশ মিনিট ধরে সভায় তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলে। সন্দীপবাবুর সমর্থনে উঠে দাঁড়ান জনতা দলের কিরণময় নন্দ, রবিশংকর পাণ্ডে, বঙ্কিম মাইতি প্রমুখ। কারও কোনও কথা পরিষ্কার শোনা যায় না। মাঝে মধ্যে সন্দীপবাবুর কথা ভেসে আসে, "গতকাল জ্যোতি বসু বলেছিলেন, সব খবর নিয়ে সভায় বিবৃতি দেবেন। আজ তিনি কোথায়?"

হইহট্টগোলের মধ্যে বিরোধী উপনেতা হরিপদ ভারতী উঠে দাঁড়ান। স্পিকার তাঁকে বসবার জন্য অনুরোধ করে একটা কাগজ থেকে পড়তে

শুরু করেন। কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচিতে কিছুই শোনা যায় না। খানিক বাদে স্পিকারের অনুমতি নিয়ে হরিপদবাবু বলেন, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে একটা বিবৃতি দেবেন। আশা করেছিলাম আজই সেই বিবৃতি দেবেন।

হরিপদবাবু বসতে না বসতেই কিরণময়বাবু উঠে দাঁড়ালেন: স্যার, বিধানসভার সদস্যদের পশ্চিমবঙ্গে অবাধে চলাচলের অধিকার আছে কি না? সঙ্গে সঙ্গে সরকারি বেঞ্চ তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তুমুল হইচই-র মধ্যে কিরণময়বাবুকে বলতে শোনা যায়, জঙ্গুলে আইন...। সরকারি বেঞ্চ থেকে— আহ্হা ভদ্রলোক রে।

ইতিমধ্যে রবিশঙ্কর পান্ডে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেছেন। সিপিএম সদস্যদের প্রতিবাদের ঝড়ে তাঁর একটি কথাও শোনা গেল না। শুধু দেখা গেল তাঁর ঠোঁট নড়ছে, ডান হাত একবার শূন্যে উত্থিত হয়ে আবার নেমে আসছে। ওই গণ্ডগোলের ভেতরেই ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য ছায়া ঘোষও মাইক টেনে বলতে শুরু করেন। প্রথমে তাঁরও কোনও কথা শোনা যায়নি। সভা একটু শান্ত হতে শোনা গেল। ছায়া দেবী বলছেন, মরিচঝাঁপিতে সত্যিই মহিলাদের ওপর কোনও অত্যাচার হয়েছে কি না তার তদন্ত হোক। দোষী প্রমাণিত হলে অপরাধী পুলিশদের শাস্তি দিন সরকার। সারা রাজ্যের মহিলা সমাজের তরফ থেকে এই দাবি আমি জানাচ্ছি! টেবিল চাপড়িয়ে জনতা সদস্যরা ছায়া দেবীর ভাষণকে অভিনন্দন জানান।

পরে রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বক্তব্য রাখতে উঠে কংগ্রেসের সত্যরঞ্জন বাপুলি বলেন, মরিচঝাঁপির ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্বর কুৎসিত অত্যাচারের ইতিহাসকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, রাজ্যপালের ভাষণে এই নিদারুণ ঘটনার তিলমাত্র উল্লেখ নেই। তিনি বলেন, এই ভাষণের বয়ান তৈরি হয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে। পরে বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। তিনি জানতে চান, পৃথিবীর কোথায় কবে ৩০,০০০ মানুষের অন্নজল বন্ধ করার জন্য এক হাজার পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে? আর কোথায় এ ভাবে এতগুলো অসহায় মানুষকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে?

বিরতির পর বিরোধী দলনেতা কাশীকান্ত মৈত্র বলেন, মরিচঝাঁপিতে এতগুলো লোক অসহায় অবস্থায় না খেয়ে মারা পড়তে বসেছেন। তাঁদের জন্য কিছু খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। সঙ্গে

সাংবাদিকরাও ছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে আমাদের ও সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়। হাইকোর্টের আদেশও অমান্য করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী কাল এই সভাকক্ষে বলেছিলেন যে, সমস্ত খবর সংগ্রহ করে আজ পূর্ণ বিবৃতি দেবেন। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী এ পর্যন্ত কোনও বিবৃতি দেননি। আপনি স্যার মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন এখনই বিবৃতি দিতে। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সুনীতি চট্টরাজও চড়া গলায় বলতে থাকেন, এত বড় একটা গুরুতর ঘটনা, অথচ মুখ্যমন্ত্রী একে আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন। ততক্ষণে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকেও চিৎকার করে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। জনতা ও দুই কংগ্রেসেরও অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাল্টা চিৎকার শুরু করেন। দু' পক্ষের কড়া মন্তব্য—টীকা টিপ্পনীতে সভা সরগরম। এরই মধ্যে রাজ্যপালের ভাষণের ওপর সিপিআই (এম) সদস্য যামিনী সাহা তাঁর বক্তব্য অবিরাম বলে চলেন, হইচই ও চেঁচামেচিতে তাঁর কণ্ঠ ডুবে যায়। কিছুই শোনা যায় না। স্পিকার ঘন ঘন হাতুড়ি পেটাতে থাকেন। ওই সময় ইন্দিরা কংগ্রেসের আবদুস সাত্তার স্পিকারকে লক্ষ্য করে বলেন, এই সভার মাননীয় সদস্যদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। এটা খুবই বেদনাদায়ক। আপনি আমাদের কাস্টোডিয়ান, আপনার উচিত সব কাজ ফেলে এর বিহিত করা।

এই মন্তব্যে সরকার পক্ষের সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। জনতা ও দুই কংগ্রেসের সদস্যরাও সবাই উঠে সাত্তার সাহেবকে সমর্থন জানাতে থাকেন ও সবাই মিলে স্পিকারকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, মুখ্যমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করার দাবি জানাতে থাকেন। বলাইদাস মহাপাত্র, হরিপদ জানা, কিরণময় নন্দ, বঙ্কিম মাইতি, সত্যরঞ্জন বাপুলি, অতীশ সিংহ-সহ অনেকেই দাঁড়িয়ে থেকে দাবি জানাতে শুরু করেন। সিপিআই (এম)-এর শচীন সেন, অশোক বসু ও আরও কয়েকজন কড়া মন্তব্য করতে থাকেন।

স্পিকার বলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করতে পারেন না। চিফ হুইপকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। অফিসারদের দিয়েও বলেছেন। এরপরই কাশীকান্তবাবু-সহ জনতা ও দুই কংগ্রেসের সব সদস্য একসঙ্গে সভাত্যাগ করে যান। কংগ্রেস সদস্যরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে চলে যান। সব শেষে ছিলেন কিরণময় নন্দ। তাঁর সভাকক্ষ ত্যাগের মুখেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু সভাকক্ষে বসেন। রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্ক চলতে থাকে।

মিনিট দশ পর দুই কংগ্রেস ও জনতা সদস্যগণ আবার সভাকক্ষে ফিরে আসেন। কাশীকান্তবাবু ফিরে আসার পরই আবার বিরোধীপক্ষ দাবি তোলেন, মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন, বলুন তাঁর বক্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী উঠে দাঁড়ান। তিনি বলেন, কাল তিনি মরিচঝাঁপির ঘটনা সম্পর্কে সেখানকার পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন বিধানসভা সদস্যদের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঢুকতে বারণ করা হয়েছিল, তাঁরা শোনেননি। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই কাশীকান্তবাবু-সহ প্রায় সব জনতা সদস্য দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন, একথা অসত্য, পুলিশ আদৌ বাধা দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অফিসাররা যা বলেছেন তাই তিনি বলছেন। এই শুনে কাশীবাবু ও অন্যান্য সদস্য প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিবাবুও বলেন, ঠিক আছে, আপনারা যদি আমার কথা শুনতে না চান, বলব না। বলেই তিনি বসে পড়েন, একটু পরেই সভাকক্ষ থেকে চলে যান।

এরপর বিতর্ক চলতে থাকে। আজ বুধবারও রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্ক চলবে। বেলা একটায় আবার সভা বসছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯

ওই তারিখেই একই সংবাদপত্রে প্রকাশিত আর একটি খবর:

মরিচঝাঁপিতে গুলি: সিপিআই বিচার বিভাগীয় তদন্ত চায়

বিশেষ সংবাদদাতা: সিপিআই নেতা ভূপেশ গুপ্ত এবং পশ্চিমবঙ্গে দলের এমএলএ এবং রাজ্য পরিষদের সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুন্দরবনে মরিচঝাঁপিতে আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের ওপর পুলিশের গুলি চালনার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। এখানে আজ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এঁরা বলেছেন, এই গুলি চালনার ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তার কোনও যুক্তি নেই। বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য জনমত এখন প্রবল। এঁরা আরও বলেছেন, বামফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে যে মনোভাব দেখাচ্ছেন দুঃখের সঙ্গে দলকে বলতে হয় তা রাজ্যের অতীতের বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্যের সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বেশ কয়েকদিন পরে পুলিশ জানতে পারল যে ১০ ফেব্রুয়ারিতে আমরা সুন্দরবনের কোন স্কুলে হেডমাস্টারমশাইয়ের আতিথ্য নিয়েছিলাম। তারপর

পুলিশের পদস্থ অফিসাররা সেই স্কুলের হেডমাস্টারমশাইকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করেছিল কয়েকদিন ধরে। হেডমাস্টারমশাই যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছিলেন। কিন্তু একটা সরকারের কি এ কাজ করার কোনও প্রয়োজন ছিল? মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশকে পর্যন্ত জ্যোতি বসুর সরকার 'অপরাধের' সামিল বলে গণ্য করেছিল। মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু দফতরের এক সরকারি বিবৃতি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ কাগজে প্রকাশিত হয়। বিবৃতিটি এই:

সরকার আর কোনও জবরদখল উদ্বাস্তু
কলোনিকে স্বীকৃতি দেবেন না

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্য সরকার ঠিক করেছেন আর কোনও জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনিকে স্বীকৃতি দেবেন না এবং নতুন করে কোনও জায়গায় জবরদখলও বরদাস্ত করবেন না। সোমবার রাজ্যের ত্রাণমন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি এই খবর দেন। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু কলোনিকে স্বীকৃতি দেবার যে দাবি বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা কাশীকান্ত মৈত্র করেছেন, সে সম্পর্কে বলতে গিয়েই বাধিকাবাবু ওই সিদ্ধান্তের কথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এদিন সাংবাদিকদের বলেন, মরিচঝাঁপি থেকে ২২৫টা পরিবারের প্রায় এগারোশো লোক সরকারি ব্যবস্থায় হাসনাবাদে আসছেন। ওঁদেরকে ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, ওঁদের দেখাশোনা ও চিকিৎসার সব ভারই সরকার নিয়েছেন। হাসনাবাদ থেকেই ওঁদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী আশা করেন, মরিচঝাঁপিতে এখনও হাজার দশ-বারো দণ্ডক উদ্বাস্তু রয়েছেন, তাঁরা সবাই ৩১ মে-র মধ্যেই দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাবেন।

মবিচঝাঁপির উদ্বাস্তুর ওপর অত্যাচার হচ্ছে, ওদের ওপর অবরোধ সৃষ্টি হয়েছে, কাশীকান্তবাবুর এ অভিযোগ সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উনি কি মরিচঝাঁপি গিয়েছেন? উনি যা বলে বলুন। আর তা ছাড়া মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাবার জন্য তো ওঁদের নেতা বলছেন। ওঁকে বলুন না দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। এ অদ্ভুত কথা, উদ্বাস্তুদের জন্য আমরা ক্যাম্প খুলছি, ওঁদের দেখাশোনার সব ব্যবস্থা করছি। আর উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপি ছেড়ে আসবেন না? মরিচঝাঁপিতে লোক না খেয়ে মরেছেন। ওঁরা বলেছেন— তা বনে জঙ্গলে গেলে লোক তো মরবেই। না খেতে পেয়ে লোক মরেছে

বলেছেন, আমরা যে চার কোটি টাকা ওদের জন্য খরচ করলাম তবে কীসের জন্য?

ত্রাণমন্ত্রী বলেন, কাশীকান্তবাবুদের কথা মতো যদি মরিচঝাঁপিকে উদ্বাস্তু কলোনি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়, তবে কালই গোটা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবেন। জায়গায় জায়গায় কলোনি বানিয়ে বসবাস শুরু করবেন। আজ মরিচঝাঁপি নিয়ে জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস (ই) যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন, তা হলে তো ওরা গোটা রাজ্যেই সেই ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাবেন। আর আমরা তাই মুখ বুজে সহ্য করব?

জনতা পার্টির এমএলএ-দের গ্রেফতার নিয়ে বিধানসভায় প্রচণ্ড গণ্ডগোলের পর জ্যোতিবাবু জানালেন তিনি মরিচঝাঁপি যাবেন। কিন্তু তিনি নদীর উল্টোদিকে বাগনাতে যাননি।— সেখান থেকে মরিচঝাঁপি অন্তত চোখে দেখা যায়। মরিচঝাঁপি থেকে মাইল তিনেক দূরে এক দ্বীপে গিয়েছিলেন। সেই রিপোর্ট:

জ্যোতিবাবু যাচ্ছেন ছোট মোল্লাখালি

স্টাফ রিপোর্টার: মুখ্যমন্ত্রী একুশে ফেব্রুয়ারি, বুধবার মরিচঝাঁপির কাছে ছোট মোল্লাখালি যাচ্ছেন। সেখানে সেদিন তিনি বামফ্রন্টের উদ্যোগে আয়োজিত কেন্দ্রীয় সমাবেশে বক্তৃতা করবেন। ফ্রন্টের উদ্যোগে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের প্রশ্নে ওই অঞ্চলে কুড়ি ও তেইশ ফেব্রুয়ারি আরও দুটি সমাবেশ হবে। তেইশ তারিখের সমাবেশ হবে বাসন্তী বাজারে। এ ছাড়া ওই প্রশ্নে রাজ্য সরকারের সমর্থনে আটই অথবা নয়ই মার্চ কলকাতায় বিধানসভার কাছেও একটি সমাবেশ হবে। বৃহস্পতিবার বামফ্রন্ট কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকের পর ফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও সিপিআই (এম) নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত এই খবর জানান। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই গত বুধবার মরিচঝাঁপি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে ফোন করেন। জ্যোতিবাবু জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি দিল্লি যাচ্ছেন। তখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন। তবে এ নিয়ে তার আগেই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন। তাতে ওই উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত কী কী করছেন, তা জানাবেন।

সেদিনই আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯) আরও একটি খবর ছাপা হয়:

তিন শরিকের তিন মন্ত্রী দিয়ে মরিচঝাঁপির ঘটনার তদন্ত দাবি

স্টাফ রিপোর্টার: বামফ্রন্টের তিন শরিকের তিন মন্ত্রীকে দিয়ে মরিচঝাঁপির ঘটনার তদন্ত করানোর জন্য আর এস পি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। আর এস পি-র পক্ষ থেকে একটি বিস্তারিত রিপোর্টে জ্যোতিবাবুর কাছে অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিশের একাংশ 'সুপরিকল্পিতভাবে' এবং 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' হয়ে মরিচঝাঁপি-কুমিরমারি অঞ্চলে অত্যাচার চালাচ্ছে। ওই অঞ্চলে পুলিশি সন্ত্রাস চালানোর জন্য এমন একজন পুলিশ অফিসারকে পাঠানো হয়েছে যিনি কংগ্রেসি আমলে নকশাল এবং বামপন্থী কর্মীদের নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে, পিটিয়ে হত্যা করেছেন। কুমিরমারি অঞ্চলে পুলিশ যে ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়েছে, ওই অঞ্চলের মানুষ আদৌ কখনও দেখেননি। এই অভিযোগও তাঁরা করেছেন।

আর এস পি নেতারা অভিযোগ করেছেন, বামফ্রন্টের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতি বানচাল করার জন্য পুলিশের একাংশ নানাভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি তিন মন্ত্রী জনসভায় বক্তৃতা দিতে যাবেন এটা পুলিশ সাতদিন আগে জানত। মন্ত্রীরা যাতে বিক্ষোভের সম্মুখীন হন, সেজন্যই ৩১ জানুয়ারি বিনা প্ররোচনায় কুমিরমারিতে পুলিশ গুলি চালায়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পুলিশ সরকারকে মিথ্যা রিপোর্ট দেয় যে, বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। এরপর আবার মিথ্যা রিপোর্ট দেয় যে, ৩ ফেব্রুয়ারির জনসভায় আর এস পি যোগ দেবে না। অথচ প্রকৃত ঘটনা হল, আর এস পি-র পক্ষ থেকে ওই জনসভার ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশের অপকর্মে সায় না দেওয়ার জন্য জেলা পরিষদের সদস্য প্রদীপ বিশ্বাস এবং আর এস পি-র অন্য কর্মীদের নানাভাবে হয়রান করা হচ্ছে। পুলিশ চেষ্টা করছে, আর এস পি-কে উৎখাত করে ঘুষের রাজত্ব কায়েম করতে। পুলিশ এই অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি ঢুকে বন থেকে কাঠ চুরির মিথ্যা অভিযোগে বহু লোককে গ্রেফতার করেছে। গৃহস্থ বধূ এবং মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে। ইতিমধ্যে বহু বাড়িতে আগুন দিয়েছে। স্থানীয় লোক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। মরিচঝাঁপি-কুমিরমারি অঞ্চলে পুলিশ কীভাবে কোন পথে অভিযান চালাচ্ছে তার বিবরণের সঙ্গে একটি ম্যাপও ওই রিপোর্টের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

আর এস পি নেতারা জ্যোতিবাবুকে বলেছেন, বিনয় চৌধুরী, কমল গুহ এবং দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়— এই তিন জন মন্ত্রী গত ৩ ফেব্রুয়ারি ওখানে গিয়েছিলেন। তাঁদেরই তদন্তের জন্য পাঠানো হোক।

আর এস পি প্রস্তাব করেছে দণ্ডকারণ্য এবং মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। দণ্ডকারণ্যকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে গণ্য করা হোক এবং তার প্রশাসনিক দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেওয়া হোক।

মার্চ মাসের ১৩ তারিখে উদ্বাস্তু নেতারা এক বৈঠক করে মরিচঝাঁপিতে তাঁদের বসতিকে উদ্বাস্তু কলোনির স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানালেন। সেই রিপোর্টটি এই:

মরিচঝাঁপিকে উদ্বাস্তু কলোনির স্বীকৃতি দাবি

স্টাফ রিপোর্টার: উদ্বাস্তু কলোনি হিসেবে মরিচঝাঁপিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। অন্য উদ্বাস্তু কলোনি যদি শেষ পর্যন্ত সরকারের স্বীকৃতি পায়, তবে মরিচঝাঁপিকেই বা তা দেওয়া হবে না কেন? রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের কাছে এই দাবি জানান রাজ্য বিধানসভার বিরোধী পক্ষের নেতা কাশীকান্ত মৈত্র। তিনি বলেন, মরিচঝাঁপির ব্যাপারে তাঁরা বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছেও এই দাবি তাঁরা পেশ করলেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বলছেন মরিচঝাঁপি সংরক্ষিত বন। ওখানে উদ্বাস্তুদের রাখা যাবে না। ঝড়খালিও তো সংরক্ষিত বন, তবে সেখানে সিপিআইএমের প্রায় দু-হাজার ক্যাডার রয়েছেন কীভাবে? আসলে সরকারের উদ্দেশ্য মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের সরিয়ে ওখানে নিজেদের লোক বসানো। জনতার নেতা সুনীল দাস বলেন, ওখান থেকে উদ্বাস্তুদের সরানোর অধিকার সরকারের নেই।

গত ১২ মে তারিখে কাশীকান্ত মৈত্র, স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য প্রভৃতি কয়েকজন এমএলএ এবং নেতা মরিচঝাঁপির উদ্দেশে যান। তাঁদের মাঝপথে পুলিশ আটকায়। তাঁরা ছোট কুমিরমারি পর্যন্ত যান। ছোট কুমিরমারিতে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁদের সঙ্গে এসে দেখা করে। কাশীবাবু বলেন, কঙ্কালসার একদল লোক তাঁদের কাছে এসে তাঁদের ওপর পুলিশের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা জানান। তাঁরা একটি দাবিপত্রও নেতাদের হাতে দিয়ে যান। এই দাবিপত্রে তাঁরা জানান, গত এক বছরের ওপর তাঁরা ওখানে আছেন। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তাঁদের অধিকার আছে ওখানে থাকার। ওখানে তাঁদের থাকতে দিতে হবে। মরিচঝাঁপি ও তার আশপাশে যেসব পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে সেগুলি তুলে নিতে হবে এবং উদ্বাস্তুদের খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য দিতে হবে।

সাংবাদিকদের ওখানে যাবার স্বাধীনতা দিতে হবে। তাঁরা দাবি জানান— না খেতে পেয়ে মরবেন, তবু তাঁরা ওখান থেকে অন্যত্র যাবেন না।

সুনীল দাস জানান, ওখানে অবরোধ একটি নতুন রূপ নিয়েছে। উদ্বাস্তুরা আগে এদিক ওদিক জনমজুরের কাজ করত, উপায় করত, এখন পুলিশ তা বন্ধ করে দিচ্ছে। উদ্বাস্তুরা একটি পরিসংখ্যান দিয়ে তাঁদের জানিয়েছেন, মরিচঝাঁপিতে গত ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৩১ জন অনাহারে মরেছে। ২৩৯ জন অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মরেছে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ১২৮ জন নিখোঁজ হয়েছে, জেলে আছে ৫০০ জন। লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাসের আঘাতে ১৫০ জন আহত হয়েছে, ২৪ জন মহিলার শ্লীলতাহানি হয়েছে।

কাশীবাবু ও সুনীলবাবু জানান, প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁরা মরিচঝাঁপি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পেশ করবেন। পুলিশি অত্যাচারের কথা এবং উদ্বাস্তুরা কী অবর্ণনীয় অবস্থায় ওখানে রয়েছে তাও জানাবেন।

ফিরতেই হবে: মুখ্যমন্ত্রী— বিমানবন্দরের রিপোর্টার জানাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, মরিচঝাঁপিতে অবস্থানকারী দণ্ডক শরণার্থীদের ওপর কোনও অর্থনৈতিক অবরোধ নেই।

শ্রীবসু রবিবার ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে বলেন, রোজই তাঁরা বাইরে কাজ করতে যাচ্ছেন। সরকার তো তাঁদের খাওয়াচ্ছেন না, তাঁরা বাইরে না গেলে খাবার পাচ্ছেন কোথা থেকে?

সরকারের আবেদনে যদি শরণার্থীরা ৩১ মে-র মধ্যে দণ্ডকারণ্যে ফিরতে না চান, তবে তাঁদের ফেরার দিন কি বাড়িয়ে দেওয়া হবে এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, না। ওঁদের ৩১ মে-র মধ্যে ফিরতেই হবে।

মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের প্রতি পশ্চিমবাংলা সরকারের আচরণ সম্পর্কে ১৯ এপ্রিল (১৯৭৯) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই সাংবাদটি বের হল:

মরিচঝাঁপি: রাজ্য সরকারের সমালোচনা

বিশেষ প্রতিনিধি: মরিচঝাঁপি সংক্রান্ত তিন সংসদ সদস্যের প্রতিনিধিদল তাঁদের রিপোর্ট আজ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন। গত ২২ মার্চ ওই তিন সংসদ সদস্য মরিচঝাঁপি পরিদর্শন করেন। দণ্ডকত্যাগী মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ব্যবহার করছেন, জানা যায় ওই রিপোর্টে তার যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সংসদ সদস্যদের

মরিচঝাঁপি পরিদর্শনে বাধা দান প্রসঙ্গে ওই রিপোর্টে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কেমন করে পুলিশ তিন তিনবার তাদের লঞ্চ আটকেছিল। ওই রিপোর্ট লেখবার আগে ওই প্রতিনিধিদল মরিচঝাঁপি থেকে ফেরার পথে থলি ভর্তি যেসব স্মারকলিপি নিয়ে এসেছিলেন রিপোর্ট রচনার আগে সেসব তাঁরা খতিয়ে দেখেছেন। আগামীকাল ওই রিপোর্টের সারাংশ প্রকাশিত হওয়ার কথা। ওই প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন প্রসন্নভাই মেটা। অন্য দুজন সদস্য হলেন মঙ্গলদেও বিশারদ এবং ড. লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে।

১৯৭৯-র এপ্রিলের শেষে বিএসএফ সূত্রে জানতে পারি যে, পশ্চিমবাংলা সরকার দিল্লিতে বিএসএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেলকে অনুরোধ করেছেন কিছুদিনের জন্য বিএসএফ বাগনা (মরিচঝাঁপির ঠিক বিপরীতে) থেকে ওই বাহিনীর বর্ডার আউট পোস্ট যেন অন্যত্র সরিয়ে নেয়। খবরটি জানার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না যে, পশ্চিমবাংলা সরকার মরিচঝাঁপিতে একটা অভিযান চালাবেই উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে। বিএসএফ-কে সরে যেতে বলার অর্থ এই, ওই বাহিনীর কেউ যেন রাজ্য পুলিশের অভিযান দেখতে না পারে কিংবা বিএসএফ-এর সাহায্য নিয়ে কোনও সংবাদপত্র প্রতিনিধি এই অভিযান স্বচক্ষে না দেখে। ওই সংবাদের পরে পরেই জানা গেল যে, চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার উপকূলবর্তী এলাকা থেকে দেড় শতাধিক লঞ্চ সরকার 'রিকুইজিশন' করেছে। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্য সরকার মরিচঝাঁপির পনেরো কিলোমিটার ব্যাসার্ধের জলপথে সব রকমের নৌ চলাচল বন্ধ করার নির্দেশ দিল। মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তু অপসারণের 'অপারেশন'-এর দিন গোপন রাখা হল।

১৬ মে (১৯৭৯) অনেক রাতে পান্নালাল দাশগুপ্ত মারফত খবর পেলাম, মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের সরিয়ে অভিযান ওই রাতেই আরম্ভ হবে। হাসনাবাদে কয়েকশো লরি-ট্রাক জড়ো করা চলছে। প্রচুর পুলিশ সেখানে।

সূর্য ওঠার আগেই ফটোগ্রাফার নিয়ে হাসনাবাদে লঞ্চঘাটে পৌঁছে দেখি কয়েকটি লরিতে উদ্বাস্তুদের তোলা হচ্ছে। প্রথম দিকে আমাদের ফটোগ্রাফারকে ছবি তুলতে বাধা দিল পুলিশ। খুব চিৎকার, চেঁচামেচি করায় বাধা দূর হল বটে কিন্তু ফটোগ্রাফারকে জেটির ওপর যেতে দেওয়া হল না। ফলে নদীর পাড়ের বাধা ভেঙে ফটোগ্রাফার একটা বড় নৌকার ছই-এ দাঁড়িয়ে লঞ্চ থেকে উদ্বাস্তুদের নামানোর ছবি তুলল। কীভাবে কী অবস্থায় উদ্বাস্তুরা প্রায় এক বছর মরিচঝাঁপিকে 'আপন মাটি' মনে করে বসতি করার পর চলে যাচ্ছে, তার প্রথম রিপোর্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৮ মে (১৯৭৯) প্রকাশিত হল:

তিন ছেলে, স্বামী নিখোঁজ, কী করে যাই, যেতে হয়েছে

'শ্যামলী' যখন ঘাটে ভিড়ল, তখন লঞ্চঘাটার এক দোকানের পৈঠায় চতুর মণ্ডলের স্ত্রী কোলের শিশুকে নিয়ে আর্তনাদ করে যাচ্ছেন, মরিচঝাঁপি থেকে আমার তিন ছেলে, স্বামী নিখোঁজ তিন দিন ধরে। তাদের ফেলে আমি কী করে দণ্ডকারণ্যে যাই। কিন্তু তাকে যেতে হয়েছে, যেমন করে যেতে হয়েছে দেড়শোখানা খোলা ট্রাকে বোঝাই হয়ে তার মতো অনেককেই।

মেঘদূত, শ্যামলী, সুমিত্রা এক একটি করে লঞ্চ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মাল ও মানুষ বোঝাই হচ্ছে ট্রাকে। রওনা হচ্ছে দণ্ডকারণ্যের পথে দুধকুণ্ডি বা বানপুরে। জল বা আহারের কোনও ব্যবস্থা নেই। আয়োজন নেই লঞ্চে প্রসব করা সদ্যোজাত শিশুর ও মাকে ওষুধ দেওয়ার। ট্রাকে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে ভাঙা পাঁজরের বালকেরও বুঝি চিকিৎসার দরকার নেই। কেবল ট্রাক বোঝাই করে রওনা করে দেওয়া। দণ্ডক থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের এক বছরের উপনিবেশ মরিচঝাঁপি আজ অঙ্গার। সোমবার থেকে ওই দ্বীপে চলেছে অগ্নিকাণ্ড। 'পুলিশ ও তাঁদের সঙ্গের কিছু লোক আমাদের বললেন, আপনারা আপনাদের কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করি। আমরা ভাত চড়ালাম, তরকারি কুটলাম। তারপর শুনি চালের দড়িকাটার শব্দ, চাল ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলে আমরা হা হা করে উঠলাম। তারপরেই বেড়ায় আগুন দাউ দাউ। রান্না ভাত খাওয়া হল না। জিনিসপত্র টেনে বের করলুম। তখন হুকুম, বাঁধের উপর দাঁড়াও, তারপর লঞ্চে উঠবে।'— একথা প্রথম শুনলাম মালকানগিরি থেকে আসা ভবানী মণ্ডল ও জগদীশ মণ্ডলের কাছে। একই কথা বললেন শিবপদ সানা, মন্মথ রায়, সন্তোষ গায়েন, রবীন্দ্রনাথ সরকার, হরিপদ দেবনাথ ও আরও অনেকে।

হাসনাবাদের হোটেলের লোকজন, ছোট দোকানদারেরা দেখেছেন একটি বালক ট্রাকে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। মাথা ফেটে গেল, পিঠের ছাল চামড়া উঠে গেল, দু-একটি পাঁজরাও পিঠের কাছে ভেঙেছে। তাকে সেই ভাবেই আবার ট্রাকে তুলে দেওয়া হল। বুধবার লঞ্চেই এক মহিলার বাচ্চা হল। তাকে ওই অবস্থায় বাচ্চা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকে তুলে পাচার করা হল। কারও কোনও চিকিৎসা বা ওষুধ দেওয়ার কিছু নেই।

বুধবার হাসনাবাদ থেকে ৯১টি ট্রাক, বৃহস্পতিবার সকালে একটি স্পেশাল ট্রেন প্রায় আট হাজার উদ্বাস্তুকে নিয়ে দুধকুণ্ডির পথে রওনা হয়। বৃহস্পতিবার বেলা তিনটে পর্যন্ত প্রায় ৬০ খানা ট্রাক রওনা হয়। ওইদিন

বেলা দশটা নাগাদ বাগনা পুলিশ ক্যাম্প থেকে রেডিয়োগ্রাম আসে, মরিচঝাঁপির শেষ কিস্তির উদ্বাস্তুদের নিয়ে ন'টি লঞ্চ সকালে হাসনাবাদের দিকে রওনা হয়েছে। ওর মধ্যে সাতটি লঞ্চ বেলা বারোটা থেকে একটার মধ্যে হাসনাবাদে পৌঁছায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'র বেষ্টনী। লঞ্চ থেকে আবার ট্রাক। লঞ্চে পেয়েছে দু-মুঠো করে চিড়ে ও একটু গুড়।

বসিরহাটের মহকুমাশাসক বললেন, আমরা একটা অভিযান শেষ করেছি। যা কেবল সামরিকবাহিনীর পক্ষেই সম্ভব। যে দ্রুততার সঙ্গে আমরা হাসনাবাদ থেকে উদ্বাস্তু ক্লিয়ার করেছি তা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়।

মালকানগিরি থেকে মরিচঝাঁপিতে আসা মন্মথ রায়, রবীন্দ্র সরকার, হরিপদ দেবনাথ ও সতীশ মণ্ডলকে প্রশ্ন করলাম, আপনাদের এখন আবার দণ্ডকারণ্যে ফিরতে কেমন লাগছে? ওঁরা সকলেই বললেন, আশা ছিল বাংলার মাটিতে না হোক ফুটপাথেই থেকে দিনমজুরি করে বাঁচব। অনেক বড় মুখ করে এসেছিলাম। কিন্তু আপনারা থাকতে দিলেন না। আবার প্রশ্ন করলাম, আপনাদের এই চোদ্দো মাসের দুর্ভোগের জন্য কারা দায়ী? জবাব দিলেন, 'আমাদের কপাল আর আপনারাও।'

হরিপদ দেবনাথ বললেন, 'কখনও কখনও ভাবি, এই দুর্ভোগের চেয়ে সেই পাকিস্তানে থাকলেই ভাল ছিল।' অন্য কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করল না।

উদ্বাস্তু নেই: কলকাতার স্টাফ রিপোর্টার জানান, বৃহস্পতিবার মহাকরণে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের কাছে বলেন, শেষ তিনশো পাঁচটি উদ্বাস্তু পরিবার এদিনই সুন্দরবনের ওই দ্বীপ ত্যাগ করে হাসনাবাদের পথে রওনা দিয়েছেন। এই নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ২৭১৩টি পরিবার মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে তিনি জানান। বলেন, ওখানে আর কোনও উদ্বাস্তু নেই।

গাছতলায়: মেদিনীপুর থেকে বৃহস্পতিবার নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গত তিন দিনে মরিচঝাঁপি থেকে ট্রাকে করে তিন হাজারের মতো যে উদ্বাস্তু দুধকুণ্ডি ট্রানজিট ক্যাম্পে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশই গাছের তলায় দিন কাটাচ্ছেন। এই ক্যাম্পে মাত্র পাঁচশো লোকের মতো স্থান থাকায় যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে তার প্রতিকারের জন্য এসডিও দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু তাতে সকলের জায়গা হওয়া সম্ভব নয়। এতে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার

জন্য কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জেলা কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে প্রত্যেক বয়স্ককে ৫টি করে টাকা এবং আড়াই কেজি করে গম দিচ্ছেন। শিশুরা পাচ্ছে অর্ধেক।

হাসনাবাদ থেকে লরি-ট্রাকে করে উদ্বাস্তুদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, সে কথা উদ্বাস্তুরা কেউ জানেন না। উদ্বাস্তুদের লরিতে তোলার কাজে ব্যস্ত সরকারি লোকেরাও তা বলছে না। আমি লরির ড্রাইভারদের কাছ থেকে জানলাম, লরিগুলো খড়গপুর পর্যন্ত যাবে। খোলা লরি-ট্রাক, গঙ্গার পূর্বপাড়ের তাপমাত্রা ১১৪/১১৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, পশ্চিমপাড়ের আকাশ থেকে তখন আগুন ঝরবে ১১৮/১১৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। অসংখ্য শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কোন দেবতার করুণা চাইবে?

গত এক বছরে মরিচঝাঁপিতে অনেক উদ্বাস্তুর কাছে আমি খুব চেনা হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁরা লরির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে চিনতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, "আমাগো লাইগ্যা অনেক লেইখ্যাও রাখতে পারলেন না... কপালে কী ল্যাখছে... মুসলমানরা এক রকম কইরা খেদাইল আর এইখান থিকাও আর একরকম কইরা খেদাইল... ঘরে আগুন দিয়া বাইর কইরা দিল!"

হাসনাবাদেই কয়েকজন উদ্বাস্তু লরিতে ওঠার সময় আমাকে জানিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ আগুনে পুড়ে গিয়েছেন। মরিচঝাঁপিতে নদীর ঘাটে পুলিশ টেনেহিঁচড়ে অনেক উদ্বাস্তুকে তুলতে গিয়ে আঘাত দিয়েছে। আঘাতের ক্ষতস্থানে কোনও রকম ওষুধ পর্যন্ত লাগানো হয়নি। এভাবেই উদ্বাস্তুদের খড়্গপুর ও ঝাড়গ্রামের মাঝে দুধকুণ্ডিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুধকুণ্ডি থেকেই তাঁদের কিস্তিতে কিস্তিতে ট্রেনে করে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠানো হবে। ১৮ মে রাতে ঠিক হল আমাকে দুধকুণ্ডি যেতে হবে। এদিকে ১৮ তারিখ রাতে আপ মাদ্রাজ মেল রামরাজাতলা ও উলুবেড়িয়ার মাঝে এক দুর্ঘটনায় পড়ল। বহু যাত্রী হতাহত হয়েছিলেন। ১৯ মে সকালে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে শুনলাম যে, খড়্গপুর যাওয়ার সব গাড়ি উলুবেড়িয়া থেকে ছাড়বে। সঙ্গে ফটোগ্রাফার তপন দাস। হাওড়া থেকে একটা মিনিবাস ধরে এলাম উলুবেড়িয়াতে। সেখান থেকে হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে খড়্গপুরে যখন পৌঁছলাম তখন জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রও শেষ কিরণে স্তিমিত। খড়্গপুর থেকে দুধকুণ্ডি পৌঁছতে আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। তপন লেন্স দিয়ে সূর্যের আলো পরীক্ষা করে বলল, এ আলোতে ছবি হবে না। আমার কাছে খবর যে, দুধকুণ্ডিতে আগুনে পোড়া কয়েকজন উদ্বাস্তুকে পাওয়া যাবে। চলে গেলাম মেদিনীপুর শহরে সার্কিট হাউসে। সেখানে রাতটা থাকার কথা ভাবছিলাম। সার্কিট হাউসে থাকতে গেলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি

প্রয়োজন। হঠাৎ মাথায় খেলে গেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যদি আমার দুধকুণ্ডি যাওয়ার কারণ অনুমান করতে পারেন, তাহলে হিতে বিপরীত হবে। 'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল' সূত্র মেনে সার্কিট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। এক রিকশাওয়ালা আমাদের মেদিনীপুরে লালবাজারে একটা হোটেলে নিয়ে এল। এখান থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটা-ছ'টায় ঝাড়গ্রাম যাওয়ার প্রথম বাস পাওয়া যায়। পরদিন সকালে ঝাড়গ্রামগামী বাসে চেপে সাতটার মধ্যে দুধকুণ্ডি সাবেক সেনা ছাউনিতে পৌঁছলাম। দুধকুণ্ডিতে বহু শালগাছ। কয়েকজন বয়স্ক উদ্বাস্তু উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে গাছের তলায় বসে। তাঁরা আমাকে সরকার বা পার্টির লোক মনে করে ফিরেও তাকাল না। ক্যাম্পের রাস্তায় এপাশ-ওপাশ করছি। এই সময় দু-তিনটি অল্পবয়সি ছেলে আমাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে আপনে এইখানেও আইছেন?" আমি তাদের আস্তে কথা বলতে বলে যেজন্য এসেছি সেটা জানালাম। ওরা আমাদের অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে কয়েকজন বয়স্ক লোক এসে আমাদের তিন-চারজন অগ্নিদগ্ধ মানুষের সন্ধান দিলেন। তাঁদের ছবি তুললাম। এখানে একটি ছেলে বলল এক বৃদ্ধার কথা। ছেলেটি বলল, "বুড়ির বুকের দুইটা দুধই পুইড়া গ্যাছে... ছবি তুলব ক্যামনে...।" সেখান থেকে গুদামের মতো টিনের ছাউনিতে গেলাম। বৃদ্ধা খাটিয়ায় গোঙাচ্ছেন। বুকের কাছে মাছি ভনভন করছে। ফটোগ্রাফার তপনের পরামর্শ মতো খাটিয়াশুদ্ধ ওই বৃদ্ধাকে বাইরে নিয়ে এলাম। কিন্তু ৬০/৬৫ বছরের বৃদ্ধা বুকের ওপর থেকে আঁচল সরাতে চাইছেন না। আমি হাঁটু গেড়ে বসে বৃদ্ধার কানে মুখ নিয়ে বললাম "আপনি তো একদিন আঁচল সরিয়ে সন্তানদের বুকের দুই খাইয়েছেন। এখানে আমরা সকলেই আপনার ছেলে-মেয়ে। লজ্জা কেন করবেন?" বৃদ্ধা এবার চোখ মেলে হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শ করলেন। আমি নিজের হাতে তাঁর বুকের আঁচল সরিয়ে দিলাম। দুটো স্তনই অর্ধেকের বেশি পুড়ে গিয়েছে। তপন প্রকৃতির আলোতে অনেকগুলো ছবি তুলে নিল। ছবি তোলার সময় তপনও বারে বারে চোখ মুছে নিচ্ছিল।

২১ মে (১৯৭৯) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মরিচঝাঁপিতে অগ্নিদগ্ধ এই বৃদ্ধার ছবি-সহ আমার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল সেটা এই:

মরিচঝাঁপিতে অগ্নিদগ্ধ ফণীবালা
শিবিরে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছেন

মরিচঝাঁপির ঝুপড়িতে আগুনে পুড়ে যাওয়া ৬০ বছরের বৃদ্ধা ফণীবালা মণ্ডল দুধকুণ্ডির শিবিরে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছেন। ১৪ মে রাতে উদ্বাস্তু উচ্ছেদের জন্য মরিচঝাঁপিতে ঘর জ্বালিয়ে দিলে ফণীবালা আটক হয়ে

পড়েন। তাঁর লোকজনেরা তাঁকে আগুনের জাল থেকে টেনে বের করে আনেন। ১৫ মে মরিচঝাঁপি থেকে হাসনাবাদ, তারপর হাসনাবাদ থেকে দুধকুণ্ডি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কেউ তাঁকে একটু ওষুধও দেননি।

গত মঙ্গলবার থেকে ঝাড়গ্রাম থানার দুধকুণ্ডির শিবিরে গাছতলায় ও মানিকপাড়া কলেজ ও চারুলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজার পাঁচেক উদ্বাস্তু দিনাতিপাত করছেন। তাঁদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর তোড়জোড়ই হচ্ছে। কিন্তু রবিবার দুপুর পর্যন্ত খড়্গাপুর থেকে কোনও স্পেশ্যাল ট্রেন দণ্ডকারণ্যে যায়নি। উদ্বাস্তুদের খুব সামান্য অংশই তাঁদের ক্ষুধা মেটানোর জন্য গম ও টাকা পাচ্ছেন। ফলে মরিচঝাঁপির কামারশালায় তৈরি লোহার জিনিসপত্র তারা দুধকুণ্ডি ও মানিকপাড়ার বাজারে বিক্রি করছেন। দুধকুণ্ডি এলাকায় জড়ো করা উদ্বাস্তুদের মধ্যে যাঁদের রেলের টিকিট কাটার পয়সা আছে, তাঁরা দুধকুণ্ডির গাছতলা থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। শিবির থেকেও কেউ কেউ যাচ্ছেন। তাঁদের চলে যাওয়ায় কেউ বাধাও দিচ্ছেন না। মরিচঝাঁপিতে জমির লোভে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গা থেকে যে সকল উদ্বাস্তু সেখানে গিয়েছিলেন, তাঁরা এখন নিজেদের আসল পরিচয় দিয়ে শিবির থেকে সরে পড়েছেন।

দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠানোব জন্য দুধকুণ্ডি কিংবা মেদিনীপুরের সিআরপি ব্যারাকের ট্রানজিট শিবিরগুলিতে নিখোঁজ লোকদের খুঁজে বের করার কোনও ব্যবস্থা সরকারি তরফে নেই। ফলে পুরুষ উদ্বাস্তুরা তাঁদের পরিবারের নিখোঁজ লোকদের জন্য বানপুর থেকে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর থেকে দুধকুণ্ডি ও খড়্গাপুর স্টেশনের মধ্যে ছুটাছুটি করছেন। কেউ খোঁজ পাচ্ছেন, কেউ পাচ্ছেন না। যাঁরা পাচ্ছেন না, তাঁরা কান্নাকাটি করছেন। একটি দু' বছরের শিশু তার মায়ের কোলে আশ্রয় পেয়েছে। শিবিরগুলিতে এমনি অসংখ্য ঘটনার ভিড়।

মরিচঝাঁপি থেকে উচ্ছেদের ঘটনা জানিয়ে ফণীবালা মণ্ডলের ছেলে সূর্যকান্ত মণ্ডল বললেন, সোমবার শেষ রাতে ঘরগুলিতে আগুন লাগানোর কাজ আরম্ভ হয়। আগুন দেওয়ার আগে তাঁদের একথাও বলা হয়নি যে, ঘর থেকে না বের হলে আগুন দেওয়া হবে। তাঁর মা ঘরের মাটিতে এক কোণে ঘুমোচ্ছিলেন। আগুন দেখে তাঁরা জিনিসপত্র টেনে বের করতে থাকেন। শিশু ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে টেনে তুলে আনেন। তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ভেবেছিলেন, মাও বের হয়ে এসেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখেন মা তো নেই। তখন আবার ছুটে যান মাকে খুঁজতে।

তাঁকে আগুন থেকে বের করে আনা হয়। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর একটা হাতের অংশ ও বুকের খানিকটা পুড়ে যায়। ওই অবস্থায় তাঁদের লঞ্চে তোলা হয় মঙ্গলবার ভোরে। তাঁরা মরিচঝাঁপির এক নম্বর সেক্টরে ছিলেন।

দুধকুণ্ডি শিবিরের ব্যাসমণি মণ্ডলের স্বামী দুর্গাপদ মণ্ডল নিখোঁজ। তাঁদের বারো বছরের মেয়ে বিশাখা মণ্ডলও নিখোঁজ। নিখোঁজের তালিকায় আছেন মাখন হালদার, প্রণয় হালদার, দীপক সরকার, সুভাষ মণ্ডল, অনিল বাছার, সন্তোষ সরকার (জানুয়ারিতে মরিচঝাঁপিতে পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হলে সন্তোষের একটি পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে), রামকৃষ্ণ জোয়ারদার, কালীপদ রায়, হাজারিলাল মণ্ডল, সুধীর মণ্ডল, বাসন্তী মণ্ডল, কালীপদ মণ্ডল, প্রভাস মৃধা, জ্ঞানেন্দ্র হালদার, তাঁর দুই ছেলে প্রশান্ত ও প্রকাশ। এমনি বহু লোকের খোঁজ নেই। নিখোঁজদের তালিকাভুক্ত করারও ব্যবস্থা নেই।

পরিবারের প্রধান থেকে বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলির লোকেরা বললেন, এভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাঁরা দণ্ডকারণ্যে গেলে সেখানে আরও বেশি অসুবিধায় পড়বেন। কারণ দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তালিকায় পরিবারের প্রধানদের নাম। ফলে প্রধানদের ছাড়া সেখানে গেলে তাঁদের পরিচয় গ্রাহ্য হবে না। তখন তাঁরা কী করবেন?

দুধকুণ্ডির শিবিরে যত লোক আছে, তার চেয়ে বেশি লোক আছেন গাছতলায়, শাল গাছের ছায়ায়। শনিবার বিকালে বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলিকে দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর পথে খড়্গপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ট্রাক ও বাস দুধকুণ্ডিতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তাঁরা যেতে রাজি হন না। তাঁরা বাস ও ট্রাকগুলির ওপর ইট-পাথর ছোড়েন। তখন বাস-ট্রাকগুলি ফিরে যায়। কিন্তু মধ্যরাতের পর পুলিশ ও ইউ সি আর সি এবং এস এফ আই-র 'স্বেচ্ছাসেবকদের' সাহায্যে প্রায় পাঁচশো উদ্বাস্তুকে ট্রাকে-বাসে তুলে খড়্গপুরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ইউ সি আর সি-র একজন স্বেচ্ছাসেবক বললেন, তাঁরা দুধকুণ্ডিতে উদ্বাস্তুদের জল সরবরাহের ব্যবস্থা করছেন। গম সরবরাহের তদারকি করছেন। তবে শনিবার গম ফুরিয়ে যাওয়ায় অনেককে গম দেওয়া সম্ভব হয়নি।

মরিচঝাঁপি থেকে দুধকুণ্ডিতে নিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের অভিযোগ, তাঁরা কেন দণ্ডকারণ্য ছেড়ে এলেন, একথা সরকার একবারও বিচার করলেন না। বাংলায় তাঁদের ফিরে আসার ইচ্ছা বরাবরের। কিন্তু তাঁরা তো এতদিন আসেননি। একজন মন্ত্রী আমাদের দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বক্তৃতা দিলেন, না

কাঁদলে মাও দুধ দেয় না। আমাদের বললেন, কান্নাকাটি করুন, তখন একটা কিছু হবেই। আমরা তা বিশ্বাস করেছিলাম।

তাঁরা বলেন, তাঁরা দণ্ডকারণ্যে এখনকার মতো ফিরে গেলেও তাঁরা সেখানে থাকবেন না। তাঁদের এই রাজ্যে যাঁর যেখানে লোকজন আছে, সেখানে গিয়ে দিন-মজুরি বা মোট বইবার কাজ করে খাবেন। তাঁরা প্রশ্ন করেন, মরিচঝাঁপির সব উদ্বাস্তুকেই কি সরকার উচ্ছেদ করে দণ্ডকারণ্যের পথে শিবিরগুলিতে আনতে পেরেছেন? তাঁদেরই জবাব, এবার পুলিশের সঙ্গে অন্য বহু লোকের ভিড় দেখে অন্তত তিন হাজার উদ্বাস্তু গোপনে মরিচঝাঁপি ত্যাগ করে সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁরা ক্ষেতমজুর ও চাকরের কাজ করবেন, তবু দণ্ডকারণ্যে যাবেন না, থাকবেন না।

২১ মে আমার এই রিপোর্ট বের হলে পশ্চিমবাংলা সরকার একটি প্রেসনোট জারি করে জানিয়েছিলেন, অগ্নিদগ্ধ ফণীবালা মণ্ডলের চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা করার জন্য মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আঘাত পাওয়া বা আগুনে পোড়া অন্য উদ্বাস্তুদেরও চিকিৎসা করতে ওই নির্দেশে বলা হয়েছে। আমার সম্পাদক অশোককুমার সরকার আমাকে ডেকে নিয়ে এই লেখার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, "এবার জ্যোতিবাবু বলুন যে আমার কাগজ তাঁর সরকার ও তাঁর সম্বন্ধে কেবল মিথ্যা কথা লেখে।"

আমার কাছে মরিচঝাঁপির ঘটনাবলি ও মরিচঝাঁপির কাহিনি এখানেই শেষ। তবে উপসংহারে কিছু কথা বলার আছে।

উপসংহার

সরকারি ভাবে মরিচঝাঁপি 'অপারেশন' শেষ করার পর পশ্চিমবাংলা সরকার উদ্বাস্তুদের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন— যে পরিসংখ্যানে কতজন উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠানো হয়েছে তার হিসাব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার একটা হিসাব আছে। তা হল মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা কখনই ৪৫ হাজারের বেশি অতিক্রম করেনি। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ১৫ হাজার উদ্বাস্তু স্বেচ্ছায় মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলে গিয়েছে। সুতরাং মে মাসে যখন 'অপারেশন' শেষ হল তখন উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ২৮ থেকে ৩০ হাজারের বেশি কখনই ছিল না। জুন মাসের (১৯৭৯) মাঝামাঝি সময়ে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (DDA) চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্যারি মহাপাত্র দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়া উদ্বাস্তুদের নিয়ে কথা

বলতে কলকাতায় আসেন। ১৯৬৩ সালের ওড়িশার এই আইএএস অফিসার সিভিল সার্ভেন্ট হিসাবে খুব নাম করেছিলেন। তিনি ফেরত পাওয়া উদ্বাস্তুদের সংখ্যার সঙ্গে পশ্চিমবাংলা সরকারের দেওয়া সংখ্যার অনেক ফারাক দেখতে পান। প্যারি মহাপাত্র মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেন। জ্যোতি বসু তাঁকে বিজয়ীর হাসি হেসে বলেছিলেন, "এই লোকগুলিকে বুঝিয়ে অনেক কষ্টে আবার আপনাদের কাছে ফেরত পাঠাতে পেরেছি।" মহাপাত্র সাহেব অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে জ্যোতিবাবুকে বলেছিলেন, "স্যার, আপনি বলছেন আপনি ওদের 'পারসুয়েড' করে ফেরত পাঠিয়েছেন? স্যার, আপনাদের এখান থেকে ফেরত যাওয়া রিফিউজিদের মধ্যে পাঁচশোর মতো লোককে বিভিন্ন আঘাতে আহত অবস্থায় রায়পুর, কোণ্ডাগাঁও ও কোরাপুট হাসপাতালে ঢোকতে হয়েছে!" প্যারি মহাপাত্র তাঁর বাঙালি আইএএস বন্ধুদের এই ঘটনাটি বলে মন্তব্য করেছিলেন, "তোমাদের চিফ মিনিস্টার, সাপ যেমন ছোবল মারার আগে ফণার সঙ্গে চোখ স্থির রাখে, ঠিক তেমন করে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে ফেললেন, 'আপনার ক'বছর চাকুরি হল?"

মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের ওপর জ্যোতিবাবুর 'গিলোটিন' যখন ধীরে ধীরে নেমে আসছে সে সময় মার্চ মাসের (১৯৭৯) শেষাশেষি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রভাবশালী সহকারী সম্পাদক গৌরকিশোর ঘোষ আমাকে একদিন তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে জানতে চাইলেন, মরিচঝাঁপির ঘটনাবলি রিপোর্ট করার বাইরে এমন কে আছেন যাঁকে দিয়ে সমস্যার অন্তঃস্থলের বিষয় লেখানো যায়? আমি দুজনের নাম সুপারিশ করেছিলাম। তাঁরা হলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত ও দণ্ডকারণ্যের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শৈবালকুমার গুপ্ত (আইসিএস)। পান্নাবাবুর বাংলা লেখার হাত বেশ ভালো ও উদ্বাস্তু সমস্যার গভীরতাও জানেন। গৌরবাবু প্রথম পান্নালালবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নিয়ে ধারাবাহিক কয়েকটি লেখা লিখতে অনুরোধ করলেন। পান্নাবাবু গৌরবাবুকে জানালেন যে, তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক নিরঞ্জন সেনগুপ্তকে কথা দিয়ে ফেলেছেন যে. তিনি ওই কাগজে তিন/চারটে লেখা লিখবেন। গৌরদা তখন শৈবাল গুপ্ত মশাইয়ের কাছে গিয়ে লেখার প্রস্তাব দিলেন। শৈবালবাবু রাজি হলেন। তিনি ১৯৭৯ সালের ১১/১২/১৩ এপ্রিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নিয়ে তিনটি লেখা লিখলেন। অনুভূতি, সহৃদয়তা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিল ওই লেখাগুলি। কিন্তু পান্নালাল দাশগুপ্তের প্রথম লেখাটি 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক এক কাণ্ড ঘটল। 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সিপিআইএম ইউনিয়নের প্রধান সুবোধ বসু পান্নাবাবুর বাকি তিন কিস্তি লেখার

পাণ্ডুলিপি ও 'ন্যারো প্রুফ' সিপিআইএম পার্টির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে নিয়ে জমা দিলেন। প্রমোদবাবু 'যুগান্তর' পত্রিকার কর্মচারী সুবোধ বসুকে সামনে রেখে মালিক তরুণকান্তি ঘোষকে সাফ বলে দিয়েছিলেন, পান্নার লেখা যদি আর ছাপা হয়, তাহলে রাজ্য সরকারের সকল বিজ্ঞাপন 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে দেওয়া বন্ধ করা হবে। পান্নাবাবুর আর কোনও লেখা 'যুগান্তর' কাগজে প্রকাশিত হল না।

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নেতা সতীশ মণ্ডল পাইকপাড়ায় বি টি রোডে গৌরকিশোর ঘোষের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। আমি সতীশবাবুর সঙ্গে কথা বলার কাজটা গৌরদার বাড়িতে বসেই সেরে ফেলতাম। কিন্তু পুলিশের আইবি রিপোর্ট ছিল এরকম যে, সতীশ মণ্ডল বেলগাছিয়ায় আমার বাড়িতে যাতায়াত করতেন। তাঁকে ধরবার জন্য বেলগাছিয়ায় আমার বাড়ির সামনে 'I B Watch' ছিল। বরং এতে সতীশবাবুর সুবিধাই হয়েছিল। সতীশবাবু সে সময় আমাকে একাধিকবার জানিয়েছিলেন যে মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ও এমপি সুহৃদ মল্লিক চৌধুরি কয়েকবারই মরিচঝাঁপিতে গিয়ে উদ্বাস্তু নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সুহৃদবাবুর সঙ্গে কথা বলে সতীশবাবুদের মনে হয়েছে, সিপিআইএম এটাই যাচাই করতে চেয়েছে যে 'আমরা উদ্বাস্তুরা সিপিআইএম-কে ভোট দিয়ে যাব কিঁ না!' সতীশবাবু জানিয়েছিলেন যে, সিপিআইএমের রাজ্যস্তরের কোনও নেতাই মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কথা বলেননি। এমনকী মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস, যিনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার গ্রাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে বনগাঁ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছেন, তিনি পর্যন্ত মরিচঝাঁপিতে তাঁর গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে আসেননি। এটাও ঘটনা যে, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ওপর আরএসপি-র সামাজিক প্রভাব অনেকটাই ছিল। কারণ সুন্দরবনে উপকূলবর্তী এলাকায় আরএসপি-র রাজনৈতিক প্রভাব ও আধিপত্য সিপিআইএমকে সব সময়েই দাবিয়ে রেখেছে। মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের পত্তনের গোড়া থেকেই আরএসপি-র কর্মীরা বিনা হইচইয়ে উদ্বাস্তুদের দুর্দশা লাঘবে সাহায্য করেছেন। এটা চব্বিশ পরগনা জেলার সিপিআইএম নেতৃত্ব একেবারেই ভাল ভাবে গ্রহণ করেননি।

মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের সরিয়ে দেওয়ার যাবতীয় ঘটনাবলিতে বিষাদগ্রস্ত বিরোধী দলের নেতা কাশীকান্ত মৈত্র বিখ্যাত বাঙালি সোশ্যালিস্ট কর্মী এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভোলা চ্যাটার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কাশীবাবুর বিষণ্ণতার প্রধান কারণ ছিল এই যে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কাশীবাবু ৬/৭ খানা দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাটনায় জয়প্রকাশকে পাঠিয়েছিলেন

এই আশায় যেন জয়প্রকাশ 'জাতির বিবেক' হিসাবে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন ও হস্তক্ষেপ করেন। ঠিক ওই সময়েই পশ্চিমবাংলার একটি ঘটনায় অধ্যাপক সমর গুহের অনুরোধে জয়প্রকাশ একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে নিরস্ত করেছিলেন। ওই ঘটনাটি ছিল বাংলাদেশের স্রষ্টা শেখ মুজিবর রহমানের অনুগত ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী 'টাইগার' কাদের সিদ্দিকি ও তাঁর অনুগামীদের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাতে প্রত্যর্পণ করা। কিন্তু জয়প্রকাশ মানবিকতার কারণে ওই প্রত্যর্পণে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে তেমন একটা কিছু কেন হল না? ভোলা চ্যাটার্জি সব শুনে এবং জয়প্রকাশকে পাঠানো কাশীবাবুর সব টেলিগ্রামের কপি নিয়ে পাটনায় কদমকুঁয়াতে জয়প্রকাশের বাড়ি গেলেন। জয়প্রকাশ সবিস্ময়ে ভোলা চ্যাটার্জিকে জানালেন যে, তিনি কাশীবাবুর একটি টেলিগ্রামও পাননি! তখন খোঁজাখুঁজির পরও কাগজপত্র ঘেঁটে একটা টেলিগ্রামও পাওয়া গেল না। জয়প্রকাশের এসব চিঠিপত্র-টেলিগ্রাম খুলে তাঁকে দেওয়ার কাজ করতেন একটি মুসলমান ছেলে— যিনি বলতে গেলে জয়প্রকাশের 'দত্তক পুত্র' ছিলেন। এই ছেলেটি ভোলাবাবুকে এক অভাবনীয় ঘটনার কথা জানালেন। জানুয়ারির (১৯৭৯) গোড়াতে সিপিআইএম নেতা এমপি জ্যোতির্ময় বসু একটি বাঙালি ছেলেকে নিয়ে জেপি-কে দেখতে এলেন। তিনি টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত চিঠিপত্র-টেলিগ্রাম দেখে জেপি-কে বললেন একজন লোকের পক্ষে একাজ কখনও সম্ভব নয়। সঙ্গের যুবকটিকে দেখিয়ে জ্যোতির্ময় বসু বলেছিলেন, ও এখানকারই ছেলে। ও প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে বসে এই কাজগুলিতে সাহায্য করে যাবে। জ্যোতির্ময় বসুর এই লোকটি ওই সময় থেকে নিয়মিত কদমকুঁয়ায় জেপি-র বাড়িতে এসে চিঠিপত্র-টেলিগ্রাম খোলাখুলি ও বাছাই করে দিত। কিন্তু মে মাস থেকে এই ছেলেটি আসা বন্ধ করে দিল। জয়প্রকাশের 'দত্তক পুত্র' মুসলমান যুবকটির এবং ভোলা চ্যাটার্জির এই সন্দেহই দৃঢ় হল যে, জ্যোতির্ময় বসুর পাঠানো লোকটিই মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে জয়প্রকাশকে পাঠানো কাশীকান্ত মৈত্রের টেলিগ্রাম ও কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু জ্যোতির্ময় বসু যাকে 'স্থানীয় বাঙালি' বলেছিলেন সেই লোকটি 'স্থানীয়' কিংবা পশ্চিমবাংলা সরকারের আইবি'র লোক তা যাচাই করা যায়নি। কিন্তু এই নেপথ্যের ঘটনায় আর একবার প্রমাণিত হল যে, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য জ্যোতি বসু তাঁর চাতুরিকে কতদূর পর্যন্ত খেলিয়েছিলেন!

আমি হাসনাবাদ ও দুধকুণ্ডিতে বহু আহত উদ্বাস্তুর সঙ্গে কথা বলে একটা বিষয় বারংবার যাচাই করার চেষ্টা করেছি। সেটি হল ১৬ মে (১৯৭৯) রাতে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল কারা? তারা কেউ

পুলিশকে আগুন ধরাতে দেখেননি। অবশ্য সেটা দেখা সম্ভবও নয়। রাত ১১টা কিংবা সাড়ে ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে আগুন ধরানো হয়েছিল একই সঙ্গে। এক সঙ্গে ছোট-বড় হাজারখানেক ঘরবাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ার আগে কুমিরমারি ও বাগনা গ্রামের বাসিন্দাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল উদ্বাস্তুদের আর্তনাদ। আমারও নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, পুলিশ নিজের হাতে আগুন দেয়নি। কারণ, ওই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে পুলিশ বাহিনী সামগ্রিকভাবে পার্টির কব্জায় যায়নি। এ ছাড়া তখন পর্যন্তও উচ্চ পর্যায়ের বেশ কিছু পুলিশ অফিসার ছিলেন যাঁরা জ্যোতিবাবুর মুখের ওপর 'না' বলতে ভয় পেতেন না। তবে দুজন আইএএস অফিসার ও তিনজন আইপিএস অফিসার জানতেন যে, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পার্টির কোনও নেতা আগুন ধরানোর ক্যাডার সংগ্রহ করেছিলেন এবং পুলিশের নিশ্চল সহায়তায় কীভাবে 'কাজ' হাসিল করা হবে সেই ট্রেনিংও ক্যাডাররা কীভাবে পেয়েছিল তা ওই অফিসাররা জানতেন। ওই আইএএস-রা হলেন তখনকার হোম সেক্রেটারি রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও চব্বিশ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইন্দ্রজিৎ চৌধুরি (দুজনেই এখন প্রয়াত)। তবে আইপিএস তিনজন অফিসার এখনও বেঁচে—তাঁরা অমিয়কুমার সামন্ত, সন্ধি মুখার্জি ও সুজিত সরকার। এঁরা মরিচঝাঁপিতে অপারেশন তত্ত্বাবধান করেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইনটেলিজেন্স ব্যুরো'র যে সকল 'ইনফরমার' ১৪ মে থেকে কুমিরমারি ও বাগনাতে ছিল, তারা কোনও লঞ্চে করে আগুন দেওয়ার লোকদের মরিচঝাঁপিতে নামিয়ে দিয়েছিল ও কাজের পর তাদের লঞ্চে তুলে সরিয়ে দিয়েছিল। তবে পার্টির যে নেতা আগুন ধরানোর নায়ক ছিলেন, তিনি প্রমোদবাবু ও জ্যোতিবাবুর উভয়েরই 'কাছের মানুষ' বলে সিপিআইএম রাজনীতিতে পরিচিত। তবে ওই সময় তিনি মন্ত্রী ছিলেন না। ১৯৮২ সালে মন্ত্রী হন।

মরিচঝাঁপি 'অপারেশন' শেষ হওয়ার পর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রয়াত যুগ্ম সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ ১৯ মে এই সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন:

হা আইন, হা শৃঙ্খলা

'ঈশ্বর আছেন তাঁহার স্বর্গে, মর্ত্যের তবিয়ত বিলকুল বহাল'— বিদেশি কবির এই কবিতাটি যাঁহারা গদগদ গলায় আবৃত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পরিতুষ্টি এবং বিশ্বাস হালফিল বেশ কিছুটা চোট খাইতে বাধ্য— বিশেষ করিয়া এই পশ্চিমবাংলায়। অবশ্য ইহা ঠিক যে, এখানকার প্রশাসককুলের উচ্চ মহলে এখনও আত্মতুষ্টির কোনও ঘাটতি দেখা যায় নাই। যাহাই ঘটুক, যাহাই রটুক, ইঁহারা তুড়ি মারিয়া সব উড়াইয়া দেন। সব ঝুট্ হ্যায়—

ক্রমাগত এই গৎটা বাজানোয় কোনও ক্লান্তি নাই। ছোট-বড় চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই, সে তো নস্যি। কর্তারা বলিবেন, তাহাতে আইন-শৃঙ্খলার নিরেট ইমারতটা কিছুমাত্র টুটা-ফুটা হইয়াছে কি, এতটুকু আস্তর-পলেস্তারা খসিয়াছে? তাঁহাদের বিচারে সকলের আগে দল— রাজ্য রসাতলে গেলেই বা কী? দলের প্রাধান্য বজায় থাকিলেই সুবে বাংলা হইতে দূর দিল্লি অবধি ধন্য ধন্য রব পড়িয়া যাইবে।

তবে মাঝে মাঝে ওই ইমারতটার গায়ে এমন ভয়ানক ভাঙচুরের চেহারা ফুটিয়া ওঠে যে, চুনকামের পালিশটুকু ঠেকানো ভার। 'রক্ষা করুন, থানা নীরব' এই শিরোনামায় যে-নালিশটা বাহির হইয়াছে, তন্দ্রাঘোরের আচ্ছন্নতা ঘুচানোর পক্ষে সেইটাই যথেষ্ট। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের 'জনতা' এমএলএ বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র অন্ধকারের কাণ্ডকারখানার বিরুদ্ধে আর্জি হাজির করিয়াছেন খোদ জ্যোতিবাবুর দরবারে। গভীর রাত্রে সিপিএম-এর হাজারখানেক সমর্থক তাঁহার বাড়ি চড়াও হইয়া নাকি স্লোগান দেয়: মৈত্র মহাশয়ের বাড়ি ভাঙিয়া দাও, গুঁড়াইয়া ফেল। 'বাঁধ ভেঙে দাও' আর 'পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' গান দুইটি হইতে ইহাদের প্রাণ প্রেরণা ও উৎসাহ পইয়াছে কিনা নালিশে অবশ্য তাহার ইঙ্গিত নাই। এই ব্যাপারটাকেও বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দেওয়া চলিত যদি অভিযোগকারী হইতেন একজন যে-কে-সে। তিনি আবার একটা কৌশল (চক্রান্ত?) করিয়াছেন কিনা! হল্লাবাজি আর জিগিরের টেপ্ তুলিয়া রাখিয়াছেন। ক্যাসেটটি নিয়াই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে উপস্থিত হন— ওইখানেই বিপত্তি। ফলে মামলাটা অন্তত বিচারাধীন রাখিতে হইয়াছে। একজন এমএলএ-রই যদি এই দুর্দশা হয়, তবে সামান্য মানুষ বুক চাপড়াইয়া বলিবে, হা আইন, হা শৃঙ্খলা!

মরিচঝাঁপির সাম্প্রতিক কাণ্ডকারখানা লইয়া রাজ্য 'জনতা' পার্টির নেতা কাশীকান্ত মৈত্র যে রোমহর্ষক অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা যেন মালদহের ডিস্কটিরই অন্য পিঠ। এখন অবশ্য, মরিচঝাঁপি 'সাফ'। তবে আগেই রাজ্য সরকার মরিচঝাঁপিকে নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত করিয়াছেন। (গণতান্ত্রিক দেশে এই বিধান কোন সংবিধানের বলে, কে জানে!) তার উপর ছত্রিশশো সশস্ত্র পুলিশেও কুলায় নাই, হাজার দুই সিপিএম কর্মী বা ক্যাডারও নামাইতে হইয়াছে! এই ক্যাডারদের সম্পর্কেই লোকেরা বিস্মিত, বিহ্বল আতঙ্ক। ইহারা নাকি উদ্বাস্তুদের উৎখাত করিতে ঘর ভাঙিয়া জ্বালাইয়া পুড়াইয়া সব তছনছ করিয়া দিয়াছে। কথাটা এই মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের ঠাঁই দেওয়া না দেওয়া স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু পার্টির ক্যাডারদের ছাড়িয়া দেওয়া

হয় কোন যুক্তিতে? পুলিশ কি যথেষ্ট পরাক্রান্ত নহে, নাকি তাহার বাহুবলের উপর সরকারের তেমন আস্থা নাই? ক্যাডারেরা কি ধর্মের ষণ্ড যে, যেমন খুশি তেমনই সব লণ্ডভণ্ড করিয়া ফিরিবে? ইহারা কি পার্টি বিশেষের এস-এস ট্রুপস? মোটের উপর কোনও দলের পক্ষেই নিজস্ব বাহিনী পুষিয়া রাখা, এখানে-ওখানে লেলাইয়া দেওয়া গণতান্ত্রিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে।

অবশ্য সাধারণ মানুষের যকৃৎ, প্লীহা হইতে হৃৎপিণ্ড ইস্তক চমকাইয়া দিয়াছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমতার গাজিপুরের ঘটনায় হাঁড়ি হাটে ফাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার ভাষায় এ-ঘটনা অমানুষিক ও বর্বরোচিত। একটি ঘটনা নয়, ঘটনার পরম্পরা। একদিন আরএসপি-র মিছিলের উপর আক্রমণ, পর দিন বসতবাটিতে হামলা, অন্তঃসত্ত্বা নারীদেরও নাকি রেহাই মেলে নাই। অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে ছিল না কী? বোমা, পাইপগান, শাবল, কুড়ুল— সবই ছিল। দেবব্রতবাবুর বিবরণ চাক্ষুষ— একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান। একদল সিপিএম সমর্থকের হাতে গোসাবা ব্লকের বিডিও-র নিগ্রহের ব্যাপারেও পঞ্চায়েত মন্ত্রী সাহসী ভূমিকা নিয়াছেন।

যখন প্রফুল্লবাবু কিংবা আভা মাইতি চরম নৃশংসতার কথা ফাঁস করিয়া দেন, অথবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সিপিএম হামলাবাজি সম্পর্কে তারিখওয়ারি তালিকা পেশ করেন, তখন শাসকমহল না হয় কর্ণপাত না-ই করিলেন। মালদহের বীরেন মৈত্রের নালিশ? ধরা যাক, তিনিও বিপক্ষীয় ('শত্রু পক্ষের'?) মুখপাত্র কিন্তু দেবব্রতবাবু যে পঞ্চায়েত মন্ত্রী। একজন মন্ত্রী যখন মানবতার তাগিদে স্পষ্টবক্তার ভূমিকা নেন, তখন তাঁহার উক্তিকে ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত বা অপপ্রচার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় কই? তাঁহার গায়ে তো আর শত্রুপক্ষীয় বা চক্রান্তকারী— এই লেবেল আঁটিয়া দেওয়া যায় না? তিনি তো মিত্রপক্ষীয়! তাঁহাকেও বৈরিতার অপবাদ দিলে, হায়, বামফ্রন্ট নামে দল-সমষ্টির জোড়াতালিটা বাঁচানো দায় হইয়া পড়ে, মিত্রতার জয়যাত্রাও অব্যাহত থাকে না।

এই সম্পাদকীয়টি লিখে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, "গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করেছি। তুমি গতকাল যে রিপোর্ট করেছ তা দিয়েই সম্পাদকীয় লিখলাম।" আজ তিনি নেই। তবে সেদিনই আমি তাঁর ওই উক্তিকে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নিয়ে লেখা সব রিপোর্টের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মাথায় তুলে নিয়েছিলাম। ২১ মে তারিখে তিনি এই নিয়ে আর একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। সেটি হলঃ

সেই হতভাগ্য নারী কোনও দিন আর তাহার স্বামী ও পুত্র তিনটির সন্ধান পাইবে কি না জানি না, কেন না মরিচঝাঁপি অপারেশন শেষ। দণ্ডকারণ্য যাত্রার দীর্ঘ পথে এক প্রসূতি এবং সদ্যোজাত শিশুটিকে শেষ পর্যন্ত পথ্য ও ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই, কারণ মরিচঝাঁপি অপারেশন শেষ। সামরিক নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গোটা এলাকাই একদম 'ক্লিয়ার' হইয়া গিয়াছে। আজ কি আগামীকাল তাহাদের চিহ্নমাত্র মিলিবে না, যাহারা বাংলার জমিতে সোনা ফলানোর স্বপ্নে ছিল মশগুল। নিয়তির ষড়যন্ত্রে, অকরুণ কঠোর প্রহারে তাহারা বারবার আবার ছিন্নমূল। দুধকুণ্ডির ট্রানজিট্ ক্যাম্প আর তার আশেপাশের গাছের তলা ভাগ্যহত মানুষগুলিকে নূতন কোন বাস্তুর ঠিকানা দিবে, কে জানে।

অপারেশন শেষ— চব্বিশ পরগনার পুলিশ সুপার স্বরাষ্ট্র দফতর রেডিয়োগ্রামে এই পুণ্যকীর্তির কথা জানাইয়া দিতে দেরি করেন নাই। শিরোপা তাঁহার অবশ্যই প্রাপ্য এবং প্রোমোশন সম্ভবত অবিলম্বে। মুখ্যসচিব সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করিয়াছেন এখন হইতে মরিচঝাঁপির সম্পূর্ণ দায়িত্ব বনবিভাগের। সেটা এমন কিছু অবাক ব্যাপার নয়, জংলি পদ্ধতিতে যে-এলাকা সাফ হইয়াছে, সেই এলাকায় জঙ্গলরাজ কায়েম হইবে, এইটাই স্বাভাবিক!

'পুলিশ ও তাদের সঙ্গের কিছু লোক আমাদের বলিলেন, আপনারা আপনাদের কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করি'— উদ্বাস্তুদের জবানি। তা পুলিশের কাজ যে অত্যন্ত নিখুঁত এবং নিপুণ হইয়াছে, সে কথা মানিতেই হইবে। মরিচঝাঁপি না হয় পুনরায় জল ও জঙ্গল কিন্তু পুলিশের 'সঙ্গের কিছু লোক'— ইহারা কাহারা? পার্টি-বিশেষের ক্যাডার নহে তো? যদি তাই হয়, তবে উদ্বাস্তুদের বাদ দিয়া ওই এলাকা এবার কি ক্যাডারের আবাদে পরিণত হইবে? এ বড় আজব ব্যাপার— যেখানে এমপি, এমএলএ-দের প্রবেশ নাস্তি, সাংবাদিকদের তো পদার্পণের কথাই ওঠে না, সেখানে কিনা একটা রাজনৈতিক দলের বশংবদ বাহিনীর অবাধ বিচরণ। শোনা এবং পড়া কথার উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হইতেছে, কারণ স্বচক্ষে যাচাই করার উপায় নাই। প্রশাসককুল ঝাঁপ ফেলিয়া সব একেবারে অন্ধ-বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। রটনা এবং অভিযোগ বড় মর্মভেদী অমানবিক।

ইহার তিলমাত্র সত্য হইলেও মরিচঝাঁপির নাম বদলাইয়া এবার 'ক্যাডার-স্থান' করিলেই তো উত্তম।

বাস্তুহারাদের প্রাণ-মান, স্থিতি-স্বস্তি লইয়া অদৃশ্য বিধাতা পুরুষের হয়তো অনেক খেলা খেলিতে এখনও বাকি। দণ্ডকের বন্ধ্যা প্রান্তরে তাহাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন সম্ভব কি না জানি না। সেখানকার পরিবেশ এবং বাতাবরণও তো শোনা যায় বিরূপ, প্রতিকূল। তা ছাড়া বারবার যাহারা ঠকিয়াছে তাহারা কোনও পদস্থ মতলববাজের ফুসলানিতে বিশ্বাস করিয়া ফের যে ঠকিবে না, এমন নিশ্চয়তা কোথায়? এবার নাকি তাহাদের পথভ্রান্ত করিয়াছে এমনই এক আলেয়ার আলো, ভরাডুবি ঘটাইয়াছে অলীক ছল, চপল এবং বাচাল হাতছানি।

দেশবিভাগ তো আদি পাপ। তাহার পর হইতে বারবার চতুর রাজনীতি উন্মূল মনুষ্যকুলের সহজ সহজাত বিশ্বাসপ্রবণতা লইয়া খেলিয়াছে একই রকম ছিনিমিনি। সেদিন উদ্বাস্তুরা যদি প্রকৃত বন্ধু কে সেটা সঠিক চিনিতে পারিত তবে স্বাধীনতার এই বত্রিশ বছর পরেও তাহাদের স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসিতে হইত না, ঠকিতে হইত না আঘাটার পর আঘাটায়। বিধানচন্দ্রের উপর আস্থা রাখিলে এত দিনে আন্দামানও হইত বাঙালির, একটি নূতন সুজল সুফল পত্তন। সেদিনের উদ্বাস্তুরা ভজনা করিয়াছে বামপন্থা, সর্বনাশা বাঁশির উন্মাদনায় মজিয়াছে। অথচ তখনকার উদ্বাস্তু কলোনিগুলির সৃষ্টিও কিন্তু তখনকারই সরকারের আনুকূল্যে। বামপন্থা তাহাদের উপহার দিয়াছে খালি রকমারি রগরগে স্লোগান: ঘর বাঁধার নয়, ঘর-হারানোর উত্তরাধিকার।

আজ প্রয়োজন শেষ, তাই অপারেশন শেষ— উদ্বাস্তুরা রাজনৈতিক হিসাবে সম্ভবত বাম-নেতৃকুলের বিচারে চটকানো ছিবড়ানো লেবুর সামিল। সেদিন যাঁহারা দণ্ডকে যাওয়ার ব্যাপারে বাগড়া দিয়াছেন, আজ হায়, প্রত্যাগত উদ্বাস্তুরা তাঁহাদের কাছেই উৎপাত এবং উপদ্রব। তাহাদের যত্নে-গড়া উপনিবেশটি ঠ্যাঙাড়ে-বাহিনী দিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে এতটুকু মায়া কিংবা লেশমাত্র চোখের পর্দাও নাই। সেই বিলুপ্ত ইতিহাসের নাম মরিচঝাঁপি। রাজ্যের একজন মন্ত্রী তথ্য বিতরণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, শেষ তিনশো পাঁচটি পরিবার সুন্দরবনের ওই দ্বীপ ত্যাগ করিয়া হাসনাবাদে রওনা হইয়াছেন। মানুষ হইয়াও কুকুর-বিড়ালের মতো বিতাড়িত হওয়ার নাম ত্যাগ করা? অভিধানের অর্থ নূতন করিয়া শিখিতে হইবে দেখিতেছি।

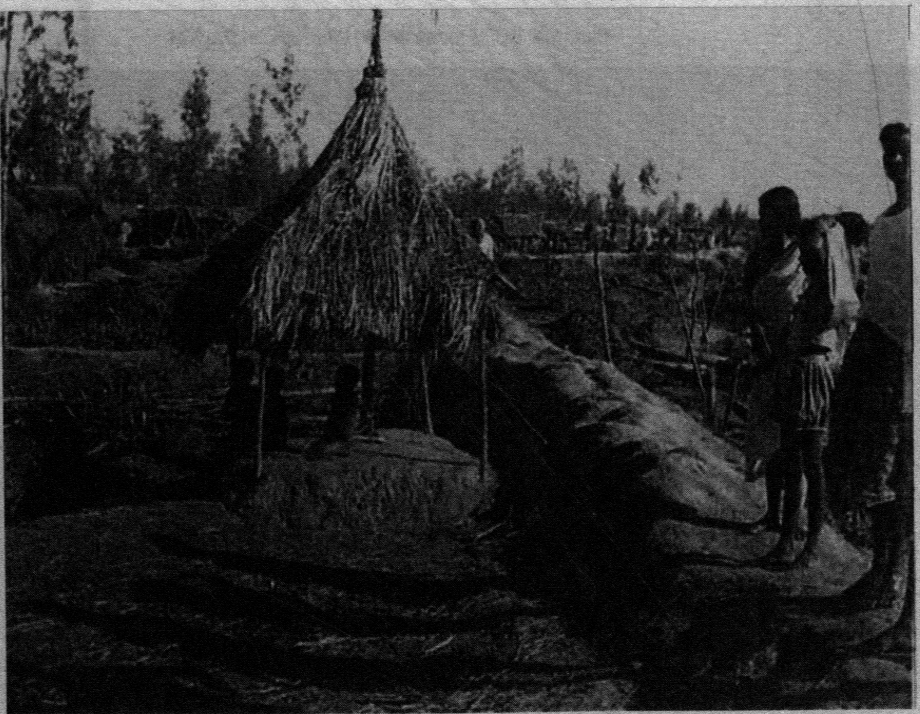
মরিচঝাঁপি আজ সত্যিই নিষ্ঠুরতার 'লুপ্ত ইতিহাস'। কিন্তু মানুষের বিবেকের কাছে কি সব ইতিহাস 'লুপ্ত' হয় কিংবা হতে পারে? যেমন 'লুপ্ত' হতে পারেনি 'কারবালা' প্রান্তর— লুপ্ত হতে পারেনি 'বিষাদ সিন্ধু'— আমার প্রায় অর্ধশত বছরের নীরব অশ্রুর 'বিষাদ সিন্ধু' মরিচঝাঁপি আমি প্রত্যক্ষ করেছি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত।



ওঁরা বাঁচতে এসেছিলেন। নিজেদের শ্রমে, মানুষের অধিকারে।



ওঁরা গড়েছিলেন ঘর, নিজেদের শ্রমে। যদিও দরিদ্র, দেশের মাটির স্পর্শে ধনী।



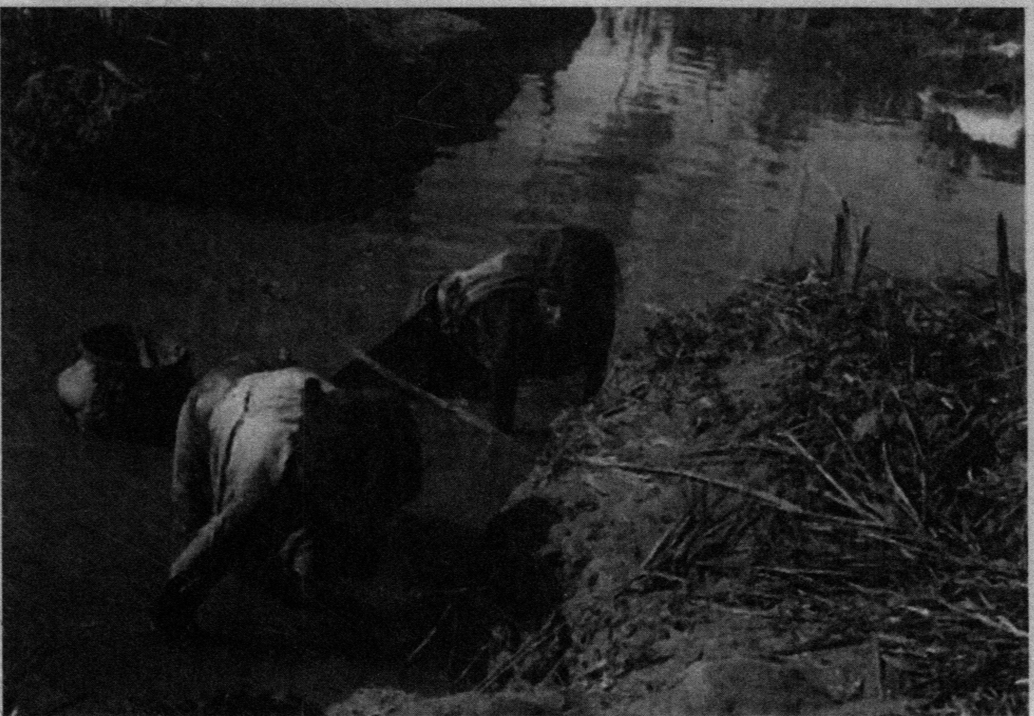
গড়েছিলেন পথ, ছায়ামণ্ডপ।



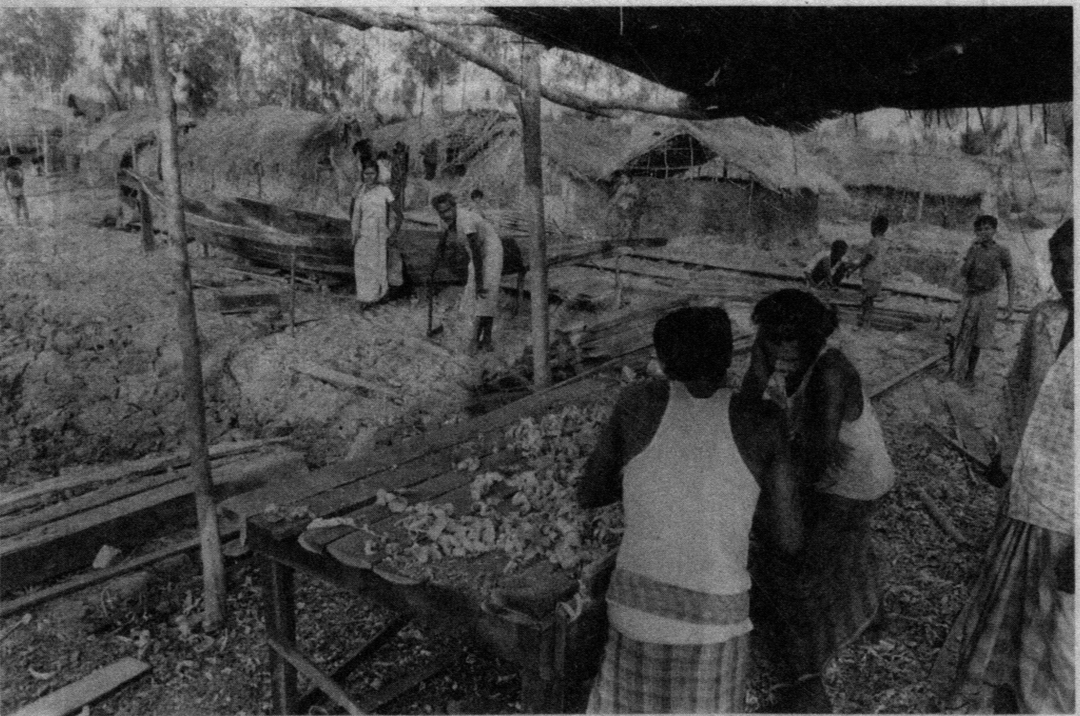
গড়েছিলেন স্কুল, পাঠ শুরুর আগে প্রার্থনা হত রোজ।



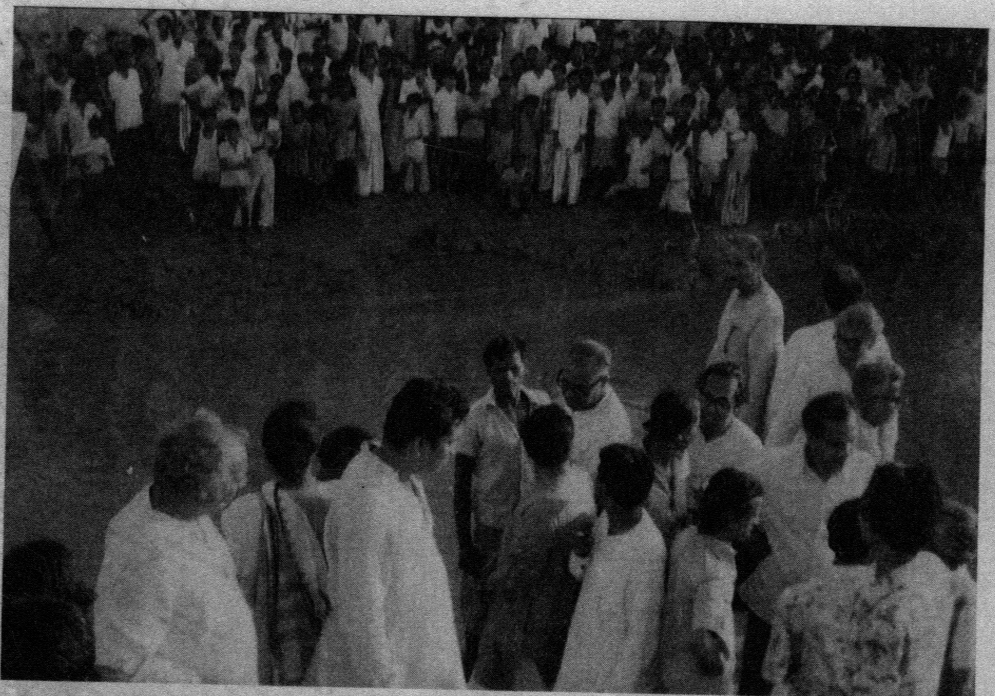
নোনাজলের মধ্যিখানে মিষ্টিজলের সন্ধানে।



মাছের খোঁজে, ভেড়িতে সকাল-দুপুর।



নৌকো গড়ার কারখানা। ওঁদের তৈরি



পরিদর্শনে, পারাপার
সৌজন্যে: তুষার ভট্টাচার্য, আনন্দবাজার পত্রিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন যেভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে কিউবার জনগণকে নতজানু হতে বাধ্য করার অপচেষ্টা করেছিল, প্রায় একই কায়দায় জ্যোতি বসুর সরকার মরিচঝাঁপির অসহায় মানুষগুলোর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করল।

অভূতপূর্ব অসম অঘোষিত যুদ্ধ

মনোজ ভট্টাচার্য

ইতিহাস বিস্মৃত হলে পৌনঃপুনিক ভুলের ফাঁদে পড়তে হয়। ভুল দ্বারা অন্য একটি ভুলকে প্রতিস্থাপিত করার অবোধজনোচিত আচরণ থেকে বাঁচার জন্যও ইতিহাসের বারংবার চর্চা আবশ্যক। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা ঘটতে পারে, যা পরবর্তীকালের ব্যাপক ও বিস্তারিত বৌদ্ধিক আলোচনা পর্যালোচনায় অন্যায় বা ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, সে ইতিহাসেরও ব্যাপক পুনঃপাঠ ও পুনঃচর্চার আয়োজন উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। এগিয়ে চলতে চলতে অবশ্যই ফিরে দেখতে হয়। ভুল ভ্রান্তি কিছু হয়ে থাকলে সে-সব সংশোধন করে আবার এগিয়ে চলতে হয়। এসব বিবেচনায় অবশ্যই মানবিকবোধই মূল মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। মানবিক বোধ বলতে নিশ্চিতই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণবোধ বিবেচ্য। কোনও ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমষ্টিগতভাবে মানুষের সমাজ কতটা সামনের দিকে এগোতে পারল, কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারল, কতটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং সৌভ্রাতৃত্বের বোধে উজ্জীবিত হয়ে সর্বজনীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারল, তার মাধ্যমেই বিচার করা কাম্য ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলি। মনে রাখতে হবে মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে। উল্টোটা নয়।

এমন বোধে অন্বিত হয়েই আজ থেকে তিন দশকেরও বেশি সময়কাল আগে সংঘটিত মরিচঝাঁপির অমানবিক ঘটনাবলির পুনঃপাঠ হওয়া প্রয়োজন। কোনও নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র রাজনীতিপ্রসূত অবধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নয়, বরং ভারত রাষ্ট্রের এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চরম হৃদয়হীন মানবিক বোধ-বিবর্জিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার পারস্পরিক অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েই সেই আলোচনা বা পুনরালোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত।

১৯৭৮-এর অগস্ট মাস থেকে প্রায় দীর্ঘ এক বছরব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের মরিচঝাঁপি দ্বীপখণ্ডের জঙ্গল হাসিল করে বসতি স্থাপন-করা অতি দরিদ্র যথার্থ ঠিকানাহীন উদ্বাস্তু নরনারী শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর বল্গাহীন পুলিশি ও নিয়োজিত সমাজবিরোধীদের যুগপৎ অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি। এসব ঘটনার পূর্বাপর ইতিহাস, এমনকী এসব নির্মমতার সংবাদ পর্যন্ত সে-সময় বিস্তারিতভাবে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। দুর্গম এবং বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে অবস্থিত একটি দ্বীপখণ্ডে কী ঘটছে না ঘটছে, সে সম্পর্কে এ রাজ্যের বা দেশের মূল ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাগরিক সমাজের অজ্ঞতা বিশেষ আশ্চর্য হবার বিষয় নয় বা ছিল না। অতএব এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হবার পর সে-সব ভয়াবহতার বিবরণ অনেকটাই স্মৃতিনির্ভর এবং কোনও কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণনির্ভর। যে-সমস্ত হতভাগ্য উদ্বাস্তু পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল, সেই সব পরিবারের অনেক সদস্যই, যাঁরা কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও কোনও নির্দিষ্ট এবং ব্যাপক সুলুকসন্ধান পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং পূর্বোক্ত সংখ্যাতত্ত্বের ওপরেও নির্ভরশীল হতে হয়। ওই সময় যাঁরা মরিচঝাঁপি দ্বীপে অতিকষ্টে বসতি গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের 'অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারী' অভিযোগে রাষ্ট্রহীন সংখ্যালঘু জনসমষ্টির ওপর বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়ে এসেছে, একই আচরণ যে করা হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। যুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভর বিশ্লেষণ এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে পারে। অন্য কিছু নয়।

ধর্মীয় বিশ্বাস বা আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল মানুষদের জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করে ইংরাজ ঔপনিবেশিক দখলদারি অপশক্তির নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখ্য নেতৃত্বদানকারী জাতীয় কংগ্রেস। জাতির জনক বলে আখ্যায়িত গান্ধীজি অদ্ভুতভাবে নীরবতা অবলম্বন করে বস্তুত নেহরু, প্যাটেল, জিন্নাহ প্রমুখের পরিকল্পনাকেই পরোক্ষ সমর্থনদান করে নিজের অতিপ্রাকৃত ভাবমূর্তি সযত্নে রক্ষা করার প্রয়াস গ্রহণ করলেন। তৎকালীন ভারতের প্রধান বামপন্থী দল হিসেবে স্বীকৃত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও

একই ভাবে চরম বিভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এসব নিয়ে এ দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে এতাবৎকাল পর্যন্ত বহু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। নতুন করে মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই। এ ধরনের চরম অবিমৃষ্যকারী এবং দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে এই বিশাল উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে এক অভাবিতপূর্ব বিপর্যয় নেমে এসেছিল। উদ্বাস্তু অভিধায় চিহ্নিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রূর সাম্প্রদায়িক হানাহানির হতভাগ্য শিকারে পরিণত হয়ে নিজেদের বাপ-পিতামহের ভিটেমাটি নিঃশর্তে পরিত্যাগ করে রাজনৈতিকভাবে চিহ্নিত ভারত বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে অযাচিত জনসংখ্যা হিসেবে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই চরম অমানবিক সময়কালে যে উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কত সংখ্যক মানুষ নিহত হয়েছিলেন, কত নারী (অপ্রাপ্তবয়স্কসহ) যে বিরোধী সম্প্রদায়ভুক্ত বহু অমানুষের উদগ্র যৌন লালসার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন, তার প্রামাণ্য তথ্য পরিসংখ্যান আজও নির্মিত হয়নি। হয়তো আর হতেও পারবে না। বিভিন্ন আলোচনা থেকে যতটুকু জানা যায় তা হয়তো নিমজ্জিত তুষারপর্বতের শৃঙ্গদেশমাত্র। এমন ব্যাপক ও সর্বব্যাপী মানবিক সঙ্কটের অবতারণা কোনও দুর্ঘটনা ছিল না। বরং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে পরিবর্তিত সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ও কর্মধারারই অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ ছিল এই দেশভাগ। উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থবোধে প্রাণিত সম্পদশালী শ্রেণির মানুষেরাই এমন অপহ্নবের কারিগর ছিলেন। সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক মতামতের কোনও ভূমিকাই ছিল না।

এ নিবন্ধের আলোচনা মুখ্যত বাংলা ভূখণ্ডের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ, আলোচ্য প্রসঙ্গ ১৯৭৮-৭৯র মরিচঝাঁপির মানবিক সঙ্কট। অতএব অন্যান্য বহুবিধ আবেগময়তাকে সংযত করেই চলতে হবে। প্রাসঙ্গিক হলেও সামান্য উল্লেখেই সীমারেখা টেনে চলতে হবে।

ভারত উপমহাদেশের মহান ঐতিহ্যপূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই চরম কলঙ্কজনক অধ্যায়ে সারা দেশের মুখ্য রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই ১৯৪৭ সালের জুন মাসে অর্থাৎ ইংরাজ ঔপনিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের মাস দুয়েক আগেই বঙ্গীয় আইনসভা দ্বিখণ্ডিত করে তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা ও পূর্ববঙ্গ আইনসভা। প্রথমোক্ত আইনসভার সমস্ত অমুসলমান সদস্য, এমনকী বামপন্থী বা কমিউনিস্ট সদস্যরাও খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের সপক্ষে ছিলেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে বিপুল ভোটাধিক্যে বাংলা ভাগের পক্ষে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবার বিপক্ষে মতদান করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠন সুনিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য, সে সময় পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জ্যোতি বসুও ওই আইনসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনিও,

নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা যায়, তাঁর দলের সর্বভারতীয় স্তরে গৃহীত 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পদদলিত হয়েছিল নির্মমভাবে। বিগত দিনের চরম বিভীষিকাময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হানাহানির অভিজ্ঞতাই হয়তো এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়ক হয়েছিল! ১৯০৫-এর বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা ভূখণ্ডে যে উত্তাল গণ সংগ্রামের মহান ঐতিহ্য নির্মিত হয়েছিল, যার নেতৃত্ব দিতে এসেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেই ঐতিহ্য অনায়াসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল রবীন্দ্র-তিরোধানের মাত্র পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই।

সমসাময়িক সময় থেকেই নতুন করে শুরু হল এক নির্মম সাম্প্রদায়িক হানাহানি। প্রাণভয়ে উভয় বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ এপারে ওপারে নিতান্ত আশ্রয়ের সন্ধানে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলাচল শুরু করল। প্রাপ্ত তথ্য পরিসংখ্যানের হিসেবে ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যেই প্রায় এগারো লক্ষ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হিসেবে চলে এসেছেন। এঁদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ ছিলেন পূর্ব বাংলার শহরে মধ্যবিত্ত, সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, এক লক্ষের মতো কৃষিজীবী এবং বাকি জনসংখ্যা কারিগরি কাজের সঙ্গে যুক্ত। বিপুল সংখ্যক এসব উদ্বাস্তুর অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ। মুখ্যত এইসব উচ্চবর্ণের মানুষেরাই পূর্ববঙ্গে অ-মুসলিম লিগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং স্বভাবতই অতি দুর্ভাগ্যজনক দেশভাগের পর এঁদের এক বড় অংশ চরম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রাণভয়ে নবনির্মিত বা চিহ্নিত সীমানা অতিক্রম করে এপারে চলে আসেন। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি জমিগুলি দখল করে বসতি স্থাপনের এক নতুন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যাঁদের সামান্যতম কোনও আশ্রয় এপার বাংলায় ছিল, তাঁরা অধিকাংশই নতুন এই যুদ্ধে সেভাবে যুক্ত হননি। দীর্ঘদিন যাবৎ এভাবে নয়া বসতি স্থাপনের কঠিন শ্রম ও দৃঢ়তাসম্পন্ন লড়াই চলতে থাকে। তৎকালীন ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বহুবিধ অবিমৃষ্যকারিতা এবং একদেশদর্শী মনোভাব এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সুষ্ঠু এবং মানবিকবোধসম্পন্ন পুনর্বাসনের প্রসঙ্গটিকে জটিল করে তোলে। একদিকে নতুনভাবে গড়ে তোলা বসতিগুলির জমির মালিকদের নিয়োজিত গুণ্ডাদের মুহুর্মুহু সশস্ত্র আক্রমণ, অন্যদিকে জমিদারদের স্বার্থবাহী পুলিশি অভিযানগুলিকে পরাভূত করেই কলকাতা শহরের দক্ষিণ দিকের বিস্তীর্ণ জলাভূমি, পতিত জমি ইত্যাদির ওপর বহু সংখ্যক উপনিবেশ বা কলোনি গড়ে ওঠে। চরম অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিবানিশি মনুষ্যেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। দারিদ্র্য, নিপীড়ন এবং লাঞ্ছনার মধ্যেও বাঁচার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে

গেছেন বিশাল সংখ্যক পরিবার, যাঁদের অধিকাংশই ওপার বাংলায় নিজস্ব বাসভূমিতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সচ্ছলতার মধ্যেই অভ্যস্ত ছিলেন।

ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই নিষ্ঠুর দেশভাগের অসহায় শিকার। এত বিশাল সংখ্যক মানুষের পশ্চিমবঙ্গের আপাত পরিচিত প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সুষ্ঠু এবং ব্যাপক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উদ্বাস্তুদের এক বড় অংশকে আন্দামান দ্বীপে ও দণ্ডকারণ্যের মতো সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে স্থানান্তরিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। দেশের উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ডে, বিশেষত অবিভক্ত পাঞ্জাবেও বিশাল সংখ্যক ছিন্নমূল পরিবার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদেরও দুর্ভোগ এবং দুর্ভাগ্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু ভারত সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং ত্রাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁদের কোনও ভাবেই কোনও দূরতম এবং অচেনা স্থানে বলপূর্বক পাঠিয়ে দেবার কোনও পরিকল্পনাই ছিল না। এই ধরনের বহুবিধ বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের অবিমৃষ্যকারিতা এবং একদেশদর্শিতার প্রভূত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সাধারণ একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রলোভন সম্বরণ করা যাচ্ছে না। তা হল, রাজধানী দিল্লির ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বেশ কয়েকটি অঞ্চলকে 'উদ্বাস্তু' পুনর্বাসনের স্থান বলে চিহ্নিত করে সেই সব জমিতে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ বা বালুচিস্তান প্রভৃতি স্থান থেকে চলে-আসা পরিবারগুলির সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁদের সবাই 'উদ্বাস্তু' হিসেবে স্বীকৃত হয়ে ঘোষিত সরকারি অনুদান লাভ করে কিছুটা সুবিধা পেয়েছিলেন। অথচ পূর্ববঙ্গ থেকে যে সমস্ত ছিন্নমূল পরিবার কোনওক্রমে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন, তাঁদের চিহ্নিত করা হল 'পূর্ববাংলা থেকে স্থানচ্যুত জনসমষ্টি (displaced persons) হিসেবে। উদ্বাস্তু বলে স্বীকার করলে যেটুকু সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেত তা 'চিত্তরঞ্জন কলোনি'র উষর জমিতে নয়া বসতি স্থাপনকারী মানুষেরা পাননি। একদেশদর্শিতার এমন উদাহরণ বহু।

সম্ভবত এসব কারণে বিশেষ ধরনের অপরাধীদের বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একাংশকে কঠোর শাস্তিমূলক নির্বাসনের জন্য চিহ্নিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অধিকাংশ বঙ্গভাষী ছিন্নমূল মানুষ যেতে চাননি। দণ্ডকারণ্য সম্পর্কেও যথার্থ কারণেই বাস্তুহারা মানুষদের মধ্যে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল। সাধ করে আর কেই বা বনবাসে যেতে চায়!

১৯৪৭-এর পর থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অবিরাম ধারায় বাস্তুহারা দুর্ভাগা মানুষদের পশ্চিমবঙ্গে আগমন চলতেই থাকে। ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্গমনের ধারা বহু গুণ বেড়ে

যায়। ওই সময় কাল পর্যন্ত অর্থাৎ, ১৯৬৫ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বিশেষ কয়েকটি জেলায় বসবাসকারী বৃহৎ সংখ্যক অন্ত্যজ শ্রেণির কিংবা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যায় নিজেদের বাসস্থান পরিত্যাগ করে এদেশে এসেছিলেন। এঁরা মুখ্যত ১৯৬৫-র পরে এবং আরও বিশাল সংখ্যায় ১৯৭১-এর পর প্রাণভয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এঁদের অধিকাংশের কাছেই পশ্চিমবঙ্গে তেমন কোনও দূরতম ঠিকানাও ছিল না। ফলে দণ্ডকারণ্য ব্যতীত অন্য কোথাও এই জনগোষ্ঠীর মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এর কারণ মূলত এঁরা অন্ত্যজ শ্রেণির অতি দরিদ্র মানুষ! এঁদের হয়ে উমেদারি করার মতো প্রভাবশালী মানুষ হয়তো ছিলেন না।

দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বসতি স্থাপনে বাংলাভাষী এবং সংস্কৃতির মানুষদের প্রভূত বাস্তব সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ওই অঞ্চলের অনুর্বর পাথুরে জমির সঙ্গে মূলত কৃষিজীবী বঙ্গভাষী মানুষদের কোনও পরিচয়ই ছিল না। তাঁদের পূর্বতন বহু পুরুষের অভিজ্ঞতা নদীমাতৃক বাংলা ভূখণ্ডের অনায়াসসাধ্য কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দুর্গম জঙ্গল পরিষ্কার করে পাহাড়ি জমির ওপর চাষাবাদ করা অতি দুঃসাধ্য। ওই অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা এবং সংস্কৃতি এইসব মানুষদের কাছে গ্রিক-রোমানের সমার্থক। পুরুষানুক্রমে জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই বাংলাভাষী বাস্তুহীন মানুষদের ওই অঞ্চলে অযাচিত অনুপ্রবেশকারী বলেই ধরে নিয়েছিলেন এবং যে কোনও অছিলায় বা কারণে দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। মারামারি, হানাহানি, বাংলাভাষী পরিবারগুলিকে সদা সন্ত্রস্ত করেই রাখত। স্থানীয় প্রশাসন বা পুলিশের কাছেও এই ছিন্নমূল মানুষগুলি বহিরাগত হিসেবে বিবেচিত হত এবং যে কোনও গণ্ডগোলে পুলিশ প্রশাসন বাস্তুহারা মানুষদের বিরুদ্ধাচরণ করতেই অভ্যস্ত ছিল। উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মেয়েদের ওপরেও নানা ধরনের অমানবিক অত্যাচারের ঘটনা বিরল ছিল না। উল্লেখ্য, দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার মাত্র একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। পরিকাঠামো উন্নত করে সম্যক সেচের ব্যবস্থা প্রচলন করে কয়েক সহস্র পরিবারের জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ। সে সময়ের হিসেব থেকে দেখা যায় যে ওই একশো কোটি টাকার মধ্যে তেইশ কোটি টাকাই ব্যয়িত হয়েছিল পুনর্বাসন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের পিছনে। এর অর্থ, পরিকাঠামো উন্নয়নের অর্থসংকুলান করাই অসম্ভব। এসব সংবাদ লোকমুখে বা অন্যভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে দ্রুত পৌঁছে যেত। বলপূর্বক দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রতিহত করতে উদ্বাস্তুরা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পথে চলতে শুরু করেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি প্রথম থেকেই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহানুভূতির সঙ্গে ছিন্নমূল মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আন্দোলন-সংগ্রামকে তীব্রতর করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ড. মেঘনাদ সাহার মতো বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিকও ইস্টবেঙ্গল রিলিফ সোসাইটির মতো সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে উদ্বাস্তু কল্যাণ বিষয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বামপন্থীরা ইউসিআরসি, আরসিআরসি প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অন্যায় ও একদেশদর্শিতাপূর্ণ পুনর্বাসন প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক সংখ্যক উদ্বাস্তু কলোনিগুলি অচিরেই বামপন্থীদের শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়। দিনের পর দিন ক্লান্তিহীন লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করেই বামপন্থীরা বিপুল সংখ্যক বাস্তুহারা হৃতসর্বস্ব মানুষদের সম্যক বন্ধু হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। আন্দামান এবং দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রসঙ্গে সব কটি বামপন্থী দলেরই প্রবল আপত্তি ছিল। তাঁরা নানা ভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাধ্য হয়ে চলে-আসা মানুষদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই পুনর্বাসন দেবার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা নিয়ে বলপূর্বক উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টাই করে চলছিল। কেন্দ্রীয় সরকারও একই পথে চলার সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। যে সমস্ত পরিবার সরকারি নির্দেশ মানতে অস্বীকৃত হচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেও ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের রাজ্য সরকার উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৬১-এর ১৩ জুলাই তৎকালীন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও ত্রাণ মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে।[১] বহু পত্রে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সূত্র ধরে তিনি (জ্যোতি বসু) জানাচ্ছেন, 'উদ্বাস্তু মানুষেরা দীর্ঘ মাসাধিককাল যাবৎ অনশন ধর্মঘট করছেন। রাজ্যের সব কটি অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরেই এই আন্দোলন চলছে। এই মানুষগুলি তাঁদের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার-পরিকল্পিত দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন। বস্তুত সরকারি অনুদান এবং সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও কোনও মানুষই দণ্ডকারণ্যে যেতে প্রস্তুত নয়। অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেই এই মানুষগুলি তাঁদের বর্তমান অবস্থান পরিবর্তনে কোনও ভাবেই আগ্রহী নন।...' তিনি দাবি জানাচ্ছেন, 'উদ্বাস্তু জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য পথেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে

১ দ্র. পরিশিষ্ট ঙ

হবে। অনশনরত আন্দোলনকারীদের অবস্থা আরও খারাপ হবার আগেই সরকারকে তাদের পূর্বতন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে।' অর্থাৎ, দণ্ডকারণ্যে পাঠানো বন্ধ করতে হবে। ওই একই পত্রে জ্যোতি বসু পরামর্শ দিয়েছেন যে, সোনারপুর অঞ্চলের অস্থায়ী শিবিরগুলিতে যে সমস্ত পরিবার অবস্থান করছেন, তাঁদের সহজেই সুন্দরবনের হেড়োভাঙ্গা দ্বিতীয় স্কিমে পুনর্বাসিত করা সম্ভব। আফসারাবাদে যে সমস্ত পরিবার রয়েছে তাদের ওই অঞ্চলের পরিত্যক্ত কলোনিগুলির জমিতেই বসবাস করতে দেওয়া যেতে পারে ইত্যাদি। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, বাস্তুহারা মানুষদের জবরদস্তি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে অনেক কম খরচে এবং ন্যায়সঙ্গত সময়কালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরেই এইসব পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে।

একই ভাবে তৎকালীন সাংসদ এবং কমিউনিস্ট পার্টি নেতা সমর মুখার্জি লিখিত অভিযোগ[২] করেন যে, সরকারের নানা ধরনের উৎপীড়নমূলক আচরণ সত্ত্বেও মাত্র পাঁচ শতাংশ উদ্বাস্তু পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো গেছে। উদ্বাস্তুদের ওপর নানা ভাবে অত্যাচার করে ভীতি সঞ্চার করে অথবা বিভিন্ন ভাবে প্রলুব্ধ করে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে পুনর্বাসনের অন্যায় প্রচেষ্টা অনতিবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। বস্তুত, এ ধরনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তৎকালীন সমস্ত বাম দলের নেতারা। বামপন্থী দলগুলি নির্দিষ্ট ভাবে মনে করত যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অচাষযোগ্য জমিগুলিতে বাস্তুহারা পরিবারগুলি পুনঃস্থাপিত হতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু জনমুখী পরিকল্পনা। কংগ্রেস দল যেহেতু জনস্বার্থবাহী কর্মসূচি অনুসরণ না করে চলতেই অভ্যস্ত, সুতরাং এই যুক্তিসঙ্গত কর্মপন্থা গ্রহণ না করে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। ছিন্নমূল পরিবারগুলির মধ্যে বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে যে ধরনের প্রবল অসুবিধা এবং সভ্য সমাজগ্রাহ্য নাগরিক সুবিধাগুলির পরিপূর্ণ অপ্রতুলতা নানা সামাজিক সঙ্কটের সৃষ্টি করছিল। মানুষের ন্যূনতম অধিকারগুলি ক্রমাগত অস্বীকৃত বা অবহেলিত হলে সেসব মানুষের মধ্যে অবশ্যই এক মনোবিকার বাসা বাঁধে এবং তা থেকে কী ধরনের বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, তা অনেক সময়ই রাষ্ট্র পরিচালনায় যুক্ত আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে না।

বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তর থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ সত্ত্বেও লক্ষাধিক মানুষকে বলপ্রয়োগ করেই দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। বেশ কয়েক বছর ধরেই এমন অমানবিক কর্মসূচি অনুসৃত হয়ে চলল।

২ দ্র. পরিশিষ্ট ঙ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এমনকী ১৯৭৬ সালেও এই রাজ্যে পাঁচ লক্ষ আটাত্তর হাজার একর খালি বা vacant জমি ছিল। এই পরিমাণ জমির মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একর জমি বা ভূখণ্ডকে সহজেই চাষযোগ্য করে তোলা সম্ভব ছিল। অথচ সুদূর দণ্ডকারণ্যে এক চরম প্রতিকূল এবং অনেক অর্থে, শত্রুতাপূর্ণ বিপ্রতীপ পরিবেশের মধ্যে এত বিশাল সংখ্যক নরনারী শিশু বৃদ্ধকে ঠেলে দেওয়া কোনও অর্থেই মানবিক কাজ ছিল না। ওই সময় পর্যন্ত সিপিআই(এম)-সহ সবকটি বামপন্থী দলই এমন অন্যায়ের ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই প্রায় সমস্ত বাস্তুহারা মানুষের কাছে বাম দলগুলি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। এইসব ভাগ্য বিড়ম্বিত ক্রমাগত দুর্যোগতাড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই বামপন্থী দলগুলির ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। এঁরা বিশেষ ভাবে মনে করতেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যদি কোনও ভাবে কংগ্রেসি অপশাসনের অবসান ঘটে এবং বামপন্থী দলগুলি রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষে আরোহণ করতে পারে তাহলে, তাঁদের জীবনে সুসময় ফিরে আসবে। তাঁরা সবাই গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জননী বঙ্গভূমির কোলে আশ্রয় পেতে পারবেন। এক অদম্য বাসনায় তাঁরা কায়ক্লেশে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন শিবিরে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। সুদিনের আশায় তাঁরা স্বপ্ন দেখতেন।

১৯৭৭ সালের প্রথম দিকে সাধারণ নির্বাচনে সারা দেশব্যাপী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দলের ভরাডুবি হয়। তার অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে চরম অত্যাচারী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সরকারের উৎপাটন সম্ভব করেন এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ। প্রতিষ্ঠিত হয় জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার। এক নতুন যুগের সূচনা ধ্বনিত হয় এ রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানবিক বোধের নব উদ্বোধনে। রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরা উদ্বেল হয়ে ওঠেন। এর রেশ দ্রুত পৌঁছে যায় সুদূর দণ্ডকারণ্যে অসহায় মানুষদের মনে। তাঁরাও উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। স্বপ্নপূরণের আশায়। অবদমিত আবেগ এবং মানুষের মতো বাঁচার অদম্য বাসনা নানা ভাবে বিস্ফারিত হতে থাকে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলের বিভিন্ন উদ্বাস্তু ঘেরাটোপ বা ঘেটোগুলিতে। সত্তর দশকের শুরুতে সংগঠিত উদ্বাস্তু উন্নয়ন সমিতির মতো সংগঠনগুলি নতুন করে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর পূর্বে ১৯৭৪ নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী মানুষদের ওপর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সরকার নৃশংস পুলিশি আক্রমণ সংঘটিত করেছিল। বর্ধিত রেশন এবং উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে গিয়ে কাজ করার অধিকার অর্জন, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ছিন্নমূল জনগণের সুন্দরবন অঞ্চলে পুনর্বাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার উদ্দেশে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের রাজ্য পুলিশ

বাহিনী গুলি চালিয়ে একাধিক আন্দোলনকারীকে হত্যা করে। পরবর্তী বছরগুলিতে সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলন প্রসারিত করার প্রচেষ্টা হয়। এই আন্দোলনের মুখ্য দাবি হিসেবে উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনবসতিহীন এবং চাষযোগ্য নয় এমন সব জমিতে এবং সুন্দরবন অঞ্চলে পুনর্বসতির অধিকার। বহুসংখ্যক উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং দীর্ঘ এক বছরকাল জেলে আটকে রেখেও এই আন্দোলন স্তব্ধ করা যায়নি।

অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই পূর্বোক্ত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করার প্রসঙ্গে অত্যুৎসাহী হয়ে পড়েন। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারও এই বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিল এমন নয়। বরং ১৯৭৭-এ নতুন সরকার গঠিত হবার পরেই ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষ নেতা অশোক ঘোষ এবং তৎকালীন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা রাম চ্যাটার্জি দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পৌঁছে যান। তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবশ্যই ওই অঞ্চলে অতীব যন্ত্রণায় দিন গুজরান-করা মানুষদের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল বলেই প্রকাশ। বামফ্রন্টের বর্ষীয়ান নেতা অশোক ঘোষ এখনও দৃঢ়ভাবে মনে করেন যে, দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে বলপূর্বক উদ্বাস্তুদের পাঠিয়ে দেওয়া অতি অমানবিক কর্মকাণ্ড ছিল এবং বাংলাভাষী ও বাঙালি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষদের পক্ষে ওই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করা অসম্ভব এক প্রকল্প ছিল। তুলনায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তথাকথিত কালাপানি পেরিয়েও পুনর্বাসনের প্রকল্প গ্রহণযোগ্য ছিল বলে তিনি মনে করেন।

এই দুই শীর্ষস্থানীয় বামপন্থী নেতা দণ্ডকারণ্যের মানা এবং অন্যান্য শিবিরগুলি পরিদর্শন করে এসে নিশ্চিতভাবেই রাজ্য সরকারের কাছে কিংবা প্রমোদ দাশগুপ্তর নেতৃত্বাধীন রাজ্য বামফ্রন্টের কাছে তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ পেশ করেছিলেন। সুতরাং ১৯৭৮-এর প্রায় প্রথম দিক থেকেই যে বহু সহস্র উদ্বাস্তু পরিবার তাঁদের জীবনযন্ত্রণা থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি পাবার জন্য দলে দলে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে পৌঁছে যাচ্ছিলেন তা রাজ্য সরকার বিলক্ষণ জানত। এর পিছনে কোনও বিশেষ কায়েমী স্বার্থের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সুস্থিতি ধ্বংস করার চক্রান্ত বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপস্থিতিও অতি কষ্টকল্পনা।

১৯৭৮-এর প্রথম দিক থেকেই প্রায় বাঁধভাঙা নদীর মতো দণ্ডকারণ্যত্যাগকারী উদ্বাস্তু পরিবারগুলি তাঁদের দীর্ঘ প্রার্থিত সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে যেতে থাকেন। যতদূর জানা যায়, হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চল দিয়ে তাঁরা পৌঁছে যান জনমানবশূন্য

মরিচঝাঁপি দ্বীপে। জনাকীর্ণ কুমিরমারি দ্বীপের বিপরীতে অবস্থিত মরিচঝাঁপিতে অল্পকালের মধ্যেই গড়ে ওঠে মনুষ্য বসবাসের উপযুক্ত এক বিশাল উদ্বাস্তু উপনিবেশ। পরিকাঠামো উন্নয়ন বা নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের কোনও সহযোগিতা ব্যতীতই কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ওই দ্বীপে বিদ্যালয়, পাউরুটি তৈরির ছোট কারখানা, অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প, কাঁচা পথঘাট এবং বাঁধ দিয়ে মাছ চাষের ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। পানীয় জলের অভাব পূরণের জন্য নদীর ওপারে অবস্থিত কুমীরমারি দ্বীপে বসবাসকারী মানুষদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে প্রয়োজনে ওই দ্বীপের পরিকাঠামো ব্যবহার করার ব্যবস্থাও দ্রুত গড়ে ওঠে। কায়িকশ্রমে পুরুষানুক্রমিকভাবে অভ্যস্ত প্রায় পনেরো হাজার পরিবারের অধিকাংশই ছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা মুখ্যত দিনমজুরি, মৎস্য শিকার কিংবা অন্যান্য কারিগরি কাজকর্মের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। মরিচঝাঁপিতে চলে-আসা এই বিশাল সংখ্যক মানুষদের অধিকাংশই শোষিত ও বঞ্চিত সমাজভুক্ত। এঁদের মধ্যে কোনও ডাক্তার, প্রযুক্তিবিদ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক বা বৃহৎ জমির মালিক ছিলেন না। এঁদের সকলেই প্রান্তিক জনসমষ্টির হৃতদরিদ্র এবং লাঞ্ছিত মানুষ।

১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কয়েক সহস্র পরিবার হাসনাবাদে পৌঁছে যান। এঁরা প্রায় মাসাধিককাল ওখানে অবস্থান করে নানা ধরনের কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পরবর্তীকালে এই মানুষগুলি সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলে চিহ্নিত মরিচঝাঁপিতে পৌঁছতে শুরু করেন। কুমিরমারি দ্বীপেও এঁরা অনেকেই কিছু সময় বসবাস করেন। বস্তুতপক্ষে, এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলি দণ্ডকারণ্যের 'মানা উদ্বাস্তু শিবিরে' বসবাসের ভয়াবহ যন্ত্রণায় জর্জরিত ছিলেন। জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তাও এঁদের ছিল না। কথায় কথায় আদিবাসী মানুষদের তীর-ধনুকসহ হিংস্র আক্রমণ, পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের চরম দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণ এবং যে কোনও প্রতিবাদের শাস্তিস্বরূপ পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়া কিংবা কারাবাস এঁদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। সেচব্যবস্থার অভাব এবং পাথুরে জমিতে অতি কষ্টে কিছু পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারলেও সেই ফসল প্রায়শই লুঠ হয়ে যেত। সরকার ঘোষিত সামান্য সাহায্য বা অনুদান, রেশন ব্যবস্থা মারফৎ খাদ্য, জীবনদায়ী ওষুধ এমনকী পানীয় জল পর্যন্ত এঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী পেতেন না। প্রকৃতপক্ষে বধ্যভূমিতে বন্দি গরু ছাগলের জীবনের মতোই এঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে পরিবারের মহিলা সদস্যদের ন্যূনতম সম্ভ্রম বজায় রাখাও অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় বহু দুঃশীল মানুষ, পুলিশ, সিআরপি, অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর বহু সদস্য প্রমুখের নারকীয় লোভ লালসার সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু মহিলা। ওই অঞ্চলে প্রচলিত প্রশাসনিক বা আইন ব্যবস্থা উদ্বাস্তু

পরিবারগুলিকে বহিরাগত এবং অবাঞ্ছিত হিসেবে গণ্য করে তাঁদের কোনও অভিযোগকেই কোনও মর্যাদা দিতে সম্মত ছিল না। এই মানুষগুলি বাধ্য হয়েই মরিচঝাঁপির প্ল্যান্টেশন অঞ্চল ও বাগনায় বসবাস স্থাপন করতে বাধ্য হন। এক চরম মানবিক সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই এঁরা দলে দলে সুন্দরবন অঞ্চলে চলে আসেন। নমঃশূদ্র হন আর ব্রাহ্মণ হন, শেষ পর্যন্ত সবাই তো মানুষ। মানুষ হিসেবে বাঁচার আর্তি তো সকলেরই থাকে। এই মানুষগুলিরও ছিল এবং এর মধ্যে মধ্যে কোনও গর্হিত অন্যায় কিংবা ষড়যন্ত্রের গল্প ছিল না।

সঙ্গত কারণেই এই দুর্ভাগা পরিবারগুলি হাসনাবাদে কোনও প্রশাসনিক বা অন্য ধরনের বাধার সম্মুখীন হননি, হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলেও কোনও সমস্যা হয়নি। কুমিরমারি অঞ্চলেও এঁরা অবাধেই প্রবেশ করেছিলেন। এমনকী বর্ষা নামার আগে অর্থাৎ, জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত ওই হাজার হাজার মানুষ যখন মরিচঝাঁপিতে ১৫০ মাইল লম্বা নদী বাঁধ এবং প্রায় ত্রিশ হাজার একর জমিতে মৎস্য চাষের জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলেন তখনও কোনও প্রশাসনিক বাধা ছিল না। ওই বছরেই অগস্ট মাসের শেষ দিকে (২০ অগস্ট ১৯৭৮) প্রায় আচমকাই ত্রিশটি লঞ্চবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পুলিশ বাহিনী ওইসব হতভাগ্য মানুষদের পুনর্বার দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে ফেরৎ পাঠানোর মহান কর্তব্য পালন করতে মরিচঝাঁপি পৌঁছে যায়। ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। যে বামপন্থী দলগুলি পূর্বাপর উদ্বাস্তুদের বলপূর্বক দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর বিরোধিতা করে এসেছেন, তাঁরাই রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই তাঁদের পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে সামান্য কারণে ওই উদ্বাস্তু জনগণকে বলপূর্বক সেই দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠানোর জন্য বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করলেন। ওই বীরপুঙ্গব পুলিশ বাহিনী দীর্ঘ ১৫ দিন যাবৎ বহু চেষ্টা করেও একটি পরিবারকেও দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেনি। মানুষগুলি প্রাণের তাড়নায় পালিয়ে বাঁচার অদম্য চেষ্টা করে গেছে। পুলিশের লঞ্চগুলি উদ্বাস্তুদের প্রায় পঞ্চাশটি দেশী নৌকা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, যতটা সম্ভব ভীতি উৎপাদনের সর্বরকম অপচেষ্টা করেছে, এমনকী পুলিশের গুলিতে দু'জন উদ্বাস্তু বালকেরও মৃত্যু হয়েছে। উদ্বাস্তুরা পালিয়ে বাঁচার পথ খুঁজেছে জলে ও জঙ্গলে। এক অস্বাভাবিক এবং সম্ভবত অভূতপূর্ব এক অসম অঘোষিত যুদ্ধ।

নভেম্বর ১৯৭৮-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায় যে, রাজ্য সরকার আর মরিচঝাঁপিতে বসত নির্মাণ করা উদ্বাস্তুদের উত্যক্ত করবে না। এমন সংবাদে স্বভাবতই সন্ত্রস্ত ও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তু পরিবারগুলি আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায়

বদ্ধপরিকর বিকল্প পথের সন্ধানী বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের প্রাসঙ্গিক পূর্বতন সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করছেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ১৯৭৯-এর জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে নতুন উদ্যমে মরিচঝাঁপিতে রাজ্য প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার চূড়ান্ত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমস্ত বাস্তুহারা পরিবারগুলিকে দণ্ডকারণ্যে ফিরিয়ে দেবার প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হল। ১৯৫৯ সালে কিউবার সফল বিপ্লব-পরবর্তীকালে ১৯৬২ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন যেভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে কিউবার জনগণকে পিষে মারার অপচেষ্টা করেছিল, যেভাবে এই ক্যারিবিয়ান দ্বীপটির অধনতান্ত্রিক সরকারকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে আত্মসমর্পণ করে মার্কিন স্বৈরাচারের কাছে নতজানু হতে বাধ্য করার অপপ্রয়াস গ্রহণ করেছিল, প্রায় একই কায়দায় পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদী নেতা জ্যোতি বসুর সরকার মরিচঝাঁপির অসহায় মানুষগুলির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করল। এই দ্বীপটিতে কোনও খাদ্য, ওষুধ, পানীয় জল এবং অন্যান্য জীবনদায়ী পণ্য সামগ্রীর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কড়া পুলিশি পাহারায় দ্বীপটিকে ঘিরে রাখল। ওই দ্বীপের অসহায় মানুষগুলোর প্রতিবাদ প্রতিরোধকে স্তব্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা ঘোষিত হল। মরিচঝাঁপির কাছাকাছি দ্বীপগুলি যথা, মোল্লাখালি এবং কুমিরমারিতেও কড়া নজরদারি চালু হল।

২৪ জানুয়ারি সকাল থেকেই সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, উপকূল রক্ষী বাহিনী প্রভৃতির বড় বড় স্টিমার সহ অন্যূন ত্রিশটি জলযান থেকে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে এবং বহু কাঁচা ঘরবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করে বন্দি করে ফেলল এবং ক্রমাগত অত্যাচারের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলল। প্রায় সাতদিন যাবৎ ধারাবাহিকভাবে এই একতরফা আক্রমণ চলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ৩১ জানুয়ারি অনাহারে অনিবার্য মৃত্যুর করাল-গ্রাস থেকে আপন সন্তানদের বাঁচানোর আত্যন্তিক তাগিদে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে কুমিরমারি দ্বীপে যাবার চেষ্টা করেছিলেন বহু সংখ্যক মহিলা। পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর বীরপুঙ্গবেরা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মত্তের মতো আক্রমণ করেছিল ওই সব মায়েদের। ক্ষুধার্ত এবং অবসন্ন মহিলাদের ওপর ক্রমাগত নিষ্ঠুর আঘাত সংঘটিত করে তাঁদের অনেককেই ডুবিয়ে মারা হল। পরিবারের মহিলাদের ওপর এমন অত্যাচার প্রতিহত করার জন্য যে সব পুরুষ সদস্যরা জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদেরও কোনও ভাবে রেয়াত করেনি পুলিশ প্রশাসন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের ওই দুর্গম অঞ্চলে উপস্থিত থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা অবশ্যই বেশ কঠিন ছিল। তা ছাড়াও যতদূর জানা যায়, এসব চরম প্রশাসনিক উৎপীড়ন

সংঘটিত করার আগে ওইসব অঞ্চলে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, লোকমুখের সংবাদের ওপর নির্ভর করেই তথ্য ও বিবরণ বিশ্বাস করতে হয়। এমন সব তথ্য থেকে জানা যায় যে, ২৪ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি মাত্র আট দিন সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩৭৫ জন মানুষ অনাহারজনিত কারণে মারা যান। সহস্রাধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করে তাদের ওপর অকথ্য পুলিশি অত্যাচার চলে। পুলিশের গুলি এবং কাঁদানে গ্যাসের গোলার আঘাতে এই প্রথম পর্যায়ে কত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, তার কোনও সঠিক পরিসংখ্যান ওই সময় পাওয়া যায়নি। এমন সংবাদও পাওয়া যায় যে, ওই সব অসহায় মানুষদের জীবনধারণের জন্য নৌকায় করে যে বিশাল পরিমাণ খাদ্যশস্য মরিচঝাঁপিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই নৌকাগুলিকে পুলিশ বাহিনী আটকে দেয় এবং খাদ্যশস্যগুলি বাজেয়াপ্ত করে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, ওই 'অপারেশন মরিচঝাঁপি'' দুষ্কর্মে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সিপিআই(এম)-এর বহু সংখ্যক কর্মীও যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার অবকাশ কম। কিন্তু এর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যদি যথার্থ হয়, তা হলেও তা অভাবনীয়। যে দলটি দীর্ঘকাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পুনর্বাসনের দাবিতে প্রকাশ্যে লড়াই করেছে, সেই দলটিরই কোনও অংশের কর্মীরা সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করবেন, তা ভাবলেও শিহরিত হতে হয়। তবে, এ বিষয়ও সকলেই জানেন যে, বিশেষ করে সিপিআই(এম) মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। হয়তো বা সে সময় থেকেই বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন এবং বামপন্থী আদর্শনিষ্ঠ দল হিসেবে এই কমিউনিস্ট পার্টিটি একা হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। কঠোর আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই একটি গভীর মানবিক সমস্যার সমাধানে সহজ পথে চলতে আগ্রহী হয়ে পড়েছিল ওই বামপন্থী দলটির একাংশ। বামফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব যাতে কোনও ভাবেই কোনও প্রশ্নের মুখে না পড়ে সে বিষয়টিই সমধিক গুরুত্ব পেয়ে গেছিল। তাছাড়া, সে সময় কেন্দ্রে মোরারজি দেশাই-এর নেতৃত্বে জনতা পার্টির সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্থিতি নির্ভরশীল ছিল বামপন্থী দলগুলিরও সমর্থনের ওপর। অতএব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে কোনও রূপ প্রশ্ন করার বিষয়ও ভেবে উঠতে পারেননি দেশের প্রধানমন্ত্রী!

মরিচঝাঁপির নতুন বাসিন্দারা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় এক চরম অসহায়ত্বের করুণ শিকারে পরিণত হলেন। কতদিন আর এমন অসমযুদ্ধ চলতে পারে! জানুয়ারি ১৯৭৯ থেকে তিন-চার মাসের মধ্যেই প্রায় একশো শতাংশ বাস্তুহারাদের মরিচঝাঁপির নতুনভাবে গড়ে তোলা আস্তানা থেকে উৎখাত করা হল। কত নারী শিশু বৃদ্ধসহ মানুষ মারা পড়লেন তার কোনও নির্দিষ্টভাবে সরকার স্বীকৃত পরিসংখ্যান পাওয়া

যায়নি। অনেকটা অনুমান এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যর ওপর নির্ভর করে মৃত বা হারিয়ে-যাওয়া মানুষদের যে সংখ্যাটা প্রকাশিত হয়, তা সর্বার্থে যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে শিহরিত হতে, অধোবদন হতে বাধ্য করবে। অন্ত্যজ শ্রেণির এবং দেশের প্রান্তিক ও উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার এসব মানুষের প্রাণের মূল্য এত কম যে, বস্তুতপক্ষে, রাজ্যের নাগরিক সমাজ এ গিয়ে বিশেষ চিন্তা করার তাগিদও অনুভব করেনি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মন্ত্রিসভায় আরএসপি সদস্যরা মরিচঝাঁপির ঘটনাবলি সম্পর্কে প্রবলভাবে তাঁদের মতবিরোধের কথা ব্যক্ত করেছিলন। সুন্দরবনের লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষদের মধ্যে আরএসপি-র সাংগঠনিক প্রভাব তখনও উল্লেখযোগ্যই ছিল। সংগঠনগতভাবে তাঁরা অসহায় এবং চরম উৎপীড়িত উদ্বাস্তু জনগণের সংগ্রামে পাশে দাঁড়ালেও সর্বশক্তি সংহত করে ওই পুলিশ বাহিনী বা অসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবিলা করার পথে যেতে পারেননি। কোনও ক্ষেত্রে কোনও ধরনের দ্বিধাগ্রস্ততা সম্ভবত কাজ করেছিল! সদ্যগঠিত বামফ্রন্টের ঐক্য সুদৃঢ় রাখার বিষয়টি সম্ভবত বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। বিশেষ করে যখন স্থানীয় প্রশাসন বাছাই করা মুসলিম সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্ত বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে বলপূর্বক উৎখাত করার অপকর্মে নিয়োগ করে, তখন সম্ভবত গণসংগঠনের নিরস্ত্র কর্মীদের পক্ষে নিরস্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোনও পথ অবলম্বন করাও দুরূহ হয়ে পড়েছিল। এমনও জানা যায় যে, সিপিআই(এম)-এর অনেক সদস্য এবং কর্মীও এভাবে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অসহায় উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বিরুদ্ধে চরম আক্রমণ সংগঠিত করার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। অনেকেই মনে করেন যে, নদী পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত এ ধরনের দ্বীপখণ্ডে ওই সব উদ্বাস্তু জনগণকে পর্যুদস্ত করার জন্য অতীতের সাম্প্রদায়িক জিঘাংসাকেও ব্যবহার করা হয়েছিল। এর চাইতে ন্যক্কারজনক ঘটনা আর কী হতে পারে!

এই বিশ্বাসঘাতকতা কলকাতার 'ভদ্রলোক'দের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল— যারা সুন্দরবনের মানুষকে বাঘের খাদ্য বলে মনে করে, পূর্ব-প্রতিশ্রুত জমি-বাড়ির দাবি জানালে অনায়াসেই যাদের গুলি করে হত্যা করা যায়।

সুন্দরবনের বাঘ নরখাদক হল কীভাবে

অনু জালে

অনুবাদ: পদ্মিনী চক্রবর্তী

সারমর্ম: এই গবেষণাপত্রটির মূলে আছে সুন্দরবনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি বিশ্বাস যে, মরিচঝাঁপিবাসী শরণার্থীদের ওপর প্রশাসনের পাশবিক অত্যাচারই সুন্দরবনের বাঘকে মানুষখেকো বাঘে পরিণত করেছে। সুন্দরবনে থেকে প্রায় দু'বছর ধরে চালানো এই গবেষণায় দেখা গেছে, বাঘের প্রথম শ্রেণির নাগরিকে ও শরণার্থীদের 'বাঘের খাদ্যে' পরিণত হওয়ার ব্যাপারে সেখানকার মানুষজনের মনে মরিচঝাঁপির স্মৃতি কীভাবে বারবার ফিরে আসে।

১৯৫০ থেকে শুরু করে ষাট ও সত্তর দশক জুড়ে বাঙালি হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে ঘর বাঁধবার আশায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাদের সকলের স্থান হয় না। অনেককেই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বসবাসের অযোগ্য কোনও কোনও জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই আশ্বাস দিয়ে যে, কোনও এক সময়ে তাদের পশ্চিমবঙ্গেই ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে বাম সমর্থক শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে থাকে। তাদের মধ্যে ৩০,০০০ মানুষ যায় সুন্দরবনের উত্তরের জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপটিতে, যেখান থেকে নৃশংসভাবে তাদের উৎখাত করা হয় অরণ্য আইন অমান্য করবার দায়ে।

এই গবেষণাপত্রে দেখানো হবে, প্রশাসনের কাছে পরিবেশের এই প্রাধান্য এবং শ'য়ে শ'য়ে শরণার্থী হত্যা সুন্দরবনের মানুষের কাছে কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল হয়ে ওঠে। বিশ্বাসঘাতকতা— শুধু উদ্বাস্তুদের প্রতি নয়, সাধারণভাবে সমস্ত দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের প্রতি এবং বাঙালি নিম্নবর্ণ শ্রেণি পরিচয়ের প্রতিও। আমরা আরও দেখাবার চেষ্টা করব, বাংলাদেশ এবং ভারতের জাতীয় প্রাণী হিসাবে বাঘের এই প্রাধান্য কীভাবে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের দাবিদাওয়ার কণ্ঠরোধ করেছে।

প্রসঙ্গত, গবেষণাপত্রটি ২০০৩ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে শিকাগোয় অনুষ্ঠিত আমেরিকান অ্যানথ্রোপলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কনফারেন্সের 'বিস্মৃত বাংলা' ('Forgetting Bengal') স্মারক সূচিতে পেশ করা হয়েছিল।

প্রস্তাবনা: বাংলাদেশি শরণার্থী, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙালি অভিজ্ঞান:

একদিন সন্ধের দিকে ছেলেদের খেলা দেখতে যাওয়ার পথে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল এবং এই নিয়ে অন্তত একশোবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম যে, আমার বাঘ সংক্রান্ত পড়াশুনোর বিষয়বস্তুটা ঠিক কী। তখন আমি মাত্র কয়েকদিন হল নৃতাত্ত্বিক কাজকর্মের খাতিরে জঙ্গল-লাগোয়া সুন্দরবনের এই দ্বীপটিতে এসে বাসা নিয়েছি। এই অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষই সংখ্যায় বেশি। গ্রামবাসীরা সব সময়েই মনে করত যে আমি বন্যপ্রাণী নিয়ে কাজকর্ম করতে এসেছি আর তাদের এই ভুল ধারণা ভাঙতে প্রত্যেকবারই আমাকে বলে দিতে হত যে বাঘ নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। আমার উদ্দেশ্য তাদের সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে বসবাসকারী মানুষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে জানা। এর উত্তরে একজন তরুণ আমাকে বলেছিল, 'কিন্তু, আমাদের ইতিহাস-সংস্কৃতি জানবার কারও দরকার কী? তোমরা তো আমাদের, সুন্দরবনের লোকেদের কেবল বাঘের খাদ্য বলে মনে কর।' এর পরের কথোপকথন থেকে এবং ওখানে উনিশ মাস বসবাস করবার অভিজ্ঞতা থেকে বাঘ-সংক্রান্ত গল্পগাথার মধ্য দিয়ে অনেকগুলি বিষয়ই উঠে আসতে থাকে, এর মধ্যে এখানে আমি সেই একটি মাত্র দিকেরই উল্লেখ করব, যেখানে দেখা যাবে এই অঞ্চলের ইতিহাস বাঘের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে মরিচঝাঁপির ঘটনাকে এখানকার মানুষ দেখে সেই যোগসূত্র হিসেবে, যে-ঘটনার আগে সুন্দরবনের বাঘ মানুষ খেত না আর যে-ঘটনাব পরে সুন্দরবনের বাঘ মানুষখেকো হয়ে উঠল।

মরিচঝাঁপি সুন্দরবনের গ্রামবাসীদের কাছে একটি যুগ্ম বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা— প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা শহুরে সম্পন্ন বাঙালির, যাদের কাছে শরণার্থীদের থেকে বাঘের স্বার্থই বেশি মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল, এবং দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতাটি অবশ্যই বাঘের। বস্তুত প্রথম বিশ্বাসঘাতকতাটিই দ্বিতীয়টির পথ খুলে দিয়েছিল

বলে তাদের বিশ্বাস। অন্যভাবে বলতে গেলে, 'ভদ্রলোক'[১] গোষ্ঠীর প্রান্তসীমায় বসবাসকারী এই 'নিম্নবর্ণের'[২] লোকেরা প্রান্তিক বলেই বিবেচিত হত এবং বাঘ, যেন এই সঙ্কেতটি পেয়েই তাদের নিজের খাদ্য বলে ভাবতে শুরু করে দেয়। 'ভদ্রলোক' বলতে আমি এখানে অবশ্যই উচ্চবর্ণের হিন্দু বাঙালি শ্রেণিকে নির্দেশ করতে চাইছি, যারা ইংরেজি-শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, সুসংগঠিত, সম্পন্ন এবং মূলত শহরবাসী, আর 'নিম্নবর্ণের লোক' বলতে বোঝাতে চাইছি সেই 'নিপীড়িত শ্রেণি সম্প্রদায়'-কে, যারা 'ভদ্রলোকের' জমিতে অথবা বাড়িতে কাজ করে দিনগুজরান করে, 'ভদ্রলোক' শ্রেণির বাইরে যাদের বাস এবং সামাজিকভাবেও যারা চিরকালই হীন বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। মরিচঝাঁপির ঘটনা কীভাবে সুন্দরবনের গ্রামবাসীদের মনে এই বিশ্বাসঘাতকতার ধারণাটি তৈরি করে দিল, এই গবেষণায় আমরা সেটিই দেখাতে চেষ্টা করব।

রস মল্লিক[৩] খুবই দক্ষতার সঙ্গে আমাদের দেখিয়েছেন, মরিচঝাঁপির দুর্ঘটনার পিছনের কারণগুলো যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে ভারতভাগের সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং শ্রেণি বর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোর নিরিখেই সেই কারণগুলোকে আমাদের বুঝে নিতে হবে। সংক্ষেপে, পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলিত[৪] আন্দোলনগুলোর অন্যতম হিসাবে ঔপনিবেশিক ভারতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় তারা বাংলার কংগ্রেস পার্টিকে ১৯২০-র দশক থেকে বিরোধী দলের আসনে ঠেলে দেয়। স্বাধীনতার পরে অন্তত পশ্চিমবাংলার উপরে যাতে ভদ্রলোকশ্রেণির নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসে, সেজন্য অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায় এবং ঘটনাচক্রে তৎকালীন কংগ্রেস দল স্বাধীনতার সময় বঙ্গবিভাগ চেয়েছিল।[৫] ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, বঙ্গভঙ্গ আদতে দলিত আন্দোলনকে দুর্বল করে ফেলে ও দুই বাংলাতেই তাকে রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়।[৬]

ভারতভাগের সঙ্গে সঙ্গে, মুসলিম ও নিম্নবর্ণের রায়তদের ভয়ে উচ্চবর্ণের অভিজাত জমিদার শ্রেণি প্রথম পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। তারপর চলে আসে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজ: কৃষিজীবী ও শিল্পজীবীর দল। এই শরণার্থীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সচ্ছল, কলকাতা ও কলকাতার আশপাশে তাদের আত্মীয় কিংবা বন্ধুদের মধ্যে তারা মোটামুটি জায়গা পেয়ে যায়। দরিদ্রতর শরণার্থীরা সরকারি বা বেসরকারি জমি বিনা স্বত্বেই দখল করে বসে এবং প্রাণপণে উচ্ছেদ ঠেকাবার চেষ্টা করতে থাকে। ১৯৫০, '৬০ এবং '৭০-এর দশকগুলি ধরে (১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং '৭৫-এ মুজিবর রহমানের হত্যা ও জিয়ার

ক্ষমতা দখলের পরে) পূর্ববঙ্গে রয়ে যাওয়া দরিদ্রতম নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হতে থাকে। এরাও এবার পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় খুঁজতে থাকে। পরিবার এবং বর্ণহিন্দুদের সূত্রে সম্পন্ন শরণার্থী পরিবারগুলো কলকাতায় আশ্রয় পেয়েছিল, কিন্তু এই দরিদ্র পরিবারগুলোর কলকাতায় ঠাঁই হল না। তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল বসবাসের অযোগ্য কিছু অনুর্বর জায়গায়। এর মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিল দণ্ডকারণ্য— মধ্য ভারতের একটি শুষ্ক পাথুরে অঞ্চল। এলাকাটি ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পূর্বের মধ্যপ্রদেশ এবং বর্তমান ছত্তিশগড়ের কিয়দংশ জুড়ে। বোঝাই যাচ্ছে, শরণার্থীদের এতদিনকার চেনা জগতের সঙ্গে সংস্কৃতি ও ভূমিরূপ— কোনও দিক দিয়েই এই অঞ্চলটির কোনও মিল ছিল না। বিরোধী রাজনৈতিক দলটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে শরণার্থীদের বিতাড়িত করবার জন্য কংগ্রেসকে অভিযুক্ত করল এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে তারা ক্ষমতায় এলে শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনা হবে[৭] এবং খুব সম্ভবত সুন্দরবনের কোনও দ্বীপে তাদের থাকার জায়গা করে দেওয়া হবে।[৮]

শরণার্থীদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষত যারা খুলনা থেকে এসেছিল, তারা শূন্য ও বিচ্ছিন্ন দণ্ডকারণ্যের থেকে লোকবসতিপূর্ণ সুন্দরবনেই থাকতে চাইছিল। সুন্দরবনের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা খুলনা থেকে উনিশ শতকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে এসেছিল। ১৯৭৫ সালে, যাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়েছিল তারা অনেকেই গোসাবা থানার মরিচঝাঁপি দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত বালুকাময় মরিচচক অঞ্চলে চলে আসতে শুরু করে। তারা ভেবেছিল যে, সেখানে ১৬,০০০ পরিবারের স্থানসঙ্কুলান হয়ে যাবে। বাকি ৩০,০০০ পরিবার সেক্ষেত্রে চলে যেতে পারে কাছাকাছি দত্তপাসুর[৯] এবং সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে 'চাষযোগ্য পোড়ো জমি' পাওয়া যাবে।[১০] কিন্তু এখানে বসতি স্থাপনের প্রথম উদ্যোগেই তাদেরকে গুলি করে পাশবিকভাবে উৎখাত করা হয়।[১১]

হিন্দু ও মুসলিমদের বাসভূমি হিসাবে যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের এই মেরুকরণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গ্রামের দরিদ্র নিম্নবর্গের জনগণ, বিশেষত, নিম্নবঙ্গে বসবাসকারী মানুষেরা, ধর্মের ভিত্তিতে যাদের মধ্যে ততটা বিভেদ ছিল না, যতটা ছিল ভদ্রলোক ও নিম্নবর্ণের বা নিম্নবর্গের লোক হিসাবে আর্থ-সাংস্কৃতিক দিক থেকে। 'বাঙালি' ও 'মুসলিম'— এই দুই পরিচয়ের মধ্যেকার বিরোধের কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে।[১২] কিন্তু, যেটা বলা হয় না সেটা হল 'বাঙালি', কিন্তু 'ভদ্রলোক' নয়— এই দুই পরিচয়ের মধ্যে বিরোধের কথা। কিন্তু, কেন দ্বীপবাসীরা 'ভদ্রলোকে'দের চোখে নিজেদেরকে 'কেবল বাঘের খাদ্য' বলে মনে করে সে কথা বুঝতে গেলে ওই বিরোধটির উল্লেখ করা দরকার। রণজিৎ গুহ তাঁর

'এলিমেন্টারি অ্যাস্পেক্টস্ অফ পেজেন্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' (১৯৮৩) গ্রন্থে ঔপনিবেশিক বাংলার গ্রামীণ আন্দোলনগুলো পর্যালোচনা করে গ্রামীণ জনসমাজের সচেতনতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।[১৩] এবং এরপর থেকেই নিম্নবর্গের ইতিহাস গুরুত্ব পেতে থাকে। সংযুক্তা দাশগুপ্ত অবশ্য মনে করেন[১৪] যে, এই ধরনের আলোচনায় বিশেষত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সূত্রে কৃষকদের ধর্মই প্রাধান্য পায়। ধর্মের দিকটি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু শুধুমাত্র সেটার উপরেই জোর দিলে সমান গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলোকে অবহেলা করা হয়। অবহেলা করা হয় তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিচিত সাংস্কৃতিক দিকটিকেও। অন্তত, এক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত সচেতনতা তৈরিতে ধর্মের প্রাধান্য ছিল না। মরিচঝাঁপি ও বাঘের মানুষখেকো হয়ে ওঠা নিয়ে স্থানীয় যে কাহিনিগুলি প্রচলিত আছে, তা থেকে বোঝা যায় যে শ্রেণিবর্ণের বিভাজন থেকেই এই সচেতনতা গড়ে উঠেছিল। (বাঘ এখানে নিতান্ত একটি জন্তুমাত্র নয়, সে জাতীয় প্রাণীর গৌরব লাভ করেছে। দ্বীপের অধিবাসীদের বাঘ-সংক্রান্ত গল্পগুলো কিন্তু বলে যে, বাঘের এই গৌরববৃদ্ধির মধ্যে আসলে লুকিয়ে আছে তাদের প্রতি অবিচারের সুদীর্ঘ ইতিহাস)। এখানে আমি দেখাতে চেষ্টা করব, পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য দরিদ্র শরণার্থীদের দাবির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল, তাকে কীভাবে সুন্দরবনের দ্বীপবাসী মানুষ আত্মস্থ করেছে আর কেনই বা তাদের দাবিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে তারা মনে করে।

সুন্দরবনে আসার পরেই আমি শুনলাম যে, এখানকার বাঘের মানুষখেকো হয়ে ওঠার কারণ সন্ধান করতে হবে মরিচঝাঁপির ভয়ংকর ঘটনাটির মধ্যে। অনেকেই আমাকে বোঝালেন যে, মরিচঝাঁপির ঘটনা ঘটার আগে সুন্দরবনের মানুষ ও সুন্দরবনের বাঘ নির্বিরোধ সহাবস্থানে ছিল। মরিচঝাঁপির ঘটনার পরেই এখানকার বাঘ মানুষ শিকার করতে আরম্ভ করে। তাদের এই আকস্মিক পরিবর্তনের পিছনে দুটো কারণ ছিল বলে এখানকার মানুষের বিশ্বাস। প্রথমত, সরকারের হিংস্র নীতির ফলে সুন্দরবনের জঙ্গল দূষিত হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনার পর থেকে সুন্দরবনের অধিবাসীদের তুলনায় বাঘই এখানে গুরুত্ব পেতে থাকে। শরণার্থীদের এখান থেকে যে পাশবিক নৃশংসতায় বিতাড়ন করা হয় এবং তারপরেই সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণের জন্য সরকার যেভাবে নানান নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে, তাতে, গ্রামবাসীদের মতে, বাঘের নিজের কাছেই তার গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। নিজেদের মূল্য সম্পর্কে অত্যধিক আত্মবিশ্বাসী হয়ে-ওঠা এইসব বাঘ দরিদ্র দুর্বল মানুষকে তাদের 'খাদ্য' বলে ভাবতে শুরু করে দেয়।

গ্রামবাসীদের ইতিহাসের সূত্রে বাঘের এই মানুষীকরণের (anthropomorphisation) দিকটি আমাকে আকৃষ্ট করে। সুন্দরবনের ও সুন্দরবনের বাঘের আরণ্যক সৌন্দর্যকে রোমান্টিক ভাবসৌন্দর্যের আলোয় দেখা অনেক সময়ই বাঙালি 'ভদ্র' পরিচয়ের একটি অঙ্গ। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের প্রতি বাঙালি 'ভদ্রলোকদের' এই সহানুভূতির পিছনে আছে বাঘ-শিকারের রাজকীয় ও ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় প্রাণী হিসেবে তার সাম্প্রতিক অবস্থান। এবং এই সহানুভূতির কারণেই সুন্দরবনকে বিশ্বের একটা ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান (World Heritage Site) হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে যা মুখ্যত বাঘের আবাসস্থল হয়ে উঠেছে (Prime Tiger Area)। কিন্তু জাতীয় প্রাণী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে 'ভদ্রলোকেরা' যে বাঘকে একটা অতিরিক্ত মর্যাদা দিল (যদিও এখানে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি না)— এখানেই গ্রামবাসীদের প্রশ্ন। তারা তুলে ধরে বাঘের আর একটা রূপ। 'ভদ্রলোকদের' বাঘের সমস্ত ঔপনিবেশিক ও জাতীয় মহিমা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারা বাঘকে সামনে এনেছে এমন একটি প্রাণী হিসাবে যে তার সত্যিকারের ভদ্র ও নির্বিরোধী আচার-আচরণ ভুলে গিয়ে মরিচঝাঁপির ঘটনার পরে চিরকালের মতো মানুষ-খেকো হয়ে উঠেছে। 'তাদের' বাঘের এই রূপান্তরের বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামবাসীরা সেই ইতিহাসকে তুলে আনে, যা তাদেরকে বিস্মরণের অতলে ঠেলে দিয়েছে। শহুরে অভিজাতদের সেই অবিচারের কথা তারা রোমন্থন করে, যাদের কাছে বাঘ গ্রামবাসীদের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল। কারণ— গ্রামবাসীরা তো আসলে নিম্নবর্গের লোক!

মরিচঝাঁপি থেকে পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীদের পাশবিক উচ্ছেদ

১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে দেখতে পেল যে তাদের শরণার্থী সমর্থকেরা তাদের কথায় বিশ্বাস করে জমিজায়গা বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। সরকার তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি বজায় রাখবে[১৫]— এই ভরসায় সব মিলিয়ে দেড় লক্ষ শরণার্থী দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে।[১৬] কিন্তু হঠাৎ-আসা এই উদ্বাস্তুদের জোয়ার রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে আশঙ্কা করে সরকার তাদের জোর করে ফিরে যেতে বাধ্য করে। তবে শরণার্থীদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় পালিয়ে যায়। সে রকমই একটা জায়গা সুন্দরবন। সেখানে তারা জঙ্গলে ও জলা জায়গায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে— সংসার পেতে বসে। ওই বছরই মে মাস থেকে 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'র সভাপতি ও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্বাস্তু পরিকল্পনার প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ সহযোগী সতীশ

মণ্ডলের নেতৃত্বে প্রায় ৩০,০০০ শরণার্থী মরিচঝাঁপিতে এসে বসবাস শুরু করে।[১৭]

মরিচঝাঁপি পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের একেবারে উত্তরে একটা জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপ। ১৯৭৫ সালে এই দ্বীপটির স্বাভাবিক ম্যানগ্রোভ গাছগুলো কেটে ফেলে সরকারের তদারকিতে নারকেল ও ঝাউচাষ আরম্ভ হয়। রাজ্যের কোষাগারে রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল। দ্বীপটির পুরোটাই ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ঢাকা ছিল না। কিন্তু, তবুও, সরকার এখানে জনবসতি গড়ে ওঠার কোনও উদ্যোগকে প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিল না। সরকারের বয়ান অনুযায়ী, "শরণার্থীরা অবৈধভাবে মরিচঝাঁপি অধিকার করেছে। এবং যেহেতু মরিচঝাঁপি সুন্দরবনের সরকার-কর্তৃক সংরক্ষিত অরণ্যের অংশবিশেষ, সুতরাং শরণার্থীরা অরণ্য-আইনও অমান্য করছে।" তাদের মতে, শরণার্থীরা এখানে এসেছে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে। এতে এখানকার অরণ্যসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিবেশগত সাম্যও বিঘ্নিত হবে।[১৮] সরকার পরিবেশকেই প্রাধান্য দিল। কিন্তু, গ্রামবাসীদের মতে, কলকাতার 'ভদ্রলোকদের' কাছে তাদের উচ্ছেদকে যুক্তিগ্রাহ্য করবার জন্যই এই সব যুক্তি দেখানো হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি করে উদ্বাস্তু চলে না আসে, সে জন্যই সরকার এসব ব্যবস্থা নিচ্ছিল— এই যুক্তিকেও তারা অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। রস মল্লিকও দেখিয়েছেন, ততদিনে যেহেতু পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীদের শেষতম দলটাকেও জোর করে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, সেই হেতু মরিচঝাঁপিতে যারা বসবাস শুরু করেছিল, তাদের জন্য কোনও বাড়তি অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেবার আশঙ্কা সরকারের তরফে ছিল না।[১৯]

দণ্ডকারণ্য থেকে আসা শরণার্থীরা এসে মিলল সুন্দরবনের গা-ঘেঁষা সাতজেলিয়া, কুমিরমারি, পুঁইজালি, ঝড়খালি দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে। ১৯৩০ বা '৪০-এর দশকে খুলনা থেকে এদের এনেছিল অরণ্য পরিষ্কারের কাজে, সুতরাং, নতুন অভিবাসনকারীদের সঙ্গে এদের সহজেই মিল হল। এদের অনেকের মধ্যে আবার দেখা গেল রক্তের সম্পর্কও আছে। জমি-জায়গা, শাক-সবজি আদান-প্রদান ও নিত্য যাতায়াতের সূত্রে সেই বন্ধন সুদৃঢ় হল। জমিজমাহীন তরুণ দম্পতিকে অনুরোধ করা হল মরিচঝাঁপিতেই থেকে যেতে। আগে থেকেই যারা ছিল এখানে, স্বভাবতই জঙ্গলের এই অংশ সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ ও নিবিড় জ্ঞান ছিল। তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। প্রয়োজনে ডিঙি ধার দিল শরণার্থীদের। বিনিময়ে নতুন-আসা শরণার্থীরা তাদের স্বার্থ মজবুত করার জন্য এখানেই থেকে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করল। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেউ কেউ যদিও তাদের সেই সময়কার অসুবিধার কথা বলেন।— যেমন শরণার্থীদের অসহায় নির্ভরশীলতার জন্য এক রাতের মধ্যে নাকি গোটা পুকুরের জলই নিঃশেষ হয়ে গেছিল। কিন্তু, বেশির ভাগেরই মনে

তিক্ততার বদলে আছে সৌভ্রাতৃত্বের মধুর স্মৃতি। মরিচঝাঁপি ১২৫ বর্গ মাইলের একটা বেশ বড় দ্বীপ। সুতরাং শরণার্থীরা সেখানে জমি নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না করে হাতে হাত মিলিয়ে তাদের দাবি কলকাতায় পৌঁছে দেবারই চেষ্টা করেছিল। কারণ— একে তো মরিচঝাঁপির মাটি অনুর্বর, তারপর সে মাটি ভাগাভাগির অধিকার সেখানকার মানুষের ছিল না।

শরণার্থীরা ও আশপাশের গ্রাম থেকে আসা মানুষ সরকারের ঝাউ ও নারকেল গাছের নিচে চাষের জমির ধার ধ'রে কিছু অস্থায়ী কুটির তৈরি করেছিল। এদের বেশির ভাগই জঙ্গলের কাঁকড়া ও মাছ ধরে এবং দ্বীপের অধিবাসীদের সহায়তায় তা আশপাশের গ্রামে বিক্রি করে দিনগুজরান করত। সেই সময়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুন্দরবনের মানুষ শরণার্থীদের সঙ্গে তাদের মধুর সহাবস্থানের কথাই বেশি করে বলে। এ ছাড়াও তারা শরণার্থীদের মধ্যে পেয়েছিল সরব নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কিছু মানুষকে। গ্রামের অভিজাত ধনী জমিদার শ্রেণি, যারা তাদের এতদিন শাসন করেছে এবং কোনও রকম সুযোগ পেলেই কলকাতায় চলে যেতে চেয়েছে, তাদের পরিবর্তে এই পূর্ববঙ্গীয় নেতাদের তারা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিল। কারণ— এই নেতৃস্থানীয় মানুষগুলো ছিল তাদেরই মতো গ্রামের গরিব নিচু জাত। ফলত মাছ ধরার মতো দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করতে তাদের বাধত না। এবং ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্য দিয়ে তারা বুঝেছিল অধিকার রক্ষার লড়াই বলতে কী বোঝায়। এক কথায়, শরণার্থীরা সুন্দরবনবাসীদের চোখে বেশ সম্মানের পাত্র হয়ে উঠেছিল। পড়াশোনোতেও পূর্ববঙ্গীয়রা অনেক বেশি এগিয়ে ছিল। এবং কলকাতায় শাসক শ্রেণির কাছে গ্রামের সমস্যাগুলো তুলে ধরবার শক্তি এই সর্বহারা মানুষগুলোর আছে— এমনই বিশ্বাস তারা করেছিল। দ্বীপবাসীরা পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীদের প্রতি এখনও তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। কারণ তাদের কল্যাণেই মরিচঝাঁপি রাতারাতি একটি উন্নত এলাকায় পরিণত হয়। টিউবওয়েল বসে, মৎস্যশিল্প, নুন-কুঁয়া, ডাক্তারখানা তৈরি হয়। কতকগুলি স্কুলও বসে।[২০] দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই দ্বীপগুলিতে এত রকম সুব্যবস্থা আগে ছিল না, এমনকী এখনও নেই।

শরণার্থী ও দ্বীপবাসীদের এই সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি নিয়ে গল্পের অভাব নেই। প্রান্তিকীকরণের অভিজ্ঞতা তাদের দু'পক্ষেরই ছিল। উভয়ের লক্ষ্যও ছিল সাধারণ— যথাযোগ্য একটা জায়গার জন্য লড়াই— যে লড়াই নতুন পশ্চিমবঙ্গে অধিকার আদায়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। শরণার্থীদের মরিচঝাঁপিতে বসবাস করার ব্যাপারটাকে গ্রামবাসীরা দু'ভাবে ব্যাখ্যা করে। শরণার্থীদের পরিচিতিকে মর্যাদার সঙ্গে চিহ্নিত করার জন্য একটা সম্মানিত লড়াই এবং একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির রাশ কিছুটা হলেও দরিদ্রতম ও প্রান্তীয় মানুষের হাতে আনা। তারা

ভেবেছিল, শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠিয়ে যে অবিচার তাদের ওপর করা হয়েছিল এই সুযোগে সেই ত্রুটি সরকারও শুধরে নেবে।

সরকার আদৌ অনুতপ্ত ছিল না, সমবেত স্বসহায়তার এই উদ্দীপনা সত্ত্বেও তারা মরিচঝাঁপি থেকে শরণার্থীদের উচ্ছেদ প্রকল্পে অবিচল থাকে। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ পুলিশ ৩৬ জনকে গুলি করে হত্যা করে। সংবাদ মাধ্যমও শরণার্থীদের দুরবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে তাদের নিজেদের পুনর্বাসনের চেষ্টাকেই উৎসাহ দেয়। ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯-র অমৃতবাজারে উচ্ছেদের ছবি প্রকাশিত হয়, এবং বিধানসভায় বিরোধী দল সরকারের এই পাশবিকতার প্রতিবাদ জানিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করে। আরও বেশি প্রতিরোধ ও জনতার ক্রমবর্ধমান উত্তাপ আশঙ্কা করে মুখ্যমন্ত্রী মরিচঝাঁপিতে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। সংবাদমাধ্যমের বিবৃতির সমালোচনা করে তিনি জানালেন যে এর ফলে উদ্বাস্তুরা নিজেদেরকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করছে এবং তারা হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থে প্রচারমাধ্যমের বরং এই উচ্ছেদকে সমর্থন জানানো উচিত।

অর্থনৈতিক অবরোধ (অদৃষ্টের পরিহাসে ২৬ জানুয়ারির প্রজাতন্ত্র দিবসেই এই অবরোধ ঘোষণা করা হয়) ব্যর্থ হবার পরে এই বছরেই মে মাসে সরকার জবরদস্তি উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করে (পুলিশের ৩০টি লঞ্চ) দ্বীপবাসীদের খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশে দ্বীপ ঘিরে ফেলে। কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়, কুটিরগুলো ভেঙে ফেলা হয়। নৌকোগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে তাদের মাছ ধরবার সরঞ্জাম ও টিউবওয়েলগুলোকেও নষ্ট করে ফেলা হয়। নদী পেরোতে গিয়ে বহু মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়। জলের সন্ধানে দ্বীপের অধিবাসীদের এবার ঢুকতে হয় গভীরতর অরণ্যের অন্ধকারে। বাধ্য হয়ে খেতে হয় বুনো ঘাস। হিসাব মতো, কয়েকশো নারী-পুরুষ-শিশুকে সেই সময় পুলিশ হত্যা করে। মৃতদেহগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কলকাতা হাইকোর্ট দু'সপ্তাহের জন্য উচ্ছেদ বন্ধ রেখে তাদের অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। কতজন মারা গিয়েছিল তার সঠিক হিসাব আমাদের হাতে নেই। কিন্তু রস মল্লিকের মতে মোট ৪১২৮টি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কেউ মারা যায় অনাহারে, রোগে, কলেরায়, অতিরিক্ত পরিশ্রমে। কেউ মারা যায় জলে ডুবে— পুলিশ তাদের নৌকো ফুটো করে জল ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কাশীপুর, কুমিরমারি ও মরিচঝাঁপিতে কিছু মানুষের মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে।[২১]

এর সঙ্গে জড়িত কোনও আমলা বা রাজনীতিকের বিরুদ্ধে এর পরেও, কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির [সিপিএম] সমর্থন লাভের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী দেশাই পর্যন্ত এ বিষয়টাকে নিয়ে

আর অগ্রসর হতে চাননি। সরকারের এই নৃশংসতা, উদ্বাস্তুদের মতে, সম্ভব হয়েছিল কেবল এর পিছনে 'ভদ্রলোক' শ্রেণির সমর্থন ছিল বলেই। 'ভদ্রলোক'দের চোখে সুন্দরবনের মানুষ প্রান্তিক গুরুত্বের নিরিখে বাঘের নিচে যার স্থান। মরিচঝাঁপি আসলে প্রান্তিক দরিদ্র শ্রেণির প্রতি 'ভদ্রলোক' শাসককুলের একটি বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। অনেক শরণার্থী ও গ্রামবাসীই সরকারকে ভোট দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে তাদের পুনর্বাসনের আশ্বাসবাণীর উপর ভিত্তি করে। মরিচঝাঁপির বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় মর্যাদার শহর ও প্রান্তিক অবস্থানের গ্রাম এবং 'ভদ্রলোক' ও নিম্নবর্ণের লোকের চিরাচরিত বৈষম্যটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

মরিচঝাঁপি: দ্বৈত বিশ্বাসঘাতকতা

গ্রামবাসীদের স্মৃতিতে এই ঘটনা ছিল দু'দলের মানুষের মধ্যে 'যুদ্ধ'।— এক দলের হাতে ছিল রাষ্ট্র ও ক্ষমতা, ছিল আধুনিক যুদ্ধোপকরণ; অপর দলের কিছুই ছিল না— ছিল কেবল দুটো করে হাত ও নিজেদের মধ্যে অটুট সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন। জয়ন্ত, দ্বীপের একজন অন্যতম অধিবাসী, যখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সেখানে যায়, তখন তার তরুণ বয়স। জয়ন্তর কাছ থেকে মরিচঝাঁপির একটি তীব্র বিবরণ আমি পেয়েছি। সে তার স্মৃতি থেকে বলে যাচ্ছিল, নিজের ছেলেমেয়েকে চোখের সামনে অনাহারে ও কলেরায় মরতে দেখে, কেমন করে উদ্বাস্তুরা মরিয়া হয়ে পুলিশের কর্ডন ও মিলিটারি লঞ্চের পাহারা ভাঙতে যায়। সরকারি আমলাদের তারা কাঠের তৈরি তির, ধারালো ইটের টুকরো ও শুকনো মাটির দলা ছুড়ে মারে। গালিগালাজও করতে থাকে। সরকারি আধিকারিকদের নির্দেশে পুলিশ এর বদলা নেয় অসহায় মানুষগুলোর দিকে কাঁদানে গ্যাস ও বোমা ছুড়ে। আগ্নেয়াস্ত্রেরও ব্যবহার হয় বইকী। 'যুদ্ধ' চলল। একদল লড়ছে কাঠের তির-ধনুক আর পাথর দিয়ে, আর এক দলের হাতে কাঁদানে গ্যাস, বন্দুক আর লাউড-স্পিকার। আরও বেশি সুরক্ষার জন্য ওই তিরিশটা লঞ্চকে ঢেকে দেওয়া হল তারের জাল দিয়ে। আশপাশের গ্রামে বসল পুলিশ ক্যাম্প। লঞ্চগুলোকে দেখতে লাগছিল ভাসমান মৌচাকের মধ্যে তীক্ষ্ণ হুলের মৌমাছির ঝাঁক।

আশ্চর্য সহজভাবে এই চূড়ান্ত অমানবিক কাজটি নিষ্পন্ন হয়ে গেল। আঠারো মাস ধরে মরিচঝাঁপিতে জীবনের যে কল্লোল তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল, তার আর কোনও চিহ্ন রইল না। এই ঘটনাই গ্রামবাসীদের কাছে প্রমাণ করে দেয় যে তাদের জীবন, বিশেষত, বাঘের সঙ্গে তুলনা করলে, প্রভাবশালী বাঙালি শ্রেণির কাছে কতটাই মূল্যহীন। দু'সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত জনবসতি ধ্বংস হয়ে যায় এবং উদ্বাস্তুরা

চলে যায়। 'আমরা কি ক্ষতিকারক পোকামাকড় যে আমাদের বাসা ওইভাবে ভেঙে দিতে হল।'— তীব্র শ্লেষের সঙ্গে প্রশ্ন করে একজন। উদ্বাস্তুদের এরপর জোর করে লঞ্চে উঠিয়ে হাসনাবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখান থেকে লরি ভর্তি করে ফের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল দণ্ডকারণ্যে। সেই সময় দ্বীপের বহু অধিবাসী, যাদের উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। লরি থেকে তাদের কিছু কিছু উদ্বাস্তু সঙ্গীসাথি নিয়ে পালায়। তারা আবার দ্বীপে ফিরে আসে এবং নতুন করে বাঁধের ধারে ধারে বসতি স্থাপন করে। অনেকে আবার রেললাইনের ধার ধরে পশ্চিমবঙ্গের বারাসত, গোবরডাঙা বা বনগাঁ অঞ্চলে বাসা তৈরি করে নেয়।

উদ্বাস্তুদের সঙ্গে দ্বীপবাসীদের এই একাত্মবোধের স্বরূপ বুঝতে গেলে দ্বীপের জীবনযাত্রা এবং তার সামাজিক খুঁটিনাটি খানিকটা জেনে নিতে হবে প্রথমে। সুন্দরবন জায়গাটিতে ছোটবড় ৩০০টি দ্বীপ আছে। পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের মধ্যবর্তী গঙ্গার এই ব-দ্বীপ অঞ্চলের অনেকটাই ব্রিটিশ অধিকৃত ছিল। নদনদী জালিকার মতো অঞ্চলটিকে ছেয়ে রেখেছে বলে, ব-দ্বীপগুলির প্রবেশপথও খুব সুগম নয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মিলিয়ে মোট প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার অরণ্য অন্তত ৬০০ বাঘের স্বাভাবিক বাসভূমি। মরিচঝাঁপির ঘটনার কয়েক বছর আগে এখানে ব্যাঘ্র-প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্প সফল হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই সুন্দরবন অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ১৯৮৫ থেকে ইউনেস্কোর বিশ্বের ঐতিহ্যপূর্ণ এলাকার তালিকাতেও সুন্দরবন স্থান করে নেয়। এইসব তালিকায় সুন্দরবন মাদকতাময় ম্যানগ্রোভের সুগভীর অরণ্য সুন্দরবন। সেখানে এই তথ্যের উল্লেখও থাকে না যে, অরাজকতার কারণে এই অঞ্চলকেই ডাকা হয় 'মগের মুলুক' নামে। থাকে না এ তথ্যও যে, ন্যূনতম পরিকাঠামো, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অভাবে এ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক দরিদ্র অঞ্চলগুলোর অন্যতম।

সুন্দরবন থেকে কলকাতার ধনী-বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে আসা এক বিপুল জনসংখ্যার কারণে সুন্দরবনের আর এক নাম 'কলকাতার ঝি'। ১৯৮০-তে চিংড়ি চাষ হওয়ার আগে এখানকার আদিবাসীরা খেতেই পেত না বললেই চলে।

জয়ন্ত, এখানকার অনেকেই, বিশেষ ভূমিহীন মানুষদের কথা ভেবে অন্তত একবারের জন্যও দরিদ্রতম মানুষদের দাবিদাওয়ার প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে মরিচঝাঁপিতে নতুন করে জীবন শুরু করবার কথা চিন্তা করেছিল। কিন্তু পাঁচ মাস যেতে না যেতেই তার কুটিরটাকে পুলিশ গুঁড়িয়ে দিল। ব্যাঘ্র সংরক্ষণের আওতার বাইরে থাকা মরিচঝাঁপিকে কেন যে সরকার বাঘের থাকার জায়গা করে তুলতে চাইছে, জয়ন্ত তা ভেবে পায় না। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, এই সরকারই উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই বিশ্বাসঘাতকতা তার চোখে কলকাতার

'ভদ্রলোক'দের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল— যারা সুন্দরবনের মানুষকে বাঘের খাদ্য বলে মনে করে, পূর্ব প্রতিশ্রুত জমি-বাড়ির দাবি জানালে অনায়াসেই যাদের গুলি করে হত্যা করা যায়।

পার্টি নেতৃত্ব যেভাবে উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলা করেছিল, তা নিয়ে সিপিআইএমের ভিতরেই মতবিরোধ ছিল। পার্টির কর্মীদের মতে, পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে যেখানে একটি গণ আন্দোলন গড়ে তোলা যেত, সেখানে দলীয় নেতৃত্ব বিষয়টিকে নেহাতই আমলাতান্ত্রিকভাবে দেখে। যাই হোক, সিপিআইএম রাজ্য কমিটির রাজনীতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, এই বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, কোনও অবস্থাতেই এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে এই রাজ্যে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়।[২২] মিথ্যা অভিযোগ স্তূপীকৃত হতে থাকে। ভূমি রাজস্বমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য দাবি জানালেন যে, মরিচঝাঁপির ঘটনার পিছনে নাকি বিদেশি শক্তি সক্রিয় ছিল।[২৩] তা ছাড়াও, সিপিআইএম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, কংগ্রেস এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে দোষারোপ করল, এরা এই ইস্যুটি থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছেন। সিপিআইএমের পক্ষ থেকে দাবি করা হল যে, তারা এই চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে এবং ১৯৭৯-এর মে মাসে তারা অবশেষে শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে।

জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গীয় বলেই যে দ্বীপের অধিবাসীরা পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এমন নয়। যে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে উদ্বাস্তুদের পড়তে হয়েছিল, তার সঙ্গেও তারা পরিচিত ছিল। জয়ন্ত বিশেষভাবে জোর দেয় এই দুই সম্প্রদায়ের নিকট সম্পর্কের উপরে। মরিচঝাঁপিতে আসার পরে একই স্বপ্ন চোখে নিয়ে, এই দুর্ভাগ্য স্বীকার করে, একই সঙ্গে লড়ে তারা একটামাত্র বড় পরিবারের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা যতদিন না তাদের চুরমার করে দিয়েছিল, ততদিন তাদের মধ্যে এই বন্ধন ছিল অটুট। কিন্তু তারপরে আমরা, দুর্বল বিশ্বস্ত একটা পরিবারের সদস্যদের মতোই রক্তমাখা হাত আর ভাঙা মন নিয়ে দ্বীপে কিংবা ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। মরিচঝাঁপির ঘটনাটাকে খুব দ্রুত ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হল। কিছু সাংবাদিক প্রশ্ন তুলেছিল যে, নিজেদের কমিউনিস্ট বলেই দাবি করুন বা অন্য কিছু, সমাজের ওপরতলার মানুষেরা সত্যই নিচুতলার দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন কি? 'যুগান্তর'-এর এক সাংবাদিক যেমন লিখেছিলেন, 'দণ্ডকারণ্যের শরণার্থীরা সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ। এরা সমাজের নিপীড়িত শ্রেণি-চাষি, জেলে, দিনমজুর, মিস্ত্রির দল। যতদিন পর্যন্ত সমাজের উপরতলার অভিজাত লোকেদের হাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা থাকবে, ততদিন এই অসহায় দরিদ্র ভিক্ষুক

শরণার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতেই থাকবে।[২৪] কেন আমাদের মৃত্যুর হিসাব রাখার, মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবার ন্যূনতম দায় কলকাতার বাবুরা অনুভব করবেন না, কেন আমাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুর পর জঙ্গলে জঙ্গলে ভূত হয়ে থাকতে হবে। অথচ, গ্রামে বাঘ ঢুকলেই তাকে মারলে আমাদের জেলে ঢুকতে হবে কেন?— গ্রামবাসীদের তীক্ষ্ণ এই প্রশ্নের কোনও জবাব থাকে না।

'ভদ্রলোক' হিংস্রতার নতুন আধার: জাতীয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

ভাঙা ভাঙা কিছু বাঁধ আর এখানে থাকাকালীন অধিবাসীদের লাগানো কিছু ফলের গাছ সাক্ষ্য দেয় যে, মরিচঝাঁপিতে একদা মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। বাকি সবই জঙ্গল গ্রাস করে নিয়েছে। আমরা আর কখনওই জানতে পারব না ঠিক কত লোকের মৃত্যু হয়েছিল সে সময়। দ্বীপের অনেকে বলে, যারা মরিচঝাঁপিতে এসেছিল, তাদের মাত্র পঁচিশ শতাংশ ফিরতে পেরেছিল এই দ্বীপ থেকে। এই হিসেব হয়তো সঠিক পরিসংখ্যান হিসেবে তত মূল্যবান নয়। কিন্তু, তার মূল্য এইখানে যে, এর থেকে গ্রামবাসীদের মনোভাবটা স্পষ্ট হয়ে যায়। মরিচঝাঁপির ওই রক্তরাঙা দিনগুলো সম্পর্কে তাদের প্রথম প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়, সরকার এবং কলকাতার শহুরে লোক তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মুজিবের হত্যা অনেক দিক থেকেই গ্রামবাসীদের কাছে ভারত-বাংলাদেশ, হিন্দু-মুসলিম, ভদ্রলোক-নিম্নবর্গের লোক ও বাঘ-মানুষ মৈত্রী সম্পর্কের শেষ বলে প্রতিভাত হয়েছে। অনেকে বলে, জঙ্গলে এই ব্যাপক হিংসা-হানাহানি রক্তপাতের ফলে বিরক্ত হয়ে বাঘ মানুষ মারতে শুরু করে। সেই থেকেই তারা প্রথমে মানুষের রক্তের স্বাদ পায়। আবার অনেকে বলে, নদীতে ভাসতে থাকা মৃত শরণার্থীদের শবভক্ষণ করেই তারা মানুষের মাংস খেতে শুরু করে। বাঘের 'স্বভাব' পরিবর্তনে মরিচঝাঁপিই সেই মোড়।

আগে, প্রতিবেশী মানুষদের সঙ্গে একটা সমতা রক্ষা করার উদ্দেশেই, অনেক গ্রামবাসীর মতে, বাঘের প্রজননও হত কম। এখন তাদের বংশবৃদ্ধির উদ্দেশে ইঞ্জেকশন দেওয়ায় তাদের প্রজননও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন গ্রামবাসী মন্তব্য করেন, এখন বর্ণসংকর বাঘও তৈরি হচ্ছে। এরা আরও বেশি হিংস্র। গণ-অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় সরকার কখনওই বাঘের সঠিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে না। যে সংখ্যা তারা বলে তা হাস্যকরভাবে স্বল্প। বাঘের এই বাড়বাড়ন্তে সরকার খুবই খুশি। যদিও, দ্বীপের লোকজন বাঁচল কি মরল তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না। কারণ, তারা তো বাঘের খাদ্যমাত্র।

সরকারের এই সমস্ত পদক্ষেপের মধ্যে এই মনোভাবটি অন্তর্নিহিত আছে যে সরল জেলে, মধু সংগ্রাহক আর কাঠুরেদের তুলনায় এখানকার বাঘ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের মতে, বাঘের মানুষ-খেকো হয়ে ওঠার পেছনে এই একটি অন্যতম বড় কারণ। আমি অনেকবার বন্ধুদের কাছে শুনেছি যে, আগে বাঘরাই মানুষকে ভয় পেত। নদী আর জঙ্গলের সম্পদ যে মানুষের সঙ্গেই ভাগ করে নিতে হবে সেটা তারা বুঝে গিয়েছিল। যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ও সমঝদার ছিল নাকি তারা। কিন্তু, এখন, বৃদ্ধরা আক্ষেপ করেন যে, তাদের সুরক্ষায় মানুষ-মারা আইনানুগ করে ফেলায়, বাঘেরা যেন অহংকারী হয়ে উঠেছে— মানুষকে আক্রমণ করতেও তারা এখন দ্বিধা করে না। বাঘেরা এখন নদী-জঙ্গল ভাগ করে নেওয়া প্রতিবেশী নেই। বাঘ এখন 'রাষ্ট্রের সম্পদ' হয়ে উঠেছে। অভিজাত শাসক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বীপের মানুষজনকে তারাও 'বাঘের খাদ্য' বলে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। নিরুদ্ধ রাগে শরণার্থীরা মরিচঝাঁপি ছাড়বার আগে সরকারের লাগানো নারকেল ও ঝাউগাছ কেটে ফেলে। এখনও, যখনই দ্বীপের অধিবাসীরা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের ওপর ক্ষেপে ওঠে, প্রত্যেকবারই তারা সরকারি জিনিসপত্রই তছনছ করতে থাকে। গাছ কাটে, সৌর-বিদ্যুতের আলোগুলো ভাঙচুর করে, সরকারি নানা প্রকল্প থেকে যথেষ্ট লুঠতরাজ চালায়। তাদেরকে 'কম মানুষ' ভাবা হয় বলে তারাও এই ভাবনার অনুরূপই আচরণ করে। খুন রাহাজানির অধ্যায় এখানে চালু করা হয়েছে বলেই তাদের হাতও রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তাদের মন ভেঙে গেছে। জয়ন্ত আমাকে বোঝায়. কারণ বাঘ ও নেতাদের প্রতি এদের সমস্ত বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে।

মরিচঝাঁপির ঘটনার পরে, বাঘের গুরুত্ব বেড়ে চলে। ১৯৮০-র দশক জুড়ে কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে বিশেষজ্ঞরা[২৫] এই মর্মে মতপ্রকাশ করতে থাকেন[২৬] যে, সুন্দরবনের বাঘের মানুষ খাওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। মানুষের মাংসের প্রতি বাঘের এই অনুরাগ দূর করবার উদ্দেশ্যে সরকার থেকে আজকাল নানা কৌশল উদ্ভাবন করা হচ্ছে। ১৯৮৬-র নভেম্বর থেকে ১৯৮৭-র অক্টোবরের মধ্যে একটা প্রকল্প রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যবহারযোগ্য স্বচ্ছ জলের পুকুর খুঁড়ে তার চারদিকে চারটে মানুষের মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হত। এই মূর্তিগুলোকে সাধারণ পোশাক-আশাক পরিয়েই রাখা হত, যাতে বাঘ সেগুলোকে মানুষ বলেই ভুল করে। আসলে এগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ-সংযোগ ছিল। এ ছাড়াও, প্রায় ২৫০০ প্লাস্টিকের মুখোশ বিনামূল্যে জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে যাওয়া মধুসংগ্রাহক ও কাঠুরেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। বাঘের স্বভাব 'মধুর' করার উদ্দেশ্যে ওই পুকুরগুলো খোঁড়া হয়। ওই মূর্তিগুলো রাখা হয় এই

ভেবে যে, একবার তড়িদাহত হবার পর বাঘ অন্তত মানুষকে আক্রমণ করতে কিছুটা ভয় পাবে। (এই তড়িত প্রবাহের পরিমাণ অবশ্য বাঘের নিরাপত্তার কারণে খুবই সামান্য, ২০-২৫ মিলি অ্যাম্পিয়ার উচ্চচাপে, এ ছাড়াও এর সঙ্গে একটি সেফটি ফিউজ-ও যুক্ত থাকে।) প্রত্যেকটা মূর্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে ১২ ভোল্টের একটি করে ব্যাটারি। একটি উদ্দীপকের সহায়তায় সেখান থেকে ২৩০ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। মুখোশটা মাথার পিছন দিকে পরার কথা। বাঘ সাধারণত মানুষের পিছন থেকেই আক্রমণ করে। মাথার পিছনে আরও দুটো চোখ তার দিকে জ্বলজ্বল করছে দেখলে হয়তো সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পালাতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রামবাসীরা ভিত্তিহীন-অর্থহীন বলে মনে করেন। কারণ বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। দরিদ্র মানুষেরও তো এই একটাই পথ সেখানে জীবিকানির্বাহ করবার জন্য। বর্তমানে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বছরে গড়ে ১৫০ মানুষ বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারান।

১৯৮০-র দশকে জঙ্গলে কাজ করতে ঢোকা মানুষের বাঘের হাতে প্রাণ হারানোর মতো ভয় আর কিছু ছিল না। ভয় শুধু তার নয়, তার পরিবারের, সহকর্মীদের এমনকী পুরো গ্রামের। মৃত্যুর পর দেহ বাড়িতে আনা হত না, ভয় ছিল, জঙ্গলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা এ খবর জানলে তার পরিবারের সদস্যদের কঠোর শাস্তি হতে পারে, হতে পারে জরিমানা।[২৬] বাড়ির বাচ্চাদের অবধি শোক প্রকাশ করতে কাঁদতে দেওয়া হত না। শেখানো হত যে, কেউ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে যে তাদের বাবা উদরাময় হয়ে মারা গেছে। কারণ, ধরা পড়লে তারা এমন ব্যবহার পাবে যেন চুরি-ডাকাতির মতো কোনও অপরাধ করে ফেলেছে।

উপসংহার: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দাবিদাওয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়ছে। এমতাবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে একটা মাত্র সমাধান নীতি গ্রহণ করেছে, তা হল বাঘের সংশোধনের কাজ। বাঘের মানুষখেকো হওয়ার পিছনে যে আঞ্চলিক বিশ্বাস, ধ্যানধারণা তাকে গুরুত্ব না দিয়ে এবং অন্য সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বাঘের এই মানুষখেকো স্বভাবকে স্বাভাবিকত্ব দান করার পিছনে আছে সমাজের সেই চিরাচরিত উচ্চনীচ বিভাজনের বহু পরিচিত দর্শন। বাঘের এই 'স্বভাব' তো আসলে 'ভদ্রলোকের' চোখ দিয়ে দেখা অরণ্য ও বণ্যপ্রাণীর স্বভাব। বাঘের এই মানুষ-খেকো, 'স্বভাব'কে 'স্বাভাবিকত্ব' দান করার প্রক্রিয়া আসলে 'ভদ্রলোক' বামপন্থী সরকারের চোখে বাঘেব তুলনায় নিম্নবর্ণের লোকেদের জীবনের মূল্যহীনতাকে একটা স্বাভাবিক মোড়ক দেওয়ার প্রচেষ্টামাত্র।

'ভদ্রলোকে'রা বঙ্গভঙ্গের দাবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে নমঃশূদ্র আন্দোলন যেভাবে ভেঙে পড়েছিল,[২৭] আর তার ফলে শত শত শরণার্থীকে যেভাবে মরতে হল, তা একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত কলকাতায় উদ্বাস্তুদের স্রোত বাড়িয়ে দিয়েছিল, বাড়িয়ে দিয়েছিল সম্পদের অসম বণ্টনের প্রবণতাকে, অন্যদিকে আসলে তা সূচনা করেছিল বৃহত্তর এক সামাজিক সংকটের— সেই সংকট তাদের, যারা বাঙালি অথচ ভদ্রলোক নয়।

পাদটীকা

১. 'ভদ্রলোক' শব্দটি বাংলায় খুবই প্রচলিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদার শ্রেণি উদ্ভূত হয়, তারা নিজেরা জমি চাষ করত না কখনই। কিন্তু তাদের আয়ের উৎস ছিল তাদের জমিই। এই জমি চাষ করত নিযুক্ত ভাগচাষিরা। এই দৈহিক পরিশ্রমই তথাকথিত 'বাবু' শ্রেণি থেকে সামাজিকভাবে নিচুতলার এই চাষিদের পার্থক্য নির্দেশ করে দিত। 'বাবু' উপাধিটি সাধারণত যুক্ত হত উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে, যাঁরা ছিলেন জমির মালিক। 'বাবু' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে এই মালিকানা ও প্রভুত্বের ভাবটিকেও নির্দেশ করত। কারণ 'বাবু' শব্দটি স্বভাবতই এখানে 'ভৃত্য' গোত্রের বিপরীত। পরে 'বাবু' বলা হতে থাকে শুধু জমির মালিককে নয়, ইংরেজি শিক্ষিত ও সুসংস্কৃত সমগ্র ভদ্রলোক সম্প্রদায়কে। (চ্যাটার্জি জয়া, ১৯৯৪, 'বেঙ্গল ডিভাইডেড'. কেমব্রিজঃ য়ুনিভার্সিটি প্রেস পৃ. ৫)

২. 'নিম্নবর্ণ' বলতে আক্ষরিকভাবে বোঝায় নিচু জাত। যারা তথাকথিত হীন বৃত্তি, যেমন— চামড়ার কাজ, মদ তৈরি, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া প্রভৃতির সাহায্যে জীবনধারণ করে, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় যাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হত, এই শব্দটি দিয়ে সেই শ্রেণিকেই নির্দেশ করা হয়। জয়া চ্যাটার্জি (১৯৯৪:৩৭) যদিও এদের 'ছোটলোক' বলে উল্লেখ করেছেন, আমি এই শব্দটি ব্যবহার করছি না। কারণ— এই শব্দটি প্রায়শই নিন্দা-অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর পরিবর্তে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও সেটি নির্দিষ্টভাবে জাতপাতকে নির্দেশ করে না।

৩. 'রিফিউজি রিসেটলমেন্ট ইন ফরেস্ট রিজার্ভসঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিসি রিভার্সাল অ্যান্ড দ্য মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার', দ্য জার্নাল অব এশিয়ান স্টাডিজ, ৫৮, নং ১ (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯): ১০৪-১২৫; এখানে দ্রঃ পৃ ১০৫।

৪. মল্লিক 'অস্পৃশ্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন; কিন্তু এই শব্দটি যেহেতু অনস্পৃশ্য তফসিলি জাতি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিকে (অন্যান্য নিম্নবর্ণের থেকে এদের পৃথক করার জন্য সরকার প্রদত্ত অভিধা) নির্দেশ করে না, সেজন্য আমি এখানে 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করেছি। 'দলিত' বলতে নির্যাতিত শ্রেণিকে বোঝায় এবং শব্দটি দলিত ও অ-দলিত মানুষের রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৫. রস মল্লিক (ওই, ১০৫) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৭) তাঁর 'কাস্ট, প্রোটেস্ট অ্যান্ড আইডেন্টিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়াঃ দি নমশূদ্রস অব বেঙ্গল ১৮৭২-১৯৪৭' (রিচমন্ড, সারে, ইংল্যান্ডঃ কার্জন প্রেস) এবং জয়া চ্যাটার্জি (১৯৯৪) তাঁর 'বেঙ্গল ডিভাইডেড' (কেমব্রিজঃ কেমব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস) বইয়ে একই কথা বলেছেন।

৬. মল্লিক, ঐ।

৭. ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ১ এপ্রিল ১৯৬৭।

৮. বিধান রায়ের আমলে ১৯৫০ ও ৬০-এর প্রথম দিকে জ্যোতি বসু, তৎকালীন বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভায় [বিধানসভায়] এদের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। ১৯৭৪ সালেও একটা জনসভায় তিনি দণ্ডকারণ্যের শরণার্থীদের জন্য সুন্দরবনে জায়গা দাবি করেছেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে পরবর্তী বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম সারির নেতারা শরণার্থীদের আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে তাদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাম চ্যাটার্জি। আটটি বামফ্রন্ট দলের এক মিটিঙে ১৯৭৫ সালে ঠিক হয় যে, উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনে জায়গা পাবেন।

৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ জুন ১৯৭৫।

১০. ইউ সি আর সি, 'রিপোর্ট অব দি ফোর্থ কনফারেন্স', কুপারস ক্যাম্প, কলকাতা, ১৯৫৭, রিফিউজি ইন দণ্ডকারণ্য গ্রন্থে, এলাহি, কে মাউদুদ, 'ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিভিউ', ভল্যুম ১৫, নং ১/২, 'রিফিউজিস টুডে' (১৯৮১, ২১৯-২২৫)

১১. এলাহি, কে মাউদুদ (ওই ১৯৮১)

১২. অসীম রায়, (১৯৭০) 'ইসলাম ইন দি এনভায়রনমেন্ট অব মিডিয়েভাল বেঙ্গল', পি. এইচ. ডি. গবেষণাপত্র (ক্যানবেরা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি), রফিকউদ্দিন আহমেদ, (১৯৮১) 'দি বেঙ্গল মুসলিমস ১৮৭১-১৯০৬: এ কোয়েস্ট ফর আইডেন্টিটি', দিল্লি; অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস; মুস্তাফা নুরুল ইসলাম, (১৯৭৩) 'বেঙ্গলি মুসলিম পাবলিক ওপিনিয়ন অ্যাজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য বেঙ্গলি প্রেস ১৯০১-১৯৩০', ঢাকা (বাংলা অনুবাদ: সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ১৯০১-১৯৩০/'লাইফ অ্যান্ড পাবলিক ওপিনিয়ন ইন দ্য পিরিয়ডিক্যাল লিটারেটার'।

১৩. দ্রষ্টব্য— সরকার (১৯৮৫, ১৯৮৭); ভদ্র (১৯৯৪); দাশগুপ্ত (১৯৮৫); কুপার (১৯৮৮); বোস (১৯৯৩)।

[তনিকা সরকার (১৯৮৫), 'জিতু সাঁওতালস মুভমেন্ট ইন মালদা ১৯২৪-১৯৩২', দ্র: রণজিৎ গুহ (সম্পা) সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ৪, দিল্লি· অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; তনিকা সরকার (১৯৮৭), বেঙ্গল ১৯২৮-১৯৩৪: দ্য পলিটিক্স অফ প্রোটেস্ট, দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; গৌতম ভদ্র (১৯৯৪), ইমান ও নিশান: বাংলার কৃষক চৈতন্যের এক অধ্যায়, কলকাতা: সুবর্ণরেখা; স্বপন দাশগুপ্ত (১৯৮৫), 'আদিবাসী পলিটিকস ইন মিদনাপুর ১৭৬০-১৯২৪', দ্র: রণজিৎ গুহ (সম্পা) সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ ৪, দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; এড্রিয়েন কুপার (১৯৮৮), 'শেয়ার ক্রপিং অ্যান্ড শেয়ার ক্রপার্স স্ট্রাগলস ইন বেঙ্গল ১৯৩০-১৯৫০' প্রদিত বোস (১৯৩৩), পেজেন্ট লেবার অ্যান্ড কলোনিয়াল ক্যাপিটাল: রুরাল বেঙ্গল সিন্‌স ১৭৭০, নিউ ইয়র্ক: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস]

১৪ সংযুক্তা দাশগুপ্ত, ২০০১, 'পেজেন্ট অ্যান্ড ট্রাইবাল মুভমেন্টস ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল: এ হিস্টরিওগ্রাফিক ওভারভিউ', পৃ. ৬৫-৯২, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গল: রিথিংকিং হিস্ট্রি' গ্রন্থে, নিউ দিল্লি: মনোহর, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ। এক্ষেত্রে পৃ. ৭৬।

১৫. রস মল্লিক (১৯৯৩:১০০) পৃ. ৮।

১৬. ই পি ডব্লিউ, ৮ জুলাই, ১৯৭৮, পৃ. ১০৯৮-১০৯৯, রস মল্লিকের (১৯৯৩:১০০) 'ভিক্টিমস অব দেয়ার লিডারস মেকিং' প্রবন্ধে কল্যাণ চৌধুরীর উদ্ধৃতি— 'এখন যখন কংগ্রেসের হাতে আব ক্ষমতা রইল না, শরণার্থীদের পক্ষে একথা ভাবা কি খুব ভুল হয়েছিল যে সিপিআই(এম) তাদের কথা রাখবে?'

১৭. ওই, রঞ্জিত কুমার সিকদার, 'মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার', 'দ্য অপ্রেসড ইন্ডিয়ান', জুলাই (১৯৮২:২১), মল্লিকের প্রবন্ধ (১৯৯৩:১০০)

১৮. আঞ্চলিক অধিকর্তা, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, আঞ্চলিক অধিকর্তার দপ্তর, অনুন্নত শ্রেণি ও উপাধ্যক্ষ (তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য) পূর্বাঞ্চল, বিষয়— 'প্রবলেমস অব রিফিউজিস্ ফ্রম দণ্ডকারণ্য টু ওয়েস্ট বেঙ্গল, নং-৩২২৩-রেহাব/ডি এন কে-৬/৭৯, মল্লিক (১৯৯৩:১০০)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের উপসচিবের লেখা চিঠি।

১৯. মল্লিক (১৯৯৩:১০০)

২০. মল্লিক (১৯৯৩:১০০) একই তথ্য দিচ্ছেন।

২১. সিকদার, 'মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার' (১৯৪২-২২) আঠারোবাকি বিশ্বাস, 'হোয়াই দণ্ডকারণ্য এ ফেইলিওর, হোয়াই মাস এক্সোডাস, হোয়্যার সলিউশন'? মল্লিকের (১৯৯৩:১০০) 'দি অপ্রেসড ইন্ডিয়ান', জুলাই (১৯৮২-১৯)।

২২. সিপিআই(এম), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন; রাজনীতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট যা গৃহীত হয় চতুর্দশ প্লেনারি সেশনে, ১৯৮১, ২৭ ডিসেম্বর— ১লা জানুয়ারি, ১৯৮২, (কলকাতা: ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কমিটি, সিপিআইএম, ১৯৮২), পৃ. ১৪

২৩. দ্য স্টেটসম্যান (১৯/২ ১৯৭৯)

২৪. সিকদার, 'মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার', পৃ. ২৩, যুগান্তরেব (২৯/৫/১৯৭৯) উদ্ধৃতি।

২৫. বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে একমাত্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারই মানুষকে 'স্বাভাবিকভাবে' আক্রমণ করে, এর কারণ খুঁজতে গিয়ে অন্যান্য অঞ্চলের বাঘের সঙ্গে এদের আচরণের তুলনা কবে তাঁরা কতগুলি সিদ্ধান্তে এসেছেন— (১) বাঘেরা সাধারণত নিজেদের এলাকা নির্দিষ্ট করে নেয়। কিন্তু বারবার বানভাসি হওয়ার ফলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের হয়তো মনে হয়েছে যে তাদের নিজস্ব কোনও পৃথক জায়গা নেই এবং এই নিরাপত্তাহীনতার বোধ তাদের সাধারণ বাঘের তুলনায় আরও বেশি আক্রমণাত্মক করে তুলেছে। (২) যে জন্তুদের সুন্দরবনের বাঘ ভক্ষণ করে, সমুদ্রের নোনা জল পান করে তাদের মাংসও লবণাক্ত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তাই বাঘ মানুষের মিষ্টি মাংস খেতে চায়। (৩) পশ্চিম সুন্দরবনের নদনদী ক্রমশই লবণাক্ত হয়ে উঠছে যা বাঘের স্বাদকোরকের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। মানুষের মাংসের প্রতি এই আসক্তির কারণ যাই হোক না কেন, আশ্চর্যের কথা এই যে প্রায়-উদাসীন কর্তৃপক্ষ এখানে যেটুকু ব্যবস্থা নিয়েছেন তা প্রত্যেক বছর প্রায় ১০০/১৫০ মানুষকে বাঁচাবার উদ্দেশে নয়, বরং বাঘের এই 'স্বাভাবিক' স্বভাবকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

২৬ ১৯৭৫-এ হেন্ড্রিক্স-কৃত প্রথম সমীক্ষার সঙ্গে চৌধুরী (১৯৮৫), চক্রবর্তী (১৯৮৬), ঋষি (১৯৮৮) প্রত্যেকেই একমত হয়েছেন।

[এম কে চৌধুরি ও প্রণবেশ সান্যাল (১৯৮৫), 'সাম অবজার্ভেশনস অন ম্যান-ইটিং বিহেভিয়ার অফ টাইগারস অফ সুন্দরবনস', চিতল ২৬ (৩/৪): ৩২-৪০; কল্যাণ চক্রবর্তী (১৯৮৬), 'টাইগার (প্যানথেরা টাইগ্রিস) ইন দ্য ম্যাংগ্রোভ ফরেস্টস অফ সুন্দরবনস—অ্যান ইকলজিকাল স্টাডি', টাইগার পেপার ১৩ (২): ৮-১১; ভি. ঋষি, 'ম্যান, মাস্ক অ্যান্ড ম্যান ইটার', টাইগার পেপার ১৫ (৩): ৯-১৪]

২৭. সাম্প্রদায়িক পুরস্কার ও পুনা চুক্তির পরে (চ্যাটার্জি)।

মূল লেখাটির শিরোনাম: 'Dwelling on Marichjhapi When tigers became citizens, refugees tiger-good'। অনুবাদ ছাপা হয় 'অদলবদল' নামের একটি পত্রিকায়। পাদটীকায় তৃতীয় বন্ধনীতে দেওয়া তথ্য সম্পাদকীয় সংযোজন।

কুমিরমারিতে নদীর পাড়ে রবি মণ্ডলের উঠোনে ৪০ উদ্বাস্তুর দেহ। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৮। রবি 'ভাড়াটে' খেটেছিলেন পুলিশের। অবরুদ্ধ দ্বীপের খবর বাইরের মানুষ পায় না। কুমিরমারির মানুষ জানে, লঞ্চের সারেংরা জানে কত মৃত-অর্ধমৃত দেহ কোথায় গিয়েছিল, কীভাবে পুড়েছিল মরিচঝাঁপি।

উদ্বাস্তু 'বিদায়' প্রক্রিয়া

তুষার ভট্টাচার্য

অনেক প্রস্তুতির পর ১৩ মে ১৯৭৯ মধ্যরাতে উদ্বাস্তুদের চূড়ান্তভাবে নিকেশ করার জন্য ঘরে আগুন দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। আগুনের লেলিহান শিখা আর অসহায় মানুষের কান্নার রোল ১৩ মে'র রাতের স্তব্ধতাকে চুরমার করে দিয়েছিল। গুলিতে মৃত এবং আহতদের লঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় বাঘের খাদ্য হিসেবে টাইগার প্রজেক্টে। আহতরা চিৎকার করে উঠেছিল— 'আমরা বেঁচে আছি, আমাদের বাঘের পেটে দিয়ো না।'— সেই মর্মান্তিক আর্ত চিৎকার শুনেছিলেন লঞ্চ ড্রাইভার ইউনুস। বাকিদের ফেলা হয়েছিল গভীর সমুদ্রে।

১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পর প্রথম গণহত্যার স্বাদ পেলেন জ্যোতি বসু ও তাঁর বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট আমলে যতগুলো গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে যে মৌলিক পার্থক্য আছে মরিচঝাঁপি গণহত্যার, তা হল,— বামফ্রন্ট নেতারাই দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের নিয়ে এসেছিলেন সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে। কয়েক মাস যেতেই 'স্বাধীনতার বলি' হওয়া আশ্রয়হীন, অশিক্ষিত, পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর উপর মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ, সিপিএমের ক্যাডার আর পোষা গুন্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল। হত্যা, লুঠ, ধর্ষণ কোনও কিছুই বাদ গেল না। বন্ধুর ছদ্মবেশে এমন নৃশংসতা ইতিহাসে আর একটিও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ বিধানসভায় জ্যোতিবাবু বলেন, 'গত বছরের প্রথম দিকে কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সংস্থা নানা ধরনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ও ভুল কথা বুঝিয়ে দণ্ডকারণ্য ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে লক্ষাধিক উদ্বাস্তুকে নিয়ে আসেন।... মরিচঝাঁপিতে আইনের শাসনকে উপেক্ষা করে এক স্বেচ্ছাচারী রাজত্ব চালানোর চেষ্টা হয়।... পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সব বেআইনি কার্যকলাপের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।' জ্যোতি বসু যেদিন বিধানসভায় এই বিবৃতি দিচ্ছেন— ঠিক তার কয়েকদিন আগে, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯, প্রায় ৪০ জন অভুক্ত উদ্বাস্তুকে বামফ্রন্টের পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।

বামফ্রন্ট সরকার প্রথম ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৮-এ[১] ১৪৪ ধারা জারি করে সুন্দরবনের সমস্ত যাত্রী এবং পণ্যবাহী লঞ্চ অধিগ্রহণ করে। যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জল আইন বিরোধী। তখন মরিচঝাঁপিতে মাত্র দুটি জলের কল। খাদ্য ও পানীয় জল আনতে যেতে হত কুমিরমারি দ্বীপে। 'দেবযানী' লঞ্চে পাহারা দিতেন ওই এলাকার আই সি গঙ্গাধর ভট্টাচার্য। তিনি লঞ্চের ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতেন কীভাবে উদ্বাস্তুদের খাদ্য ও পানীয় জলের ডিঙি নৌকাগুলো লঞ্চ দিয়ে ভেঙে ডুবিয়ে দিতে হবে। ১৬৩ খানা নৌকা ডুবিয়ে ১১৩ জনের মালপত্র লুঠ করে নিয়ে যায় ওরা। সঙ্গে ছিল পুলিশের পোষা গুন্ডা এবং সিপিএম বাহিনী। লঞ্চ ড্রাইভার সুনীলকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কাজ সফলভাবে করতে পারলে তাকে পুলিশ লঞ্চে চাকরি দেওয়া হবে। সেই সুনীল দাসকে অন্যান্য সারেং ড্রাইভাররা একঘরে করেছিল।

বামফ্রন্ট সরকারের খাদ্য-অবরোধের ফলে মরিচঝাঁপিতে ৪০ হাজার উদ্বাস্তুর কান্নার রোল ওঠে। মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়ে যায়। অবশেষে মরিয়া কিছু যুবক খাদ্য ও পানীয় জলের সন্ধানে অবরোধ উপেক্ষা করে কয়েকটি নৌকো নিয়ে হাজির হন কুমিরমারি দ্বীপে। দ্বীপে উঠতেই পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়ে প্রায় ৪০ জন উদ্বাস্তুর দেহ। তাঁদের অপরাধ ছিল মরিচঝাঁপির অভুক্ত শিশুদের জন্য খাদ্য জোগাড় করা। প্রায় ৪০ জনের দেহ কুমিরমারির 'বুধবারের বাজারের' কাছে রবি মণ্ডলের উঠোনে রাখা ছিল। রবি মণ্ডল সে-সময় পুলিশের ভাড়াটে হিসেবে কাজ করেন। পরে তিনি সাক্ষাৎকারে এ-বিষয়ে বিশদে জানিয়েছেন। পুলিশ এসে লঞ্চে তুলে নিয়ে যায় লাশগুলো, ফেলে আসে গভীর সমুদ্রে। ওই লঞ্চের ড্রাইভার ইউনুস পরে গা-ঢাকা দেয়। একমাত্র সাক্ষী হিসেবে তাকে পুলিশ মেরে ফেলতে পারে এই ভয়ে।

১. ২৪ পরগনার তৎকালীন পুলিশ সুপার অমিয় সামন্ত জানিয়েছেন, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে। স.

৩১ জানুয়ারি পুলিশের গুলি চালানো নিয়ে জ্যোতি বসু বিধানসভায় ব্যাখ্যা দেন এইভাবে, '...প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার ফলে পুলিশ ক্যাম্পের উপর আক্রমণ ও পুলিশের গুলি চালানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।... যে দুজনের মৃত্যু ঘটেছে তাঁদের পরিবারবর্গকে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।' মাত্র দু'জনের মৃত্যু স্বীকার করেছেন জ্যোতি বসু। তদানীন্তন মরিচঝাঁপির পুলিশ সুপারও বলেছেন 'দুজন আদিবাসী মহিলার মৃত্যু হয়েছে।'

জ্যোতিবাবুরা মাত্র দুজনের মৃত্যুই বা স্বীকার করলেন কেন? প্রায় ৪০ জনের মৃত্যুকে ধামাচাপা দিতে গিয়ে মিথ্যেটা ঠিকভাবে পরিবেশন করতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর প্রশাসন। কুমিরমারিতে একজন আদিবাসী রমণী পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। তিনি তখন বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, নাম মেনি মুণ্ডা।

মেনি মুণ্ডার মৃত্যুতে কুমিরমারিতে বিক্ষোভ হয়। স্থানীয় মানুষ বলে তাঁর মৃতদেহ লোপাট করা সম্ভব হয়নি। আর উদ্বাস্তুদের তো ঠিকানা ছিল না— তাই তাদের দেহ সহজেই লোপাট হয়েছিল।

জ্যোতি বসু বিধানসভাতেই বলেছেন, '...ওরা যে বলছেন খাদ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তা ঠিক নয়। খাদ্য তো পাশেই আছে— তারা সেখানে এলেই পাবেন।'

তদানীন্তন মরিচঝাঁপির পুলিশ সুপার সাক্ষাৎকারে বলেছেন— 'খাদ্যে অবরোধ ছিল, পানীয় জল আটকানো হয়নি। ওদের জন্য কুমিরমারিতে দুটো জলের কল বসানো হয়েছিল।'

হ্যাঁ, পুলিশ সুপার ঠিকই বলেছেন, দুটো জলের কল বসানো হয়েছিল দুটো পুলিশ ক্যাম্পে। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা জল নিতে এলে তখন তাদের হত্যা করা অথবা গ্রেফতার করা সহজ হবে একথা ভেবেই।

ওই পুলিশ সুপার সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় উপদেশ দিয়েছিলেন, 'প্রকৃত ঘটনা জানতে হলে কলকাতায় বসে হবে না, আপনারা কুমিরমারি, মোল্লাখালিতে গিয়ে বয়স্ক মানুষদের জিজ্ঞাসা করুন সঠিক তথ্য পাবেন।' তারপর কুমিরমারিতে গিয়ে পুলিশের ভাড়াটে গুন্ডা দীনবন্ধু মণ্ডল, ভবসিন্ধু মণ্ডলের কাছে শুনে এসেছি কীভাবে ওরা ঘর-বাড়ি ভেঙে, আগুন লাগিয়ে নরহত্যা ঘটিয়েছিল।

খাদ্য অবরোধের সময় রাতের অন্ধকারে সুফল হালদার, দেবব্রত বিশ্বাসরা নদী সাঁতরে অপর পারে ওঠেন এবং সেখান থেকে কলকাতায় আইনজীবী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও শাক্য সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে হাইকোর্টে আবেদন করেন অবরোধের বিরুদ্ধে। বিচারপতি আর এন পাইন অন্তর্বর্তী নির্দেশে অবরোধ বেআইনি বলে রায় দেন। এবং মরিচঝাঁপির অবস্থার তদন্তের ভার দেন দু'পক্ষের আইনজীবীদের উপর। যথা নিয়মে সরকার পক্ষের আইনজীবী তদন্তে অনুপস্থিত। এবং উদ্বাস্তুপক্ষের

আইনজীবী শাক্য সেন তদন্তে গেলে তাঁর গতিপথে সাদা পোশাকের পুলিশ লাগিয়ে দেওয়া হয়। কোনও ছবি তুলতে দেওয়া হয়নি। শাক্য সেনরা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিলেও পরবর্তী শুনানির দিন দেখা যায় আর এন পাইনের বদলে বিমলচন্দ্র বসাকের এজলাসে মামলা উঠেছে। তিনি রায়ে বলেন, 'মরিচঝাঁপি সংরক্ষিত বনাঞ্চল, উদ্বাস্তুদের উপস্থিতি অবৈধ।' ৩১ পাতার রায়ে বিস্ময়করভাবে আইনজীবী শাক্য সেনদের দেওয়া রিপোর্টের কোনও উল্লেখ ছিল না। সত্য চাপা দিতে, তথ্য চাপা দিতে বামফ্রন্ট সরকারের অদৃশ্য হাতের খেলাই কি এসব ঘটিয়ে তুলেছিল?

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে হাইকোর্টের নির্দেশে খাদ্য অবরোধ উঠে যাওয়ার দিন সন্ধ্যায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তৃতা করেন সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার। সে-খবর 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা ছাড়া কোথাও ছাপা হয়নি। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সেন্সরে কলকাতার প্রথম শ্রেণির বাংলা কাগজগুলোতে মরিচঝাঁপির খবর ছাপা বন্ধ হয়ে যায়। যুগান্তর-এ পান্নালাল দাশগুপ্তের লেখা ছাপা বন্ধ হয়। সিপিআই প্রথম বামফ্রন্টে যোগ না দেওয়ায় তাদের মুখপত্র কালান্তর-এ কিছু কিছু লেখা ছাপা হত। খবরের ওপর অঘোষিত অবরোধ জারি বামফ্রন্ট সরকারের আর এক কীর্তি! পরবর্তী সময়ে এই সরকার যে দমনপীড়ন চালায়, তার মহড়াভূমি ছিল মরিচঝাঁপি।

মরিচঝাঁপিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বলা হলেও সরকারের কোনও নথি বা মানচিত্রে উল্লেখ নেই। জ্যোতি বসু বিধানসভায় বলেছেন, 'মরিচঝাঁপিতে নির্বিচারে গাছ কাটা ও বনসম্পদ নষ্ট করা চলতে থাকে। এইসব কাজে ওই অঞ্চলের পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।' এটি আরও একটা মিথ্যাচার। মরিচঝাঁপিতে বড় গাছ ছিল না। ছিল ঝোপ জাতীয় গাছ। আজও তাই আছে। এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা আছে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত বনদপ্তরের শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থে। আর 'অর্থনীতির উপর প্রভাব' তার ব্যাখ্যায় জ্যোতি বসু যাননি। যে দ্বীপ থেকে এক পয়সা রাজস্বও আসে না, অর্থনীতিতে তার প্রভাব কী? বরং বসতি হলে অর্থনীতি লাভবান হত।

এপ্রিল ১৯৭৮-এ মরিচঝাঁপি দ্বীপে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হওয়ার পর ১ জুলাই ১৯৭৮ সিপিএম-এর তিনদিনের রাজ্য কমিটির আলোচনা শেষে ঘোষণা করা হল 'প্রয়োজন হলে উদ্বাস্তুদের বলপ্রয়োগ করে সরিয়ে দিন।' পরদিন ২ জুলাই প্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিক বৈঠকে বললেন, 'উদ্বাস্তুদের নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।'

শুরু হল সিপিএমের আসল ষড়যন্ত্র। হাইকোর্টের রায়ের ফাঁকফোকর খোঁজা হল। বলা হল বাইরে থেকে খাদ্য মরিচঝাঁপিতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা হচ্ছে খাদ্য। সেটাকে যদি বন্ধ করে দেওয়া যায়,

আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়বে। মরিচঝাঁপিতে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা সহ বাইরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। সাংবাদিকরা, রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দ্বীপ থেকে নৌকো করে মরিচঝাঁপিতে ঢোকার চেষ্টা করেছেন। বিরোধী নেতা কাশীকান্ত মৈত্র গ্রেফতার হয়েছেন একবার। তিনি বিধানসভায় হইচই করলেও মোরারজি দেশাই সরকারের প্রাণভোমরা বাঁধা ছিল সিপিএমের কাছে। মোরারজি নিতান্ত মুখ রক্ষার জন্য জনতা দলের তিন সাংসদকে পাঠিয়ে দেন মরিচঝাঁপিতে তদন্ত করতে। তাঁদের তদন্ত রিপোর্ট সংসদে পেশ করতে দেননি সিপিএম সাংসদরা দুটি কারণ দেখিয়ে। এক, বিষয়টি রাজ্যের, দুই, সংসদীয় সদস্যরা সবাই জনতা দলের।— তাই এই তদন্ত কমিটি বৈধ নয়।

মরিচঝাঁপির আশপাশের দ্বীপগুলোর বাসিন্দাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল উদ্বাস্তুদের সঙ্গে। অনেক দ্বীপে দেখেছি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও হয়েছে। আরও একটা কারণ ছিল। উদ্বাস্তুরা ছিলেন বেশির ভাগ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের এবং স্থানীয় বাসিন্দারাও এই একই সম্প্রদায়ের। বিচক্ষণ জ্যোতি বসু এটাকে ভাল চোখে দেখলেন না। তিনি মহাকরণে ডেকে পাঠালেন কুমিরমারির জেলা পরিষদের সদস্য আরএসপি-র প্রদীপ বিশ্বাস ও কুমিরমারির পঞ্চায়েত প্রধান আরএসপি-র প্রফুল্ল মণ্ডলকে। জ্যোতি বসু তাঁর দপ্তরে এনে সতর্ক করে দিলেন, উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে বামফ্রন্টের বর্তমান অবস্থানও বুঝিয়ে দিলেন। বামফ্রন্টের শরিক মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি, কিরণময় নন্দ এবং সিপিএম মন্ত্রীরা জ্যোতি বসুর ধমক খেয়ে 'আদর্শ' পকেটে পুরে ফেললেন।

এরপর জ্যোতি বসু তিন মন্ত্রী আরএসপি-র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের কমল গুহ, সিপিএমের বিনয় চৌধুরীকে পাঠিয়ে দিলেন কুমিরমারি, মোল্লাখালি ও সাতজেলিয়া দ্বীপে। স্থানীয় বামফ্রন্ট নেতাদের ও উদ্বাস্তুদের বোঝাবার দায়িত্ব দিয়ে। মাটি কামড়ে থাকা উদ্বাস্তুদের কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না দেখে জ্যোতি বসু নিজেই আসরে নেমে পড়লেন। তিনি টাকি ও মোল্লাখালিতে সভা করলেন। বললেন, মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের থাকতে দিলে অন্যান্য দ্বীপের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। অতএব ওদের তুলে দিতে হবে।

সিপিএম এরপর ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ বন্ধ করে দিল। মাদার টেরিজা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও পিছিয়ে গেলেন— তিনি জানালেন, 'সাহায্য পাঠাতে না পারার জন্য দুঃখিত। কেন পাঠাতে পারছি না— এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

প্রচার চলল মরিচঝাঁপিতে সমান্তরাল প্রশাসন চলছে। সেখানে অস্ত্র কারখানা আছে, বিদেশি হাত আছে ইত্যাদি। উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে এমন

সব মিথ্যা প্রচারকে আশ্রয় করতে হয়েছিল। অন্যদিকে উদ্বাস্তু নেতৃত্বের মধ্যেও ভাঙন ধরাবার কাজ শুরু হল। অরবিন্দ মিস্ত্রিকে গোপনে মহাকরণে জ্যোতি বসু হরেক রকম টোপ দিলেন।

কোনও কিছুতেই যখন কাজ হল না, তখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে বনদপ্তরের কর্মীদের মরিচঝাঁপিতে পাঠানো হল বন্ধুর বেশে।

৬ মে ১৯৭৯ মরিচঝাঁপিতে পুলিশ ওঠে। স্কুলের দখল নিয়ে ক্যাম্প করে। পুলিশ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহার শুরু করে। মরিচঝাঁপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু ঢালি জানিয়েছেন, তখনকার পুলিশ সুপার তাঁকে সমবেদনার প্রলেপে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার টোপ দিয়ে দ্বীপের বাইরে পাঠাবার চেষ্টা করেছেন। এই সময় কিছু যুবককে কলকাতায় ঠিকাদারের অধীনে কাজ করার ব্যবস্থা করে দেয় পুলিশ। বলে, 'টাকার দরকার, বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারবে আর মাসে মাসে বাড়িতেও আসতে পারবে।' এইভাবে বেশ কিছু যুবককে মরিচঝাঁপির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দিল্লির সিটিজেনস ফর ডেমোক্র্যাসির সভাপতি বিচারপতি ভি এস তারকুণ্ডে সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারকে জানান, তাঁরা মরিচঝাঁপিতে তদন্তে আসবেন। জ্যোতি বসু সঙ্গে সঙ্গে তারকুণ্ডেকে চিঠি লিখে জানান— আপনার আসার প্রয়োজন নেই। আমরা উদ্বাস্তুদের প্রকৃত বন্ধু। এতেও আশ্বস্ত না হয়ে জ্যোতি বসু ৯ মে ১৯৭৯ দিল্লিতে হাজির হন তারকুণ্ডের বাড়িতে।

পুলিশ এরপরই শুরু করে অপারেশন। নৌকা ভাঙা, খাদ্য লুঠ, ধর্ষণ শুরু হয়ে যায়। জোর করে লঞ্চে তুলে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করে। পুরুষদের গ্রেপ্তার করা হতে থাকে।

১৩ মে ১৯৭৯ মধ্যরাত্রি। প্রথমে আগুন জ্বালানো হল মরিচঝাঁপির বাজারে, এরপর স্কুল, হাসপাতাল, বেকারি, নৌকো কারখানা। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আগুনে পুড়িয়ে, গুলি করে কত শত নাকি হাজার মৃত অর্ধমৃত উদ্বাস্তুর দেহ নিয়ে লঞ্চে করে ফেলে দেওয়া হল গভীর জঙ্গলে বাঘের খাদ্য হিসেবে। বাকি দেহ ফেলা হল গভীর সমুদ্রে। এ দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন অপর পারে কুমিরমারির মানুষরা। ১৩, ১৪, ১৫ মে একনাগাড়ে আক্রমণের পর মরিচঝাঁপিতে কান্নার রোল গেল থেমে। এ দৃশ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে কুমিরমারির মানুষের চোখ আজও জলে ভিজে যায়।

জ্যোতি বসুর উত্তরাধিকারী, সেদিনের তথ্যমন্ত্রী, আজকের মুখ্যমন্ত্রী, ১৭ মে ১৯৭৯ বিধানসভায় ঘোষণা করলেন, 'মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুশূন্য করা হয়েছে।'

উদ্বাস্তুদের প্রতি এমন নির্মম বিশ্বাসঘাতকতার দ্বিতীয় উদাহরণ সম্ভবত পৃথিবীতে নেই। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, 'জ্যোতি বসু এমন ঘটনা ঘটালেন কী করে?' ২৪ পরগনার তদানীন্তন পুলিশ সুপার এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এইভাবে, 'এই কমিউনিস্ট সরকার এক সময় খুবই উদ্বাস্তু দরদি ছিলেন। আন্দামানে যাওয়া ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।... এঁরা যখন রাজ্যপাট পেলেন... তখন বিরোধিতা করলেন... রাজনৈতিক ভোল পাল্টাবার জন্যই এ ঘটনা ঘটেছে। উদ্বাস্তুরা ব্যবহৃত হয়েছেন রাজনীতির জন্য।'

সিপিএমের উদ্বাস্তু নেতা প্রাক্তন সাংসদ সমর মুখার্জিকে প্রশ্ন করা হলে উনি দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মরিচঝাঁপি প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, 'বই লিখছি, তাতেই সব পাবেন।'

জ্যোতি বসু বলেছেন, 'মানবিকতা বোধ আছে বলে আমরা অপেক্ষা করি। তা না হলে আমরা তাদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে দিতে পারতাম।' আসলে পারলেও করেননি, তার কারণ জ্যোতিবাবুদের সময়ের দরকার ছিল। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উপর প্রথমেই আঘাত করলে— পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী উদ্বাস্তুদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারত। ধাক্কা খেত এত কালের তৈরি করা ইমেজ। বুদ্ধিজীবীদের চোখের ঠুলি খুলে যেত। সদ্য হাতে পাওয়া গরম সরকারকে একটু ধীরে এগোতে হয়েছে। উদ্বাস্তুদের উৎখাত করতে তাই সময় লেগেছে এক বছরের কিছু বেশি।

জনতা দলের এমপি শক্তি সরকারের উদ্যোগে কাশীকান্ত মৈত্র, আইসিএস শৈবাল গুপ্ত, অশোকা গুপ্ত ছাড়াও অনেকেই মরিচঝাঁপিতে গিয়েছেন। জ্যোতির্ময় দত্তের উদ্যোগে শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, গীতা ঘটক অনুষ্ঠান করেছিলেন উদ্বাস্তুদের সহযোগিতা করার জন্য। অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ-সহ অনেকেই।

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের জ্যোতি বসু-সহ বামফ্রন্টের নেতা-মন্ত্রীরা অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে আসার জন্য উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়েছিলেন। জ্যোতি বসু তা অস্বীকার করেছেন। জ্যোতি বসু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'আমি নাকি সতীশ মণ্ডলকে বলেছিলাম ভিলাইতে কোন সালে যে, আমাদের সরকার যখন হবে তখন আপনাদের সব নিয়ে যাব।... আমি যখন মার্চ মাসে স্টিল কনফারেন্সে গিয়েছিলাম তখন কয়েকজন এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন।'— মার্চ মাসে নয়, জ্যোতি বসু ভিলাইতে সভা করেছিলেন ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫। নিজেই চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন সতীশ মণ্ডলসহ অন্যদের। তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা এখানে থাকলেও লোকসভায় আমাদের প্রতিনিধিকে ভোট দিন। কেন্দ্রে আমাদের শক্তিশালী করুন। পশ্চিমবঙ্গে

আমরা ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। ক্ষমতায় এলে উদ্বাস্তুদের দাবি অবশ্যই পূরণ করব।'

১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পর সারা ভারত উদ্বাস্তু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমর মুখার্জি, হরিদাস মিত্র, রাম চ্যাটার্জি, কিরণময় নন্দ ও বিদর্ভ আন্দোলনের নেতা ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক জাম্বুবন্ত রাও ধোতে। সুন্দরবনে আসার জন্য এঁরাই সেদিন বলেছিলেন। উদ্বাস্তু উপদেষ্টা কমিটির সম্পাদক ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ সেদিন বলেছিলেন, 'আপনারা সব তৈরি থাকুন। আমরা ডাকলেই বেরিয়ে পড়বেন।' কিরণময় নন্দ বলেছিলেন বিভিন্ন সভায়, বিশেষ করে মালকানগিরিতে, 'আপনারা সব পশ্চিমবঙ্গে চলে আসুন,— ৫ কোটি বাঙালির ১০ কোটি হাত আপনাদের অভ্যর্থনা জানাবে।'

১৯৬১ সালের ১৩ জুলাই। পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্ল সেন তখন পুনর্বাসন মন্ত্রী। জ্যোতি বসু চিঠি লেখেন প্রফুল্ল সেনকে— সেই চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব সেই জায়গাগুলোর নাম উল্লেখ করে জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার বার বার বলছেন যে, এ রাজ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য এক তিলও জায়গা নেই। তথাপি আমি মনে করি সরকারের অভিপ্রায় থাকলে অবশিষ্ট উদ্বাস্তুরা এ রাজ্যে পুনর্বাসন পেতে পারে।' ২৭ জুলাই ১৯৬১ সমর মুখার্জি জওহরলাল নেহরুকে দীর্ঘ চিঠি লেখেন উদ্বাস্তু আন্দোলন নিয়ে, 'উদ্বাস্তুদের ইচ্ছানুসারে পশ্চিমবঙ্গে তাদের পুনর্বাসনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছেন যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও উদ্বাস্তুকেই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো হবে না।'[১]

ক্ষমতায় এসে এঁরা নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এলেন। অস্বীকার করলেন নিজেদের অঙ্গীকার। বাঙালি উদ্বাস্তু বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হলেন। দমন-পীড়ন, মিথ্যাচার, অপপ্রচারে চরম অমানবিকতার নজির রাখলেন। দেখিয়ে দিলেন এতদিন লুকিয়ে-রাখা তাঁদের ফ্যাসিস্ত মুখ।

১ দ্র. পরিশিষ্ট ৬

কুরানখালি নদীর এপার থেকে দেখা ওপারে মরিচঝাঁপির জন্ম ও মৃত্যু। মুখ্যমন্ত্রীর শাসানি আর কত প্রকারের ফোর্স, লোকাল চোর গুণ্ডা বদমাইশ খুনিদের দাপাদাপি, আগুন-চিৎকার-চেঁচামেচি— এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

জালিয়ানওয়ালাবাগকেও হারিয়ে দিল

প্রফুল্ল মণ্ডল

[মরিচঝাঁপির সব থেকে কাছের দ্বীপ কুমিরমারির গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বামফ্রন্টের শরিক আরএসপি-র নেতা প্রফুল্ল ঢালি ১৯৭৮ থেকে টানা ২৫ বছর একই পদে নির্বাচিত ছিলেন। তার 'অন ক্যামেরা' সাক্ষাৎকারটি নেন তথ্যচিত্র নির্মাতা তুষার ভট্টাচার্য এবং সহযোগী অরুণ সেন, ৭ এপ্রিল ২০০৭-এ।]

প্রশ্ন : আপনার নাম?

প্রফুল্ল : প্রফুল্ল মণ্ডল।

প্রশ্ন : কুমিরমারিতেই থাকেন?

প্রফুল্ল : হ্যাঁ, কুমিরমারিতেই থাকি।

প্রশ্ন : রাজনীতির সাথে কতদিন ধরে জড়িত?

প্রফুল্ল : আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ৬০ সাল থেকে, অর্থাৎ Student Life থেকে।

প্রশ্ন : আমাদের আলোচ্য বিষয় মরিচঝাঁপি। উদ্বাস্তুরা কুমিরমারির উল্টোদিকে মরিচঝাঁপিতে এসেছিলেন। সেই সময় উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আপনাদের ভূমিকা কি ছিল?

প্রফুল্ল : ১৯৭৮ সালে আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হলাম। সেই সময় আমাদের সঙ্গে দল করতেন কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস। ও জেলা

পরিষদের সদস্য হল। আরএসপি দলের সমর্থনে। প্রধান হবার পরে ১৯৭৮-এ শরণার্থীরা এল। আমরা আগেই খবর পেয়েছিলাম শরণার্থীরা আসছে। ওরা এল, বন্যার মতো এল। কুমিরমারির উপর দিয়ে, যোগেশগঞ্জের উপর দিয়ে, সাতজেলিয়ার বিভিন্ন রুট দিয়ে মরিচঝাঁপিতে ওরা প্রথম ঢুকে গেল।

মরিচঝাঁপিতে একটা plantation ছিল। শ'খানেক একর হবে— এটা আমাদের ধারণা। প্রথম ওটাতেই ঢুকে গেল। সাহায্য করার মতো নির্দেশ আমরা পাইনি। আমরা সাহায্য করিনি, বিরোধিতাও করিনি। ওরা যখন ঢুকে গেল, আমি, প্রদীপ বিশ্বাস মাঝে মাঝে ওখানে যেতাম দেখতে, কারা, কোথা থেকে এল, কী করছে। ওখানে সুখচাঁদ মণ্ডল বলে ওদের বোধহয় লিডার ছিলেন। তাকেই দেখলাম ওদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। সুখচাঁদ মণ্ডল এবং সতীশ মণ্ডল দুজন। ওদের পরিচয় নিলাম। দেখলাম ওদের অধিকাংশ হচ্ছে নমঃ শ্রেণির (নমঃশূদ্র) লোক। যশোর, খুলনা, বরিশাল— ওদিককার লোক। আমরা যারা খুলনা আগত, যদিও আমার জন্ম কুমিরমরিতে, আমার বাবা-ঠাকুর্দা তারা তো খুলনার লোক। ভাষার সামান্য পার্থক্য ছিল।

ওরা আছে। প্রায় পাঁচ-ছ' মাস পর সরকার সিদ্ধান্ত নিল, ওদের তুলে দিতে হবে। ওদের ধারণা ছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ করে জ্যোতিবাবুর, আরএসপি ওদের সহযোগিতা করছে।

অনেক মিটিং মিছিল হবার পর একদিন ডিএম এখানে এসে আমাদের ডেকে পাঠালেন। প্রদীপ বিশ্বাস, আমি গেলাম। কিছু আলোচনা হল। উনি (ডিএম) বললেন, আপনাদের নেতৃত্বে শরণার্থীদের তুলে দিতে হবে। সোজাসুজি বললেন। আমরা সেখানে বললাম, দেখুন— আপনি আমাদের নেতা নন। কমরেড নিখিল দাস যদি আমাদের নির্দেশ দেন, মানতে পারি নচেৎ আমরা মানতে পারছি না। তবে এটুকু আমরা বলতে পারি, আমরা কোনও সহযোগিতা করছি না, বিরোধিতাও করছি না।

(ডিএম)— 'না, আপনাদের বিরোধিতা করতে হবে।'

না, আমরা পারব না।

প্রশ্ন : 'বিরোধিতা' কীভাবে করতে বলছেন?

প্রফুল্ল : বিরোধিতা বলতে উনি (ডিএম) যেটা বলতে চাইলেন, পুলিশ আসবে. বিভিন্ন ফোর্স আসবে, সহযোগিতা করে ওদের এখান থেকে তুলে

দিতে হবে। আমি পরিষ্কার বললাম— এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। Even আমার দলও যদি বলে মারপিট চালাও, আমরা পারব না— কারণ এরা বাঙালি।

প্রশ্ন : ঠিক কীভাবে সহযোগিতা করতে হবে— এ কথা কি বলেছিলেন?

প্রফুল্ল : সহযোগিতা বলতে— আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। কুমিরমারির যারা আরএসপি নেতৃস্থানীয় তাদের সবাইকে ওদের সঙ্গে থাকতে হবে। আমি বললাম, এটা আমরা পারব না।

প্রশ্ন : সঙ্গে থেকে গুণ্ডাগিরি করে তুলতে বলেছিলেন?

প্রফুল্ল : খানিকটা তাই। আমরা সাঙ্গোপাঙ্গ হয়ে ওদের সঙ্গে থাকা মানে জুটে তুলতে হবে। অত্যাচার করতে হবে— এই তো অবস্থা!

যখন অস্বীকার করলাম, দিন চারেক পরে দেখলাম— দুটো চিঠি এল আমার নামে এবং প্রদীপ বিশ্বাসের নামে। একটা ডেট দিয়ে জ্যোতিবাবু লিখেছেন— তোমরা এই ডেট-এ এই সময়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ আমার সঙ্গে দেখা করো। নিখিলদা (নিখিল দাস) আমাদের জানালেন, তোরা আয়, ওই ডেট-এ আমি রাইটার্স-এ আছি। তখন তিনি এম.এল.এ।

আমরা গেলাম। উনি (নিখিল দাস) বললেন— কথাবার্তা একটু সমঝে বলিস। কারণ জ্যোতিবাবু জানিস তো।

বসলাম। জ্যোতিবাবু প্রথমেই বললেন— তোমাদের কেন ডেকেছি জানো? বললাম, জানি না তো। (জ্যোতিবাবু) ডেকেছি তোমরা শরণার্থীদের সহযোগিতা করছ।

প্রদীপবাবু (প্রদীপ বিশ্বাস) বললেন— কই আমরা তো সহযোগিতা করছি না।

(জ্যোতি বসু) তাহলে তোমরা কী করছ?

(প্রদীপ বিশ্বাস) আমরা সহযোগিতাও করছি না, বিরোধিতাও করছি না।

(জ্যোতি বসু) এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নির্দেশ, ওদের এখান থেকে তুলতে হবে। আমি তোমাদের ডেকেছি এই জন্যে যে, তোমরা ওখানকার বামফ্রন্টের লিডার। তোমরা যদি সহযোগিতা করে থাক, ভবিষ্যতে আর করবে না। তাহলে আমি তুলে নেব।

প্রশ্ন : তুলে নেব বলতে কী তুলে নেবেন?

প্রফুল্ল : মানে অ্যারেস্ট করবেন।

নিখিলদা চুপচাপ আছেন। হঠাৎ আমার মাথায় ক'টা কথা জোগাল— জ্যোতিদা, আমি তো আপনার নাতির বয়সী।— আমার তখন বয়স কম। কতো হবে? First term of Panchayet. কলেজ থেকে বেরিয়েই। ওই ২৩/২৪ হবে।

(জ্যোতি বসু)— বলো।

বাঙালিগুলো কি ছাগল কুকুর?

(জ্যোতি বসু)— কেন তুমি এ কথা বলছ?

বেশ খচে গেছেন।

দেখুন, এদের বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে তাড়ানো হল। মানা ক্যাম্প, কোথায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, কোথায় কোথায় রাখা হল। এই ছাগল-কুকুর আমরা যেমন পুষি! ইচ্ছে মতোন এক জায়গায় নিয়ে যাই, আবার আনি। তারপর তাদের সুন্দরবনে আনার জন্য কোনও রাজনৈতিক দল থেকে উসকানি দেওয়া হয়েছে। আপনাদের মানে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের যদি ইচ্ছা না থাকত এদের স্থান দেব না, কেন সীমান্ত থেকে ফেরত পাঠানো হল না? এখন তাদের এনে মেরে ধরে খুন-জখম করে আবার তুলে দেওয়া হচ্ছে।

তার মানে বাঙালি নিধনযজ্ঞ একটা চলবে।

খুব অসন্তুষ্ট হলেন। নিখিলদা মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি ভেবেছি বলে যাব, তারপর যা হয়... জেলের উপরে আর তো কিছু হবে না।

(জ্যোতি বসু)— দেখ খোকা, তোমাদের কাছে এ ধরনের কথা শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। তবে আমি একটা কথা বললাম যে— ওদের তুলতে হবে। এবং তুমি যেটা বললে আমি খুব একটা অস্বীকার করব না। গভর্নমেন্টের একটা ভুল হয়েছে।

(প্রফুল্ল)— আর এই ভুলের মাশুল দিতে হবে ওদের। ওরা হাজার হাজার লোক প্রাণ দেবে, মরবে, তাড়া খাবে। ছিন্নমূল হয়ে ঘুরে বেড়াবে!

(জ্যোতি বসু)— যাই হোক, রাজনীতিতে সেন্টিমেন্ট বলে কিছু নেই। তোমরা এরপর থেকে আর সহযোগিতা করবে না।— ওই ক'টা কথা বলে আমাদের ছেড়ে দিলেন।

আদতে তো আমরা সহযোগিতাই করি। ওরা ওদের মতোই চলে।

তারপর এল সেই দিনটা।

দেখলাম শ'য়ে শ'য়ে লঞ্চ। কত প্রকারের ফোর্স এল, মিলিটারি, আধা-মিলিটারি, র‍্যাফ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভর্তি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। রাত্রে আগুন জ্বলল। সুন্দরবনের যে সমস্ত এলাকায় এরা ছিল, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলল, চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্না! আমরাও সেদিন এপারে ছিলাম। সারা রাত ধরে চলল। লাশ বস্তাবন্দি হল। লঞ্চের পর লঞ্চ ভরা হল। গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হল। সবই দেখলাম। সকাল হল সব পরিষ্কার। সব থেমে গেলে বিকেলে আমরা একটু দেখতে গিয়েছিলাম। ৭/৮ শিশু দেখেছিলাম দাদা, আধ পোড়া অবস্থায় ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে। অবর্ণনীয় দৃশ্য। আমি সেদিন বলেছিলাম, জালিয়ানওয়ালাবাগকেও এরা হারিয়ে দিল! ভাল, বাঙালি উৎখাত হোক!

তোলার কিছু দিন আগে শরণার্থীদের ওরা গুলি করতে গিয়ে মেনি মুণ্ডা নামে এক আদিবাসী মহিলাকে গুলি করে মারে।

ওরা একদম অবরোধ করে দিয়েছে, ব্যারিকেড করে দিয়েছে! কুমিরমারিতে শরণার্থীদের আসতে দিচ্ছে না। যাতে ওরা খাদ্য না পায়, জল না পায়— এই ভাবে অবরোধ করেছিল। কিছু শরণার্থী পেটের জ্বালায় পার হয়ে এ-পারে কিছু খার্দ্যটাদ্য পায় কিনা এসেছিল— ওরা গুলি চালিয়েছিল। সেই গুলির মধ্যে মেনি মুণ্ডা মারা যায়। আমি প্রধান হিসাবে নোট পাঠালাম, আমার গ্রামের মেয়ে। পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ বিডিও দিয়েছিল। সেই টাকাটা নিয়ে ওদের দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : শরণার্থীদের নৌকোগুলো কি পুলিশ ভেঙেছিল?

প্রফুল্ল : শরণার্থীরা আসার পর বেশ কিছু কাঠ কেটে ওরা নৌকো বানিয়েছিল। ওরা নৌকো করে খাদ্য আনত। কেউ কেউ মাছ ধরত। বিভিন্নভাবে জীবিকা অর্জন করত। নৌকোগুলো ওরা (পুলিশ) ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছিল।

প্রশ্ন : জ্যোতি বসুরা যে অভিযোগগুলো উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে করেছিলেন— বিদেশিদের সঙ্গে হাত রয়েছে, চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত, বনসম্পদ ধ্বংস করছে। বনসম্পদ সম্পর্কে বন দফতরের রিপোর্ট বলছে বড় বড় গাছপালা কিছু নেই। আগাছা টাইপের গাছই বেশি ছিল। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য?

প্রফুল্ল : ওরা যেখানে ছিল, Plantation area, ওখানে কোনও বড় ধরনের গাছ ছিল না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু নারকেল গাছ লাগিয়েছিল। খুব বেশি অন্য গাছ ছিল না।

ক্ষয়ক্ষতি এরা যা বলছে— ওরা গভীর জঙ্গল থেকে কিছু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করত, যেটা দেখেছি। রান্নাবান্নার জন্য এটা ওরা করত। বড় ধরনের গাছ কেটে, দেখিনি... কেটে আনতে গেলে তো আমাদের উপর দিয়েই যেতে হবে। সে রকম কোনও ঘটনা আমরা দেখিনি। এগুলো অজুহাত বলে আমার মনে হয়।

প্রশ্ন : এই যে নৌকোটা যে বানাল, কাঠ তো চাই, বড় কাঠ না হলে তো নৌকো বানানো যায় না।

প্রফুল্ল : ছোট ছোট নৌকো। ডিঙির মতো ৩-৪ জন যেতে পারে। Plantation area-র মধ্যে ছোট ছোট গাছ ছিল, তাই দিয়েই তৈরি করা।

প্রশ্ন : ওরা প্রায় এক বছর ছিল। শুনেছি এই সময়ের মধ্যে স্কুল, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, তাদের সংস্কৃতি অর্থনীতি— এগুলো আপনি কি দেখেছেন?

প্রফুল্ল : ওরা স্কুল করেছিল, দোকান করেছিল। মালগুলো ওরা ন্যাজাট, বসিরহাট লাইন দিয়ে আনত।

প্রশ্ন : ওরা স্বশাসিত অঞ্চল তৈরি করেছিল। সেখানে তাদের স্কুল, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় নয়, একটা সমান্তরাল প্রশাসন তৈরি করেছিল— এ বিষয়ে আপনার জানা ঘটনা যদি কিছু থাকে?

প্রফুল্ল : আমরা যেটা দেখেছি, যারা সরকারের অধীন কোনও ব্যক্তিই নন। একটা জায়গায় সমবেত হয়েছে। ধরুন এক লক্ষ লোক। তাদের কোনও সরকার নেই, তাদের কোন জাত নেই, কিছুই নেই। তারা এক জায়গায় হয়ে নিজেদের বাঁচার তাগিদে কয়েকটা প্রাইমারি স্কুল করেছিল, কয়েকটা টিউবওয়েল বসিয়েছিল, দোকানপাট খুলেছিল— তাদের মতো চলত— এটাকে স্বয়ংশাসিত সরকার বললে বোধহয় ভুল হবে। স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান যদি বলি তাতেও বোধহয় ভুল হবে। তাদের যতটুকু দরকার, নিজেদের বাচ্চাগুলোর একটা স্বাক্ষরদানের জন্য কাজগুলো তারা করেছিল— এটা সরকারের বিরোধিতা নয়— তাহলে সরকার যদি তাদের কথা ভাববে— তাহলে ওদের জন্য দোকানপাট, স্কুল, কলেজ সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত ছিল।

প্রশ্ন : জ্যোতি বসু আপনাকে বলেছিলেন— তাদের উৎখাত করাটা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ। অথচ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধীপক্ষ জনতা দলের সদস্যরা শরণার্থীদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন। অন্যদিকে সিপিএমের সমর্থন নিয়ে মোরারজি সরকার কেন্দ্রে। মোরারজি সরকার ৩ জনের সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল। সংসদীয় দলের রিপোর্ট ভূপেশ গুপ্ত সংসদে তুলতে দেননি, 'রাজ্যের বিষয়' এবং তদন্ত কমিটিতে ৩ জনই ছিলেন জনতা পার্টির সদস্য— এই কারণ দেখিয়ে।
শরণার্থীদের উৎখাতের পিছনে রাজনৈতিক কারণ কি ছিল?

প্রফুল্ল : এর ব্যাখ্যাটা ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না। ওরা (সরকার) একটা কারণ যেটা দেখিয়েছিল সেটা কিছুটা যুক্তিসঙ্গত। আরগুলো নয়। সুন্দরবন গভীর অরণ্য। এই জঙ্গল কেটে যত সাফ করা হবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় তত বাড়বে। এই যুক্তিটা খানিকটা গ্রহণ করা যায়, সবটা নয়। কারণ জঙ্গল তো হামেশাই কাটছে। Timber Merchant-রা কাটছে। এখন কিছুটা বন্ধ হয়েছে। জঙ্গল তো কাটছে। কিছু শরণার্থী এসে জঙ্গল কাটলে পরিবেশের ক্ষতি হবে, ভারসাম্য নষ্ট হবে— এটা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। আসলে এদের (সরকারের) পিছনে অন্য কোন কারণ ছিল।

প্রশ্ন : ডিএম আপনাদের ডেকেছিলেন সহযোগিতা করার জন্য। আমরা এমন লোকের সন্ধান পেয়েছি, কয়েক জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, যারা পুলিশের সঙ্গে থেকে শরণার্থীদের ঘর-বাড়ি জ্বালানো, উৎখাত করার সহযোগিতা করে পুলিশের কাছ থেকে পয়সা পেয়েছে। এরা কারা, এরা কি সিপিএমের লোক ছিল?

প্রফুল্ল : রাজনীতিতে বলতে গেলে বোঝায় তাই। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক জায়গায় কিছু চোর, গুন্ডা, বদমাইশ, খুনি— যারা পয়সার বিনিময়ে খুন করে, এমন লোক থাকে। এবং সেই লোকগুলোকে ওরা সিপিএমের ব্যানার দিয়ে সংগ্রহ করেছিল— তারা এই জিনিসটা চালিয়েছিল।

প্রশ্ন : শরণার্থীদের মূল জীবিকা কি ছিল?

প্রফুল্ল : ওদের কাছে কিছু পয়সা ছিল। দীর্ঘদিন জমিয়ে সংগ্রহ করে রেখেছিল একটা আশ্রয়ের আশায়। শুধুমাত্র জ্বালানি কাঠ বেচে কতদিন চলতে পারে? নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। অধিকাংশ লোক ছোট ছোট ডিঙিতে করে মাছ ধরত।

প্রশ্ন : সেই সময় সরকার থেকে, বিশেষ করে সিপিএম থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল— এরা রাষ্ট্রবিরোধী, সরকারবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। আপনি এদের এ ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখেছেন কি না?

প্রফুল্ল : সরকারবিরোধী বলতে কী বলতে চেয়েছে আমি জানি না। কিন্তু একদল বাঁচার তাগিদে এল, থাকল। সরকারবিরোধী বলতে সিপিএম যেটা বলতে চেয়েছিল তদানীন্তন সময়ে— বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ, চোর-গুন্ডার সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অনেকবার গেছি— আমার মনে হয় সে রকম কোনও ঘটনা ছিল না।

কোথাও বলপ্রয়োগ হয়নি। আগন্তুকরা দ্বীপ ছাড়ার জন্য তৈরি ছিলেন। তাঁরা স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে চলে গেছেন। পুলিশ সহযোগিতা করেছে মাত্র। 'পুলিশের অত্যাচারের গল্প' একটা ভয়ঙ্কর মিথ্যাচার। উদ্বাস্তু নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা চাপা দেওয়ার অপপ্রয়াস।

মরিচঝাঁপি

অমিয়কুমার সামন্ত

১

প্রায় ত্রিশ বছর পরে সম্প্রতি মরিচঝাঁপির ঘটনা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। টেলিভিশনের দু-একটি বাংলা চ্যানেলে কিছুদিন ধরে মরিচঝাঁপির ঘটনাকে সরকার ও পুলিশের নৃশংসতার চরম উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। যে সমস্ত ঘটনায় সরকারি যন্ত্রের রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহারের ফলে নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, সেই সব ঘটনার শীর্ষে রাখা হয়েছে মরিচঝাঁপির ঘটনাকে; কিংবা বলা যায় মরিচঝাঁপির কল্পিত কাহিনিকে। এই সব কাহিনি রচয়িতারা বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতার সীমা বেপরোয়াভাবে অতিক্রম করে গিয়েছেন। যেহেতু কোনও প্রতিবাদ হয়নি, তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কল্পনা লাগামবিহীন। আমাদের দেশে অতিরঞ্জন কিংবা মিথ্যা অপবাদ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এদিক থেকেও আমাদের রাজনীতিতে নৈতিকতার মান খুব উঁচুতে নয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভেবেছিলাম যে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যে প্রচার তার অসত্য অংশ আপনিই বিলুপ্ত হবে, মিথ্যা আপন ভারেই ভেঙে পড়বে। কিন্তু সম্প্রতি টিভির কিছু প্রতিবেদন এবং একটি সিডি-তে (Compact Disc) মরিচঝাঁপির ঘটনার উপস্থাপনা দেখে ও সেই সঙ্গে দু-তিনটি বই পড়ে মনে হল মরিচঝাঁপির আনুপূর্বিক ঘটনাবলি যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে

তথ্যের উপর নির্ভর করে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। একটি নিবন্ধের পরিসরে সমগ্র বিষয়টি বিশদভাবে উপস্থাপিত করা যাবে না— অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ আখ্যান রচনার চেষ্টা করা যাবে।

একটি টিভির প্রতিবেদনে দেখলাম ঔপন্যাসিক অমিতাভ ঘোষকে হাজির করে ও তাঁকে দিয়ে মরিচঝাঁপির বিবৃত ঘটনাবলির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা হচ্ছে, যদিও তাঁর মরিচঝাঁপির ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই! অমিতাভ ঘোষ তাঁর The Hungry Tide (২০০৪) নামক সুন্দরবনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসে মরিচঝাঁপির সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা ও ব্যর্থতাকে কাহিনি নির্মাণের কাজে ব্যবহার করেছেন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মে কল্পনার অবাধ অধিকার। সেখানে ঘটনার বিবরণে সত্যনিষ্ঠার দায় নেই। ঐতিহাসিকের ও বস্তুনিষ্ঠ আখ্যান রচয়িতার সেই কল্পনার স্বাধীনতা নেই; তাঁদের নথি ও প্রমাণের উপর নির্ভর করে ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে হয়। গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা তাই তথ্যের দিক থেকে ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা পায় না। তবে গল্প-উপন্যাসেও সাম্প্রতিক বা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতি-বিকৃতি বা বিচ্যুতি বাঞ্ছনীয় নয়। অমিতাভ এই কথা স্বীকার করে তাঁর উপন্যাসের 'Author's note' অংশে মরিচঝাঁপি সম্পর্কে তথ্যের উৎস নির্দেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'Today the only historical treatment available in English is an article by Ross Mallick, 'Refugee Resettlement in the Forest Reserve: West Bengal: Policy Reversal and the Marichjhapi Massacre'.[১] এই প্রবন্ধটি 'Asiatic Studies' নামে একটি পত্রিকায় ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। Ross Mallick-এর ওই নিবন্ধটি আমি দেখেছি, তা ছাড়া মল্লিক-এর ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'Development Policy of a Communist Government: West Bengal Since 1977', (Cambridge) বইটিও দেখেছি। ওই বইতেও মরিচঝাঁপি সম্পর্কে কিছু কথা আছে। বস্তুতপক্ষে সংখ্যাতত্ত্ব ও ঘটনাটির উপস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত দুই রচনাতে মোটামুটি একই রকম। মরিচঝাঁপি সম্পর্কে তাঁর তথ্যের উৎসগুলো নিতান্তই অস্পষ্ট, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুল্লেখিত এবং অপ্রাসঙ্গিক। গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহের জন্য যাঁরা আইন অনুসারে এবং বিধিসম্মতভাবে তথ্য জানার বা তথ্য সংরক্ষণের অধিকারী, তাঁরাই বা সেই সংস্থার কার্যালয়ই তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক উৎস। এঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কার্যালয়গুলিও তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। মল্লিক তাঁর 'Development Policy of a Communist Government' বইয়ের

১ দ্র. পরিশিষ্ট ঘ

Acknowledgement অধ্যায়ে প্রথমেই লিখেছেন, 'This book would not have been completed without the help of a member of people who wish to remain anonymous'. অর্থাৎ ধরে নিতে পারি তিনি ক্ষেত্র-সমীক্ষা করেছেন। সেক্ষেত্রেও নামধাম দেওয়া আবশ্যিক। কিন্তু তিনি যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা লিখেছেন, যে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়েছেন তার তথ্যসূত্রকে যদি নাম-পরিচয়হীন অবয়বের আড়ালে গোপন রাখা হয় তবে কি তাকে গবেষণা বলা যায়? যেমন, তিনি 'conversation amongst government officials' শুনেছেন; সেই শোনা বাক্যালাপই তাঁর তথ্যসূত্র! 'They talked about a massacre', সুতরাং Ross Mallick মরিচঝাঁপির ঘটনাকে 'massacre' বলে বর্ণনা করেছেন। ওই অফিসাররা কারা, তাদের ওই ঘটনাবলি জানার এক্তিয়ার ছিল কি না, কিংবা কোন সূত্রে শুনেছেন, তাঁদের নামধাম কী— এসব নিয়ে অর্থাৎ তথ্যসূত্রের যথার্থতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তাভাবনা ছিল বলে মনে হয় না; কারণ এই তথ্যসূত্রগুলি উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি। এটি কোনও সৎ গবেষণার পদ্ধতি নয়। সেই সময় রাজ্যে যাঁরা মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, কমিশনার, জেলাশাসক ইত্যাদি পদে ছিলেন তাঁরা আইনসম্মত ও পদ্ধতিগতভাবে সমস্ত ঘটনা বিশদভাবে জানার ও সেই সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁদের স্থলাভিষিক্তরাও নথিপত্রের ভিত্তিতে সেই জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এঁরাই হতে পারতেন তাঁর প্রাথমিক তথ্যসূত্র। এঁদের দেওয়া তথ্য তাঁকে গ্রহণ করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। অন্য কোনও সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যের সঙ্গে যদি এঁদের তথ্যের গরমিল বা পরস্পরবিরোধিতা থাকে, তবে যুক্তিপূর্ণভাবে বিচার করে একটিকে গ্রহণ, অপরটিকে বর্জন করতেই পারতেন। কিন্তু তিনি তথ্যসূত্র সম্পূর্ণ গোপন রেখে বা বিকৃত করে কতকগুলি ঘটনা ও সংখ্যাতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। এইরূপ গবেষণা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অসত্যভাষণ ছাড়া কিছুই নয়। মল্লিক-এর সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে পরেও আমাকে মন্তব্য করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তির উল্লিখিত বইটির অন্য অনেক তথ্য ও সিদ্ধান্ত নিয়ে গুণীজনেরা অনেক আগেই সংগত প্রশ্ন তুলেছিলেন।

রস মল্লিক কানাডা প্রবাসী ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাঁর পূর্বপুরুষ বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাগেরহাট অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু ভূস্বামী পরিবার। রস মল্লিক-এর পিতামহ কুমুদ মল্লিক (১৮৮২-১৯৪১) ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর এক পুত্র সুকুমার ছিলেন আইসিএস; তিনি পরে পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারি হন। অপর পুত্র সুশীল ছিলেন কানাডা প্রবাসী— রস মল্লিক তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান। কুমুদের ভাই মুকুন্দ মল্লিক (১৮৮৮-১৯৭৪), সমাজসেবা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে

সুপরিচিত। ১৯১৫ সালে তিনি All Bengal Namasudra Association প্রতিষ্ঠা করেন। তফশিলি জাতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা মুকুন্দ মল্লিক ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ফজলুল হক মন্ত্রী সভার মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তী জীবন তিনি ওকালতি ও সমাজসেবায় কাটিয়েছেন।

রস মল্লিকের রচনা ছাড়া অমিতাভ ঘোষ নির্ভর করেছেন Brown University-র উদ্বাস্তু সম্পর্কিত একটি অপ্রকাশিত dissertation-এর উপর এবং আর একটি নিবন্ধের উপর, যা তখনও প্রকাশিত হয়নি (২০০৪)। যাই হোক, অমিতাভ ঘোষের মতো জনপ্রিয় ও শক্তিশালী লেখকের কলমে ঘটনার অতিরঞ্জন বা বিকৃতি স্বীকৃতি পেয়ে গেলে তার ছাপ মানুষের মন থেকে সহজে মোছা যায় না। আমার আক্ষেপ এই, অমিতাভকে বিকৃত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

এ ছাড়া মরিচঝাঁপির উপর বাংলায় আরও দুটি বই দেখার সুযোগ হয়েছে। ২০০২ সালে প্রকাশিত 'মরিচঝাঁপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে' নামক বইটির লেখক জগদীশ মণ্ডলের মরিচঝাঁপির ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তিনি সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারের অনুরোধে, প্রধানত তাঁর উপর নির্ভর করেই, বইটি রচনা করেছেন। বইটির ছ'টি অধ্যায়ের মধ্যে পাঁচটিই উদ্বাস্তু আন্দোলনের ইতিহাস। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি যোগ করেছেন কয়েকটি সংবাদপত্রের মরিচঝাঁপির ঘটনার প্রতিবেদন, উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সেক্রেটারি হিসেবে রাইহরণ বাড়ে-এর কয়েকটি বিবৃতি ও স্মারকলিপির প্রতিলিপি, কয়েকটি ইস্তাহার, কাশীকান্ত মৈত্রকে লেখা কয়েকটি চিঠি, এবং মরিচঝাঁপি ভ্রমণের উপর কমলা বসুর একটি চিঠি। এ ছাড়াও আছে রাইহরণের পাঠানো অনেকগুলি নামের তালিকা।[২]

দ্বিতীয় বইটি শিবনাথ চৌধুরীর 'মরিচঝাঁপির কান্না' (২০০৪)। লেখকের ঘটনা সম্পর্কে কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, বা তিনি তথ্য সংগ্রহের বিশেষ কোনও চেষ্টা করেননি। এমন কি মরিচঝাঁপির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর ধারণা আছে বলে মনে হয় না। বইটি পড়ার পর মনে হয় মরিচঝাঁপির ঘটনায় কাশীকান্ত মৈত্রের ভূমিকাটি তুলে ধরাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য। যাইহোক এই বইগুলিতে পরিবেশিত তথ্য সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করব।

সম্প্রতি মরিচঝাঁপির উপর যে সিডি-টি প্রচারিত হয়েছে সেই সিডি-তে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি অংশ দেখানো হয়েছে। সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি দেখানো হয়নি; সাক্ষাৎকারের প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল ২০০৬-২০০৭ সালের শীতকালে কোনও এক সময়।

২ দ্র. পরিশিষ্ট চ

একদিন সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার ফোন করে মরিচঝাঁপির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তাঁর বক্তব্য, 'তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়ে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উৎখাত না করার জন্য অনুরোধ করেন।' নিরঞ্জনবাবু জানতে চান ওই চিঠি সম্পর্কে আমি কিছু জানি কি না, কিংবা ওই চিঠির কপি আমার কাছে আছে কি না। আমি জানালাম ওইরূপ কোনও চিঠির কথা আমার জানা নেই। তা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা প্রধানমন্ত্রীর চিঠির বিষয়বস্তু সাধারণভাবে জেলার একজন পুলিশ অধিকর্তার জানার কথা নয়। তবে মরিচঝাঁপির ব্যাপার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন মিটিঙে শুনেছি, উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকারও চেয়েছিল যে মরিচঝাঁপি থেকে আগন্তুকদের দ্রুত সরিয়ে দেওয়া হোক। এরপর নিরঞ্জনবাবু জানালেন যে, মরিচঝাঁপি নিয়ে সাক্ষাৎকার নিতে কয়েকজন আসবেন। আমি সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হলাম। যথারীতি সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে কয়েকজন এসেছিলেন। তাঁরা সাক্ষাৎকারটি ভিডিও-টেপ করে নিলেন। মরিচঝাঁপিতে আগন্তুক মানুষেরা যে কিছু লোকের রাজনৈতিক উচ্চাশা ও বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে টানাপোড়েনের শিকার সে কথা বললাম। পুনর্বাসনের জায়গা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পিছনে যে বামফ্রন্টের কোনও কোনও নেতার অবস্থাগতিকে কিছু উসকানি ছিল সে কথাও বললাম। মরিচঝাঁপিতে আগন্তুকদের নেতারা একটি ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে দ্বীপে পুলিশ বা অন্য সরকারি কর্মীদের যেতে বাধা দিয়েছিলেন। বেআইনিভাবে সংরক্ষিত অরণ্যের গাছ কেটে, মাছ ধরে বা অন্য দ্বীপে দিন মজুরি করে জীবিকানির্বাহ করতেন। পুলিশ এই সমস্ত বেআইনি কাজ বন্ধ করলে ভলান্টিয়ার বাহিনী ও আগন্তুকরা মরিচঝাঁপির অপর পারে কুমিরমারিতে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। পুলিশ গুলি চালালে কুমিরমারির অধিবাসী দুজন আদিবাসী মহিলা নিহত হন। মরিচঝাঁপিতে বসবাসকারী আগন্তুকরা কেউই নিহত হননি। ১৯৭৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি আগন্তুকরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যান। পুলিশ-প্রশাসন লঞ্চের ব্যবস্থা করেছিল। প্রশাসন চলে যাওয়ার জন্য তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, কিন্তু বলপ্রয়োগ করে তাদের লঞ্চে তুলে দেয়নি বা লাঠি-গুলি মেরে তাড়ায়নি। পুলিশের আগুন লাগানোর কথাও সর্বৈব মিথ্যা। কতকগুলি পরিত্যক্ত ঘরে রাতের অন্ধকারে এসে আগুন লাগিয়েছিল ভলান্টিয়ার দলের পলাতকরা। পুলিশের এক কনস্টেবল আগুনে জখম হয়েছিলেন— কোনও আগন্তুকের গায়ে সেই আগুনের আঁচ লাগেনি। মনে করেছিলাম এই সাক্ষাৎকার হয়তো কোনও চ্যানেলে দেখানো হবে। কালক্রমে সাক্ষাৎকারটির কথা ভুলে যাই। সাম্প্রতিক কালে টিভিতে যে সিডিটি দেখানো হয়েছে, তাতে ওই সাক্ষাৎকারের সামান্য অংশ আছে, কিন্তু বেশির ভাগ অংশ

জুড়ে আছে তাদের সাক্ষাৎকার— যারা নাকি মরিচঝাঁপির নির্যাতনের শিকার। আর কলাকৌশলের সাহায্যে দেখানো হয়েছে আগুন, শোনানো হয়েছে গুলির আওয়াজ, আর্তনাদ ইত্যাদি। কুমিরমারিতে পুলিশের গুলি চালনায় দুই স্থানীয় মহিলার মৃত্যুর কথা আছে, কিন্তু আমার আর সমস্ত বক্তব্যই ছাঁটাই করা হয়েছে। কাল্পনিক অত্যাচারের কথা শোনানো হয়েছে অ্যানিমেশনের সাহায্যে বিধ্বংসী আগুন জ্বালিয়ে, পলায়মান জনতার ছায়াছবি দেখিয়ে ভাষ্যকার বলেছেন পুলিশ আগুন লাগিয়ে, গুলি চালিয়ে অনেক মানুষকে মেরে মরিচঝাঁপির আগন্তুকদের দ্বীপ ছাড়া করেছে। শেষের দিকে দেখলাম কুমিরমারির অধিবাসী বলে কথিত একজন— নাম প্রফুল্ল মণ্ডল— দাবি করেছেন তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলছেন, তিনি স্বচক্ষে কয়েকশো গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পুলিশকে লঞ্চে করে নিয়ে গিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিতে দেখেছেন। কয়েকশো আগুনে পোড়া মৃতদেহও ভাসিয়ে দিতে দেখেছেন তিনি। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার জীবনে এহেন অসত্যবাক্য শুনিনি।

এই সিডিতে বারবার বলা হয়েছে যে সিপিএমের ক্যাডার ও পুলিশ বাহিনী যৌথভাবে মরিচঝাঁপির মানুষদের আক্রমণ করে তাদের চলে যেতে বাধ্য করেছিল। কয়েকদিন আগে এক প্রথিতযশা নাট্য-ব্যক্তিত্বের লেখাতেও ক্যাডার ও পুলিশের যৌথ আক্রমণের কথা পড়লাম। আমি সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মরিচঝাঁপির ঘটনা ১৯৭৮-৭৯ সালের— তখন সিপিএম তথা বামফ্রন্ট কিঞ্চিদধিক এক বৎসরকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তারা যে পরবর্তী বত্রিশ বৎসর কাল পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে, তা তাদের অজ্ঞাত ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রশাসনের ও পুলিশের পারস্পরিক স্বার্থ ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বর্তমানে বত্রিশ বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্ন রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করার পর ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও পুলিশ-প্রশাসনের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেই সম্পর্ক ১৯৭৮-৭৯ সালে বিদ্যমান ছিল না। ২০০৮-০৯ সালের অবস্থা ১৯৭৮-৭৯ সালের উপর আরোপ করলে কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট হতে হয়। ফলে আলোচনা ও আলোচনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ হয় না। তা ছাড়া মরিচঝাঁপির নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে— যেমন কুমিরমারি, সাতজেলিয়া ইত্যাদি— সেই সময় সিপিএম দলের আধিপত্য ছিল না; এখনও বিশেষ নেই। সুতরাং সেখান থেকে সিপিএমের ক্যাডার আসার কাহিনির বাস্তব ভিত্তি দুর্বল।

১৯৭৮ সালে বাংলার বাইরে পুনর্বাসিত মানুষের দল বেঁধে আগমন এবং ওই বিশেষ দ্বীপটিতেই বসবাসের চেষ্টা বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বের পরিণাম। উদ্বাস্তুদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক ও জাত-সংক্রান্ত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা আমাদের স্বাধীনতার পরবর্তীকালের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। বস্তুতপক্ষে উদ্বাস্তু

আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক দল অনুসারে বিভাজন তো ছিলই— বিভিন্ন কারণে জাতভিত্তিক বিভাজনও ছিল। মরিচঝাঁপির রাজনীতির মধ্যে সেই বিভাজন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচ্ছন্ন স্রোত প্রবহমান ছিল। এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, সমগ্র ঘটনাটি, অর্থাৎ বহির্বঙ্গ থেকে পুনর্বাসিত মানুষের আগমন, তাদের একটি অংশের হাসনাবাদে মাসাধিক কাল অবস্থানের পর মরিচঝাঁপির সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসতি স্থাপনের উদ্দেশে যাত্রা— এ সমস্তই কৌশলী রাজনীতির খেলা। আমাদের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ব্যবহার করা হয়, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে উত্তেজিত করা হয়, তাদের দুর্দশার মধ্যে ফেলে রেখে নেতারা আত্মগোপন করেন। মরিচঝাঁপির ঘটনা দুরভিসন্ধিমূলক একটি প্রয়াসের পরিণতি।

২

১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই বাংলার বাইরে থেকে, বিশেষ করে ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ থেকে পুনর্বাসিত মানুষদের একাংশ পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করেন। এই সময় আমি বর্ধমান জেলার এসপি ছিলাম। অকস্মাৎ একদিন বর্ধমান রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। নিত্য যাত্রীদের দারুণ অসুবিধা, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। প্ল্যাটফর্মেই রাঁধা-খাওয়া চলল। অবশ্য বেশিদিন নয়। বর্ধমানে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, তাঁদের বেশির ভাগই আসছেন মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র থেকে। তাঁরা সবাই বিশ্বাস করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে এবং অন্যত্র যে অনাবাদি কৃষিজমি আছে সেখানে সবাইকে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। একথা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বিরোধী দলই পঞ্চাশের দশক থেকে বলে এসেছে। আগন্তুকরাও সেই কথাই বললেন। আমরা আর একটু অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, এদের মধ্যে প্রায় কেউই পিছনের সেতু পুড়িয়ে দিয়ে আসেননি। অনেকে জমিজমা দেখাশোনার বন্দোবস্ত করে এসেছেন। কেউ কেউ তৈজসপত্র ও কৃষির সরঞ্জাম বিক্রি করেছেন বটে কিন্তু একেবারে বাস তুলে আসেননি। যাই হোক, কমবেশি এক সপ্তাহের মধ্যে রেলস্টেশন খালি হয়ে গেল।

১৯৭৮ সালের ১৮ আগস্ট আমি ২৪ পরগনা জেলায় এসপি হিসাবে যোগ দিই। তখনও জেলা অবিভক্ত। কার্যভার নেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও আরক্ষা মহাপরিদর্শকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে মরিচঝাঁপির সমস্যা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হলাম। ওই দ্বীপে গোয়েন্দা বিভাগের হিসাব মতো প্রায় ৩২ হাজার মানুষ ঘর বেঁধে বসবাস শুরু করেছেন। কিন্তু দ্বীপটি একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল; ওখানে বসবাস করা তো দূরের কথা, বিনানুমতিতে প্রবেশ

করাও অরণ্য আইন (Forest Act 1927) অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। ওই দ্বীপের ১৪৪ নং লটে একটি নারকেল 'প্ল্যানটেশন' (plantation) করার জন্য বন দপ্তর জঙ্গল পরিষ্কার করে কয়েক হাজার নারকেল গাছ লাগিয়েছে। আগন্তুকরা প্ল্যানটেশন এলাকা ছাড়াও দ্বীপটির দক্ষিণ দিকে আরও জঙ্গল সাফ করে বসবাস করছে। ওদের ফেরত পাঠাতে হবে। এটিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং স্বভাবতই চব্বিশ পরগনা জেলার প্রশাসন ও পুলিশের একটি সমস্যা। একথাও শুনলাম যে আগন্তুকরা জঙ্গল থেকে গাছ কেটে, নদী ও খালে মাছ ধরে বিক্রি করছে এবং অন্যান্য দ্বীপে দিনমজুরি করে জীবিকানির্বাহ করছে। সরকার উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কোনও সংঘর্ষ চায় না— তাদের বলে-বুঝিয়ে মরিচঝাঁপি থেকে স্বস্থানে ফেরত পাঠাতে হবে। আমাকে বলা হল যে, বেশ কিছু পরিবার 'প্ল্যান্টেশনের' বাস্তব অবস্থা দেখে হতাশ— তাঁরা ফিরে যেতে পারেন।

আমি সমস্যাটি শুনলাম বটে; কিন্তু কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। কারণ সুন্দরবন আমার কাছে একেবারে অপরিচিত জায়গা। সমস্যাটির একটি ভৌগোলিক ও ভূ-প্রাকৃতিক দিক আছে, আছে তার প্রেক্ষিত ও মানব-সম্পর্কের দিক। আমি কোনওটিই জানি না। স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে আগন্তুকদের নেতা, সংগঠন, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জানা গেল। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ সমস্যাটির অবয়ব ও ব্যাপ্তি অধরাই রয়ে গেল। পরদিন বিকেলে জেলা শাসকের সঙ্গে মরিচঝাঁপির পথে বসিরহাট রওনা হলাম। নেজাট থেকে লঞ্চে করে ২০ আগস্ট বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ (আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার লঞ্চ যাত্রা— জোয়ার-ভাটার উপর সময়ের কমবেশি নির্ভর করে) কুমিরমারি দ্বীপের বাগনায় পৌঁছলাম। কুমিরমারির সামনে কুরানখালি নদী— তার ওপারে মরিচঝাঁপি দ্বীপটির নদীর তীরে জঙ্গলই দেখলাম; কোনও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। জানলাম কুরানখালি ধরে আর একটু পশ্চিমে গেলে বাঁধের উপর লোকজন দেখা যাবে, তবে বসবাসের চালাঘর ইত্যাদি দেখা যাবে না, কারণ সেগুলি খানিকটা ভিতরের দিকে। আমরা লঞ্চ নিয়ে যখন ওপারের কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন তীরে জড়ো হয়েছে প্রায় দু-তিনশো লোক। প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু অস্ত্র— অবশ্য সাধারণ অস্ত্র। কয়েকজনের হাতে দা, দু-চার জনের হাতে বর্শা ও টাঙ্গি এবং বেশির ভাগের হাতে লম্বা কাঠের লাঠি— তার এক দিকটা বেশ ছুঁচোলো। শুনলাম গরান বা হেতাল কাঠের লাঠি, বেশ মজবুত। ওদের মধ্যে মাঝবয়েসি, দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি দা হাতে আস্ফালন করছেন, তাঁরা কোনও পুলিশ বা সরকারি কর্মীকে নামতে দেবেন না। আমরা অবশ্য নামার কোনও চেষ্টাই করিনি। তবে জেলাশাসক একটা হাত মাইক নিয়ে মরিচঝাঁপি ছেড়ে যাওয়ার জন্য যেই বলতে

শুরু করেছেন, অমনি জনতা হইহই করে উঠল। 'না, আমরা যাব না, আমরা এখানেই থাকব। আমরা কোনও সরকারি সাহায্য চাই না'। ওখান থেকে সরে অন্য জায়গায় লঞ্চ নিয়ে গেলেও ওই জনতাই দৌড়ে সেখানে চলে যায়। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। এইরূপ চলল প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা। ইতিমধ্যে জনতা প্রায় ৪-৫শো হয়ে গিয়েছে। এদের বেশির ভাগ অল্পবয়েসি যুবক বা মাঝবয়েসি ব্যক্তি— দু-এক জন বৃদ্ধ কৌতূহলী চোখে দেখছেন। কিন্তু দ্বীপের আগন্তুকদের কাছে আমরা ঠিক পৌঁছতে পারলাম না। বিকেলে অনেকে নৌকায় পার হয়ে কুমিরমারিতে এলেন— কেউ কেউ জল নিলেন টিউবওয়েল থেকে, আবার অনেক কুমিরমারি বাজারে গেলেন বিকেলের দিকে। আর একবার আমাদের কথা শোনাবার চেষ্টা করা গেল। জনতার মতিগতি দেখে অভিজ্ঞ অফিসারদের পরামর্শ মতো মরিচঝাঁপির তীরে লঞ্চ না ভিড়িয়ে মাঝনদী থেকে আবেদন জানানো হল। কিন্তু কোনও ফল হল না। আগন্তুকরা ফিরে যাবেন এই আশায় জেলা প্রশাসন কয়েকটি লঞ্চকে বাগনায় আসার নির্দেশ দিয়েছিল— সেগুলিকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্থানীয় অফিসারদের এবং অন্যান্য সূত্রের খবরাখবর থেকে জানা গেল যে, বেশ কিছু পরিবারের ফেরত যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও প্রতিবেশী ও স্বজন-পরিজনদের ইচ্ছাকে অমান্য করতে পারছেন না। তা ছাড়া তাঁদের সংগঠন ও ভলান্টিয়ার্স দল তাঁদের চলে যেতে দিতে চান না। এই সমস্ত অগ্রাহ্য করে তাঁদের পক্ষে বেরিয়ে আসা মুশকিল। লঞ্চে রাত কাটিয়ে দুপুরে কলকাতায় ফিরে এলাম।

মরিচঝাঁপিতে আগন্তুকদের আগমনের পশ্চাৎপটটির দিকে একটু নজর দেওয়া যেতে পারে। বহির্বঙ্গ থেকে যে লক্ষাধিক (সরকারি হিসেবে ১ লক্ষ ৬০ হাজার) আগন্তুক এসেছিলেন, তার মধ্যে বড় জোর ৩০/৩৫ হাজার এসেছিলেন প্রধানত সুন্দরবনের এই দ্বীপটিকেই লক্ষ্য করে। যাঁরা তাঁদের আসার জন্য প্ররোচিত করেছেন, তাঁরা এই দ্বীপটি সম্পর্কে তাঁদের তথ্য দিয়েছেন। তাঁরা দ্বীপটির একটি ম্যাপ সঙ্গে করেই এনেছিলেন; সেই সঙ্গে সেখানে পৌঁছনোর পথ নির্দেশও। ১৯৭০ সালে মানা (মধ্যপ্রদেশ) পুনর্বাসন কেন্দ্রে সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি' গঠিত হয়। তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত একটি বিশেষ জাতি (নমঃশূদ্র) এই সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১৯৭৪ সালে সমিতির নেতারা মরিচঝাঁপি গিয়ে সেখানে বসবাসের বিষয় খতিয়ে দেখেন। বর্ধমান স্টেশনে আগন্তুকদের কারও কারও মুখে সুন্দরবনের নাম শুনেছিলাম এবং তাঁদের আগমনের পিছনে যে বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থন আছে এ কথাও তাঁরা বলতেন। বস্তুতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার অবহিত ছিল যে, বিভিন্ন উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে যে ম্যাপ বিতরণ করা হয়েছিল সেখানে মরিচঝাঁপি দ্বীপের 'প্ল্যানটেশন' বলে একটি জায়গা চিহ্নিত ছিল—

এইটিই ছিল সম্ভাব্য পুনর্বাসন ক্ষেত্র।

১৯৭৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন প্রায় ২০/২৫ হাজার আগন্তুক হাসনাবাদে জমায়েত হন সেখানে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি। কিন্তু তিনি তাঁদের নিরস্ত করতে পারেননি। আগন্তুকরা এসেছেন 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'র আহ্বানে ও পরিচালনায়। ওই সময় হাসনাবাদে সমিতির সভাপতি সতীশ মণ্ডল, সেক্রেটারি রাইহরণ বাড়ৈ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে রংলাল গোলদার, অরবিন্দ মিস্ত্রি প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। এঁরা মরিচঝাঁপি দ্বীপের ১৪৪ নম্বর লটের, যেটি প্ল্যান্টেশন নামে পরিচিত হয়েছে, অনেকগুলি ম্যাপ বিলি করেন। ১৪৪ নম্বর লটকে 'প্ল্যান্টেশন' বলা হয়েছিল কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার (বনদপ্তর) ওই লটের কিছু অংশকে জঙ্গলমুক্ত করে, একদিকে বাঁধ দিয়ে নারকেল বাগান করেছিল। একদিকে বাঁধ দেওয়ার ফলে নোনা জল কিছু কম ঢুকত। ওই লটটি বাদ দিয়ে ১৫/১৬ মাইল লম্বা পুরো দ্বীপটিই ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। দ্বীপের পূর্বে ঝিল্লা নামে একটি নদী। ওই নদী পার হয়ে সংরক্ষিত অরণ্যের মধ্য দিয়ে রায়মঙ্গল পার হয়ে বাংলাদেশের খুলনা জেলায় পৌঁছনো সহজ। মরিচঝাঁপি দ্বীপের উত্তরে কুরানখালি নদী ও কুমিরমারি দ্বীপ। দ্বীপটি ১৪৪ নম্বর লটের নিকটতম জনবসতি।

বামফ্রন্টের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জির ১৯৭৭-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে দণ্ডকারণ্য ইত্যাদি ভ্রমণ, সরকারের আদৌ অজানা ছিল না। রাম চ্যাটার্জি ছাড়াও বামফ্রন্টের অন্য শরিক দলের নেতারাও দণ্ডক ভ্রমণ করেছেন এবং পুনর্বাসনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সরকার এই সময় নীরব ছিল। এমনকী আগন্তুকদের পশ্চিমবঙ্গ-মুখী স্রোত ঠেকাবার রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কোনও উদ্যোগ প্রথম দিকে দেখা যায়নি। যদি সরকারের মরিচঝাঁপির সংরক্ষিত অরণ্যাঞ্চলে আইন ভেঙে বসবাস করতে দিতে অনিচ্ছা ছিল তাহলে হাসনাবাদেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারত। তবে সে সময় তারা অত্যন্ত মারমুখী ছিল। সেখানে তারা প্রায় দেড় মাস অবস্থান করেছিল। হাসনাবাদ থেকে যখন তারা দলবেঁধে মরিচঝাঁপির দিকে যাত্রা করল, তখন সন্দেশখালি থানার সামনে তাদের আটকাবার ক্ষীণ চেষ্টা করেছিল পুলিশ ও প্রশাসন। কয়েকটি লঞ্চ দিয়ে তাদের পথ অবরোধ করা হয়— কিন্তু সামান্য সংঘর্ষের পর তারা সে বাধা অতিক্রম করে 'প্ল্যানটেশনে' পৌঁছে যায়। এই দ্বিধাগ্রস্ত আচরণ ও অক্ষম প্রতিরোধ সমিতির উৎসাহ ও আগ্রাসী মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছিল। যাই হোক, মরিচঝাঁপিতে আগন্তুকদের বসবাস করতে দেওয়ার বিষয়ে যে দোলাচলচিত্ততা ছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নীতি-নির্ধারণে দ্বিধা-সংশয় যাই থাক না কেন পরিস্থিতির উপর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সতর্ক রাজনৈতিক দৃষ্টি রেখেছিল। তাঁদের অনেক নেতাই উদ্বাস্তু আন্দোলন থেকেই উঠে এসেছেন; তাই এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তের ভার তাঁরা কেবলমাত্র প্রশাসনের উপর ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। সব বিষয়ে ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখার প্রবণতা তখন আরও গভীর ছিল। বস্তুতপক্ষে মরিচঝাঁপি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তই কেবল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নেয়নি। সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করেছেন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে।

১৯৭৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে মরিচঝাঁপির ১৪৪ নম্বর লটে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ৩০-৩২ হাজার মানুষ বসতি স্থাপন শুরু করেন। বসতি স্থাপন যখন চলছিল সেই সময় মে মাসের প্রথম দিকে দুজন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ১৪৪ নম্বর লটে গিয়েছিলেন অবস্থা সরজমিনে দেখতে এবং আগন্তুকদের মুখ্যমন্ত্রীর তরফে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে। ১লা মে গিয়েছিলেন চিফ সেক্রেটারি, ১৫ই মে ডি.আই.জি, আই বি। দ্বীপের ও পারিপার্শ্বিকের অবস্থা দেখে বেশ কয়েকটি পরিবার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতারা আর কোনও সরকারি অফিসার বা পুলিশকে মরিচঝাঁপি দ্বীপে পদার্পণ করতে দেয়নি। রংলাল গোলদারের নেতৃত্বে তাদের ভলান্টিয়ার বাহিনীকে জোরদার করা হয়েছে। তাদের সাহায্যে শুধু সরকারি কর্মী নয়, বাইরের অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের আগমন বন্ধ হয়েছে। অনিচ্ছুক পরিবারদের মরিচঝাঁপি ত্যাগ আটকানো হয়েছে, সর্বোপরি তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং উন্নয়ন সমিতির নির্দেশ মানানোও হয়েছে। প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ হাজার মানুষের একটি উপনিবেশ— যা লোকসংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষের অনেক ছোটখাটো মহকুমা শহরের সমান— এক বৎসর ধরে শাসন করেছে উন্নয়নশীল সমিতি। সেখানে রাষ্ট্রের কোনও নিয়মকানুন বা কর্তৃত্ব ছিল না। ভলান্টিয়ার বাহিনীতে প্রায় ২৫০ জনের মতো সদস্য ছিলেন— বাহিনীর বিভিন্ন কাজের বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অরবিন্দ মিস্ত্রি, পবিত্র বিশ্বাস প্রমুখ। এই সময়ের মধ্যে আগন্তুকরা বসবাসের জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা দেখে ছোট ছোট চালাঘর তৈরি করেছিল। ঝিল্লা নদী থেকে যে ঝিলমারি খালটি ১৪৪ নম্বর লটে প্রবেশ করেছে, তার একদিকে মাটি কেটে বাঁধ দিয়ে একটি ভেড়ি তৈরি করেছিল। সেইরূপ আরও একটি ভেড়ি তৈরি করেছিল কুরানখালি থেকে যে খালটি লটের মধ্যে প্রবেশ করেছিল তার উপর। ফুটবল মাঠের মতো একটি জায়গা ভরাট করে তার চারদিকে বসিয়েছিল কয়েকটি চালাঘর। তাদের একটি ছিল ডাক্তারখানা, কয়েকটি ছোট ছোট দোকান, একটি

বাচ্চাদের স্কুল ইত্যাদি। আগন্তুকরা কয়েকটি টিউবওয়েলও বসিয়েছিল। সরকার কুমিরমারিতে দু-তিনটি টিউবওয়েল বসিয়েছিল আগন্তুকদের সুবিধার জন্য। মরিচঝাঁপিতে টিউবওয়েল বসিয়ে জবরদখল উপনিবেশকে পরোক্ষে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু আগন্তুকদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল সংরক্ষিত জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এবং নদী ও খালে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করা এবং নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে দিনমজুরের কাজ করে উপার্জন করা। প্ল্যানটেশনের জমিতে যে চাষ হওয়া অসম্ভব সে কথা ওখানে পৌঁছবার পর অনেকে বুঝতে পারেন, তার আগে প্ল্যানটেশন মানে অনেকেই মনে করেছিলেন সরকার ১৪৪ নম্বর লটটি বাঁধ দিয়ে ঘিরে ওখানে গাছ লাগিয়েছে, সুতরাং নোনা জল ঢুকতে পারে না। আর অনেক বর্ষার জলে ধৌত হওয়ায় মাটির লবণাক্ত ভাব অনেকটাই কেটে গিয়ে চাষের উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল অন্যরূপ— জোয়ারের সময় লোনা জল যথারীতি প্ল্যানটেশনের মধ্যে ঢুকত। বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব কালে বিরোধীরা সুন্দরবনে বসতি স্থাপন নিয়ে যখন শোরগোল তুলেছিলেন, তখন তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে জানিয়েছিলেন যে, জোয়ারে নোনাজল ঢোকা একেবারে বন্ধ করার পরও যদি অন্তত তিনটি বর্ষার জলে নুন ধুয়ে না যায়, তবে সেখানে ফসল ফলানো দুষ্কর।

১৯৭৮ সালে চাষের সময় ও পরে ধান কাটার সময় মরিচঝাঁপির আগন্তুকরা অন্য দ্বীপে দিনমজুরের কাজ করেছিল। কেউ কেউ কাজের চেষ্টায় দূরবর্তী শহরেও চলে গিয়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ দিনমজুরের সংখ্যা কয়েক হাজার বেড়ে যাওয়ায় মজুরি গেল কমে। এমনিতে সরকার-নির্ধারিত দিনমজুরিই পেত না অনেক জায়গায়— সেই মজুরি আরও কমে যাওয়ায় স্থায়ী দিনমজুররা বিক্ষুব্ধ হল। তা ছাড়া একসঙ্গে অনেক মানুষ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে পড়ার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও অনেক বেড়ে গেল। ফলে স্থানীয় মানুষ বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সময় কুমিরমারির স্থানীয় মানুষ তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছিল সরকার ও জেলা প্রশাসনকে। এইরূপ ক্ষোভ শুধু কুমিরমারিতে নয়, সাতজেলিয়া, ছোট মোল্লাখালি ইত্যাদি দ্বীপেও দেখা গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। রাইহরণ বাড়ৈ তাঁর স্বাক্ষরিত ৫/৩/৭৯ তারিখের একটি ইস্তাহারে স্বীকার করেছেন, 'এই সব ঘটনা সাতজেলিয়া, ছোট মোল্লাখালি, আমতলী এবং কুমীরমারি এলাকায় প্রতিদিন ঘটে চলেছে।' কিন্তু এ সবের জন্য তিনি যথারীতি 'জ্যোতি বসুর পুলিশ ও সিপিএম ক্যাডারদের' দায়ী করেছেন।

জঙ্গলে কাঠ কাটা ও মাছ ধরা নিয়েও প্রথম দিকে ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধত। কিন্তু ফরেস্ট গার্ডরা স্বল্পসংখ্যক বলে তারা ভয়ে পিছিয়ে আসত। ফলে জঙ্গল কাটা, মাছ ধরা ও বন্য জন্তু মারা— বিশেষ করে হরিণ মারা অবাধেই চলত। বনবিভাগের অফিসাররা, বিশেষ করে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কল্যাণ চক্রবর্তী বার বার অভিযোগ জানালেন সরকারের কাছে। বস্তুতপক্ষে কাঠের ব্যাবসা বেশ লাভজনক ব্যাবসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেবল মাত্র জ্বালানি কাঠই (fire wood) ছিল না, গভীর জঙ্গলের বড় গাছের কাঠও (timber) ছিল; যদিও তার পরিমাণ ছিল কম। দ্বীপের গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিও এ বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল। কাঠের ব্যাবসা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ক্যানিং ও বারাসতের কাঠ ব্যবসায়ীরা আগন্তুকদের দাদন দিতে শুরু করেছিল।

১৯৭৮ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিসে একটি মিটিং করে মরিচঝাঁপির অবস্থা পর্যালোচনা করলেন এবং জঙ্গল থেকে বেআইনি কাঠ কাটা বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে বললেন। ৭ সেপ্টেম্বর সকালে খবর পাওয়া গেল যে, একটি বেশ বড় দল নৌকাতে করে কাঠ নিয়ে হাসনাবাদের দিকে যাচ্ছে। দলে প্রায় একশো ছোট বড় নৌকা আছে। এই রকম বেআইনিভাবে কাটা কাঠ নিয়ে যাওয়া কিছু নতুন নয়— স্থানীয় মানুষ প্রায়ই এ দৃশ্য দেখে থাকেন। পুলিশ ও বনকর্মীরাও দেখেন। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য সবাই চুপচাপ থাকে। ওইদিন এই দলটিকে আটকানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সন্দেশখালি থানার সামনের নদীতে তাদের আটকানোর জন্য বেশ কয়েকটি লঞ্চে সিনিয়র অফিসার ও কনস্টেবল একটু আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন। প্রথমে একটা পুলিশ লঞ্চ যখন তাদের আটকাতে যায়, তখন তারা পুলিশকে অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারপর নদীর বাঁক থেকে একের পর এক প্রায় দশ-বারোটি লঞ্চ বেরিয়ে এলে ভয় পেয়ে অনেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়, আবার অনেকে তীরের নিকট অগভীর জলে— যেখানে লঞ্চ যেতে পারবে না— নৌকা নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সব নৌকাগুলিই ধরা পড়ে— দুটো নৌকা লঞ্চের ধাক্কায় কাঠ সহ ডুবে যায়। লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লাগার অনেক আগেই নৌকার আরোহীরা জলে ঝাঁপিয়ে পালিয়ে যায়। নদীর তীরে অনেক লোক জমায়েত হয়েছিল— তাঁরা সমস্ত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। এখানে টিয়ার গ্যাস বা গুলি কিছুই চালানো হয়নি— কারণ সে রকম কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টিই হয়নি। নৌকার সংখ্যা ছিল ৮০/৮৫টি— ছোট-বড় সব মিলিয়ে। পরে মার্চ মাসে (১৯৭৯) সংসদীয় প্রতিনিধি দলের নিকট দেওয়া এক স্মারকলিপিতে রাইহরণ বাড়ৈ ওই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, 'the police launches ran over 43 boats, breaking them into

pieces, and also opened fire resulting deaths of two refugee boys. The refugees ran away leaving 157 boats behind loaded with timber and firewood costing Rs. 3.50 lakhs.' আমি ওই ঘটনার সময় সন্দেশখালি থানার সামনে নদীতে একটা লঞ্চে উপস্থিত ছিলাম— সমস্ত ঘটনাটি আমার নির্দেশে, আমার সামনেই ঘটেছিল। স্মারকলিপিতে রাইহরণ বাড়ৈ যা লিখেছেন তা অতিরঞ্জিত ও অসত্য। রস মল্লিক সম্ভবত এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, '128 died from drowning when their boats were scuttled by the police'. কোথা থেকে এই সংবাদ পেয়েছেন তিনি? এমনকী রাইহরণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অসত্যও দুটো মৃত্যুর ওপরে ওঠেনি; 'নিরপেক্ষ গবেষক' মল্লিক মৃত্যুর সংখ্যা দিয়েছেন ১২৮! মল্লিক কোনও সূত্র নির্দেশ করেননি। সন্দেশখালিতে চোরাই কাঠ সহ নৌকা বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর বড় বড় দলে কাঠ কাটা ও পাচার কম হয়ে গেল— কিন্তু একেবারে বন্ধ হল না।

এরপর নানা কারণে (১৯৭৮ সালে রাজ্যে অভূতপূর্ব বৃষ্টিপাত ও বন্যা) কিছুদিন মরিচঝাঁপির সমস্যা রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে ছিল না। পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষেও সামান্য নজরদারি ও খবরাখবর সংগ্রহ ছাড়া এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এক বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকে খবর প্রকাশিত হল, সরকার সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আগন্তুকদের বসবাস স্বীকার করে নেবে। বস্তুতপক্ষে পুলিশ ও প্রশাসনের জেলাস্তরেও ওইরূপ একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ অবশ্য মরিচঝাঁপির আগন্তুকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবরই রাজ্য সরকারকে জানাত। এই সময়েই মরিচঝাঁপিতে বাংলাদেশিদের আসা-যাওয়া অনেক বেড়েছে এবং আগন্তুকদের অনেকেই নিয়মিত খুলনা যাতায়াত করছেন। সেই সময় ভারত থেকে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে চাল-চিনি-কেরোসিন ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বাংলাদেশে পাচার হত। মরিচঝাঁপিও এরকম পাচারের ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। লট নম্বর ১৪৪ থেকে ঝিল্লা নদী পার হলে খাল দিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রায়মঙ্গল পার হয়ে সহজেই বাংলাদেশে পৌঁছনো যায়। রায়মঙ্গলে বিএসএফের টহলদারি থাকে বটে, কিন্তু তার নজর এড়িয়ে টহলদারি লঞ্চ চলে যাওয়ার পর ওপারে পৌঁছনো কঠিন নয়। বাংলাদেশ থেকে আসত পোশাক-আশাক ও খুলনা-যশোর থেকে আসত তামাক ও বিড়ি পাতা। খুলনা-যশোহরের বিড়ি বিখ্যাত। রাইহরণ বাড়ৈ মরিচঝাঁপিতে বিড়ি-কারখানায় বিড়ি তৈরি করে সুন্দরবন এলাকায় বিক্রি করতেন বলে যে দাবি করেছেন, কলকাতা বা মুর্শিদাবাদ থেকে পাতা ও তামাক এনে মরিচঝাঁপিতে বিড়ি বেঁধে বিক্রি করলে তা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হতে পারে না।

জানা গিয়েছিল যে, উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতারা, আরও কিছু মানুষকে বহির্বঙ্গের বিভিন্ন পুনর্বাসন শিবির থেকে মরিচঝাঁপিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং সেই উদ্দেশে তাঁরা বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়েছেন। গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী ২১ নভেম্বর তাঁর অফিসঘরে মিটিং ডাকলেন। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল, কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গে আসার জন্য উদ্যোগ শুরু হয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত। কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোকে সতর্ক করে দিয়েছে ও পশ্চিমবঙ্গকে সত্বর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে। ইতিমধ্যে ২৫ অক্টোবর একদিনের সফরে কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মরিচঝাঁপি নিয়ে আলোচনা করে গেছেন।

মরিচঝাঁপির উপর নজরদারি ও সীমান্ত বরাবর বিএসএফের টহলদারি সাময়িকভাবে বাড়ানো হলেও বাংলাদেশে যাতায়াত ও জিনিসপত্র লেনদেন বন্ধ হল না। জঙ্গলের কাঠকাটা কিছু কমেছিল, ধানকাটার মরশুমে দিনমজুরি কমে গিয়েছিল। চাল ও অন্যান্য জিনিসের দামও বেড়ে গিয়েছিল।

মরিচঝাঁপিতেই উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি প্রথম থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এর প্রধান কারণ, উন্নয়নশীল সমিতি মুখ্যত যাদের প্রতিনিধিত্ব করে, খুলনা জেলায় এবং পার্শ্ববর্তী যশোহরেও সেই সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস বেশি। বস্তুতপক্ষে মরিচঝাঁপির অনেকের আত্মীয়স্বজন খুলনা জেলায় বসবাস করতেন। ফলে দুই জায়গার মধ্যে আত্মীয়তার সূত্রেও যাতায়াত ছিল। তা ছাড়া সুন্দরবনের মধ্যে কুমিরমারি দ্বীপেই ওই সম্প্রদায়ের মানুষের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিতি আছে। তাই স্বজন-সান্নিধ্যের একটা স্বাভাবিক পরিবেশ আছে বলেই মরিচঝাঁপি দ্বীপটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণ করা যায় যে, স্বাধীনতার আগে থেকেই, হিন্দু মহাসভার প্ররোচনায়, দক্ষিণবঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তান সহ) কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি সম্প্রদায়ের জন্য একটি হোমল্যান্ড বা স্বভূমি তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। চব্বিশ পরগনার ও নদিয়ার কিছু অংশ ও খুলনা যশোহরের কিছু অংশ সেই প্রস্তাবিত স্বভূমির মধ্যে ছিল। সতীশ মণ্ডল সেই সময় স্বভূমি পরিকল্পনার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন; এবং ১৯৭৮ সালেও মরিচঝাঁপিতে বসতি স্থাপনের তিনিই প্রধান হোতা। হোমল্যান্ডের লক্ষ্য যে মরিচঝাঁপি ঘটনায় একেবারে অনুচ্চারিত ছিল, তাও নয়। এ সম্পর্কে কথাবার্তা ও স্লোগানও শোনা গিয়েছে। নাগরিক সংঘ নামে এক সংস্থা বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল।

এ ছাড়াও উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি মরিচঝাঁপির প্ল্যান্টেশনের জমি, জঙ্গল কেটে হাসিল করা জমি, এমনকী ঝিল্লা নদীর অপর পারে ঝিল্লা ব্লকের

জমিও বিলি করা শুরু করেছিল। জমি পেয়েছিলেন মরিচঝাঁপির অধিবাসীরা ছাড়াও খুলনা জেলার কিছু আত্মীয়বন্ধু, কুমিরমারির কিছু মানুষ। সে জমি অবশ্য চাষযোগ্য তখনই ছিল না। সমিতির নির্দেশে ও কর্তৃত্বে জমির জন্য লিখিত কাগজও দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে রাইহরণ বাড়ৈ ১৯৭৯ সালের ২২ মার্চ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের নিকট যে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছেন, 'We have distributed lands of Marichjhapi among the six thousand families in the shape of paras, villages and anchals. Neaıly thousand families built their houses in different plots in groups system and have been residing there about a year.' এই জমিগ্রহীতাদের মধ্যে যে বাংলাদেশের নাগরিকরাও ছিলেন তার প্রমাণ গোয়েন্দা বিভাগের হাতে এসেছিল।

বাংলাদেশে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য চালানের বিষয়টি বিএসএফের হাতে আটক হওয়া নৌকা ও চাল ইত্যাদি থেকে প্রমাণিত হয়। টহলদারি লঞ্চের হাতে ধরা পড়ার আগে নৌকার আরোহীরা জলে ঝাঁপিয়ে পালিয়ে যেত। পুলিশের হাতেও এ রকম পারিবারিক প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি চাল ও আটা সহ নৌকা ধরা পড়েছে। ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) রাইহরণ বাড়ৈ কাশীকান্ত মৈত্রকে লেখা চিঠিতে জানাচ্ছেন, পুলিশ একটি নৌকা ও ৫০ কুইন্টাল চাল ধরে বাগনা ক্যাম্পে নিয়ে গেছে, এবং তিন জন আরোহী জলে ঝাঁপ দিয়ে কুমিরমারিতে উঠেছে। এই পঞ্চাশ কুইন্টাল চাল অবশ্যই একটি বা তিনটি পরিবারের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে কেনা হয়নি। ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখেই আর একটা ইস্তাহারে রাইহরণ বাড়ৈ দাবি করেছেন, ৫ ব্যক্তির কাছ থেকে পুলিশ মোট ৪৩ কুইন্টাল চাল, ৩৬ কুইন্টাল আটা, ১৩ কুইন্টাল লবণ, ৩০ টিন সরষের তেল এবং ১৯ টিন কেরোসিন তেল 'ছিনতাই' করেছে। এই অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির পরিমাণ দেখে এগুলো যে পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সমিতির স্বীকৃতি অনুযায়ী এই পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য যদি একদিনের আমদানির একটি অংশ হয়ে থাকে তবে কী বিপুল পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সংগৃহীত ও সীমান্তের ওপারে প্রেরিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়।

খুলনার মানুষদের সঙ্গে তাঁদের যোগযোগ ছিল সেই কথাও রাইহরণ বাড়ৈ তাঁর দেওয়া স্মারকলিপিতে পরোক্ষে স্বীকার করেছেন। হোমল্যান্ড সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'We have never demanded for homeland. Even we do not know the definition of homeland. The Udvastu Unnayansil Samity never delivered any speech, bulletin about homcland, and never any person from Khulna of Bangladesh under any intimation like this.' তৃতীয় বাক্যের

শেষ অংশটি লক্ষণীয়, খুলনার মানুষের যে হোমল্যান্ড সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলেই তিনি সে বিষয়ে অবহিত। জগদীশ মণ্ডলের বইতে এই স্মারকলিপিটির যে প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে তাতে এই বাক্যটিকে বদলে করা হয়েছে, 'We never delivered any speech or published anything regarding homeland. We never brought any person from Khulna of Bangladesh.' এই অবৈধ পরিবর্তনের কারণ যে সত্যকে আড়াল করা তা অনুমান করা কঠিন নয়।

আগন্তুকরা মরিচঝাঁপিতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল বলে দাবি করেছিলেন রাইহরণ বাড়ৈ। কলকাতার কয়েকটা খবরের কাগজেও তাদের অর্থনৈতিক উদ্যোগের ব্যাপারে খবর প্রকাশ হতে থাকে। একটা কাগজে সবুজ ধানের খেতের কথাও লেখা হয়েছিল, যদিও কোনও চাষের সম্ভাবনাই সেখানে ছিল না। রাইহরণ স্মারকলিপিতে বলেছিলেন, 'We managed to find out sources of income also establishing cottage industries such as Bidi factory, Bakery, Carpentry, Weaving factory etc, and also we built embankment 150 miles long, covering an area of nearly 30 thousand acres of land (to) be used for fishery, expecting an income of (Rupees) 20 crores per year.' এই দাবিগুলো অসত্য ও অতিরঞ্জিত। বিড়ি ফ্যাক্টরি খুলনা-যশোহরের বিড়ি এনে কিংবা পাতা ও তামাক এনে বিড়ি বেঁধে ব্যাবসা করার আড়াল মাত্র। বাঁধ কিছু দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ১৫০ মাইল লম্বা কোনও বাঁধের অস্তিত্ব ছিল না। দুটো খালের উপর মাটি কেটে দুটো ছোট ভেড়ি তৈরির চেষ্টা হয়েছিল ঠিকই— কিন্তু তাতে মাছ চাষ শুরু হয়নি। অর্থাৎ জবরদখল দ্বীপটি থেকে এমন কিছু উৎপাদনের ব্যবস্থা সমিতি করতে পারেনি যার আয়ে এই উপনিবেশ অদূর ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারত। ব্যক্তিগত ভাবে জীবনধারণের উপায় ছিল দিনমজুরি, জঙ্গলের কাঠ ও নদী-খালের মাছ বিক্রি এবং ওপার বাংলার সঙ্গে সীমান্ত অতিক্রম করে অবৈধ লেনদেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন যে মরিচঝাঁপিতে একটি 'সমান্তরাল সরকার' চলছে। রাইহরণ বাড়ৈ স্মারকলিপিতে লিখেছেন, 'We are not establishing any parallel government in Marichjhapi. We are most poor and helpless in the world having no place to live in. Everyone may come to us to see the position with his own eyes. We do not obstruct to enter Marichjhapi to anybody except policemen.' কিন্তু যদি একটি ৩০ হাজার মানুষের জবরদখল উপনিবেশে পুলিশ ও সরকারি প্রশাসনকে গায়ের জোরে বাইরে রাখা হয়, যদি সেখানে সরকারি জমি নিজেরাই বিলি-বাঁটোয়ারা করেন

এবং যদি জমি-প্রাপকদের মধ্যে বিদেশি নাগরিক থাকেন, যদি দেশের আইনের তোয়াক্কা না করে বিদেশিদের সঙ্গে লেনদেন, ব্যাবসাবাণিজ্য করেন, যদি উপনিবেশে বিদেশি নাগরিকরা বসবাস করেন তবে এই অবস্থাকে সমান্তরাল সরকার বলা কি খুব ভুল হয়েছিল?

এই প্রেক্ষিতেই ১৯৭৯ সালের ১৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিসঘরে মিটিং ডাকলেন। সেখানে জানলাম যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা ৩১ মার্চের মধ্যে মরিচঝাঁপির আগন্তুকরা স্বস্থানে ফিরে যান। কিন্তু কেন্দ্রের প্রধান শাসকদল জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা মরিচঝাঁপির বসতি স্থায়ী করতে চায়। এই দলের সদস্যদের সঙ্গে উন্নয়নশীল সমিতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কলকাতা থেকে অনেকে মরিচঝাঁপিতে গিয়েছেন, অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও বিভিন্ন ধরনের সাহায্য দিয়েছে। ফলে মরিচঝাঁপির আগন্তুকদের মনোবল ও উৎসাহ অনেক বেড়ে গেছে।

এই মিটিঙে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের প্রশাসনিক কর্তাদের তৈরি করা একটি পরিকল্পনা আলোচিত হল। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক হল, মরিচঝাঁপি দ্বীপে একে একে কয়েকটা পুলিশ ক্যাম্প করতে হবে— প্রত্যেক ক্যাম্পে একজন পুলিশ অফিসার, একজন বন বিভাগের অফিসার ও একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। দ্বীপের যে এলাকার অধিবাসীরা বাধা দেবে না সেই এলাকাতেই প্রথম ক্যাম্পটি করতে হবে। পরিকল্পনা শুনে জেলাশাসক ও আমি চুপ করে রইলাম। যেখানে দ্বীপে নামতে গেলেই ভলান্টিয়ার বাহিনী তেড়ে আসছে, সেখানে বিনা সংঘর্ষে নামা যাবে কী প্রকারে? আমরা ভলান্টিয়ার বাহিনীর আগ্রাসী মনোভাবের কথা বললাম। মুখ্যমন্ত্রী অবস্থা বুঝলেন, তবুও বললেন দেখুন সংঘর্ষ এড়িয়ে দ্বীপে নামতে পারেন কি না। তবে মরিচঝাঁপি থেকে দলবেঁধে কাঠ কাটতে বা মাছ ধরতে বেরিয়ে যাওয়া, দলবেঁধে বাজার-হাটে গিয়ে জুলুম করা, দিনমজুরির ব্যাপারে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা ইত্যাদি বন্ধ করা দরকার। সেই সঙ্গে যাঁরা মরিচঝাঁপিতে গিয়ে দ্বীপে বেআইনি বসতি স্থাপনের উৎসাহ দিচ্ছেন— কখনও কখনও বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন তাও বন্ধ করা দরকার। সিদ্ধান্ত হল, আগমন-নির্গমন বন্ধ করার জন্য মরিচঝাঁপির বাইরে কুরানখালি নদী ও কুমিরমারিতে ১৪৪ ধারা জারি করে পাঁচজনের বেশি মানুষের একসঙ্গে আগমন ও নিগর্মন বন্ধ করা হবে। অধিবাসীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া দরকার যে, তাঁরা বেআইনি ভাবে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন এবং সরকার এই বসতিকে স্বীকৃতি দেয়নি। তা ছাড়া তাঁরা জীবিকা অর্জনের জন্য যে পথ নিয়েছেন তাও বেআইনি। বহিরাগতদের সাময়িক সাহায্যের উপর নির্ভর করে স্থায়ীভাবে বাস করা যায় না। আগন্তুকদের জল ও খাবার বন্ধ করে দেওয়ার বা তাঁদের যাতায়াত বন্ধ করার কোনও পরিকল্পনাই নেওয়া হয়নি।

চাল-চিনি-কেরোসিনের সীমান্তে বাণিজ্য করা কিংবা সীমান্ত অতিক্রম করে চালান দেওয়া এমনিতেই বেআইনি, সেটা বন্ধ করাও অবশ্যই এই ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল।

এই মিটিঙের পর ১৯ জানুয়ারি জেলাশাসক ও আমি মরিচঝাঁপি রওনা হলাম। অবস্থা দেখে এবং স্থানীয় অফিসারদের নিকট বিস্তৃত খবরাখবর নিয়ে জানলাম যে ভলান্টিয়ার বাহিনী সংখ্যায় বেড়েছে। দুটো ভেড়ি তৈরির জন্য খালের ধারে মাটিকাটা চলছে। কুমিরমারি বাজারে জিনিসপত্র কেনা নিয়ে ছোটখাট বচসা ও হাতাহাতি হয়েছে। চাল-চিনি-কেরোসিন আসছে মরিচঝাঁপিতে। মরিচঝাঁপি দ্বীপের চতুর্দিকে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা মুশকিল। ম্যাপ দেখলেই তা বোঝা যাবে। শুধু কুমিরমারি ও ঝিল্লা নদীর দিকেই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হবে। ১৯ তারিখ রাত্রেই আমরা কলকাতায় ফিরলাম। ২১ তারিখ মহেশতলায় উপনির্বাচন ছিল। ২০ জানুয়ারি জেলাশাসক স্বরাষ্ট্রসচিবকে জানিয়ে দিলেন, বর্তমান অবস্থায় মরিচঝাঁপিতে নেমে পুলিশ ক্যাম্প বসাতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্য— তাই বর্তমানে ওই প্রস্তাব কার্যকরী করা যাবে না। ২৬ জানুয়ারি সকাল থেকে ১৪৪ ধারায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। লঞ্চ থেকে মাইকে করে এই ঘোষণা করা হল। কুমিরমারিতে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হল। কুমিরমারিতে কুরানখালির উপর চারটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হল— বাগনাতে একটা ছিলই, নদীর বাঁধের ধারে দুটো এবং পশ্চিমে খেয়াঘাটের কাছে আর একটা। এখান দিয়ে প্রধানত আগন্তুকরা নিজেদের নৌকাতেই পার হয়ে কুমিরমারি বাজারে আসত বা টিউবওয়েল থেকে জল নিতে আসত। ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মরিচঝাঁপি গেলাম। দেখলাম, নদী পার হয়ে নৌকায় কুমিরমারি ও মরিচঝাঁপির মধ্যে যাতায়াত যথারীতি চলছে। মরিচঝাঁপির দিকে একাধিক মাইক লাগিয়ে আগন্তুকদের নেতারা সরকারের ও পুলিশের তীব্র সমালোচনা করছেন।

রাইহরণ বাড়ৈ এটিকে বলেছেন অবরোধ ('blockade)। তাঁর স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে লিখেছেন, 'Marichjhapi completely isolated from all other civilised places.' অন্য অনেকে বলেছেন economic blockade বা অর্থনৈতিক অবরোধ। মরিচঝাঁপি থেকে আগমন-নির্গমন বন্ধ করা হয়নি— ফলে সভ্যসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তবে economic blockade কথাটি অংশত সত্য— কারণ এর ফলে তাদের জীবিকা অর্জনের উপায়গুলো সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার, এই উপার্জনের পথগুলো ছিল বেশির ভাগই বেআইনি। সুতরাং সে পথগুলোকে বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার সরকারের ছিল। এখানে বলা দরকার, তাদের খাদ্য ও পানীয় নিয়ে যাওয়া কখনও বন্ধ করা হয়নি।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সমিতির নেতা ও সদস্যরা আগন্তুকদের মনোবল বাড়াবার চেষ্টা করছিল— কারণ এক প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে তাদের বাসস্থান স্থায়ী হওয়ার আশা ছিল। তা ছাড়া ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন। কিন্তু ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পর সেই মনোবলে ভাঙন ধরল। সমিতির নেতা ও তাঁদের নিজেদের কাজকর্মের যথার্থতা সম্পর্কে মনে মনে সন্দেহ ছিলই; কারণ কাজগুলো তো আইনসঙ্গত ছিল না। কিন্তু ১৪৪ ধারার মাধ্যমে সরকার যখন মনোভাব স্পষ্ট করে দিল তখন তাঁদের চিন্তা করতেই হল যে ক্রমাগত বিবাদ করে এ রকম একটা জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা যাবে কি না। নভেম্বরের পর যাঁরা কিছুটা দোলাচলচিত্ত হয়েছিলেন তাঁরা দ্বিধা কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে মরিচঝাঁপি ছেড়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা খবর পেয়েছিলাম, অনেকে চলে যেতে উৎসুক। আমাদের লোকের মাধ্যমে খবর দিয়ে ইচ্ছুক পরিবার হাসনাবাদ চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতেন। ৩১ জানুয়ারি সকালে দূরবর্তী কাগমারি অঞ্চল থেকে কয়েকটি পরিবারকে পুলিশের লঞ্চে হাসনাবাদ পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম আমি নিজেই। স্থানীয় অফিসাররা ও বন বিভাগের অফিসাররা আরও অনেককে এইভাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই খবরগুলো নেতা এবং ভলান্টিয়ার বাহিনীও পেয়ে যেতেন। ফলে তারা আগন্তুকদের শাসাত ও ভয় দেখাত। সেই সঙ্গে হতাশায় পুলিশ ও সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যার কিছু আগে কুমিরমারিতে যে চারটে পুলিশ ক্যাম্প ছিল সেগুলো 'উন্নয়নশীল সমিতি'র ভলান্টিয়ার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হল। বাগনার নিকটে যে ক্যাম্পটা ছিল সেখানের পুলিশ অফিসার কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছুড়ে আক্রমণ প্রতিহত করেন ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়। (Gosaba P.S. Case No. 29 dated 31.01.79)। অন্য দুটো ক্যাম্পের উপর আক্রমণও সহজে প্রতিহত করা গিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটল খেয়াঘাট ক্যাম্পে— যেখানে মরিচঝাঁপি থেকে পার হয়ে অনেকে জল নিতে আসত ও হাটে বাজার করতে যেত। সেই সময় এই ক্যাম্পের কনস্টেবলরা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল। এই জায়গাটিতে অনেক লোকও জমায়েত হয়েছিল। কিছুক্ষণ লাঠি দিয়ে আক্রমণকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশের গুলিতে কুমিরমারির অধিবাসী দুজন আদিবাসী মহিলা মারা যান। তাঁরা আক্রমণকারীদের কেউ ছিলেন না। তাঁর বাড়ি ছিল কুমিরমারি বাঁধের নিকটেই— আক্রমণকারীরা তাঁর বাড়িটিকে আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করেছিল। ওই দিক থেকে আক্রমণ আসছে দেখে পুলিশ ওই দিকেই গুলি চালায়। আক্রমণকারীরা বর্শার মতো কাঠের

লাঠি, দা-টাঙ্গি, 'চ্যাঙ্গা' নামে দুদিকে ছুঁচোলো ছুড়ে মারার কাঠের ছোট লাঠি ব্যবহার করেছিল। ওই গুলিচালনায় কুমিরমারির দুই স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া আর কারও মৃত্যু ঘটেনি। কোনও মরিচঝাঁপিবাসী আগন্তুক গুলিতে নিহত হননি। আর সমগ্র মরিচঝাঁপি কাণ্ডে এই একবারই পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল। আর কখনও গুলি চালানোর মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়নি।

সরকার গুলিচালনার প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। তদন্ত করেছিলেন তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার অমল মজুমদার। সেই তদন্ত রিপোর্টে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই ঘটনার উপর গোসাবা থানায় দায়ের করা মামলায় (Gosaba P.S. Case No. 30 dated 31.1.79) চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। মামলার তদন্তের নথিতেও ঘটনার বিবরণ আছে।

কুমিরমারির গুলিচালনার বিষয়ে এত অতিরঞ্জিত, বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন খবর ছাপা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে যে আশ্চর্য হতে হয়। গুলিচালনার কিছুক্ষণ পরে আমি ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। সরকারের নিকট সেই দিনই রিপোর্ট করেছিলাম যে গুলিতে কুমিরমারির দুজন আদিবাসী মহিলার মৃত্যু হয়েছে— এখনও বলছি কুমিরমারির ৩১ তারিখের গুলিচালনায় মৃতের সংখ্যা দুই। কিন্তু সমিতির নেতারা এ ধরনের একটা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল কেন? নেতা, এমনকী নেতৃস্থানীয় ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। তবে আগন্তুকদের ক্রমাগত মরিচঝাঁপি ছাড়ার ইচ্ছার কথা জেনে তারা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নাই। একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়ে সমস্ত বিষয়টাকে একটি অন্য মাত্রা দেওয়ার পরিকল্পনা যে ছিল তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। গভীর হতাশা থেকেই যে নদী পার হয়ে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণের হঠকারী পরিকল্পনা, তাতে সন্দেহ নাই।

রাইহরণ বাড়ৈ সংসদীয় প্রতিনিধিদলকে দেওয়া স্মারকলিপিতে লিখেছিলেন, 'The police became angry and opened fire indiscriminately resulting painful death of 10 refugees and two local people including one woman.' অর্থাৎ মোট ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁর দাবি। স্মারকলিপিতে তিনি স্বীকার করেছেন, মরিচঝাঁপি থেকে লোকজন গিয়ে কুমিরমারিতে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল— সহায়তা করেছিল কুমিরমারির মানুষ। তাঁর কারণ হিসাবে রাইহরণ বাড়ৈ বলেছেন, কুমিরমারিতে পুলিশ নাকি মেয়েদের উপর অত্যাচার করছিল। রাইহরণ মরিচঝাঁপি থেকেই ১৯৭৯-র মে মাসে খুলনা (বাংলাদেশ) চলে যান। সেখানে কয়েক বছর ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি পরে অনেক নাম সম্বলিত কিছু কাগজ পাঠিয়েছিলেন। যা 'মরিচঝাঁপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে' বইতে ছাপা হয়েছে। ওই তথ্যগুলোর সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যে

সন্দেহজনক সে সম্পর্কে আগেই লিখেছি। সেই কাগজের মধ্যে ১৫ জনের নামের তালিকা আছে। তাদের মধ্যে ১৩ জন মরিচঝাঁপির আগন্তুক। যেহেতু পুলিশের গুলিতে দুজন কুমিরমারির অধিবাসী ছাড়া কেউই নিহত হননি, তাই তাঁর বক্তব্য অসত্য ও তালিকা কল্পনাপ্রসূত। পার্লামেন্টারি দলকে স্মারকলিপি দেওয়ার আগে ১৬ ফেব্রুয়ারি রাইহরণের স্বাক্ষরে একটি ইস্তাহার ছাপিয়ে বিলি করা হয়। তাতে রাইহরণ লিখছেন:

'নেতাজিনগরের পারে পুলিশ দু-রাউন্ড গুলি চালায়। কুমিরমারির পারে চালায় ৩০ রাউন্ড। মোট ৩২ রাউন্ড গুলি চালায়।' পুলিশ তো কুমিরমারির পারে ছিল। মরিচঝাঁপির অভ্যন্তরে নেতাজীনগরে গেল কী করে পুলিশ? তার পর তিনি লিখেছেন, 'এই নির্মম ও পৈশাচিক গুলি কাণ্ডে উদ্বাস্তু ও স্থানীয় সহ নিহতের সংখ্যা মোট ৩০ জনের মতো।' এই রাইহরণই ২৩ মার্চের স্মারকলিপিতে মোট নিহতের সংখ্যা দিয়েছেন ১৫ জন।

ইস্তাহারে রাইহরণ যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটিও বীভৎস রসের একটি নমুনা। 'একটি পাঁচ বৎসরের শিশুকে গলায় পা দিয়ে দমবন্ধ করে মারা হয়। ত্রিশটি মৃতদেহ ঘটনার দিন সন্দেশখালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ছোরা দিয়ে পেট কেটে মৃতদেহগুলোকে বেড়মজুরিয়া নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।'

শুধু তাই নয়। ১ ফেব্রুয়ারি কুমিরমারিতে আর একটি গুলিচালনার কথা বলেছেন রাইহরণ। 'পরদিন ১/২/৭৯ তারিখে স্থানীয় জনসাধারণ বাগনা ক্যাম্পে একটা মিছিল নিয়ে যায়। পুলিশ ওই মিছিলের ওপর দু-রাউন্ড গুলি চালায়। তাতে স্থানীয় একজন আহত হন।' (মরিচঝাঁপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে, পৃ. ১৩১) এ রকম কোনও গুলিচালনার ঘটনা ঘটেনি। এগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অসত্য প্রচার।

রস মল্লিক তাঁর দুটো রচনাতেই বলেছেন, '36 persons killed by police firing on 31.1.1979.' ওঁর তথ্যসূত্র আদৌ স্পষ্ট নয়। তা ছাড়া উনি যে তথ্যের সত্য-মিথ্যার ধার ধারেন না সে বিষয়টি অন্যান্য ব্যাপারেও পরিষ্কার হয়েছে।

'মরিচঝাঁপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে' বইতে সিপিআই-এর মুখপত্র 'কালান্তর' কাগজে প্রকাশিত (২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯) দিলীপ চক্রবর্তীর একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন, 'চার ভাটার পথ: নিষিদ্ধ দ্বীপ', উদ্ধৃত করা হয়েছে। ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে তিনি কুমিরমারি গিয়েছিলেন। চক্রবর্তী লিখছেন, 'উদ্বাস্তু সমিতির তালিকা অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ৩৬।' এই সংখ্যার সঙ্গে রাইহরণের তালিকার সংখ্যার অনেক ফারাক। সুতরাং এটি সমিতির দেওয়া সংখ্যা নয়। সম্ভবত কোনও মহলে এটি তৈরি করা। তিনি আরও লিখছেন, 'উদ্বাস্তুদের কয়েকটি মৃতদেহ নাকি পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বেড়মপুরিয়া ও কল্লাগাছিয়া নদীতে ওই দেহ ওরা ফেলে

দেয়।' তার ব্যবহৃত 'নাকি' থেকেই প্রমাণ তিনি এর সত্যাসত্য যাচাই না করেই প্রতিবেদন করেছেন। ওই বইতেই অমিত সর্বাধিকারী রচিত 'মরিচঝাঁপি: নৃশংসতার শেষ চিহ্ন' নামে 'কালান্তর' পত্রিকা থেকে একটা রচনা উদ্ধৃত হয়েছে। সর্বাধিকারী মরিচঝাঁপিতে গিয়েছিলেন আগন্তুকরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর। তিনি লিখছেন, 'কুমীরমারিতে পুলিশ জল-স্থল উভয় দিক থেকে দণ্ডক শরণার্থীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কমপক্ষে ১৫০ জনকে হত্যা করেছে।' এ তথ্যটি কোথায় পেয়েছেন তার সূত্র উল্লেখ নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন সর্বাধিকারী। তিনি আরও লিখছেন, 'অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গুলিচালনার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল তিনটি ব্যাটেলিয়নের ৪টি কোম্পানির রাইফেল। মাটিতে পড়ে গেল ৬০টির বেশি তাজা দেহ। এলোপাথাড়ি গুলিচালনার জন্য মারা গেল এক বৃদ্ধ সাঁওতাল— সে উদ্বাস্তু ছিল না, ঘরে বসেছিল। কয়েকদিন পরে আরও পাঁচটি মৃতদেহ পাওয়া গেল।' এই রচনাটি মরিচঝাঁপি থেকে আগন্তুকরা চলে যাওয়ার পর ২৪ মে 'কালান্তর'-এ ছাপা হয়েছিল। স্পষ্টত, ব্যাটেলিয়ন, কোম্পানি ইত্যাদি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ না বুঝেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যারা জানেন তাদের কাছে চার কোম্পানি মানে প্রায় চারশো কনস্টেবল এবং চারশো রাইফেল। চারশত রাইফেল থেকে একসঙ্গে গুলি চলেছিল? এ এক উদ্ভট ব্যাপার! কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কল্পনায় সবই সম্ভব।

শিবনাথ চৌধুরী 'মরিচঝাঁপির কান্না'-তে লিখছেন, 'পুলিশ সুপারের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩১ জানুয়ারি সকাল থেকে শত শত টিয়ার গ্যাস সেল ফেলা হতে লাগল মরিচঝাঁপিতে। যাতে উদ্বাস্তুরা কিছুতেই আর ঘরে থাকতে না পারে। সবাইকে যেন কোরানখালি নদীর ধারে বেরিয়ে আসতে হয় চোখে জল দেওয়ার জন্য। শুরু হল পুলিশের ফায়ারিং, এবার আর টিয়ার গ্যাস নয়, রাইফেলের ৩০০ বুলেটের তপ্ত সীসা ছুটে এল পুলিশের লঞ্চ থেকে। ওই অবস্থাতে গুলি খেয়ে উদ্বাস্তুরা মরতে লাগল। তাদের মৃতদেহ ধেয়ে চলল ভাটির টানে, কোরানখালি নদীর বুক বেয়ে রায়মঙ্গলে, তারপর সোজা বঙ্গোপসাগরে।' চৌধুরী অবশ্যই মরিচঝাঁপি ইত্যাদি ভৌগোলিক অবস্থান জানেন না। প্রথমত বিকৃত কল্পনাকে অন্তত কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার ছিল। মরিচঝাঁপিতে আগন্তুকদের বসতি কুমিরমারি বা কুরানখালি নদী থেকে দেখা যায় না। সেখানে টিয়ারগ্যাসের সেলও পৌঁছাতে পারে না। চৌধুরীর কথায় ওই দিনই (৩১ জানুয়ারি) 'পুলিশ এবার মরিচঝাঁপিতে নেমে সামনা-সামনি উদ্বাস্তুদের উপর চালাতে লাগল অত্যাচার। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হল, লুটপাট করা হল উদ্বাস্তুদের যথাসর্বস্ব। মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে চালায় পাশবিক অত্যাচার।' লেখক কোনও তথ্য বা ঘটনার সত্যাসত্য বিচারের ধার ধারেন না। যা মনে আসে তাই লিখে যান। পুলিশ

যে ১৪ মে-র আগে মরিচঝাঁপিতে পদার্পণ করতে পারেনি সে ঘটনা তিনি জানেন না বা জানার প্রয়োজনবোধ করেননি। যে ভাবেই হোক, পুলিশের কল্পিত অত্যাচারের কথা লিখেই তাঁর সুখ। তাঁর মতে, '৩০ জন বুলেটে নিহত'। তথ্যসূত্র বা সামান্য বাস্তবতাবোধ তাঁর কাছে আশা করা বাহুল্যমাত্র।

গুলিচালনার একটা প্রতিবেদন কলকাতার এক দৈনিকে দেখেছিলাম। প্রতিবেদক লিখছেন, 'নদীর তীরে শুয়ে আছে সারি সারি বুলেটবিদ্ধ মৃতদেহ।' কত জনের দেহ তা প্রতিবেদক জানাননি, তবে তা যে অনেক, লেখার মুন্সিয়ানার মধ্যেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে নেজাটের লঞ্চ ঘাটে একটি ঝুপড়ির সামনে তাঁকে দেখেছিলাম। তাঁর অবস্থা ও কথাবার্তা থেকে তাঁর প্রতিবেদনের উৎস অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়নি।

এইখানে ৩১ জানুয়ারির আর একটা ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। ওইদিন সন্ধ্যার পরে কুমিরমারিতে আরএসপি-র পতাকা নিয়ে একটি মিছিল বেরোয়। তারা গুলিচালনার প্রতিবাদ করে পুলিশ ক্যাম্প তুলে দেওয়ার দাবি জানায়। পরের দিন ওইরূপ একটি মিছিল বাগনা ক্যাম্পে গিয়ে একটা স্মারকলিপি জমা দেয়। মিছিলকারীরা মরিচঝাঁপির বেশির ভাগ মানুষ যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে রাজনীতির দিক থেকে তারা আরএসপি। সেই হিসাবে তারা দলের নীতির বিরোধিতা করছে। কিন্তু এখানে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য জাতের প্রতি আনুগত্যের থেকে দুর্বল হয়ে গিয়েছে। একটা ব্যক্তিস্বার্থের ব্যাপারও ছিল। রাইহরণ বাড়ৈয়ের জমি-প্রাপকদের তালিকায় এদের অনেকের নাম ছিল। মরিচঝাঁপি থেকে নদী পার হয়ে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণের দুঃসাহসে মদত দিয়েছিল এরাই। ভলান্টিয়ারদের হঠকারিতার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

এই সময় একদিন সকালে হঠাৎ এক অফিসার জানালেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব শঙ্কর গুপ্ত এসেছেন। কিছুক্ষণ পরে আমার লঞ্চে আসবেন। তাঁর আসার খবর কিছুই জানতাম না। তিনি এলেন— ওপারে তখন মাইকে সরকারের কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'যাবেন নাকি ওই বাঁধের ধারে, একটু কথা বলে আসবেন?' বললেন 'না থাক'। তারপর তাঁর পরিচিত অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। এরকম আরও দু-একবার পার্টির নেতারা (যেমন হেমন্ত ঘোষাল) এসেছিলেন বলে শুনেছি— আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

৩

ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে একটা রিট (Writ) আবেদনে উন্নয়নশীল সমিতি কুমিরমারিতে ১৪৪ ধারায় নিষেধাজ্ঞা বাতিল করার প্রার্থনা জানায়। আবেদনে

বলা হয়েছিল যে, পুলিশ মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের খাদ্য ও পানীয় বন্ধ করে তাদের অনাহারে থাকতে বাধ্য করছে। ৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট আদেশ দিলেন, মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের খাদ্য ও পানীয় আটকানো চলবে না। তবে ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। এই আদেশের ফলে পুলিশি ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না; কারণ কুমিরমারি থেকে বা অন্য জায়গা থেকে পারিবারিক প্রয়োজনের খাদ্য ও পানীয় নিয়ে যাওয়ায় বাধা দেওয়া হয়নি।

১ ফেব্রুয়ারি মরিচঝাঁপি থেকে কলকাতায় ফিরে ২ ফেব্রুয়ারি জেলাশাসক ও আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত রিপোর্ট দিলাম। সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে গভর্নরকে মরিচঝাঁপির ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে আসতে হল।

সরকার এই ঘটনার পর মরিচঝাঁপির আগন্তুকদের সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনের সিদ্ধান্ত নিল। এতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল বামফ্রন্টের দলগুলো। জনতা, কংগ্রেস ও সিপিআই (তখনও বামফ্রন্টে যোগ দেয়নি) বিধানসভায় গুলিচালনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত চেয়েছিল ও জোরদার প্রচার শুরু করেছিল। ৩ ফেব্রুয়ারি কুমিরমারি বাজারে বিনয় চৌধুরী (সিপিএম), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (আরএসপি) ও কমল গুহ (ফরওয়ার্ড ব্লক) একটি জনসভা করে সরকারি নীতি ও মরিচঝাঁপিতে কেন বসবাস করতে দেওয়া যাবে না সে কথা ব্যাখ্যা করে বললেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মোল্লাখালিতে একটা জনসভা করে মরিচঝাঁপির আগন্তুকদের স্বস্থানে ফিরে যাওয়ার আবেদন জানালেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির নেতারা আগন্তুকরা যেন মরিচঝাঁপি থেকে চলে না যান সেই চেষ্টাই করছিলেন। তাঁরা মিটিং-মিছিল করে, মনুমেন্টের পাদদেশে সত্যাগ্রহ করে আগন্তুকদের পক্ষে একটি জনমত গড়ে তুলতে চাইলেন। বাইরের কোনও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে মরিচঝাঁপিতে যেতে দেওয়া হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন। কাশীকান্ত মৈত্র সাতজন এমএলএ ও দলীয় কর্মী নিয়ে গোপনে মরিচঝাঁপিতে চলে গেলেন। সেখানে মিটিং করে আগন্তুকদের মরিচঝাঁপি না ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ফেরার পথে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের নেজাট লঞ্চঘাটে গ্রেপ্তার করা হল ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা ভেঙে মরিচঝাঁপি যাওয়ার জন্য। পরদিন অবশ্য সবাই জামিনে মুক্তি পান। এরপর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মশাই ঘোষণা করলেন তিনিও মরিচঝাঁপি যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিসে একটা মিটিং ডাকলেন। উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে মরিচঝাঁপি যেতে দিতে রাজি নন। আমাদের বললেন, 'ওঁকে যেতে দেবেন না।' কিন্তু ওঁকে আটকাতে হলে তো গ্রেফতার করতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী ইংরেজিতে কথাটি বললেন, 'Throw him out'। একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বিশেষ করে প্রফুল্ল সেনের মতো মানুষকে গ্রেফতার করে বা পুলিশের ব্যারিকেড

করে আটকানো শুধু দৃষ্টিকটু নয়, এতে মরিচঝাঁপির সমস্যা সমাধানে কোনও সুরাহা হবে না। প্রফুল্ল সেনের সম্পর্কে আমাদের দ্বিধার কথা বুঝে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তারপর ব্যবস্থা করলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন প্রফুল্ল সেনের মরিচঝাঁপি যাওয়া বন্ধ করতে। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করলেন প্রফুল্ল সেন। মরিচঝাঁপি না গিয়ে আগন্তুকদের সমর্থনে সত্যাগ্রহ শুরু করলেন কলকাতায়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক সমাজকর্মী, রাজনৈতিক নেতা কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে মরিচঝাঁপি গিয়েছেন। আমরা যথারীতি খবর পেয়েছি কখনও একটু দেরিতে, কখনও বা আগেভাগে, প্রকৃতপক্ষে জানুয়ারি মাস থেকে মরিচঝাঁপির অভ্যন্তরের গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার প্রশাসনের নিকট গোপন ছিল না, আমরা বুঝতে পারছিলাম, 'মরিচঝাঁপিতে বসতি গড়ে উঠবে'— এই বিশ্বাস বেশির ভাগ মানুষেরই আর নেই। নেতাদের উপরও তাদের আস্থা নষ্ট হতে শুরু করেছিল।

অনেকের মতো প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বিপ্লবী বীণা দাস (ভৌমিক) আর একজন মহিলা সহকর্মীর সঙ্গে মরিচঝাঁপিতে এসেছিলেন ৪ ফেব্রুয়ারি। সেদিন আমি মরিচঝাঁপিতে ছিলাম। দুপুরের দিকে আমাকে জানাল, বীণা দাস মরিচঝাঁপি অঞ্চলে এসেছেন। ওঁকে আগে দেখিনি এবং ওঁকে দেখার ইচ্ছা ছিল খুব। প্রাক্-স্বাধীনতা বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন কারণে আমার কৌতূহল বেশি। তাই মরিচঝাঁপি দ্বীপে লঞ্চ নিয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভলান্টিয়ার বাহিনীর লোকজন এলেন। একটা দা হাতে সেই মাঝবয়েসি লোকটিও ছিলেন। আমি লঞ্চ থেকে নামলাম না। কয়েকজনকে ডেকে বললাম, 'বীণা দাস এসেছেন শুনেছি, আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওঁকে একবার ডেকে দিন।' বেশ বাধ্য ছেলের মতো কয়েকজন বীণা দাসকে খবর দিতে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি এলেন, সঙ্গে আর এক মহিলা, তাঁর নাম কমলা বসু। তখন অবশ্য আমি তাঁর নাম জানতাম না। আমি নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, তাঁকে শুধু দেখবার জন্যই দেখা করতে চেয়েছি— কারণ আমাকে তো ভিতরে যেতে দেবে না। তারপর আরও দু-চারটে কথাবার্তা হল। সবই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে। মরিচঝাঁপি সম্পর্কে উনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, আমিও কিছু বললাম না। ওঁরা কীভাবে এসেছেন তা আগেই জেনেছি। তাই বললাম, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে ফেরার সময় আপনারা আমাদের একটা লঞ্চে যেতে পারেন।' জানতাম ওই অবস্থায় আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু মনে হয়েছিল এটুকু হয়তো ওঁর জন্য করা উচিত। বীণা দাস কিছু বলার আগে সঙ্গের মহিলা (কমলা বসু) জবাব দিলেন, 'আমরা আপনাদের লঞ্চে যাব না।' বীণা দাস কিছুই বললেন না। তারপর আমি নমস্কার করে চলে এলাম। উনি দলবল সহ দ্বীপের

ভিতর চলে গেলেন। আমার ৪ ফেব্রুয়ারির (১৯৭৯) ডায়েরিতে এই সাক্ষাতের কথা লেখা আছে।

'মরিচঝাঁপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে' বইটিতে নিরঞ্জন হালদারকে লেখা কমলা বসুর একটি চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে।[৩] চিঠিটি সাম্প্রতিক কালে (সম্ভবত ২০০২ বা ২০০৩) লেখা। চিঠিটি বীণা দাসের সঙ্গে মরিচঝাঁপি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখা। কমলা বসুর চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি: 'মরিচঝাঁপিতে বীণাদিকে সভানেত্রী করে একটা সভা হল। এমন সময় একদল ছেলেমেয়ে (তাদের কাজই ছিল নদীর ধারে পাহারা দেওয়া কারণ তখন মরিচঝাঁপিতে অচেনা কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এই ছিল সরকারি নিয়ম) ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'স্টিমার ভর্তি পুলিশ এসেছে।' আমরাও ছুটে গেলাম— ভাবলাম হয় বীণাদিকে গ্রেপ্তার করবে, নয় নির্বিচারে গুলি চালাবে। না ওরা সে সব কিছুই করেনি— স্টিমার থেকে মাটিতে নামার সাহস পর্যন্ত হয়নি। তারপর ওরা আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল, আপনারা কতদিন ধরে এখানে আছেন, কবে এসেছেন, কবে ফিরবেন ইত্যাদি। কোনও নির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে পাশ কাটানো ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না। শেষকালে বলে কিনা 'ফেরবার জন্য তো আপনারা কিছু পাবেন না, আমাদের সঙ্গে চলুন আমরা পৌঁছে দিচ্ছি।' কী স্পর্ধা! অবশ্য কথাগুলো বলেছিল খুব ভদ্রভাবে। বীণাদি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত গম্ভীর ও দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমাদের জন্য আপনাদের ভাবতে হবে না, আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব না।' শেষ পর্যন্ত ওরা চলে গেল।

কমলা বসু স্মৃতি থেকে লিখেছেন; আমি আমার ডায়েরি থেকে সেদিনের সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ বাংলা করে দিয়েছি। কিছু খুঁটিনাটি ও কমলা বসুর নিজস্ব মন্তব্য ছাড়া দুটো বর্ণনায় পার্থক্য নেই। তিনি মরিচঝাঁপির নেতাদের নিকট যা শুনেছেন তাই লিখেছেন: পুলিশ 'হয় গ্রেপ্তার করবে নয় নির্বিচারে গুলি চালাবে।' কিন্তু কিছুই হয়নি। তিনি শুনেছেন, মরিচঝাঁপি অবরুদ্ধ, সেখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ তাঁরা ঢুকেছেন, এবং সেটা যে আমাদের অজানা নয় তাও জেনেছেন। আমরা তাদের আরোহীসহ নৌকা 'ল্যাসো' 'Laso' দিয়ে তুলে নিইনি। এরপরেও কমলা বসু ২২ মার্চ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এসেছিলেন। আমরা সেই দলে যে সমস্ত জনতা দলের বা অন্য দলের এমএলএ বা নেতা ছিলেন তাদের কুমিরমারিতে নামিয়ে দিয়েছিলাম— মরিচঝাঁপিতে ঢুকতে দিইনি। কমলা বসু প্রচুর জিনিসপত্র (গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি) নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বা

৩ দ্র. পরিশিষ্ট ক

জিনিসপত্র নিয়ে কোনও প্রশ্নও তুলিনি। শোনা কথার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার এই যে গরমিল তা নিয়ে তাঁর মনে কোনও প্রশ্ন জাগেনি— অন্তত চিঠিতে তিনি তা লেখেননি। বস্তুতপক্ষে, বেশির ভাগ মানুষ যা বিশ্বাস করতে চান বা বিশ্বাস করা সুবিধাজনক মনে হয় তার সপক্ষেই প্রমাণ খোঁজেন, কিংবা দুর্বল তথ্য দিয়ে তা প্রমাণ করার প্রয়াস পান।

কমলা বসু লিখেছেন, 'ব্লকেডের সময় ওরা কী খেত শুনবে? এক ধরনের ঘাস সেদ্ধ করে তাই দিয়ে ওরা পেট ভরায়।' ঘাসটার নাম কমলা বসুর মনে ছিল না; ওটার নাম যদু-পালং। কমলা বসু ও বীণা দাস গিয়েছিলেন ৪ ফেব্রুয়ারি। ৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রায় দেয় যে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে তবে খাদ্য ও পানীয় নিয়ে যাওয়াতে বাধা দেওয়া চলবে না। সুতরাং ৪ ফেব্রুয়ারি বর্ণিত ব্লকেডের চূড়ান্ত সময়। সেই সময় অনেকের যদু পালং খাওয়ার কথা। কমলা বসু নিশ্চয়ই কাউকে 'যদু-পালং' নামক ঘাসটি সিদ্ধ করে খেতে দেখেননি— দেখলে ওই অভিজ্ঞতার কথাও অবশ্যই লিখতেন। অন্য অনেক শোনা কথার মতো ঘাস সিদ্ধ খাওয়ার গল্প ওঁর শোনা কথা।

কেউ যেন মনে না করেন যদু-পালং সম্পর্কে এই সমস্ত লিখে মরিচঝাঁপিতে ক্ষুধা বা খাদ্যাভাব ছিল না, এই কথা প্রমাণ করতে চাইছি। মরিচঝাঁপিতে ক্ষুধা ছিল, রোগ ছিল, অপঘাত মৃত্যু ছিল— বরং সুন্দরবনের অন্যত্র যেমন থাকে তার থেকে অনেকটা বেশিই ছিল। নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য সাধারণ মানুষ যারা বাংলায় বাস করার বা হোমল্যান্ডে বাস করার প্রলোভনে এসেছিলেন কিংবা জমি পাওয়ার লোভে এসেছিলেন তাঁরা যে সীমিত সঞ্চয় এনেছিলেন তাতে খুব বেশি দিন চলেনি। তারপরই তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছিল দিনমজুরি, কাঠ ও মাছ বিক্রি ইত্যাদির উপর। দূরের শহরেও কিছু কিছু মানুষ কাজ করতে গিয়েছিলেন। সীমান্ত অতিক্রম করে যে ব্যাবসাবাণিজ্য হয়েছিল তাতে কেবল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই লাভবান হয়েছিলেন। আর প্ল্যান্টেশনের জমি যে দু-এক বছরের মধ্যে ফসল দেবে না তা তাঁরা ওখানে পৌঁছবার পরই বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর কিছুদিন পরে যখন অবাধ কাঠ কাটা ইত্যাদি বন্ধ হল, দিনমজুরি নিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষের সূচনা হল, তখন থেকেই খাদ্যাভাব টের পাওয়া যেত। সেই সময় থেকেই কোনও কোনও পরিবার চলে যেতে শুরু করে। প্রথমে যায় পন্থনগর (তখন উত্তরপ্রদেশ) অঞ্চলের কয়েকটি পরিবার। উর্বর জমির মালিক ও ছোট ব্যবসায়ী ছিলেন তাঁরা। তারপর মহারাষ্ট্রে পুনর্বাসিত ব্যক্তিরা। জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় যখন স্পষ্ট হল যে, সরকার ওই বসতি স্বীকার করে নেবে না তখন বেশির ভাগ মানুষই ফিরে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠল। এই সময়েই বহিরাগত

রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা মরিচঝাঁপিতে গিয়ে তাঁদের সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন, টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন, ওইখানেই বসতি স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। উন্নয়নশীল সমিতির ভলান্টিয়াররা অনিচ্ছুক পরিবারগুলির উপর নজর রেখেছেন, ভয় দেখিয়েছেন এমনকী মারধোর করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকেই সংগোপনে মরিচঝাঁপি ত্যাগ করতে থাকেন। এ বিষয়ে পুলিশ ও বন বিভাগের কর্মচারীরা তাদের সাহায্য করেছেন। এই যে বিপরীতমুখী স্রোত, এর পিছনে ছিল এই অভিজ্ঞতা যে, মরিচঝাঁপিতে আইনি পথে জীবনধারনের মতো খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতা এইখানেই নষ্ট হয়ে যায়।

মরিচঝাঁপিতে একটি ডাক্তারখানায় স্থানীয় দু-একজন এবং কুমিরমারি থেকে গিয়ে একজন স্থানীয় মানুষদের চিকিৎসা করতেন। কুমিরমারিতে বা খুব প্রয়োজনে হাসনাবাদেও যেত কেউ কেউ। কিন্তু ত্রিশ হাজার মানুষের পক্ষে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। শিশুমৃত্যুর হার কত ছিল জানি না, তবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য হার যে বেশি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে আমাদের সংবাদদাতা মারফত খবর পেতাম। অত্যন্ত লবণাক্ত পরিবেশের জন্য পাকস্থলী সংক্রান্ত রোগই ছিল বেশি। তাদের মারফতই খবর পেয়ে মাঝে মাঝে খুব সংকটাপন্ন রোগী বা প্রসূতিকে সরকারি লঞ্চে হাসনাবাদ বা অন্যত্র পাঠানো হয়েছে।

যাই হোক, জানুয়ারি মাসে প্রত্যাবর্তনের যে ধারা শুরু হয়েছিল, ফেব্রুয়ারিতে নানান অসুবিধার মধ্যেও সেই ধারা শুধু অব্যাহতই থাকল না, ধীরে ধীরে বেড়ে চলল। উন্নয়নশীল সমিতির নেতারা ও সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলি সেই স্রোত বন্ধ করার জন্য আরও উচ্চ কণ্ঠে পুলিশের উপর নিগ্রহের ও অত্যাচারের অভিযোগ আনতে শুরু করল। কাশীকান্ত মৈত্র মরিচঝাঁপি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি ফিরে যান, ১৩ ফেব্রুয়ারি মণীন্দ্র রায় নামে মরিচঝাঁপির একজন অধিবাসী অভিযোগ জানালেন যে, তিনি ও তাঁর পরিবারকে মহেশ বারুই ও আরও ১০-১৫ জন ভলান্টিয়ার জোর করে বাড়ি থেকে বেরোতে দেয়নি। তাঁদের জীবনহানিরও ভয় দেখিয়েছে। মণীন্দ্র রায় অবশ্য পরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন (দ্রষ্টব্য, Gosaba P.S. Case No. 9 dated 13.2.1979 WB U/S 147/342 IPC)

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে রাইহরণ বাড়ৈ কাশীকান্ত মৈত্রকে লিখেছেন: 'আপনার গত ১১/২/১৯৭৯ তারিখ রবিবার মরিচঝাঁপি পরিদর্শনের পর হতে পুলিশের তৎপরতা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। পৈশাচিক অত্যাচার আগের থেকে তীব্র রূপ ধারণ করছে। মরিচঝাঁপির অন্তর্গত কাকসা, ভাইজোরা, চিলমারী, বিজয়া ভারানি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় এক বৎসর বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালাচ্ছে। প্রায় এক হাজার পরিবারকে ঘরবাড়ি ভেঙে,

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, ছারখার করে উৎখাত করেছে। উক্ত পরিবারের প্রায় আড়াই হাজার লোককে পুলিশ স্ত্রী-পুরুষ-শিশুকে পাশবিক অত্যাচার করেছে এবং মারধোর করেছে। বেশির ভাগ লোককে পুলিশ বাগনায় নিয়ে ২/১ দিন অনাহারে রেখে জোর করে হাসনাবাদ পাঠিয়ে দিচ্ছে।'

মরিচঝাঁপি থেকে আশাহত মানুষের ফিরে যাওয়া বন্ধ করতে না পেরে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও হতাশাগ্রস্ত রাইহরণ বাড়ে কল্পিত পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগের মধ্যে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। শুধু রাইহরণ বা উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতারাই নন, তাঁদের সমর্থক রাজনৈতিক নেতাদেরও ওই একই কৌশল। উদ্বাস্তুদের মনুষ্যসত্তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাঁরা তাঁদের হাতের পুতুল মনে করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে রাইহরণ একটি হাস্যকর ভুল করেছেন। 'পুলিশি নির্যাতন' ও 'পাশবিক অত্যাচার'-এর অভিযোগ করে চিঠির শেষ পরিচ্ছেদে লিখছেন, 'প্লানটেশনের চার কোনায় চারটি পুলিশ ক্যাম্প করবার জন্য পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্বাস্তুরা পুলিশ ক্যাম্প করবার পক্ষপাতী নয়। তাই উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পুলিশের বাক্‌বিতণ্ডা চলছে। পুলিশের আক্রমণাত্মক মনোভাব দূর করার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।' অর্থাৎ পুলিশ যেন মরিচঝাঁপিতে না নামে সেই জন্য ব্যবস্থা করতে কাশীকান্তবাবুকে অনুরোধ করা হয়েছে। পুলিশ যেখানে যেতেই পারছে না, সেখানে তারা এত মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে জোর করে ধরে আনবে কী করে? এই বাস্তবতার প্রশ্নগুলো অভিসন্ধিপরায়ণ নেতাদের মনে কখনওই ছিল বলে মনে হয় না।

এই সময় এক সংবাদসূত্র মারফত খবর পাওয়া গেল, যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগন্তুকদের আন্দামানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন তবে তাঁরা মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলে যাবেন। এই বার্তার সত্যতা যাচাই করে দেখলাম যে বার্তাটি ঠিক। কিন্তু ওঁরা তো কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরি জানাতে পারেন, সে রকম যোগাযোগ তো ওঁদের আছে। প্রশ্নের উত্তরে জানলাম যে রাজ্য সরকার এই দাবি সমর্থন করলে তার গুরুত্ব বাড়বে। একটা মিটিঙে মুখ্যমন্ত্রীকে জেলাশাসক ও আমি এই কথা জানালাম। মুখ্যমন্ত্রী শুনলেন কিন্তু কিছু বললেন না। তখনও জানতাম না মুখ্যমন্ত্রী আগে থেকেই এ ব্যাপারে চেষ্টা করছেন। পরের মিটিঙে তিনি প্রথমেই বললেন যে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আরও বসতি বাড়ালে আন্দামানের অরণ্য-আচ্ছাদন কমে যাবে এবং দ্বীপটি সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবে। সুতরাং ওখানে হবে না। কয়েকদিন পরে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী সিকন্দর বক্তের বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল: আন্দামানে আর জনবসতি বাড়ানো সম্ভব নয়।

'উন্নয়নশীল সমিতি'র তরফে আরও কিছু রাজনৈতিক চেষ্টা হল মরিচঝাঁপির বসতি স্থায়ী করার। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দলের নেতাদের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল মরিচঝাঁপিতে পাঠাতে রাজি হলেন। তাঁরা মরিচঝাঁপিতে এসে সরজমিনে অবস্থা দেখে যাবেন। ২২ মার্চ সকালে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস ঘরে যে মিটিং হল তাতে সিদ্ধান্ত হল যে কেবল তিনজন এমপিই মরিচঝাঁপিতে যাবেন। তাঁদের সঙ্গে সাহায্যকারী দু-একজন থাকতে পারেন। কিন্তু স্থানীয় কোনও রাজনৈতিক নেতা থাকবেন না। তাঁরা নেজাট হয়ে সরকারি লঞ্চে মরিচঝাঁপি যাবেন। চিফ সেক্রেটারি টেলিফোনে কথা বলে এই ব্যবস্থা করেছেন। সরকার পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে যাবেন ডিআইজি, আইবি, চব্বিশ পরগনার অ্যাডিশনাল এসপি, ডিআইবি এবং একজন ইনস্পেক্টর। সবাই সাদা পোশাকে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রসন্নভাই মেহতা, মঙ্গলদেও বিশারদ ও ডা. লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে। ২৩ মার্চ সকালে নেজাট হয়ে মরিচঝাঁপি যাওয়ার পথে ওয়ারলেসে শুনলাম যে, সংসদীয় প্রতিনিধি দল পূর্ব নির্ধারিত সরকারি ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে ক্যানিংয়ের পথে মরিচঝাঁপি রওনা হয়েছেন। সরকারি অফিসারদেরও সঙ্গে নেননি। তাঁরা ক্যানিং থেকে জনতা দলের এমপি শক্তি সরকারের পরিকল্পনা মতো 'মা বাতালা' নামে একটি লঞ্চে ক্যানিং থেকে মরিচঝাঁপি রওনা হয়েছেন। সরকারি যে সমস্ত অফিসারদের যাওয়ার কথা ছিল, তাঁরা অন্য একটি লঞ্চে সাংসদীয় দলকে অনুসরণ করেন। পথে 'মা বাতালা' লঞ্চটি থামিয়ে একজন এডিএম ও একজন অ্যাডিশনাল এসপি সংসদীয় দলকে জানিয়ে দেন যে, কোনও এমএলএ বা আর কোনও দলীয় নেতা মরিচঝাঁপিতে যাবেন না। এটাই সরকারি নির্দেশ। শেষ পর্যন্ত জনতা পার্টির নেতাদের মধ্য থেকে দুজনকে সঙ্গে নিয়ে (দোভাষীর কাজ করার জন্য) সাংসদরা মরিচঝাঁপিতে গিয়ে আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বলে এলেন। অন্যরা কুমিরমারিতে অপেক্ষা করলেন। তাঁরা সরকারি অফিসারদের সঙ্গে নেননি। রাইহরণ বাড়ে সংসদীয় কমিটির হাতে একটি স্মারকলিপি দেন। ওই স্মারকলিপির প্রাসঙ্গিক অংশ আলোচনা করেছি।

ইতিমধ্যে ৩০ মার্চের মধ্যে উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাবার যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল তা শেষ হয়ে গেছে। তবে আমরা আমাদের সূত্র মারফত যে সংবাদ পাচ্ছিলাম তাতে অনুমান করছিলাম, প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মতো মানুষ মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলে গেছেন। ভলান্টিয়ার ও নেতারাও কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত। বিশেষ করে সংসদীয় দল দ্বীপে বসতি স্থাপনের কথা বলেননি বরং ওখানে বাস করার দুরূহতার কথাই বলেছেন। পুলিশ ফায়ারিং-এর নিন্দা করলেও দ্বীপে পুলিশ নামতে না দেওয়াকে তাঁরা সমর্থন করেননি। মোট কথা, সাংসদরা আগন্তুকদের মনোবল বাড়াতে মোটেই সাহায্য করেননি। ইতিমধ্যে ১৫-১৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী একদিনের সফরে কলকাতা

ঘুরে গেলেন। তিনি উদ্বাস্তুদের ফেরত যাওয়ার বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করে গেলেন। সাংসদরা ফিরে যাওয়ার পর মরিচঝাঁপির লোকসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। ভলান্টিয়ারদেরও সংখ্যা কম হয়ে গেছে। বাইরের রাজনৈতিক নেতাদের আগমনও বেশি ছিল না। ২৮ এপ্রিল সমস্ত অবস্থাটি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে জেলাশাসক ও আমি মরিচঝাঁপি গেলাম। বাঁধের উপর ভলান্টিয়ারদের উপস্থিতি অনেক কম। লঞ্চের টহলদারি পুলিশ মাঝে মাঝে বাঁধের ধারে লঞ্চ ভিড়িয়ে বাঁধে নেমে দাঁড়াচ্ছে— মানুষজনের সঙ্গে গল্পও করছে। দু-একজন সাহস করে ভেতরের ফুটবল মাঠটি পর্যন্ত গিয়েছে। নেতা এবং অন্যদের মনোবলও যথেষ্ট কমে গেছে। প্ল্যানটেশন এলাকার তিন দিক ঘুরে দেখে এলাম।

২৯ এপ্রিল কলকাতায় ফিরে ১ মে একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হল। বর্তমান অবস্থায় যদি অকস্মাৎ অনেকগুলি জায়গায় একসঙ্গে বেশি পুলিশ নিয়ে মরিচঝাঁপিতে নেমে পড়া যায় তাহলে বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আর বেশি পুলিশ দেখলে খুব বেশি মাথাগরম যাদের, তারাও ভয় পেয়ে যাবে। তারপর যদি অনিচ্ছুক পরিবার কেউ থাকে তাদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠানো মুশকিল হবে না। নেমেই নেতাদের ও ভলান্টিয়ার বাহিনীর প্রধানদের গ্রেফতার করলে সবাই চলে যাবে বলে আমাদের সংবাদের সূত্রগুলিও আশ্বস্ত করেছিল। কাগজেপত্রে পরিকল্পনাটি পাকা করা হল। কোথায় কোথায় লঞ্চ ভিড়িয়ে নামা হবে, কোন পথে গিয়ে এক সঙ্গে মিলিত হবে, নেতাদের বাড়িগুলো কোথায় তা ম্যাপে চিহ্নিত করা হল।

৫ মে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস ঘরে মিটিঙে বিষয়টি বিস্তারিত করে বললাম। আগন্তুকদের সংখ্যা যে অনেক কমে গিয়েছে এবং তাদের মনোবল যে ভেঙে পড়েছে সে কথার উপর জোর দিলাম। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য আমরা পাঁচ জায়গায় একসঙ্গে নামতে চাই। প্রত্যেক দলে একজন ম্যাজিস্ট্রেট, একজন বন বিভাগের অফিসারও থাকবেন। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও আইজিপি এই পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও দু-একটি খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলেন। কবে নাগাদ এই 'Operation Landing' আমরা কার্যকর করতে চাই তা জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, ৯ মে ভোরবেলায় মরিচঝাঁপি দ্বীপে নামতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী সম্মতি দিলেন। শেষকালে গোপনীয়তা রক্ষার উপর তিনি সবিশেষ জোর দিলেন।

৫ মে রাত্রিতেই জেলাশাসক ও আমি মরিচঝাঁপি গেলাম। অতিরিক্ত পুলিশও আসতে শুরু করল। অভিজ্ঞ বরিষ্ঠ অফিসাররাও আসতে শুরু করলেন। অফিসারদের পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে বলা হল। কিন্তু এত পুলিশ ও অফিসারদের আনাগোনা দেখে কুমিরমারির অধিবাসীরা কিছু সন্দেহ করেছিল— সে কথা

মরিচঝাঁপিতে পৌঁছাতেও দেরি হয়নি। বাঁধের উপর অনেক মানুষের জমায়েত— কিন্তু 'মরিচঝাঁপি ছাড়ছি না, ছাড়ব না' স্লোগান আর শোনা গেল না। ৮ মে যখন প্রস্তুতি প্রায় সারা, সেই সময় বিকেলে একজন আইবি'র অফিসার এসে দেখা করলেন। তিনি বললেন, সরকার চায় না যে নেতাদের গ্রেফতার করা হোক অর্থাৎ এখন ওই অপারেশন মুলতুবি থাক। এই বার্তা নিয়ে জেলাশাসক ও আমি আলোচনা করলাম। নেতারা তো স্বেচ্ছায় যাবেই না, আর গ্রেফতারও করা যাবে না। সুতরাং তারা এমন একটা কিছু করার চেষ্টা করবে যাতে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে যায়। সুতরাং অপারেশন মুলতুবি রইল। ৯ মে সকালে কলকাতায় ফিরে শুনলাম কলকাতার একটি বাংলা কাগজে মরিচঝাঁপিতে অপারেশনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ৮ মে। তাই সম্ভবত সরকার অপারেশন মুলতুবির আদেশ দিয়েছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ জোর দিয়ে গোপনীয়তা রক্ষার সাবধান বাণী মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিস ঘরে মিটিং ডাকলেন ১১ মে দুপুরে। প্রথমেই বেশ উষ্মা প্রকাশ করলেন যে প্রশাসনে অনেক চর আছে যারা খবর বাইরে জানিয়ে দেয়। কাউকে নির্দিষ্ট করে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু সাধারণ ভাবে, বিশেষ ব্যক্তিকে চিহ্নিত না করে, এইসব ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শোনা অস্বস্তিকর। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে নয়, অন্য অনেক মন্ত্রীর মুখে, নির্দিষ্ট কোনও উদাহরণ ছাড়াই, আমলা-পুলিশের ষড়যন্ত্রের কথা অনেক শুনেছি। তারপর যখন জিজ্ঞেস করলেন যে, এরপর কী করতে চাই, তখন জানালাম যে ওই পরিকল্পনাটাই ১৪ মে কার্যকর করতে চাই। তবে নেতাদের গ্রেফতার না করলে সংঘর্ষ এড়ানো মুশকিল। আমাদের খবর অনুসারে ৯ মে সকালে যখন মরিচঝাঁপি থেকে রওনা হই তখনও নেতারা মরিচঝাঁপিতেই ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এবারও সম্মতি দিলেন। এবার আর গোপনীয়তার কথা বললেন না।

১২ মে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় যখন নেজাটের লঞ্চঘাট থেকে রওনা হচ্ছি মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্যে, তখন একটি লঞ্চ ঘাটে ভিড়ছে। দেখলাম তাতে রয়েছেন কাশীকান্ত মৈত্র সহ আরও কয়েকজন। বাকিদের ঠিক চিনতে পারলাম না। মনে একটা খটকা লাগল— এই সময় উনি কোথা থেকে ফিরছেন? এদিকে আর কোথায় যাবেন মরিচঝাঁপি ছাড়া? একটা সন্দেহ জেগে রইল মনে। ব্যাপারটা ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলাম।

মরিচঝাঁপিতে পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট সবাইকে বুঝিয়ে বলা হল। নিতান্ত আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হলে কোনও বলপ্রয়োগ হবে না। এই সময় পুলিশের এক টহলদারি লঞ্চের অফিসারের কাছে মরিচঝাঁপির চিত্তরঞ্জন ঢালি নামে এক আগন্তুক অভিযোগ জানান যে, উন্নয়নশীল সমিতির কয়েকজন নেতা ও ভলান্টিয়ার তাঁকে ও আরও

কয়েকজনকে ঘরে আটকে রেখেছিল। তাঁরা তাদের বাড়ি ঘর ভেঙে দিয়েছে, জিনিসপত্র তছনছ করেছে। তিনি কোনও রকমে পালিয়ে এসে লঞ্চ থামিয়ে খবর দিচ্ছেন। ১১ মে থেকে এই ঘটনা ঘটছে। চিত্তরঞ্জন ঢালি যাঁদের নামে অভিযোগ করেন তাঁরা হলেন অমল সরকার, অনিল সরকার, সমীর সমাদ্দার, পবিত্র বিশ্বাস, সুনীল তরফদার, নির্মল ঢালি, সুনীল হালদার, রাইহরণ বাড়ে ও অরবিন্দ মিস্ত্রি। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গোসাবা থানায় একটা মামলা রুজু করা হয়। মামলার নম্বর, Gosaba P.S. Case No. 12 dated 13.5.1979 U/S 143/342/323/379/ IPC। চিত্তরঞ্জন ঢালিকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা গেল যে, ভয় দেখিয়ে অনেককে আটকে রেখেছে— অনেকে চলে যেতে ইচ্ছুক। এও জানালেন গত ২৪ ঘণ্টা ধরে নেতাদের দেখা যাচ্ছে না। আমাদের সংবাদসূত্র অনুসারেও ১৩ তারিখ সকাল থেকে নেতাদের দেখা যায়নি।

১৩ মে আগের মতোই প্রস্তুতি নেওয়া গেল। ১৪ মে ভোর সাড়ে তিনটে থেকে তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে পাঁচটা দল মরিচঝাঁপি দ্বীপের পাঁচ জায়গায় সাড়ে চারটের মধ্যে অবতরণ করল। প্রতি দলে চারটে লঞ্চ ভর্তি ছিল পুলিশের অফিসার ও কনস্টেবল। কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই। পাঁচটা দল নির্বিঘ্নে অবতরণ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আগে গেল নেতাদের বাড়ি। আমাদের প্রত্যেকটি দলের সঙ্গে স্থানীয় লোকও ছিলেন। কিন্তু কোনও বাড়িতেই কোনও নেতাকে পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তাঁরা দুদিন আগেই দ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা আমাদের আসার পরিবর্তিত দিনটি জানতেন। ব্যাপারটি আমার কাছে একটা প্রহেলিকাই রয়ে গেছে।

ভলান্টিয়ার দলের রংলাল গোলদার ও আরও কয়েকজনের খোঁজ করা হল। তাঁদেরও পাওয়া গেল না। বেলা ৮টার সময় জেলাশাসক ও আমি মরিচঝাঁপির ফুটবল মাঠের দিকে রওনা হলাম। ঘাটে কয়েকজন ছিলেন, তার মধ্যে ছিলেন দা হাতে আস্ফালনকারী সেই মাঝবয়েসি ব্যক্তিটি। আজ তার হাতে দা ছিল না। হেসে হাতজোড় করে বললেন, 'নমস্কার, স্যার।' জিজ্ঞেস করলাম, 'দা কোথায় গেল?' সবাই হেসে উঠল। মনে হল একটু লজ্জা পেলেন। মরিচঝাঁপির ফুটবল মাঠে অনেকেই জমায়েত হয়েছিলেন। আমরা বিশেষ কিছু বলার আগে সবাই যেতে প্রস্তুত। সমস্ত অপারেশনটি গোপন রাখার জন্য আমরা আগে লঞ্চ ভাড়া করিনি। কোনও কোনও লঞ্চ মালিক ও কর্মচারীর সঙ্গে উন্নয়নশীল সমিতির যোগাযোগ ছিল বলে খবর পেতাম। ঠিক করেছিলাম ইচ্ছুক আগন্তুকদের প্রথম দিন পুলিশের লঞ্চেই পাঠিয়ে দেব। পুলিশের লঞ্চ দিয়েই শুরু করতে হল; তারপর অবশ্য দ্রুত ভাড়া করা লঞ্চ এসে গেল। ১৪ তারিখে ১১টি লঞ্চভর্তি আগন্তুকদের

পাঠানো হল। হাসনাবাদ থেকে ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল transit camp হয়ে তাদের নিজেদের পুনর্বাসন স্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সমস্ত বিষয়টি এত নির্বিঘ্নে এবং নিরুত্তাপ ভাবে মিটে যাবে তা আমরা ভাবতে পারিনি। অন্তত মুষ্টিমেয় কিছু লোকের প্রতিরোধের আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু এত অনায়াসে সবাই দ্বীপ ছেড়ে যেতে রাজি হবে তা বুঝতে পারিনি। তবে আগন্তুকদের সঙ্গে একযোগে কোনও কথা বলার সুযোগও তো আমাদের হয়নি। এক বৎসর আগে দুজন সিনিয়র অফিসার (তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি ও ডিআইজি, আইবি) কিছুক্ষণের জন্য বসতি এলাকায় এসেছিলেন। তারপর তো কাউকে আসতে দেওয়া হয়নি। প্রথম দিন অর্থাৎ ১৪ তারিখে ১১টি লঞ্চে আগন্তুকদের পাঠানো গেল। দ্বিতীয় দিনে ২২টি, তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১৬ মে ২৯টি লঞ্চে গেলেন আগন্তুকরা। ১৭ তারিখে ৯টি লঞ্চে শেষ আগন্তুক পরিবারটি মরিচঝাঁপি ছাড়ল। সর্বমোট ২২০৯টি পরিবারে ১১ (এগারো) হাজার ১৬৭ জন আগন্তুককে পাঠানো হল। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে এসেছিলেন আনুমানিক ৩০-৩২ হাজার মানুষ। হাজার দুই অবশ্য প্রথম দু-এক মাসের মধ্যেই ফিরে গিয়েছিলেন। তবে অক্টোবর-নভেম্বরে, আমাদের সংবাদ অনুসারে, বাংলাদেশ থেকে কিছু মানুষ এসেও বসবাস করেছিলেন। তারাও জানুয়ারি মাস নাগাদ চলে যান। আনুমানিক ত্রিশ হাজারের মতো আগন্তুক জানুয়ারি মাসে ছিলেন। জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে নেতাদের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ১৭ থেকে ১৮ হাজার মানুষ মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলে গেছেন।

দ্বীপে বিনা বাধায় অবতরণ করে এবং আগন্তুকদের চলে যাওয়ার জন্য আগ্রহী মনোভাব দেখে আমরা কিছুটা আত্মতুষ্টিতে ভুগছিলাম। নেতাদের কূটবুদ্ধি যে কতটা শয়তানি খেলা দেখাতে পারে তা কল্পনা করিনি। নেতারা ও ভলান্টিয়ার দলের সদস্যরা, মনে করেছিলাম, সকলেই দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেছে— ফলে দ্বীপের অন্যান্য অঞ্চলগুলো বিশেষ করে পরিত্যক্ত চালাঘরগুলোতে অনুসন্ধান করে দেখা হয়নি। ওই সমস্ত অঞ্চলে কিছু ভলান্টিয়ার-দুষ্কৃতি লুকিয়ে ছিল। সন্ধ্যার পরে মরিচঝাঁপির ফুটবল মাঠে যখন খানিকটা পরিতৃপ্তির সঙ্গে বসে আছি তখন দূরে দেখা গেল আগুন— আগন্তুকদের পরিত্যক্ত চালাগুলিতে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আগুন অবশ্য বসতির দিকে আসতে পারল না। এদিকে ক্যাম্পের এক কনস্টেবল জ্বলন্ত হ্যারিকেনে টিন থেকে কেরোসিন ঢালতে গিয়ে ছোটখাট অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে বসল। সে নিজেই পুড়ল তাতে। তাকে সত্বর লঞ্চে করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কয়েকটি পরিত্যক্ত ঘর পুড়ল— কিন্তু দুষ্কৃতিদের ঘটানো অগ্নিকাণ্ডে কারও ক্ষতি হয়নি। যে ঘরগুলোতে মানুষ আছে তার চারদিকে রাত্রিতে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হল। পরেও আর একদিন কয়েকটা পরিত্যক্ত

বাড়িতে আগুন দিয়েছিল রাত্রির অন্ধকারে। কিন্তু বসবাসের ঘরগুলোকে পাহারার ব্যবস্থা ছিল বলে সেগুলো নিরাপদ ছিল। এই পরিত্যক্ত বাড়িতে আগুন লাগানোকেই পরে ওই দুষ্কৃতি ও তাদের নেতারা প্রচার করেছে যে ঘরে আগুন দিয়ে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের তাড়ানো হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য তিনটি ফৌজদারি মামলা করা হয়েছিল। (Gosaba P.S. Case 14 dated 16.5.79 15 dt. 16.5.79 and 16 dt. 16.5.79, all U/S 436 & 435 IPC)। এই মামলাগুলোতে আসামী ছিল চার জন, দুজন ভলান্টিয়ার দলের লোক, নাম অমল সরকার ও সুকুমার মণ্ডল এবং দুজন কুমিরমারির, নাম শত্রুঘ্ন মিস্ত্রি ও জীতেন মণ্ডল। আগন্তুকরাই আগুন লাগিয়ে পালাবার সময় এদের শনাক্ত করেছিল।

মরিচঝাঁপির আগন্তুকরা ফিরে গেলেন। তাদের ফেরাতে গিয়ে কোনও সংঘর্ষ হল না, কোনও ভাবেই বলপ্রয়োগ করতে হল না। শেষ লঞ্চটি চলে যাওয়ার পর বন বিভাগের এক অফিসারের হাতে দ্বীপের ভার দিয়ে কলকাতায় রওনা হলাম। নেতাদের সম্পর্কে পরে আর বিশেষ মাথা ঘামাইনি— কারণ তাঁদের দ্বীপ থেকে চলে যাওয়াটা যে উঁচু মহলের যোগসাজসে ঘটেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বেশ কিছুদিন পরে সতীশ মণ্ডল মধ্যপ্রদেশে তাঁর বিস্তৃত ব্যাবসায়ের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। রাইহরণ আরও কয়েকজন সহ বাংলাদেশে চলে যান; সেখানে কয়েক বছর বাস করে ভারতে ফিরেছিলেন। রংলাল গোলদার বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করার পর ক্যানিং অঞ্চলে বাস করছিলেন। এঁরা কেউই সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন না।

কলকাতায় ফিরলাম ১৭ মে বিকেলে; জেলাশাসক আগেই ফিরেছিলেন। সংবাদমাধ্যম ও সমর্থক রাজনৈতিক দল নানা ধরনের সমালোচনা ও গল্প তৈরি করছে। সরকার সব ঘটনা জানিয়েছে; তবুও পরিকল্পনাটি গোপন ছিল বলে এবং তাঁরা বাধা সৃষ্টি করতে পারেননি বলেই বোধ হয় যত ক্ষোভ। ক্রমে ক্রমে আমার মনেও মরিচঝাঁপি দ্বীপের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এল। শুধু একটি দৃশ্য আজও ভুলিনি। ১৫ মে আগন্তুকরা লঞ্চে উঠছেন; তার পাশেই এক দঙ্গল বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরী কুরানখালির ঘোলাজলে জল ছিটিয়ে স্নান করছিল। তাদের কলরবে ছিল অনাবিল আনন্দের উল্লাস। এরা তো জল-জঙ্গলের দেশে জন্মায়নি, এরা জন্মেছে পাহাড়-পাথরের রুক্ষ দেশে। তাহলে এই কাদাজলে অবগাহন করে এরা এত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে কী করে? কোথায় কী একটা অদৃশ্য নাড়ির টান আছে, তাই— one last time— শেষবারের মতো জলের, মাটির স্পর্শ নিয়ে নিচ্ছে? ১৬ তারিখেও এই দৃশ্য দেখলাম। ১৭ তারিখে কাউকে দেখা গেল না, বুকের

ভিতর একটা শূন্যতা অনুভব করলাম। প্রৌঢ় বয়সের স্মৃতিতে মরিচঝাঁপির অনেক দৃশ্য ম্লান হয়ে এসেছে; কিন্তু এই স্নানের দৃশ্যটি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

৪

আগন্তুকদের বিনা প্রতিবাদে চলে যাওয়ার বিষয়টা সমর্থক দল ও সংবাদমাধ্যমের অনেকেই বিশ্বাস করতে অথবা মেনে নিতে চাইছিলেন না, কারণ তাঁরা জানতেন না এবং খোঁজ করারও চেষ্টা করেননি যে, মরিচঝাঁপির অর্ধেক আগন্তুক মার্চ মাসের মধ্যেই মরিচঝাঁপি থেকে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা নেতা ও ভলান্টিয়ার বাহিনীর ভীতিপ্রদর্শন মারধোর ইত্যাদির কথাও জানতেন না, কিংবা জেনেও বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা কিছু নেতার অসত্য বিবৃতিতেই বিশ্বাস করেছেন। তাই ২৫ মে, ১৯৭৯, 'কালান্তর' লিখছে, ৮ মে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, '৭ মে পুলিশ মরিচঝাঁপিতে ল্যান্ড করেছে।' এত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ৭-১৬ মে-র মধ্যে 'বুঝিয়ে পাঠানোর' ব্যাপারটা সন্দেহের সৃষ্টি না করে পারে না। মন্ত্রীমহোদয়গণ যাই বলুন আমরা মরিচঝাঁপির ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই।' এই অপারেশনের মন্ত্রগুপ্তিতেই রাজনৈতিক দল ও সংবাদ মাধ্যমগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কালান্তরের ২৫ মে রিপোর্টে আছে, 'টিয়ার গ্যাসের সেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রায় মরিয়া হয়ে ৪০টি লঞ্চ থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নেমেছিল। নেমেই প্রচণ্ড লাঠি চার্জ করে। ১৩ মে রাত্রে হঠাৎ আগুন লাগানো হল।' তারপর যে সমস্ত গল্প লেখা হয়েছে তা বানাতে শয়তানের কল্পনা লাগে। ইস্কুলে আগুন দিয়ে বাচ্চাদের স্কুল থেকে বার করে এনে লঞ্চে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফুটবল খেলার আয়োজন করে সাঁড়াশির মতো ঘিরে ফেলে লঞ্চে তুলে ফেলা হল। 'কালান্তর' আরও লিখল, 'রাতের অন্ধকারে এল প্রায় হাজার খানেক পুলিশ আর সাদা পোশাকের লোক।' ২৫ মে-র এই সাদা পোশাকের লোক কয়েকদিন পরে ক্যাডারে পরিণত হল। অমিত সর্বাধিকারী, 'কালান্তরে'ই এ বিষয়ে লিখলেন, 'পুলিশের সহযোগী ছিল উঠতি ক্যাডাররা— এ অভিযোগ বসিরহাটের বুদ্ধিজীবীদের অনেকের।' এই আগুন লাগানো ও ক্যাডারের গল্প এখনও প্রচলিত। অথচ দুটোই অবিমিশ্র অসত্য অভিযোগ।

রস মল্লিক-এর হাতে ঘটনাটি, অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৭ মে তারিখে আগন্তুকদের মরিচঝাঁপি ত্যাগের ঘটনাটি কী রূপ নিয়েছে তা দেখা যেতে পারে। মল্লিক তাঁর বইয়ে লিখছেন: "The State Government ordered forcible evacuation of the refugees which took place from 14th to 16th of May, 1979. One senior IAS officer reported that Muslim gangs were hired by the government

to assist the police, as it was thought Muslims would be less sympathetic to the refugees. Several hundred men, women and children were believed to have been killed by the police in the operation and their bodies dumped in the river to be washed out by the tide. Photographs were published in the Anandabazar Patrika and the opposition leaders in the State Assembly staged a walkout in protest.' (P-101)

ওই আইএএস অফিসারটির নাম নেই; তিনি কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারও উল্লেখ নেই। তবে মুসলমান গ্যাং অর্থাৎ সমাজবিরোধী মুসলমানদের সাহায্যে উদ্বাস্তুদের বিতাড়িত তথা হত্যা করার কল্পনাটি অভিনবত্বের দাবি করতে পারে; যদিও এতে মল্লিক-এর বাস্তবতা ও ইতিহাসবোধের ছিটেফোঁটাও নেই। তাঁর জানা উচিত যে আগন্তুকরা যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায় ও মুসলমানদের মধ্যে সখ্য নিবিড় এবং শতাব্দী প্রাচীন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে স্বদেশি আন্দোলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সেই সখ্য দৃঢ় হয়েছে। ওই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ হিসাবে মল্লিকের এ-বিষয় জানার কথা। তিনি হঠাৎ সাম্প্রদায়িকতা কেন আমদানি করলেন তা বোঝা গেল না। তিনি অবলীলাক্রমে লিখতে পারেন যে, কয়েক শত নারী-শিশু-পুরুষকে মেরে পুলিশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কী তথ্যের উপর নির্ভর করে তিনি একথা বলছেন? সম্ভবত ওই আইএএস অফিসার, সম্ভবত অন্য কেউ। পাঠকদের তা জানার কোনও উপায় নেই। তবে তিনি বলেছেন যে, আনন্দবাজারে নদীতে ভাসমান মৃতদেহের ছবি ছাপা হয়েছিল। কোন তারিখের আনন্দবাজারে? তা তিনি বলেননি। ওই সময় আমরা আনন্দবাজারে মরিচঝাঁপির নদীতে কোনও ভাসমান মৃতদেহের ছবি দেখিনি। তবে মল্লিক তথ্যসূত্র জানাবার জন্য রেফারেন্স নম্বর হিসাবে '৫৪' সংখ্যাটি দিয়েছেন বাক্যের শেষে। সূত্র নির্দেশে ওই ৫৪ নম্বরে কী আছে? আছে "Amrita Bazar Patrika, Feb 8, 1979". মে মাসের খবর ফেব্রুয়ারি মাসের সংবাদপত্রে প্রকাশ হবে কী করে? তাও আবার আনন্দবাজার নয়, অমৃতবাজার পত্রিকা! এই হচ্ছে রস মল্লিক-এর গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা। বস্তুতপক্ষে মল্লিক-এর মরিচঝাঁপির উপর প্রবন্ধ এবং তাঁর বইয়ের অন্তর্ভুক্ত রচনাটি নির্ভেজাল অসত্যভাষণ ছাড়া কিছুই নয়।

'মরিচঝাঁপির কান্না' নামক বইটির লেখকের, আগেই দেখেছি, ভৌগোলিক জ্ঞানের ও বাস্তবতাবোধের অভাবে রচনার বিশ্বাসযোগ্যতা কম। এই বইতে 'নদীয়া দর্পণ' নামে স্থানীয় এক কাগজে ২০ মে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১৪ মে দুপুরে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের সাড়ে আট হাজার বাড়িতে আগুন ধরায় পুলিশ আর দৈনিক মজুরির সিপিএম ক্যাডাররা।' সিপিএম ক্যাডাররা নাকি আগেই

মরিচঝাঁপিতে নেমে স্থানীয় লোককে স্থানীয় লোক হিসাবে পরিচয় দিয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।' তারপর লেখা হয়েছে, '১২ মে কাশীবাবু কুমীরমারি ঘুরে যাওয়ার পর ১৪ মে দুপরে ওইসব লোকেরা এবং পুলিশ ওদের রান্নাবান্না করতে ও খেতে বলে। সেই মতো উদ্বাস্তুরা রান্না শুরু করে, কেউ কেউ খেতে বসে। এমন সময় উদ্বাস্তুদের ঘরগুলিতে নির্মমভাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।' আমার প্রশ্ন উদ্বাস্তুরা ছিল তো মরিচঝাঁপিতে, কুমিরমারিতে নয়। কাশীকান্তবাবু কী তাহলে মরিচঝাঁপিতে গিয়েছিলেন? ওইদিন সন্ধ্যায় তাকে আমি নেজাটে দেখেছি। ১৪ তারিখে লেখকের বর্ণিত ঘটনার সময় নেতারা কোথায় ছিলেন সে প্রশ্ন লেখক তোলেননি। এখানে 'মেয়েরা খাওয়ার সময় ঘরে আগুন' দেওয়া হয়েছে; এর আগে উনিই লিখেছেন 'ছেলেরা স্কুলে পড়ার সময়' ঘরে আগুন দিয়ে তাদের বের করে আনা হয়েছে। এরকম প্রতিবেদনের মধ্যে শুধু সাংবাদিকের স্বাধীনতার ঘোরতর অপব্যবহারই নয়, মানসিক বিকৃতিরও পরিচয় পাওয়া যায়।

কমলা বসুর একটা চিঠির (দ্রষ্টব্য 'মরিচঝাঁপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে') কয়েকটি বক্তব্যের উপর আগে মন্তব্য করেছি। মরিচঝাঁপি থেকে আগন্তুকরা চলে যাওয়ার ঘটনায় তার বক্তব্য এইরূপ: 'সময়টা সম্ভবত ১৯৭৯ সালের মে মাস হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও আদেশ অনুসারে কয়েকশো, হাজারও হতে পারে, পুলিশ মরিচঝাঁপির লোকেদের লাঠি দিয়ে, ডাণ্ডা দিয়ে মেরে আধমরা করে ওদের তৈরি সব ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে, জ্বালিয়ে দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দেয়। লাইব্রেরি ঘরে অথবা স্কুল ঘরে সুভাষচন্দ্রের একটি চমৎকার বড় ছবি টাঙানো ছিল— পুলিশেরা সেটি লাথি মেরে নীচে ফেলে দিয়েছিল।' এটিও তার লোক মুখে শোনা। যেদিন পুলিশ এরকম অত্যাচার করেছিল সেদিন কমলা বসু তাদের পাশে থাকতে পারেননি বলে দুঃখ করেছেন; কিন্তু যাঁরা ওঁদের মরিচঝাঁপিতে নানা আশ্বাস দিয়ে এনেছিলেন, যে 'সতীশবাবু ও অন্যদের সঙ্গে নানা রকম আলোচনা ও প্ল্যান' করেছিলেন কমলা বসু, তাঁরাও কেউ ওই সময় ওখানে কেন ছিলেন না সে প্রশ্ন তিনি করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। মরিচঝাঁপির ঘটনার দু-দশকের বেশি পরে এই চিঠি লেখার সময় কমলা বসু জানতেন যে, নেতারা যাঁদের আশ্বাস দিয়ে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে এনেছিলেন তাঁদের ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই নেতাদের স্বার্থপরতা ও অবিমৃষ্যকারিতাকে আড়াল করার জন্যই মরিচঝাঁপির ব্যর্থতার দায় পুলিশের কল্পিত অত্যাচারের উপর চাপাতে হচ্ছে। কমলা বসু তাই করেছেন, রস মল্লিক তাই massacre বলে বর্ণনা করেছেন, যদিও সেই massacre-এ কোনও নেতা মারা যাননি। অন্যরাও তাই করেছেন বা করে চলেছেন।

নেতাজির ছবি প্রসঙ্গে বলি, মরিচঝাঁপিতে ওই কদিন পুলিশের সঙ্গে কারও সামান্যতম বিসম্বাদ বা সংঘর্ষ হয়নি। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় পুলিশ দেওয়ালে টাঙানো ছবি লাথি মেরে ফেলবে কেন? শুধু উনি নন, পুলিশও নেতাজিকে শ্রদ্ধা করে। অভিযোগটি করেছেন রং ফলানো শোনা কথার উপর নির্ভর করে।

কমলা বসু মরিচঝাঁপি কেমন দেখেছিলেন? তিনি লিখছেন, 'সেখানে দারিদ্র্যের যে চেহারা দেখলাম (শুধু একটা বাড়িতে নয় সারাটা গ্রামেই) তা এদিককার দীনতম লোকের কাছেও অকল্পনীয়। নদীর উপর এই ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কতগুলি দ্বীপ। ইলেকট্রিক নেই, স্কুল নেই, ডাক্তারখানা নেই, বাইরে থেকে কেউ নিয়ে না গেলে একটা ট্রানজিস্টারও নেই। কিন্তু ইহা বাহ্য— দারিদ্র্যের চেহারা তারপরেও যে কী হতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, চোখে দেখলে শিউরে উঠতে হয়।'

ঠিক এরপরেই একই চিঠিতে তিনি লিখছেন: 'একটা জনহীন অরণ্যসঙ্কুল দ্বীপকে শুধু ওদের দুটি হাত দিয়ে ওরা যে ছবির মতো কী সুন্দর একটি গ্রাম তৈরি করেছে তাই দেখে আমরা তো হতবাক্। ভাবা যায় না, ওদের ইঞ্জিনিয়ার নেই, আর্কিটেক্ট নেই, সিমেন্ট বালির তো প্রশ্নই নেই, তবু যে কেউ মুগ্ধ হবে ওই ছবির মতো সুন্দর গ্রামটি দেখে— সত্যিই মানুষের ইচ্ছাশক্তি যে কী করতে পারে এটা একটা দেখবার মতো জিনিস। স্কুল, খেলার মাঠ, লাইব্রেরী, কী নেই। গ্রামের মেঠো রাস্তা, কিন্তু এতটুকু অপরিচ্ছন্নতা নেই কোথাও। আর আছে সবারই একটি করে বাড়ি, বাড়ি মানে একটি বা দুটি ছোট ছোট মাটির ঘর।'

লেখিকার একই জায়গার পরপর দুটো বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য, পরস্পরবিরোধিতা নিয়ে মন্তব্য বাহুল্য মাত্র। অলমতিবিস্তরেন।

মরিচঝাঁপি কাণ্ডে কুমিরমারিতে পুলিশ একবারই গুলি চালিয়েছিল— তাতে দুজন কুমিরমারির অধিবাসী মারা গিয়েছিলেন। মরিচঝাঁপি থেকে পুলিশের বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেই আগন্তুকরা স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিল। ১৪ মে-র আগে এক বৎসর পুলিশ মরিচঝাঁপি দ্বীপে নামতে পারেনি। তা সত্ত্বেও পুলিশ অত্যাচারের কল্পিত কাহিনি কীভাবে তৈরি হয়েছে তা দেখেছি। পুলিশের 'অত্যাচার কাহিনি'কে সাফাই হিসাবে সামনে না রাখলে অনেক প্রশ্ন উঠবে। অদূরদর্শী নেতারা এতগুলি মানুষকে কেন মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এই অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন, কেন লাঠির জোরে তাদের আটকে রেখেছিলেন, শেষে কাপুরুষের মতো সবাইকে ছেড়ে কেন পালিয়ে গিয়েছিলেন— পুলিশের অত্যাচারের গল্প প্রধান হয়ে উঠলে এই সমস্ত প্রশ্ন চাপা পড়ে যাবে। মরিচঝাঁপি তো প্রকৃতপক্ষে একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ও ব্যর্থ রাজনৈতিক উচ্চাশার কাহিনি। আরও অনেক বড় মিথ্যা দিয়ে সেই কলঙ্ককে ঢাকার চেষ্টা হয়েছে।

'মরিচঝাঁপি অঞ্চলে বহু লড়াই করে জমিদার-জোতদারদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমিতে অগণিত ছোট চাষি কৃষিকর্মে নিরত ছিলেন' বলে জানিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুরা এসেছিল সেই চাষিদের উৎখাত করে জবরদস্তি নিজেদের ঠাঁই গড়তে। তাদের এনেছিলেন কতিপয় বুদ্ধিজীবী, যাঁরা মার্কিন কনস্যুলেটে গিয়ে খানাপিনা করেন।

একদা নিশীথকালে

অশোক মিত্র

তিন দশক অনেকটা সময়, সেই দীর্ঘ কালবিস্তার বামফ্রন্ট সরকার অতিক্রম করে এল। হয়তো ভুল বললাম। বামফ্রন্ট সরকার সম্ভাষণের মধ্যে যে অখণ্ড অবয়বের ইঙ্গিত তা হয়তো এখন আর নিটোল নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিয়ম মেনেই হয়তো-বা সরকারের প্রকৃতিও ঈষৎ পালটায়, বামফ্রন্ট সরকারেরও পালটেছে। তা নিয়ে বিলাপ করবার মতো সৌখিনতা বিশ্বায়নের ঋতুতে শোভা পায় না।

তবে স্মৃতিকে তো রুখে দেওয়া সম্ভব নয়। তেমনই একটি স্মৃতি হঠাৎ মানসপটে ভেসে উঠল।

সমাজে বুদ্ধিজীবী বলে একটি বিশেষ শ্রেণিনির্দেশ আছে; থাকা উচিত ছিল না, কিন্তু তাহলেও আছে। একজাতের মানুষ যাঁরা বুদ্ধির বড়াই করেন, মাটিতে পা ঠুকে সমাজের অন্য সবাইকার দিকে চোখ রাঙিয়ে বলেন: আমরা বুদ্ধিজীবী, তোমাদের চেয়ে আমরা স্বতন্ত্র, আমাদের সঙ্গে সামলে-সুমলে কথা বলবে, আচরণ করবে, নইলে বুদ্ধির আগুনে তোমাদের ভস্ম করে দেব। এবং এ এক আশ্চর্য

হীনম্মন্যতাবোধ, সমাজস্থ অন্য সবাই এই দম্ভ-ঠাসা মানুষগুলির আস্ফালন মেনে নেয়। সে-সব তাজ্জব ঘটনা দেখে আরও কারও-কারও শখের পাখা গজায়: কী মজা, কী মজা, আমিও না হয় বুদ্ধিজীবী বনে যাই, আমার এলেম হয়তো হাড়ুডু খেলায় কিংবা এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় বে-পাড়ায়, বেপরোয়া সাইকেল চালানোয়, কিন্তু অতশত কে আর ভাববে, বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় একবার যদি কায়দা করে কোনও ক্রমে নিজের নামটি সেঁধিয়ে দিতে পারি, এখন থেকে তাহলে আমাকে আর পায় কে, আমাকেও সমাজস্থ অন্য সবাই সেলাম ঠুকবে; আমি হয়তো স্রেফ মস্ত বড়ো রেসুড়ে, তাতে কী, আমিও বুদ্ধিজীবী।

স্মৃতি উথলে আসে। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের পয়লা বছর তখনও ফুরোয়নি। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ। জলন্ধরে পার্টি কংগ্রেস। অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে একদঙ্গল মন্ত্রীও পার্টি কংগ্রেসে যোগ দিতে জলন্ধর গিয়েছেন। মহাকরণ প্রায় ফাঁকা। মাত্র একজন-দুজন মন্ত্রী কলকাতায় থেকে গিয়ে প্রশাসনের ঠাট বজায় রাখছেন।

সেই সপ্তাহের সুযোগ নিতে কতিপয় বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে একদঙ্গল লোক মাঠে নেমে পড়লেন। দণ্ডকারণ্যের দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পেতে একশো-দুশো শরণার্থী ফিরে আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে জড়ো করিয়ে এসব বুদ্ধিজীবীরা ক্ষেপানোর খেলায় মেতে উঠলেন। অতি বাঘা বুদ্ধিজীবী এঁরা, শিল্পের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, সৃষ্টির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, ভিয়েতনামের স্বাধীনতাকামী লড়াকু মানুষদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবার মার্কিনি স্বাধীনতায় তাঁরা বিশ্বাস করেন। যখন পশ্চিমবাংলার সমগ্র জনগণ 'তোমার নাম, আমার নাম, ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম' মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তখন এসব বুদ্ধিজীবীরা মার্কিন কনস্যুলেটে গিয়ে খানাপিনা করছেন, মার্কিন স্বৈরাচারের সপক্ষে ডাঁট হয়ে বসে প্রবন্ধ রচনা করছেন। তখনও পর্যন্ত তাঁদের ধারণা ছিল পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী অভ্যুত্থান একটি সাময়িক উলটো ব্যাপার; বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে নির্বাচনে জিতে বামফ্রন্ট যে সরকার গঠন করেছে তা বেশি দিন টিকবার নয়, কোনও উপলক্ষ্য ঘটিয়ে তাকে কাত করে দেওয়া যাবে। এবং সেই সরকার কাত হলে নিশ্চিন্ত মনে ফের মার্কিন কনস্যুলেটের খানাপিনায় মগ্ন হওয়া যাবে। শুধু একটি উপলক্ষ্য চাই, যাকে অবলম্বন করে বামফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় ফেলে কুপোকাত করা যায়।

তাঁরা ভাবলেন, এই যে দণ্ডকারণ্য থেকে কিছু-কিছু শরণার্থী ফিরে আসছেন, তাঁদের কেন্দ্র করেই ষড়যন্ত্রের মহড়া শুরু হয়ে যাক। সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় মরিচঝাঁপি অঞ্চল, সেখানে বহু আন্দোলন লড়াই করে জমিদার-জোতদারদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমিতে অগণিত ছোট চাষি কৃষিকর্মে নিরত আছেন, দিনভর,

ঋতুভর, বছরভর পরিশ্রম করে জীবিকা অনুসন্ধান তাঁদের। বুদ্ধিজীবীরা দাবি তুললেন, এই হতচ্ছাড়া চাষিদের জমিতে দণ্ডকারণ্য-ফেরত শরণার্থীদের সংসার পাততে দিতে হবে, চাষিদের তাড়িয়ে দিয়ে মরিচঝাঁপিতে দণ্ডকারণ্য থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের বসাতে হবে; সরকার যদি অবিলম্বে এই দাবি মেনে না নেন তাহলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হবে।

মহাকরণ ফাঁকা। মুখ্যমন্ত্রীসহ অধিকাংশ নেতাই জলন্ধরে। বুদ্ধিজীবী-চূড়ামণিরা এই সপ্তাহটি তাই বেছে নিলেন মরিচঝাঁপি অভিযানের জন্য। তাঁরা মনস্থ করলেন রাতের অন্ধকারে তিনশো-চারশো মানুষ জড়ো করে তাঁরা অভিযানে এগোবেন, মরিচঝাঁপিতে ঢুকে পড়ে চাষিদের উৎখাত করে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করবেন, দেখা যাক, বামফ্রন্ট সরকারের কত বুকের পাটা তাঁদের রুখে দেয়।

সংকট। মাত্র একজন-দুজন মন্ত্রী কলকাতায় বসে প্রশাসন সামলাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা মাথা ঠিক রাখছেন। পুলিশের তরফ থেকে অহরহ মন্ত্রীদের নানা ভয়-ভরা কাহিনি শোনানো হচ্ছে। যে-কোনও মুহূর্তে মরিচঝাঁপিতে আক্রমণ শুরু হবে। আপনারা যথাশীঘ্র আমাদের নির্দেশ দিন যাতে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাঁদের প্রতিহত করতে ধরাচূড়া পরে কামান-বন্দুক নিয়ে নামতে পারি।

একজন-দু'জন মন্ত্রী যাঁরা কলকাতায় আছেন, তাঁরা জলন্ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, পরিস্থিতির উপর তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ, কিন্তু তাঁরা আদৌ ঘাবড়াচ্ছেন না, পুলিশ কর্তারা তাঁদের যতবার ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁরা অচঞ্চল থাকছেন।

একদা নিশীথকালে ঘটনা চরমে পৌঁছোল। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশকর্তা কলকাতায়-থেকে-যাওয়া এক মন্ত্রীকে ফোন করে ঘুম থেকে তুললেন। সংবাদ নাকি গুরুতর, মরিচঝাঁপি হাজারখানেক মারমুখী মানুষ আক্রমণ করতে উদ্যত। মাঝখানে একটি খালের ব্যবধান, সেই খাল পেরিয়ে এলেই তারা মরিচঝাঁপিতে ঢুকে পড়বে, ক্ষুদ্র কৃষকদের জমি আর রক্ষা করা যাবে না। যারা এগোচ্ছে, তাদের খুব জঙ্গি চেহারা, যে-কোনও মুহূর্তে তারা খাল পেরিয়ে পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পুলিশকর্তা মন্ত্রীকে টেলিফোনে অভিমত ব্যক্ত করলেন, আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে গেলে গুলি না চালিয়ে উপায় নেই, মন্ত্রীকে গুলি চালানোর অনুমতি দিতে হবে; সময় একেবারেই নেই, এই মুহূর্তেই সেই অনুমতি দিতে হবে।

মন্ত্রীমশাই উত্তাপহীন। তিনি জানালেন, অবস্থা যদি এতটাই সঙ্গিন হয়ে থাকে, তাহলেও বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সরকার, যাঁরা ভুল বুঝে অপরের জমি দখল করতে এগিয়ে আসেন, তাঁরাও সাদামাটা, গেরস্থ মানুষ, আপাতত গৃহহীন তাঁরাও

সর্বহারা দলেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তাঁদের রক্তাক্ত করে বামফ্রন্ট সরকার নিজেকে কলঙ্কিত করবে না। রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তাকে মন্ত্রীমশাই স্পষ্ট ভাষায় বললেন: যদি একান্তই গুলি চালানো আপনার বিবেচনাপ্রসূত হয়, তাহলে আপনাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, গুলি হয় আকাশের দিকে নয়তো খালের জল লক্ষ্য করে চালাবেন, কাউকে জখম করবার বা প্রাণে মারবার প্রয়োজন নেই, শূন্যে কিংবা জলে গুলি চালানো হলে তা দেখামাত্র অগ্রসরমান জনতা পিছু হটবে। মন্ত্রী পুলিশকর্তাকে জানালেন, যদি তিনি অঙ্গীকার করেন ঠিক এমনধারা গুলি চালাবেন, যাতে একজনও হতাহত না হয়, তাহলেই তিনি গুলি চালানোর অনুমতি পাবেন, অন্যথা নয়। পুলিশের বড়কর্তা নাছোড়বান্দা, না, তাঁর পক্ষে এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়, পুলিশ গুলি চালালে একজনও হতাহত হবেন না এমন গ্যারান্টি তিনি দিতে পারবেন না। মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তাহলে আপনাকে গুলি চালানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা হতাশ হয়ে ফোন ছেড়ে দিলেন।

নিশীথ প্রভাত হল। সাতসকালেই খবর পৌঁছোল মরিচঝাঁপিতে ব্যাপারটি বেশি দূর গড়ায়নি। পুলিশ বাড়াবাড়ি করছে না দেখে খালের ওপারে থাকা জনতা একটু থমকে গেল, কিছু চেঁচামেচি হল, কিছু শ্লোগান বর্ষণ, কিন্তু কেউই খাল পেরিয়ে এদিকে এগোলো না। মরিচঝাঁপি আন্দোলন আপাতত স্তিমিত হয়ে এল। দিন দশ-বারো বাদে দূরবর্তী কোথাও কোনও রেলস্টেশনে পুলিশের সঙ্গে দলছুট কিছু শরণার্থীর একটি সংঘর্ষ হয়েছিল, কিন্তু মরিচঝাঁপি কেন্দ্র করে আন্দোলন সেই রাত্রির পরই গুটিয়ে গেল। পরের বছর আরেক দফা চেষ্টা চালানো হয়, কিন্তু তা-ও তেমন জোরালো হতে পারেনি।

দাপুটে বুদ্ধিজীবীরা একটু মিইয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ সান্ত্বনা খোঁজবার জন্য মার্কিন মুলুকে প্রস্থান করলেন।

বামফ্রন্টের ঋতু তিরিশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই উপলক্ষ্যে প্রথম বছরের এই বিশেষ স্মৃতিটুকু ঘুরে-ফিরে মনের পর্দায় ধাক্কা মারে। কিছু উৎকণ্ঠার স্মৃতি, কিছু দৃঢ়তার স্মৃতি, কিছু স্বস্তির নিঃশ্বাসের স্মৃতি।

তবে কিছু কিছু কাহিনি ফুরিয়েও ফুরোয় না। যে তাবড়-তাবড় বুদ্ধিজীবীরা তিরিশ বছর আগে বামফ্রন্ট সরকারকে নিধন করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন, তাঁদের কী করে যেন হঠাৎ হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁদেরই এখন মহাকরণের আশেপাশে ঘন ঘন হাজিরা দিতে দেখা যায়। অমুক মন্ত্রী, তমুক মন্ত্রীর জন্মদিনে পুষ্পস্তবক নিয়ে তাঁরা মহাকরণের দুয়ারে সদা সু-উপস্থিত। কী জানি তাঁরা হয়তো ভেবে বসেছেন বামফ্রন্ট সরকারেরই হৃদয় পরিবর্তন ঘটেছে।

সৃষ্টির একুশ শতক, ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মে-জুন ২০০৭

দণ্ডক ওঁদের জায়গা নয়, ওঁরা থাকছেন মাত্র। বাংলার মাটিজলে গঠিত ওঁদের শিরায় শিরায় স্বদেশের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বয়ে যায় এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের শিরায়। ওঁরা বিশ্বাস করেন স্বদেশ একদিন ফিরে পাবেনই। তাই বার বার ধ্বনি ওঠে 'চলো বাংলা'— '৬৫, '৭১, '৭৫-এ। ওঁরা আসেন, ফিরে যেতে বাধ্য হন, অনেকে হারিয়ে যান। দণ্ডকের শরণার্থীদের এটাই যেন ভবিতব্য।

আর বাংলায় যামু না!

মৃদুল দাশগুপ্ত

১৯৭৮-৭৯-তে বহু সংখ্যক বাঙালি উদ্বাস্তু পাড়ি দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। দণ্ডকে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু আওয়াজ তুলেছিলেন 'চল সুন্দরবন'। 'চল সুন্দরবন' আওয়াজটি কিন্তু নতুন নয়, আর এ আওয়াজের বাস্তব ভিত্তি দুটি— দণ্ডকে কৃষির অযোগ্য জমি ও সেচের জলের অভাব।

শুধু ১৯৭৮-ই নয়, 'চল সুন্দরবন' শ্লোগান দণ্ডকের অরণ্যে, পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তারও আগে বহুবার। ১৯৭৮-এ এই পশ্চিমবঙ্গ ফেরার আহ্বানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যিনি, সেই উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডলের মুখে সে সব আন্দোলনের ঘটনার কথা শুনেছি। তাঁর মানার ছিটেবেড়ার বাড়িতে বসে।

কথা বলেছি আরও অনেকের সঙ্গে, সকলেই বলেছেন তাঁরা একদিন বাংলায় ফিরতে পারবেন এমন ধারণা নিয়েই এসেছিলেন দণ্ডকে। তিন দশক সময়কালে বাংলা থেকে বহু দূর কোনও কৃষক পিতা তাঁর দুরন্ত বালকপুত্রকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন বাংলার সুজলা সুফলা জমির, দাদু শুনিয়েছেন পদ্মাপারের গল্প, মা তাঁর শিশুপুত্রকে ঘুম পাড়িয়েছেন ওই একই গল্পের গানে। এসব করেছেন একটাই কারণে 'ঘরে ফেরার টান'।

দণ্ডক থেকে সেই ১৯৬৫ সালে দলবেঁধে উদ্বাস্তুদের অনেকে চলে গেছেন অন্য কোথাও। কোথায়? প্রশ্নে হালকা হেসে মানা-র ডিডিএ-র এক পদস্থ অফিসার বলেছেন, অবশ্যই পশ্চিমবাংলায়। রৌরকেল্লা, জামসেদপুরে কুলি খাটতেও চলে গেছে কেউ কেউ, পরে অনেকেই ফিরেছেন, কেউ কেউ ফেরেননি, আমরা তাঁদের খবর রাখি না।

১৯৭১-এ দণ্ডকে আওয়াজ ওঠে 'চল জয় বাংলা'। কয়েকশো পরিবার চলে যান কলকাতার দিকে। ফিরে আসেন অনেকে, কেউ কেউ ফেরেননি। কোথায় গেলেন তাঁরা? অরণ্যে হাওয়ার ঝিরি ঝিরি হাসি, পাথর কথা বলে না।

উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতা সতীশ মণ্ডল বলেছেন, তিনি বাংলাদেশে চলে গেছেন এমন কয়েকজনের কাছ থেকে চিঠিপত্র পেয়েছেন; তিনি জানালেন, তাঁরা ওদেশে সুখে নেই কিন্তু এদেশে কোনও মতেই আসতে রাজি নন।

১৯৭৪ সালে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতৃত্বে ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুরা আন্দোলন করেন। দাবিগুলি ছিল:

১) বাংলায় (পঃ বঙ্গে) পুনর্বাসন অথবা এখানে (দণ্ডকারণ্যে) শিল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন।

২) পুনর্বাসন দেওয়ার তিন বছর কাল পর্যন্ত ডোল রেশন দিতে হবে।

৩) ডোল রেশনের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

৪) সামরিক প্রশাসকের বদলে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চাই।

৫) পুনর্বাসন দেওয়ার আগে জমি দেখাতে হবে।

১৯৭৪-এর ২৩ জানুয়ারি তারিখে শুরু হয় এসব দাবির ভিত্তিতে ১০১ দিনের রিলে-অনশন। অংশ নেন মানা, মানাভাটা, বড়োদা, নওগাঁও, কুরুদ ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা।

এই আন্দোলনের কারণে মানা ও নওগাঁওর ২৫০০টি পরিবারকে শিবির থেকে বহিষ্কার (camp out) করা হয়। সে-সময় আন্দোলনের নেতারা কলকাতা ও দিল্লিতে চিঠি লিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে তাঁদের দাবিদাওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন।

২২ জুন ১৯৭৪-এ গ্রেফতার হন সতীশ মণ্ডল, রঙ্গলাল গোলদারসহ উদ্বাস্তুদের শীর্ষ নেতৃবর্গ।

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ মানার শহিদ ভাটায় বিক্ষুব্ধ উদ্বাস্তুদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। নিহত হন তিনজন। এছাড়া ওই সেপ্টেম্বরের প্রথম দুটি সপ্তাহে বিক্ষুব্ধ উদ্বাস্তুদের ওপর গুলি চলে তাওয়া ক্যাম্পে ও পারলকোটে।

উদ্বাস্তু নেতারা মুক্তিলাভ করেন ১৯৭৪-এর শেষাশেষি।

১৯৭৫ সালের জুন মাসে আবার অশান্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। মানার কুরুদ ক্যাম্পের এক তরুণীকে ওই মাসের মাঝামাঝি এক রাত্রে শিবির থেকে তুলে নিয়ে যায় সিআরপি। পরদিন ধর্ষিতা তরুণীটি ফিরে এলে আওয়াজ ওঠে— চল কলকাতা, চল বাংলা, চল সুন্দরবন। পারলকোট ও মালকানগিরি থেকে দলে দলে মানুষ চলে আসেন রায়পুরে। যাত্রা শুরু হয় ১৭ জুন ১৯৭৫ তারিখ থেকে। ১৭ জুন থেকে ২৫ জুন মোট প্রায় ১৭,০০০ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। ২৪ জুন কুরুদ ক্যাম্পে গুলি চলে।

পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা শুরু করা উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকেই বর্ধমান পর্যন্ত চলে এসেছিলেন, অনেকে আটকা পড়েন বিহার-উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশের স্টেশনে স্টেশনে। ২৬ জুন ১৯৭৫ সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। গ্রেফতার হন উদ্বাস্তু নেতারা বিভিন্ন স্থান থেকে। প্রায় সকলকেই ফেরৎ পাঠানো হয় আবার দণ্ডকারণ্যে। তবে, অন্যান্য বারের মতো সেবারেও ফেরেননি কেউ কেউ।

মরিচঝাঁপির ঘটনা সাম্প্রতিকই বলা চলে, মাত্র তিন বছর আগের, যার পিছনে রয়েছে ওই ১৯৬৫, ১৯৭১ আর ১৯৭৫-এর ঘটনা আর ঘটনা জুড়ে এক ইতিহাস। এবারেও শুধু মালকানগিরি অঞ্চল থেকে মরিচঝাঁপি যাওয়া ৬৬৬৮টি পরিবারের মধ্যে ১৩৮২টি পরিবার দণ্ডকে ফেরেননি।

দণ্ডকের বহু বাঙালি উদ্বাস্তুর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে তাঁরা তাঁদের অতীতের দুঃখজনক ঘটনাগুলি ভুলতেই চান। বার বার দণ্ডক ছেড়ে বাংলায় আসা এবং ফিরে যাওয়ার ঘটনাবলিই হয়তো দণ্ডকের অনেককেই ভাবতে শিখিয়েছে এটা। অনেকেরই মুখে শুনেছি— না, আর বাংলায় যামু না। কিন্তু সব পরিবারে উপযুক্ত কাম চাই। দেশ গড়ার এই সুস্থির সংকল্পকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানাবেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ।

তবু ক্ষোভ আছে, বিশেষ করে মালকানগিরি অঞ্চলের মানুষের। লক্ষ্য করার বিষয়, দণ্ডক থেকে যতবার বাংলা অভিযান হয়েছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উদ্বাস্তু অংশ নিয়েছেন মালকানগিরি অঞ্চল থেকে। এর কারণ মালকানগিরি জমিই সবচেয়ে পাথুরে, এ অঞ্চলে জলাভাবও খুব।

কোরাপুট জেলার বৃহত্তম মহকুমা মালকানগিরি। এ অঞ্চলে ১৯৭১-৭২ সালে দুটি সেচ প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হয়— পটেরু আর সতীগুদা নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচের জন্য জল ছড়িয়ে দেওয়া হবে মালকানগিরির গ্রামে গ্রামে। কথা ছিল ১৯৭৯-এর আগেই জল পেতে শুরু করবে অনেক গ্রাম, কাজ শেষ হবে ১৯৭৯-এর মাঝামাঝি। কাজ যতদূর এগিয়েছে তাতে জানা যাচ্ছে ১৯৮৩ সালের আগে

এই দুই বাঁধ প্রকল্প সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই।

সেচ প্রকল্প দুটির মধ্যে বড়— পটেরু। শুধু এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৫ কোটি টাকা। পটেরু থেকে বারো মাস জল পাবার কথা ৬১,০০৪ হেক্টর জমিতে। সতীগুদা থেকে খরিফে ১৫,১৮০ হেক্টর জমিতে, রবিতে ৬০০ একরে। দুটি প্রকল্পেরই দায়িত্ব ওড়িশা সরকারের হাতে, টাকা দিচ্ছে কেন্দ্র। এক দশকে শুধু পটেরুর জন্যেই ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা।

১৯৮০ সেপ্টেম্বরের ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে এই দুটি সেচ প্রকল্পের রূপায়ণের কাজে বিলম্ব হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসন্তোষের কথা জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব। ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরাও নির্দেশ দেন ওই দুই সেচ প্রকল্পের কাজ দ্রুত সারার জন্য। দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে বলা হয় সিমেন্টের অভাবের জন্যই প্রকল্পের কাজে বিলম্ব ঘটছে।

দণ্ডক সমস্যা নিয়ে বে-সরকারিভাবে ভাবছেন যাঁরা, তাঁদের একজন শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত। বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে এ অঞ্চলে এ মুড়ো সে মুড়ো গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়ান মানুষটি। তাঁর বিভিন্ন রচনায় এ অঞ্চলের সমস্যা প্রসঙ্গে এই দুটি বাঁধ ও সেচ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

যেখানে মানুষ শরণার্থী, সরকারের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে কোনও সরকারি পরিকল্পনা, প্রকল্পের কাজে ব্যর্থতা এলেই হতাশ হবেন জনসাধারণ। শুধু উদ্বাস্তুদের স্বনির্ভর হতে বললেই তো চলবে না, প্রয়োজন পূর্ণ সরকারি প্রয়াস ও প্রকল্পের রূপায়ণ। ১৯৭৯ সালে সংসদের এসটিমেট কমিটির দেওয়া রিপোর্টেই দণ্ডক পরিকল্পনার কাজের ঢিলেমি ও ব্যর্থতার নজির:

(১) বারংবার এসটিমেট কমিটি বলা সত্ত্বেও দণ্ডক অঞ্চলে উন্নয়নের কোনও মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়নি।

(২) সেচ ব্যবস্থা বলতে কিছুই হয়নি— মোট চাষযোগ্য জমির ৬ থেকে ৮ শতাংশে মাত্র সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৩) উপযুক্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে না তোলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে।

(৪) ৩৮১টি গ্রামের মধ্যে ৮টি মাত্র গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছে।

(৫) পরিবার পিছু ৭ একর জমি দেবার কথা থাকা সত্ত্বেও তা কমিয়ে ৩ একর করা হয়েছে।

(৬) জমির পাট্টা দেওয়া হয়নি।

(৭) পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই।

(৮) ২৯৬টি প্রাইমারি স্কুলের মধ্যে মাত্র ১৫৯টি অস্থায়ী চালায় কাজ চলছে।

(৯) হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ওষুধের অভাব।

(সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা ১০.১.৮১)

পরিকল্পনা রূপায়ণে এই গয়ংগচ্ছ ভাব এবং ব্যর্থতার দায় মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের। সংবেদনশীলতা ও আন্তরিকতার অভাবে দণ্ডকের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর এই হাল। যাঁরা দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলেন, তাঁদের সেই প্রতিশ্রুতি আজ পরিহাসে পরিণত। অবশ্য বাঙালি ছাড়া অন্য উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়েছে। বাঙালিদের অপরাধটা কী?

মানাতে এখন ৪টি পি এল ক্যাম্প আছে। ক্যাম্পের এক পদস্থ অফিসার আমাদের একা যেতে দেননি, বললেন আপনাদের অসুবিধা হতে পারে, সঙ্গে পাঠালেন এক জুনিয়র অফিসারকে।

অফিসারের সামনে অনেকেই কিছু বলতে রাজি হচ্ছিলেন না। সাত বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এলেন তারারানী দে। বরিশাল জেলার কাকুরদা গ্রাম থেকে এসেছেন ১৯৭০-এ। বললেন তাদের বিপন্নতার কথা— ছোটদের বইপত্র নিয়মিত দেয় না সরকার, বছরে মাত্র দু-সেট পোশাক মেলে, শীতবস্ত্র অনেক সময় পাওয়াই যায় না, বাইরের আত্মীয়দের ক্যাম্পে আসতে দেওয়া হয় না, শিক্ষিত মেয়েদের কাজ জোটে না, ইত্যাদি...

মানার সান্ধ্যবাজারে দেখেছিলাম তাকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন ময়নাপাড়ার মাঠে। লালপাড় হলুদ শাড়ি পরনে, সে কাচের চুড়ি কিনছে বাঙালি উদ্বাস্তু দোকানির কাছ থেকে, বুলি ভাঙা হিন্দি। মনে এসেছিল জিজ্ঞাসা, গোনড না মাড়িয়া? এসেছে কাছের কোনও গ্রাম থেকে। মনে পড়েছিল আগের দিন রায়পুরের হোটেলে আলাপ হওয়া প্রসাধন কোম্পানির তরুণ সমীর সরকারের কথা, উমরকোটে গিয়ে দেখুন, বাঙালি ছেলেমেয়েদের দেখলে চিনতে পারবেন না, মনে হবে যেন ওরা আদিবাসী...।

দণ্ডক থেকে ফিরে 'বিশেষ প্রতিনিধি' হিসেবে লিখেছিলেন 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিকের ২১ এপ্রিল ১৯৮২ সংখ্যায়। শিরোনাম ছিল 'দণ্ডকে লক্ষ লক্ষ বাঙালি আদিবাসী হয়ে যাচ্ছে'। লেখাটির প্রাসঙ্গিক অংশ নেওয়া হল।

মরিচঝাঁপিতে অবরোধের সময়

কমলা বসু

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি মরিচঝাঁপি 'ব্লকেড' করে। মরিচঝাঁপির মানুষ খাদ্য ও জলের অভাবে যেন দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। বিপ্লবী-যুগের অগ্নিকন্যা বীণা দাশ ভৌমিক ও কমলা বসু সেই অবরুদ্ধ দ্বীপে পৌঁছে কী দেখেছিলেন, মরিচঝাঁপি কেন লজ্জা হয়ে থাকল, তারই বিবরণ।

মরিচঝাঁপি আমাদের জীবনে একটা অত্যন্ত ব্যথার জায়গা যা সত্যিই অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতোই জীবনের একান্তে পড়ে আছে। অথচ ১৯৭৮-৭৯-তে সে আমাদের প্রাণমনকে প্লাবিত করেছিল।

দেশভাগের দুঃখটা ভুলতে পারিনি— ভাগ করার ছুরিটা আজও বুকের মধ্যে বিঁধে আছে— চলতে ফিরতে ব্যথা পাই।

তাই যেদিন শুনলাম দণ্ডকারণ্য থেকে আমাদেরই কিছু ছিন্নমূল মানুষ এই বাংলায় ফিরে আসছেন— মরিচঝাঁপিতে নিজেরাই ছোট্ট গ্রাম তৈরি করে তাঁরা চাষবাস, মাছের ব্যবসা ইত্যাদি করে এখানেই থাকবেন, তখন খুশিতে মনটা ভরে গিয়েছিল। অনুভূতিগুলি তো মরে না। কিন্তু সাল তারিখ সবই তো ভুলে গিয়েছি। বোধহয় ১৯৭৮-এর এপ্রিলে শুনেছিলাম। তারপর একদিন সুকুমার নামে আমাদের পরিচিত একটি ছেলে বীণাদিকে (বীণা দাশ/ভৌমিক) জানাল যে, শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে লোক মরিচঝাঁপিতে এসে গেছে— রোজই আসছে— অথচ তাদের খাবার জলটুকু পর্যন্ত নেই। কারণ মরিচঝাঁপি লবণাক্ত জলে ঘেরা একটা জনশূন্য অরণ্যময় দ্বীপ মাত্র। খাবার জলটুকুও নৌকা করে এসে লোকদের উল্টোদিকের কুমিরমারি গ্রাম থেকে নিয়ে যেতে হয়। আর সেই সময় কোনও সরকারি টহলদার যদি দেখতে পায়, তা জলে বা স্থলে যেখানেই হোক তাহলে

তৎক্ষণাৎ সেটা ভেঙে দেবে। ওদের স্টিমার থেকে যদি নদীতে কাউকে পারাপার করতে দেখে, তাহলে লাসো (Lasso) দিয়ে তাদের টেনে তুলে নিয়ে মারে। এই জ্যোতিবাবুর সরকার কেন যে প্রথম থেকেই ওদের সঙ্গে এই রকম শত্রুতা করল, এ রহস্য আমি আজও ভেদ করতে পারলাম না।

অথচ মজা হচ্ছে এই যে বামফ্রন্ট সরকার গদিতে বসেছেন বলেই কিন্তু ওঁরা সব দণ্ডকারণ্য থেকে এখানে ছুটে এসেছেন। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় যখন আন্দামানে কিছু পূর্ববঙ্গের লোকদের বসতি স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন এই কমিউনিস্টরাই 'Son of the soil'-এর ধুয়া তুলে তাতে বাধা দিয়েছিল। তাই এবার দণ্ডকারণ্যের মানুষজন ভাবলেন, এবার তাহলে Son of the soilরা দেশেই ফিরে আসতে পারবেন। এসেই ওঁরা রাম চ্যাটার্জির (তখন তিনি মন্ত্রী) সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, 'আমরা টাকা পয়সা কিছুই চাই না, আমরা নিজেরাই সব ঠিক করে নেব। চাষ করব, মাছের ভেড়ি করে ব্যাবসা করব। সরকার চাইলে তাঁদের কাছেই মাছ বিক্রি করব। আমাদের শুধু এইখানে থাকবার অনুমতিটুকু দিন। ওঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এবং কেন্দ্রে জনতা সরকারের কাছে যে সব স্মারকলিপি দিয়েছিলেন সে সবের কপি ওঁরা আমাদের দেখতে দিয়েছিলেন। সরকার অবশ্য তাদের অবস্থানে অনড়। থাকতে তো দেবেই না— এক্ষুনি তাদের চলে যেতে হবে। যেতেই হবে।

কেন যে সরকার এই রকম একটা মনোভাব নিল এটা আমার আজও একটা রহস্য— মিস্ট্রি অব দি মিস্ট্রিজ। আমি একদিন কমলাদিকে (কমলা মুখার্জি CPI) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা, রাজ্য সরকার এ রকম করল কেন? ওদের সাহায্য করলে তো এই পুরো জনগোষ্ঠীটাকেই শাসকগোষ্ঠী নিজেদের দলে নিয়ে আসতে পারত— শুধু শুধু শত্রুতা করলেন কেন? কমলাদিও খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, বললেন, এটা আমিও বুঝিনি কমলা— এ রাজনীতিটা আমি একদম ধরতে পারলাম না।

যা হোক— আমরা, মানে বীণাদি (বীণা দাশ/ভৌমিক) আর আমি তখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কিছু টাকার ব্যবস্থা করলাম, যাতে অন্তত গোটা তিনেক টিউবওয়েল বসানো আর কয়েক কুইন্টাল চাল কেনা যায়। তারপর তাই নিয়েই তো রওনা হলাম। সুভাষ নামে একটি ছেলে চলল আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে। ক্যানিং পর্যন্ত গিয়ে তারপর লঞ্চে করে যেখানে নামলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতটুকু অপেক্ষা করতে হবে। সকালে হেঁটে কুমিরমারি গ্রাম, তারপর নৌকায় মরিচঝাঁপি। এইবার শুরু হল এক মজার খেলা। সুভাষের নির্দেশ— আমাদের পরিচয় নাকি প্রকাশ করা চলবে না। চারিদিকে সরকারি চরেরা সব ছড়িয়ে আছে। আমাদের গন্তব্য বা উদ্দেশ্য জানতে পারলেই গ্রেফতার অবধারিত। আমাদের গাইড সুভাষ বলছে,

আমরাও তাই করে যাচ্ছি। সে আমাদের অতি ছোট একটা চালা ঘরে নিয়ে এল। সেখানে চা বিক্রি হয়। জনবসতি বলে কিছুই চোখে পড়ল না। শুধু মাঠ জঙ্গল, কিছু কিছু চষা জমি। কিন্তু রাতটা তো আমাদের কোথাও কাটাতে হবে। সেই ঘরটার চালের নীচে গ্রামের বাড়িতে যেমন দেখা যায় তেমনই একটা মাচা আছে। একটা ল্যাকপ্যাকে বাঁশের মই কোত্থেকে যেন জোগাড় হল। সুভাষ তো সেই মই ধরে নীচে দাঁড়িয়ে রইল— আমি আর বীণাদি তো গুটি গুটি সেই মই বেয়ে উপরে উঠলাম আর তক্ষুনি শুয়ে পড়লাম। তারপর সুভাষও উঠে তারই একপাশে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে দিব্যি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। আমাদের তো ঘুম আর আসে না— একটু নড়লেই মচ্‌মচ্‌ শব্দ— ভেঙে না পড়লেই বাঁচি। আমার তো তখন অট্টহাসিতে পেট ফেটে যাবার জোগাড় অথচ শব্দ করা নিষিদ্ধ। কী আর করা— বীণাদির সঙ্গে ফিসফিস করে গল্প করেই রাতটা কাটিয়ে দিলাম। তারপর ভোর হতেই সুভাষ আমাদের নিয়ে হাঁটা শুরু করল। ভোর মানে তখনও অন্ধকার। মাসটা বোধহয় জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি— ঠিক মনে নেই। তবে শীতটা মনে আছে। তখন থেকে আমাদের ছদ্ম পরিচয় হল আমরা নাকি কুমিরমারিতে কোনও যজমানের বাড়িতে যাচ্ছি। এবড়ো খেবড়ো মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছি, মাঝে মাঝে আলের ওপর দিয়েও যেতে হচ্ছে। অনভ্যাসে কষ্ট যত না হচ্ছে— তার থেকে বেশি হাসি পাচ্ছে— এদিকে গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে। সেই ছোটবেলায় অকারণ হাসির জন্য স্কুলে বকুনি খেতে হত— বুড়ো বেলায়ও তার হাত থেকে নিস্তার নেই।

এখন আমাদের মরিচঝাঁপি যেতে হবে। কিন্তু যাই কী করে? সরকারি লঞ্চ ভট্‌ ভট্‌ শব্দ করে মরিচঝাঁপি দ্বীপটার চারপাশে পাহারা দিচ্ছে, কোনও নৌকা বা লোক দেখলেই Lasso দিয়ে তুলে নিচ্ছে। তাহলে? এখন উপায় কী? এবার কি তবে ফিরে যেতে হবে? অসম্ভব। কী খারাপ যে লাগছে— অথচ সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি মরিচঝাঁপি দ্বীপটা। নদীপৃষ্ঠ থেকে বেশ একটু উঁচু— অনেকটা খুব ছোট্ট একটা টিলার মতো আকৃতির উচ্চতায়। সরকারি লঞ্চটা তো সমানেই দ্বীপটাকে ঘিরে ঘুরছে। যেই ওটা কুমিরমারির সামনে থেকে ওপাশে ঘুরে গেল তক্ষুনি সুনীল নামে ছেলেটি হঠাৎ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। কোন মন্ত্রবলে জানি না, একটা ছোট্ট ছিপ জাতের নৌকা নিয়ে এসেছে— মাথায় কোনও ছাউনি নেই নৌকার মতো। বীণাদি আর আমি তো লাফিয়ে তাতে উঠে পড়লাম— আর তিরবেগে সুনীল আমাদের নিয়ে মরিচঝাঁপি পৌঁছে গেল যেন মুহূর্তে। কিন্তু এখন নামব কী করে— নামতে গিয়েই বুঝতে পারলাম সম্ভবত আমার কোমর অবধিই কাদায় ডুবে যাবে— তারপর তো আমার আর পা তোলা সম্ভব নয়। কোনও কথা না বলে চোখের পলক ফেলবার আগেই সুনীল আমায় স্রেফ পাঁজাকোলা করে

তুলে নিয়ে তার নিজের হাঁটু অবধি কাদায় ডোবাতে ডোবাতে কী এক আশ্চর্য কৌশলে এক ছুটে আমায় ওপরের বনভূমিতে পৌঁছে দিল। ততক্ষণে আবার সরকারি স্টিমলঞ্চের ভট ভট শব্দ কানে আসছে— অর্থাৎ পরিক্রমা শেষ করে আবার এদিকে আসছে। ঝড়ের বেগে সুনীল নীচে নেমে আবার সেই একই পদ্ধতিতে বীণাদিকেও পাঁজাকোলে করে তুলে উপরে নিয়ে এল। তারপর আবার ছুটল নৌকাটা তুলে আনার জন্য— গিয়ে দেখল সরকারি লঞ্চ ওটা তুলে নিয়ে গেছে আর বুঝতে পেরে গেছে ওদের টহলদারি সত্ত্বেও যাতায়াত হচ্ছে। যাক—

তারপর এই জনহীন বনভূমিটুকু হেঁটে পার হয়ে আমরা একটা বেশ বড় খাদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখানে ভূখণ্ডটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এটা পার হলেই আমরা মরিচঝাঁপির বসতিতে গিয়ে পৌঁছব। পার হবার ব্যবস্থা হিসাবে একটি মাত্র বাঁশ এপার থেকে ওপার অবধি ফেলা আছে। তবে হাত দিয়ে ধরবার জন্য ডানপাশে একটু উঁচু করে আর একটা বাঁশ বাঁধা আছে। প্রায় সার্কাসের ভঙ্গিতে ডানহাতে সেই বাঁশ ধরে এক পা এক পা করে আমরা দিব্যি পৌঁছে গেলাম।

খবর তো সব আগেই পৌঁছে গেছিল— গ্রামসুদ্ধ সবাই ছুটে এলেন— সতীশবাবু (মণ্ডল) তো ছিলেনই। কেউ কাউকে চিনি না, তবু মনে হল বহুদিন পর দেশ বিদেশে ছড়িয়ে থাকা আত্মীয়রা বুঝি সবাই বাড়ি ফিরে এসেছে। সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরল— সবারই প্রায় চোখে জল, মুখে হাসি। কারণ ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি মরিচঝাঁপি দ্বীপ অবরোধ করার পর একমাত্র আমরাই প্রথমে মরিচঝাঁপির ভেতরে গিয়েছিলাম আরও অনেকেই ওদের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন এবং অনেক দিন ধরে, এমনকী ওরা উৎখাত হয়ে যাবার পরেও। এ ব্যাপারে জ্যোতির্ময় দত্তের (বুদ্ধদেব বসুর জামাতা) নাম অগ্রগণ্য।

শেষ পর্যন্ত মরিচঝাঁপিতে একটা বাড়িতে পৌঁছলাম। গৃহকর্তা এবং কর্ত্রীর আন্তরিক অভ্যর্থনায় মনটা জুড়িয়ে গেল। বাড়ি মানে মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি। তা হোক, সেটা কিছু নয় কিন্তু সেখানে দারিদ্র্যের যে চেহারা দেখলাম (শুধু একটা বাড়িতেই নয়— সারাটা গ্রামেই) তা এদিককার দীনতম লোকের কাছেও অকল্পনীয়। নদীর ওপারে এই ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কতগুলি দ্বীপ। ইলেকট্রিক নেই, স্কুল নেই, ডাক্তারখানা নেই, বাইরে থেকে কেউ নিয়ে না গেলে একটা ট্রানজিস্টারও নেই। কিন্তু ইহা বাহ্য— দারিদ্র্যের চেহারা তারপরেও যে কী হতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না— চোখে দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

একটা জনহীন অরণ্যসঙ্কুল দ্বীপকে শুধু ওদের দুটি হাত দিয়ে ওরা যে ছবির মতো কী সুন্দর একটা গ্রাম তৈরি করেছে তা দেখে আমরা তো হতবাক। ভাবা

যায় না, ওদের ইঞ্জিনিয়ার নেই, আর্কিটেক্ট নেই, সিমেন্ট বালির তো প্রশ্নই নেই— তবু যে কেউ মুগ্ধ হবে এই ছবির মতো সুন্দর গ্রামটি দেখে— সত্যিই মানুষের ইচ্ছাশক্তি যে কী করতে পারে এটা একটা দেখবার মতো জিনিস, স্কুল, খেলার মাঠ, লাইব্রেরি— কী নেই— গ্রামের মেঠো রাস্তা, কিন্তু এতটুকুও অপরিচ্ছন্নতা নেই কোথাও। আর আছে সবারই একটি করে বাড়ি, বাড়ি মানে একটি বা দুটি খুব ছোট ছোট মাটির ঘর।

ব্লকেডের সময় ওরা তখন কী খেত শুনবে? এক ধরনের ঘাস সেদ্ধ করে তাই দিয়ে সবাই পেট ভরায়। ঘাসের নামটা মনে পড়ছে না— ওখানে ওটা নাকি অপর্যাপ্ত জন্মায়। (চাল যেটুকু জোগাড় হয়েছিল সেটা উল্লেখ্যই নয় তবে শেষ পর্যন্ত তিনটি টিউবওয়েল অবশ্য হয়েছিল।) তখন কাশীকান্ত মৈত্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, তাঁকে ঘাসটা দেখাতে পেরেছিলাম। (বিধানসভায় তখন কিছুটা হইচইও হয়েছিল কিন্তু ওই পর্যন্তই)। সেদিন মরিচঝাঁপিতে সতীশবাবু সহ অন্য সবার সঙ্গে নানা রকম আলোচনা, প্ল্যান হল কী ভাবে কী করা যায়? বিকালে বীণাদিকে সভানেত্রী করে একটা সভা হল। এমন সময় এক দল ছেলে মেয়ে (তাদের কাজই ছিল নদীর ধারে পাহারা দেওয়া, কারণ তখন মরিচঝাঁপিতে অচেনা কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এটাই ছিল সরকারি নিয়ম)। ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'স্টিমার ভর্তি পুলিশ এসেছে।' আমরাও ছুটে গেলাম— ভাবলাম হয় বীণাদিকে গ্রেপ্তার করবে, নয়তো নির্বিচারে গুলি চালাবে। কিন্তু না, ওরা সে সব কিছুই করেনি— স্টিমার থেকে মাটিতে নামবার সাহস পর্যন্ত হয়নি। আমরা তো গিয়ে দেখলাম নদীর ধারে গোটা মরিচঝাঁপি ফল ইন্ করে দাঁড়িয়ে গেছে। পুলিশ অফিসারেরা ওদের স্টিমারের সামনে এসে তাঁদের নিজেদের মতো করে লোকেদের বোঝাতে লাগলেন মরিচঝাঁপি ছেড়ে যাবার জন্য। আর সমস্ত মরিচঝাঁপি একসঙ্গে চিৎকার করে উত্তর দিল— 'আমাদের লাশ নিয়ে যান, আমরা যাব না।' অনেক ভুলেছি কিন্তু ওদের সেদিনের কণ্ঠস্বর আজও কানে বাজে। তারপর ওরা আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। কে জানে এই জন্যই ওরা এসেছিল কিনা। জিজ্ঞাসা করতে লাগল— আপনারা কতদিন ধরে এখানে আছেন, কবে এসেছেন, কবে ফিরবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনও নির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে পাশ কাটানো ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না। শেষ কালে বলে কিনা 'ফেরবার জন্য তো আপনারা কিছু পাবেন না, আমাদের সঙ্গে চলুন, আমরা পৌঁছে দিচ্ছি।' কী স্পর্ধা! অবশ্য কথাগুলো বলেছিল খুবই ভদ্রভাবে। বীণাদি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত গম্ভীর ও দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমাদের জন্য আপনাদের ভাবতে হবে না, আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব না।' ওরা শেষ পর্যন্ত চলে গেল।

এপার-ওপারে ওদের আলোর সিগন্যালে কথা হয়— শুনলাম এখনও পুলিশ আছে— আমরা গেলেই নাকি ধরবে। সত্যি হোক মিথ্যা হোক, আমরা তো ওখানেই রইলাম। এদিকে রাত বাড়তে বাড়তে তো মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেল। তারপর আবার সেই সুনীল ভুঁইফোড়ের মতো কোত্থেকে একটা ছোট্ট নৌকা নিয়ে হাজির। আমার সেদিন হঠাৎ প্রমথ চৌধুরীর 'মন্ত্রশক্তি' গল্পটা মনে পড়েছিল। এপারে মানে কুমিরমারিতে এসে শুনলাম পুলিশ সুকুমারকে (সুকুমার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ৺হেমন্ত বসুর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। এটা ওর অপরাধের একটা কারণ কিনা জানি না) গরু খোঁজা করেও খুঁজে না পেয়ে আমরা যে বাড়িতে আমাদের ব্যাগ দুটো রেখেছিলাম (তাতে সামান্য দু-চারটে জামা কাপড় আর গরম শাল ছিল) সে দুটোই রাগের চোটে নিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেদের মত, আমাদের পেলে আমাদেরও নিয়ে যেত। জানি না। শেষ রাতটুকু একটা বাড়ির বাইরের সিঁড়িতে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে বসেই কাটিয়ে দিলাম। জায়গাটা বোধহয় যেখান থেকে স্টিমার ছাড়ে তার কাছাকাছি হবে। এখন আর ভাল মনে পড়ছে না। সুভাষ বোধহয় একটা তফাতে কোথাও ছিল। এমন সময় একটি লোক এসে আমাদের নানাবিধ প্রশ্ন করতে শুরু করল। 'কোথায় যাইবেন? আপনারা কোথা থেকে আসতেছেন? কার বাড়িতে গেছিলেন?' একটা প্রশ্নেরও উত্তর না পেয়ে লোকটি বলল, 'দাদারা কথা কন না ক্যান?' এ রকম জায়গায় ও এরকম সময়ে ভদ্রলোক বোধহয় কোনও মহিলার কথা ভাবতেই পারেননি। 'দাদারা কথা কন না কেন' নিয়ে পরে আমরা নিজেরা অনেক হাসাহাসি করেছি।

ওখান থেকে ফিরে মনুমেন্টের তলায় বীণাদি একটি সভা করেছিলেন— তখন তো দিল্লিতে জনতা পার্টির সরকার, কলকাতার পার্টির লোকেরা সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন সাংসদ শক্তি সরকার। বীণাদি সেদিন যে কী অপূর্ব বললেন— এখন দুঃখ হয় কেন টেপ করে রাখিনি।

সময়টা সম্ভবত ১৯৭৯-র মে মাস হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও আদেশ অনুসারে কয়েক শো, হাজারও হতে পারে, পুলিশ মরিচঝাঁপির লোকেদের লাঠি দিয়ে ডান্ডা দিয়ে মেরে আধমরা করে, ওদের তৈরি সব ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে, জ্বালিয়ে দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দেয়। সেদিন আমরা ওদের পাশে দাঁড়াতে পারিনি। এ লজ্জা, এ দুঃখ আমাদের রাখবার জায়গা নেই। এই অসম যুদ্ধে বীণাদি আর আমি যে কিছু করতে পারতাম তা নয়— কিন্তু ওদের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গেই তো মার খেতে পারতাম— সব নৃশংসতা, সব অত্যাচার ওদের সঙ্গেই ভাগ করে নিতে পারতাম। স্বপ্নভঙ্গের কষ্টটা থাকত কিন্তু লজ্জাটা মুছে যেত। লাইব্রেরি ঘরে অথবা স্কুলঘরে সুভাষচন্দ্রের একটি চমৎকার বড় ছবি টাঙানো

ছিল— পুলিশেরা সেটি লাথি মেরে নীচে ফেলে দিয়েছিল। আমরা, শুধু আমরা দুজন উপস্থিত থাকলেই এটা হতে পারত না। আমরা বেঁচে থাকতে ওদের স্পর্ধাই হত না ওই ছবি স্পর্শ করবার। না হয় বড়জোর হারাবংশী বীরের রক্তে নকল বুঁদিগড় ভেসেই যেত।

আমরা যে সেদিন থাকতে পারলাম না, এ ব্যর্থতা এ লজ্জা বীণাদি সহ্য করতে পারেননি— আমিও আমৃত্যু ভুলব না। অথচ দু-দিন আগে থেকেই আমরা ওখানে পৌঁছবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সরকার সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল তখন—- এমনকী স্টিমলঞ্চ চলাচলও বন্ধ রেখেছিল। আমরা নানা ভাবেই মরিচঝাঁপিতে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছিলাম। অবসর নেওয়ার পর আমি আমার স্বামীকে আর আমার ভগ্নীসমা বন্ধু মীরা সেনকে বলেছিলাম— এখন তো কিছুটা সময় দিতে পারি— এখন কিছুদিন কুমিরমারি একা থেকেই দেখি না, এত বড় ব্যর্থতার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি কিনা। কুমিরমারিতে তো অনেক কিছু করবার আছে— আর ওখানে থাকতে থাকতে দেখি না মরিচঝাঁপিতে আর একটা fight দিতে পারি কি না— The best and the last. বারাসত, বসিরহাট ইত্যাদি যেখানে যেখানে ওরা ছড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের সময় লাগবে না। রবীন্দ্রনাথ একদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ করেছিলেন— 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। আজ স্বাধীন ভারতে তার চাইতে শতগুণ নৃশংসতার বিরুদ্ধে আমরা কী করছি? প্রফুল্লচন্দ্র সেন অবশ্য মরিচঝাঁপি যেতেও চেয়েছিলেন— অনশনও করতে চেয়েছিলেন। মোরারজি তখন প্রধানমন্ত্রী— তিনি অনুমতি দেননি। কোনও দলে থাকার এইটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধা— পদে পদে নিজের বিবেককে পরিত্যাগ করতে হয়। খুব ভাল মনে নেই, মোরারজি তখন বোধহয় লন্ডনে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন কিন্তু জ্যোতিবাবুরা মরিচঝাঁপিতে ওদের থাকতে দিতে রাজি হননি। পার্লামেন্টে তখন সিপিএম দলের ২২ জন সদস্য, তাদের ভোটটা তো হাতছাড়া করা যায় না।.তাতে কয়েক হাজার বঙ্গসন্তান মরলে আর কী করা যাবে!

আমি তো বলি, সেই পাপেই মোরারজির গদি গেল।

এ প্রসঙ্গে আর এক জনের কথা উল্লেখ না করলে অপরাধ হবে। তিনি হচ্ছেন প্রয়াত আইসিএস শৈবাল গুপ্ত। বুদ্ধি, পরামর্শ দিয়ে তো সাহায্য করেছেনই, তাছাড়া যতদিন দণ্ডকারণ্য থেকে আসা মানুষেরা মরিচঝাঁপিতে ছিলেন ততদিন প্রতি মাসে নীরবে নিঃশব্দে ওঁদের অর্থসাহায্য করে গেছেন এবং সেটা একেবারে দু, পাঁচ টাকা নয়। সে অর্থ 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি, সুন্দরবন' নামে যে সমিতি ওঁরা গড়েছিলেন সেইখানে জমা হত। এমন বলিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, আদর্শনিষ্ঠ সাহসী রাজকর্মচারী এ যুগের ছেলেমেয়েরা ভাবতেও পারবে না। আর একটা ঘটনা আমার মনের মণিকোঠায়

উজ্জ্বল হয়ে আছে— সেটা না বলে পারছি না। আমি তখন একটি সর্বভারতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সভাপতির সঙ্গে দেখা করেছিলাম, মরিচঝাঁপিতে কিছু সাহায্য করবার জন্য। (রামকৃষ্ণ মিশন নয় কিন্তু) উনি আমাকে একটা প্রশ্নও করেননি, আমি সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি জানবার চেষ্টাও করেননি— দু-দিনের মধ্যে আমার বাড়িতে শিশুদের জন্য কয়েকশো গুঁড়ো দুধের টিন, কয়েকশো কম্বল আর সামান্য কয়েক হাজার টাকা পৌঁছে গেল। বিশ্বাস করতে পারো?— আসলে সেই সময় জনতা সরকার দিল্লি থেকে একটা পার্লামেন্টারি টিম পাঠিয়েছিল, মরিচঝাঁপিতে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য। আমিও ওঁদের সঙ্গী হয়েছিলাম। ওই টিমকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তি সরকার নিজের টাকায় একটা লঞ্চের ব্যবস্থা করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে গিয়েছিলাম বলে এতগুলো জিনিস আমরা অনায়াসে নিয়ে গিয়ে দিতে পেরেছিলাম। সেদিন সত্যি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। দিল্লির প্রতিনিধিদের কাছেও মরিচঝাঁপির লোকেরা মিনতি করেছিল, 'আমরা কিছু চাই না, শুধু এই মাটিটুকুতে আমাদের থাকবার অধিকার দিন।' কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

প্রায় একই উত্তর দিয়েছিলেন। মীরার উত্তরটা শোনাই— 'কমলাদি, মরিচঝাঁপি যদি তুমি নাও যাও, ওরা কিন্তু তোমাকে কুমিরমারিতেই নজর রাখবে— সাত দিন, পনেরো দিন, না হয় এক মাস, তারপর ওরা যেই দেখবে কুমিরমারির লোকেদের সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেছে— তুমি ওদের আত্মীয়বৎ হয়ে গেছো, তৎক্ষণাৎ ওরা তোমায় মেরে ফেলে কাদার তলায় পুঁতে ফেলবে।'

অকাট্য সত্য— তবু ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিলাম।

আমি জানি জীবনের তিন-চতুর্থাংশ স্বপ্নই ভেঙে যায়— এক-চতুর্থাংশ হয়তো বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের যুদ্ধেও তো ১৯৭১-এর মার্চ থেকে ১৯৭২-এর মার্চ পর্যন্ত আমরা, (মানে বীণাদি, মীরা ও আমি) অত্যন্ত গভীর ভাবে যুক্ত ছিলাম। ২৯ মার্চ আমরাই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম— সেখানেও কি আঘাত পাবার মতো কিছুই ঘটেনি? সব কিছুই কি প্ল্যানমাফিক হয়েছিল? হয়নি, তবু সে যুদ্ধ ছিল আমাদের গর্বের। আর মরিচঝাঁপির যুদ্ধ শুধুই লজ্জার, শুধুই গ্লানির।

তবু এটাই আমার শেষ কথা নয়— আমার শেষ কথা হল Hold first to your dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird, that can not fly.

ইতি
বৌদি (কমলা বসু)

সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারকে লিখিত চিঠি। জগদীশ মণ্ডলের লেখা 'মরিচঝাঁপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে' থেকে উদ্ধৃত।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু-জনসাধারণের ওপর পুলিশি নির্যাতনের যে সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত। দেশের জনসাধারণের একাংশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা না করলেও কার্যত তার ব্যবহার নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়।

উদ্বাস্তুদের কুটিরগুলিকে ভেঙে ফেলার ঘটনা পূর্বতন একত্রিশ বছরের উদ্বাস্তু-নির্যাতনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

উদ্বাস্তু-জনগণের ওপর যাবতীয় পুলিশি নির্যাতন, উদ্বাস্তু রমণীদের ওপর নিগ্রহ ও গুলিচালনার ফলে উদ্বাস্তু হত্যার যাবতীয় ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও দোষী পুলিশ অফিসারদের উপযুক্ত শাস্তি আমরা দাবি করছি। উদ্বাস্তুরা কেন দণ্ডকারণ্য ছেড়ে আসতে বাধ্য হলেন সে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও প্রকাশ্য তদন্ত হোক।

আমরা এ বিষয়ে সচেতন যে, কিছু সংখ্যক অশুভ রাজনৈতিক শক্তি উদ্বাস্তু জনসাধারণের দুঃখে মায়াকান্না কাঁদছে। তাদের অনেকেই শ্রমজীবী জনগণের জীবন ও জীবিকার আন্দোলনের ওপর বিভিন্ন সময় নানা ভাবে হামলা চালিয়েছে।

আমরা চাই, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উদ্যোগী হবেন। জোড়াতালির সমাধান সম্পর্কে আমাদের মনে গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কা রয়েছে। আমরা আশা করছি, পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানে সরকার যে কোনও ধরনের বলপ্রয়োগের পথ পরিহার করবেন।

সমর সেন, বিনয় ঘোষ, পরেশ ধর, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শঙ্খ ঘোষ, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাদল সরকার, অনিল সেনগুপ্ত (অগ্নিমিত্র), সুব্রত নন্দী, কালী দাশগুপ্ত, হীরেন বসু (দর্পণ), সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় (স্পন্দন),

জি. ভি. নায়ার, শংকরলাল ভট্টাচার্য, তিমির বসু (সাংবাদিক), অধ্যাপক গৌরীপ্রসাদ ঘোষ, কমলেশ সেন, গৌতম ভদ্র, শ্যামল নন্দী, বনবিহারী চক্রবর্তী, সোমনাথ ঘোষ (জনশক্তি), নমিতা চৌধুরী (নান্দীমুখ) রত্নাংশু বর্গী, সাগর চক্রবর্তী, সমীর রায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, লুৎফার রহমান মৃধা, অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল দে, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু মৈত্র (অধ্যাপক), রতন খাসনবীশ (অনীক), শুভাশীষ রায় (ক্রান্তিক সাংস্কৃতিক সংস্থা), আশিসকুসুম দত্ত, অবনীরঞ্জন রায়, ইন্দ্রনাথ মজুমদার (প্রকাশক), রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী (আইনজীবী), তুষার চক্রবর্তী (থার্ড ওয়ার্ল্ড ইউনিটি), আশীষ লাহিড়ী (প্রস্তুতিপর্ব), ড. সুকুমার গুপ্ত, সত্যরঞ্জন বাগচী, রমেন চক্রবর্তী, সঞ্জীব সরকার (শিক্ষক), ড. বিদ্যুৎকান্তি গুপ্ত, ড. বলরাম দাশগুপ্ত, ড. শুভেন্দু গুপ্ত, ড. কুলদারঞ্জন রায়, ড. সুরদীশচন্দ্র দত্ত, শমীক ঘোষ (শনিবারের আড্ডা), শ্যামল চট্টোপাধ্যায় (অ্যাজিটপ্রপ, খড়দহ), অসিত গুহঠাকুরতা (পদাতিক পত্রিকা), রামনরেশ মিশ্র, বি. পি. সিং (জনকলা মঞ্চ), ডা. শ্যামল দে, পার্থ নাগ, (পূর্বাভাস), দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বোলান দল, খড়গপুর), রঞ্জিত গুপ্ত (মাটির কাছে), ব্রতী মুখোপাধ্যায় (ডুলুং), প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশচন্দ্র দাস, রবি সেন, ড. টি. পি. ত্রিপাঠী, হিরণ মিত্র, আলোক দেব (প্রতিকলতি), ভবদেব মণ্ডল (গণভিত্তি), ঝর্ণা ভৌমিক, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস ভট্টাচার্য (এপিডিআর), দীপংকর চক্রবর্তী (অনীক), অধ্যাপিকা অমিতা দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা দীপালি কুণ্ডু, অধ্যাপক মিহির চক্রবর্তী, অধ্যাপক দেবময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনুত্তম বিশ্বাস, অধ্যাপক গণেশ পাড়িয়া, অধ্যাপক অলককুমার মিত্র, অধ্যাপক সুহাস ঘোষ, অধ্যাপক অমল গুঁই, অধ্যাপক দিলীপ সেন, অধ্যাপক ক্রুষ্ণচন্দ্র ভূএ্যা (ওড়িয়া সাহিত্যিক), অধ্যাপক রবীন মুখার্জি, অধ্যাপক হরমোহন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক আশুতোষ জানা, অধ্যাপক অশোককুমার বসু, অধ্যাপক দেবব্রত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শিবেন্দু ঘোষ; অধ্যাপক কৃশানু দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শিখরেন্দু মোহন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক জয়ন্ত হোড়, অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ, অধ্যাপক দীপক ঘোষ, অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ ভড়, অধ্যাপক অনঙ্গমোহন চন্দ্র, অধ্যাপক জিতেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন গুহরায়, অধ্যাপক অমিতকুমার ঘোষ, অধ্যাপক তপনকুমার দাস, অধ্যাপক প্রাবৃট দাশমহাপাত্র, অধ্যাপক পুলক চন্দ, অধ্যাপক সুবল কুম্ভকার, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ দাস, অধ্যাপক ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সরোজ দত্ত, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অরূপরতন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক তাপসকুমার বসু, অধ্যাপক মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী, অধ্যাপক মৃগেন্দ্রমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কুন্তল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিশ্বনাথ ব্যানার্জি, অধ্যাপক মোহন সিংহরায়, অধ্যাপক সুশান্ত বসু, অধ্যাপক তপনকুমার ঘোষ, অধ্যাপক অরিজিৎ মিত্র, শুকদেব চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, মহাদেব নস্কর, তারকচন্দ্র রায় (সমাবেশ) বিকাশ ঘোষ (ঢাকুরিয়া-হালতু উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিরোধী কমিটি), সৃজন সেন, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (চিত্রশিল্পী) ও অন্যান্য।

কলকাতা ১ মার্চ, ১৯৭৯

অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেবব্রত পাণ্ডা কর্তৃক প্রচারিত।

মরিচঝাঁপির শিক্ষা

পশ্চিমবাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে মরিচঝাঁপির বুকে উদ্বাস্তু জনগণের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ভারতের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা হয়ে রইল। নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে নেবার শপথ নিয়ে জনগণ যদি জেগে ওঠেন, তাঁদের সীমাহীন সৃজনী প্রতিভাকে ও সংগ্রাম শক্তিকে যদি সংগঠিত করা যায়, তবে উদ্ধত প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্রও পরাজিত হতে বাধ্য, এটা তাঁরা আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের পশ্চাদপসরণ করতে হল কেন?

আমরা সকলেই জানি, দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিমবাংলায় আসার পথে, হাসনাবাদ ও অন্যান্য জায়গায় থাকার সময়ে এবং মরিচঝাঁপিতে বসতি স্থাপনের প্রথম কয়েক মাস উদ্বাস্তু জনগণ প্রতি পদে রাষ্ট্রযন্ত্রের নগ্ন আক্রমণের মোকাবিলা করেছিলেন অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে। তাঁদের সংগ্রামী নেতারা মূলত গোপনে ছিলেন এবং সরকারি মুখপাত্রদের সঙ্গে আপোস আলোচনায় বসতে বার বার অস্বীকার করেছিলেন। আশপাশের স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে দৃঢ় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলে কুটিরশিল্প ও চাষবাসের ব্যবস্থা করে এবং বিভিন্নভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও তৈরি করে তাঁরা মরিচঝাঁপিকে গড়ে তুলেছিলেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে। কয়েকটি সরাসরি আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর বামফ্রন্ট সরকার 'ভেতর থেকে দুর্গ দখল'-এর কৌশল নিয়ে এগোতে থাকে এবং এই কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে অন্য সব ক'টা প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদী পার্টি। উদ্বাস্তু জনগণের দরদী বন্ধু সেজে জনতা পার্টি, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতির নেতারা যে সমস্ত বক্তৃতা ও আন্দোলন সংগঠিত করেন তার আসল উদ্দেশ্যই ছিল ক্রমশ তাঁদের সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতার পথ থেকে সরিয়ে আনা। বিশেষ করে প্রফুল্ল সেন অ্যান্ড কোম্পানি মরিচঝাঁপির জনগণের সংগ্রামী মনোবল এই পদ্ধতিতে একটু একটু করে ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আর এই সময় জ্যোতি বসু ও তাঁর দলবল 'মরিচঝাঁপির চক্রান্ত' নিয়ে

সোরগোল তুলল, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে প্রচার অভিযান সংগঠিত করল, তারও আসল লক্ষ্য ছিল মরিচঝাঁপির সমর্থনে বিকাশমান জনমতকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করা।

এইভাবে শাসকশ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন পার্টি যখন মরিচঝাঁপির সংগ্রামকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে জনমতকেও পক্ষে রাখার জন্য বিভিন্ন কায়দায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের ভেতরকার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন উদ্বাস্তু জনগণও। তাঁদের এই রণকৌশল অবশ্যই বেঠিক ছিল না, কিন্তু এর পাশাপাশি নিজেদের সংগ্রামী প্রস্তুতি ও আত্মনির্ভরশীলতা তাঁরা বাড়িয়ে তুলতে পারেননি। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ছদ্মবেশী 'বন্ধু'র ওপর ভরসা করার বদলে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য জোরদার প্রচার আন্দোলনও সংগঠিত করতে পারেননি। শুধু যখন সিপিএম-এর গুন্ডা বাহিনী এবং পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনী মরিচঝাঁপির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সেখানকার জনগণ সামান্য ও বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধই করতে সক্ষম হন। স্বভাবতই তাঁদের পশ্চাদপসরণও করতে হয়।

এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের সমগ্র পর্যায়কাল জুড়ে আমাদের পার্টি এবং কিছু বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক গ্রুপ, সংস্থা বা ব্যক্তি মরিচঝাঁপির জনগণের ন্যায় সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন ও নানাভাবে তাঁদের সহযোগিতা করেছেন। অন্য দিকে ২-১টি বিপ্লবী গ্রুপ এই সংগ্রামের অপরিসীম তাৎপর্যকে ও তার পেছনে বিপ্লবী জনতার অফুরন্ত সৃজনীশক্তিকে দেখতে পাননি, একে একপেশে ও মনগড়াভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার ফলে এর থেকে দূরেই থেকেছেন। অন্যান্য শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের দ্বিধা দেখা যায়। মরিচঝাঁপির সংগ্রামের সমর্থনে আশপাশের ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের ও অন্যান্য সংগঠনের প্রচেষ্টাও যথেষ্ট সফলতা অর্জন করতে পারেনি। আমাদের পার্টি গোড়া থেকেই তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু এই সম্পর্ক সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে না পারার ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তাই সংগ্রামের জটিলতম মুহূর্তে সর্বহারা দৃঢ়তা ও সর্বহারা দূরদর্শিতার পরিচয় তাঁরা রাখতে পারেননি। ফলে শত্রু শিবিরের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাতে গিয়ে আপোস আলোচনার পথে তাঁদের টেনে আনার যে ফাঁদ বুর্জোয়ারা পেতেছিল তাতেই তাঁরা পা দেন। এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করে দিল— যে কোনও সংগ্রাম, তা যত সম্ভাবনাপূর্ণই হোক না কেন, ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি না তাতে সর্বহারার মতাদর্শগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মরিচঝাঁপিকে বেছে নিয়েছিল এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে— কেমন করে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখোমুখি না হয়েও ব্যাপক জনতার সংগ্রামকে দমন করা যায়। এই গবেষণার সাময়িক সাফল্যে আজ তারা তারস্বরে উল্লাস প্রকাশ করছে— করুক! তাদের এই উল্লাস মরণ-আর্তনাদে পরিণত হতে খুব বেশি দেরি লাগবে না। এত রক্তদানের বিনিময়ে মরিচঝাঁপি যে শিক্ষাগুলি দিয়ে গেল তা অবশ্যই উদ্বাস্তু জনগণের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পথ আলোকিত করবে। আর এই সমস্ত সংগ্রাম, জনগণের অন্যান্য অংশের বিপ্লবী সংগ্রামগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে এই প্রতিবিপ্লবী কীটগুলিকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেই।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) তখন নিষিদ্ধ।
দলের মুখপত্র 'লিবারেশন'-এর জুলাই, ১৯৭৯ সংখ্যা থেকে গৃহীত।

পরিশিষ্ট ঘ

Refugee Resettlement in Forest Reserves: West Bengal Policy Reversal and the Marichjhapi Massacre

Ross Mallick

While boating down the Ganges delta on a visit to the Reserve Forest Tiger Sanctuary, I noticed on the bank some idols overlooking the river. When I asked about their significance, it was explained that a tiger had killed and carried off a girl; these idols were meant to ward off future attacks. Since I was on a tour with a West Bengal government Secretary who had police bodyguards to protect him against pirates and tigers, we had none of the apprehensions locals experienced. As the launch continued downstream, the conversation among the government officials took an unexpected turn. They talked of a massacre in the area of Untouchable refugees who had illegally settled in the protected forest reserve: the killings were said to number in the thousands of families.

Seeing the area of the massacre and realizing it was also a tourist attraction brought home the conflict between environmental preservation and development. In these natural surroundings tourists would never guess what it had cost to preserve the environment for their pleasure. Whether the sacrifice is worth making is something environmentalists will increasingly have to confront as human settlement encroaches on diminishing nature preserves. Learning that no

investigation had been undertaken, I sought to find out who was responsible. As the investigation led in a political direction, the Marichjhapi massacre raised questions of secular institutional failures and how Untouchables and other marginalized peoples were being presented in Indian studies by those claiming to represent them.

Ross Mallick is a development consultant
presently living in Kanata, Ontario

The Untouchable Refugees

The events leading up to the refugee massacre revealed a trail of communal and class conflict that had its roots many centuries earlier. The Muslims were largely Untouchables and lower castes who had converted to the more emancipatory beliefs of Islam while retaining their Bengali culture. The gap between the Muslim and Untouchable tenants was therefore arguably not as great as that between the Untouchables and upper-caste landlords, and in the colonial period Untouchables and Muslims were political allies in opposition to the Hindu-landlord-dominated Bengal Congress Party. In the colonial period the East Bengal Namasudra movement had been one of the most powerful and politically mobilized Untouchables movements in India and in alliance with the more numerous Muslims had kept the Bengal Congress Party in opposition from the 1920s. The exclusion of high-caste Hindus from power led to the Hindu elite and eventually the Congress Party pressing for partition of the province at independence, so that at least the western half would return to their control (Bandyopadhyay 1997; Chatterji 1994). Partition, however, meant that the Untouchables lost their bargaining power as a swing-vote bloc between high-caste Hindus and Muslims, and then became politically marginalized minorities in both countries. With the partition of India it was the upper-caste landed elite who were the most threatened by

their tenants and who had the wherewithal in education and assets to migrate to India. Even those not as well off had the connections to make a fairly rapid adjustment in India. The first wave of refugees were traditional upper-caste elite. Of the 1.1 million who had arrived by June 1948, 350,000 were urban middle class, 550,000 were rural middle class, a little over 100,000 were agriculturalists, and under 100,000 were artisans (Chakrabarti 1990, 1). Those who lacked town houses and property in India squatted on public and private land in Calcutta and other areas, and resisted all attempts to evict them. The failure of the Congress government to grant them squatters' ownership and its attempts at eviction provided the Communist opposition with a ready following among the refugees, who gradually came to be organized by Communist-front organizations. Faced with this resistance and the public sympathy they generated among their relatives and caste members, the Congress government acquiesced in the illegal occupations.

Back in East Pakistan the near-total departure of the Hindu upper-caste landed elite and urban middle classes meant that communal agitation had to be directed against the Hindu Untouchables who remained. Later refugees therefore came from the lower classes, who lacked the means to survive on their own and became dependent on government relief. Lacking the family and caste connections of the previous middle-class refugees, they had to accept the government policy of dispersing them to other states, on the claim that there was insufficient vacant land available in West Bengal. By doing so the Congress government effectively broke up the Namasudra movement and scattered the caste in refugee colonies outside Bengal, thereby enhancing the dominance of the traditional Bengali tricaste elite. However, the land the Untouchable refugees were settled on in other states were forests in the traditional territory of tribal peoples, who resented this occupation. The crops and agricultural works of the refugees were periodically destroyed or harvested by tribal peoples. "The soil is poor and there is no irrigation. Our crops are looted by the

local Adivasis [tribals], whom we cannot fight because they shoot with bows and arrows, but even more so because they get protection from the police, which is anti-refugee" (Khanna 1978). Little integration took place, and the Untouchable refugees were often given inadequate relief supplies, when these were not misappropriated by corrupt government officials. Prior to their resettlement, refugees often spent many years in prison camp conditions under capricious and corrupt camp administrators. Protests were often met with killings by police or with imprisonment. "Very few among the intelligentsia are aware that out of the 42,000 families who had been dragged and deported there, already nearly 27,030 families have perished; and only now 15,000 families somehow linger on below sub-human level!" (Biswas 1982, 18). There is virtually unanimous agreement that the conditions in many resettlement camps were deplorable, as numerous inquiries and official documents attest.

In this period the left-dominated opposition took up the case of the refugees and demanded the government settle them within their native Bengal rather than scatter them across India on the lands of other peoples. The Communist Party leader, Jyoti Basu, in prophetic words stated that it would not be "an easy, administrative affair to get rid of the refugees from their colonies" in West Bengal, and a "united movement would make it impossible for the government to carry out the bill's [eviction] provisions" (Chatterjee 1992, 279). The sites mentioned in West Bengal for resettlement were either the Sundarbans area of the Ganges delta or vacant land scattered in various places throughout the state. In 1976 there were 578,000 acres of vacant land in West Bengal, of which 347,000 could be readily reclaimed for agriculture. With 136,000 agriculturalist refugee families up to that time, the reclaimable land could have provided more than the 0.321 acres per capita land: person ratio then used by agriculturalists (Chatterjee 1992, 185). However, as it was dispersed it would have required a greater administrative effort to relocate the refugees on surveyed vacant plots

than to put them together in large encampments. While the creation of refugee colonies provided jobs for the rehabilitation department (which would have quickly disappeared had refugees been settled on vacant local land), the creation of colonies enabled the resettlement to go on for decades without resolution. In other states, for over twenty years the cost of the Dandakaranya Project alone has been 100 crores (U.S. $30 million), of which 23 crores has gone to administrative costs (Biswas 1982, 18). Thus, while the creation of new colonies was good for government contractors and administrative personnel, providing them with a vested interest in non rehabilitation, real solutions would have soon eliminated their careers and contracts.

While the upper-caste squatters were getting their colonies legalized and services provided, the Untouchables became exiled to other states where they faced often hostile local populations. Even the affirmative action programs for which, as Untouchables, they would have been eligible in West Bengal, were not recognized in the states in which they were settled, as their castes were not native to those states. The Leftist opposition could play on these grievances to obtain a political base among both the exiled refugees and caste members resident within West Bengal.

These grievances led to the organization of refugees within the resettlement colonies. The movement began in the Mana group of camps, where the refugees had been held for twelve years as virtual "prisoners of war" and "serfs" under military officers. The top officials were embroiled in a labor conflict with the lower administrative staff, who were more sympathetic to the refugees. In 1970 the top official encouraged the refugees to form their own organization, the Udbastu Unnayanshil Samiti (UUS), as a way of undermining the demands of the lower administrative staff. The organization instead supported the staff against the official, but the person who replaced him proved to be even worse. The UUS, however, continued to press the refugee demands for increased rations, the right to work outside the camp to supplement

rations, and the right to be consulted before being dumped in new sites. They led a thirteen-day hunger strike that resulted in increased dole but no say in resettlement, which continued to place refugees in dry and unviable locations. A second boycott in 1974 against refugee dispersal led to deaths from police firings. The following year the organization decided to launch a national movement for resettlement in the Sundarbans area of West Bengal. According to a handbill the organizers put out,

> In May, representatives of the Mana Udbastu Unnayanshil Samiti went by launch from Hasnabad to Marichjhapi in Gosaba police station. Opposite this 125 square mile sand bank rising out of the sea is a 100 year-old village. The people of the village told them that the tide did not rise above 5 feet. If we could have erected dykes 5 feet high to hold out the salt water and lived here for 100 years, why can't you? There is great potential for fishing. It would be possible for 16,000 families from Mana to settle just on the island, and nearby at Dutta Pasur another 30,000.
>
> (Chatterjee 1992, 376)

However, when the refugees started walking along the railway tracks to West Bengal they were arrested by the Congress government. When the leaders were released from jail after a year they found the Dandakaranya dispersal had been accelerated, but now the Left Front had taken power in West Bengal.

The Left Front Policy

In these new circumstances of accelerated dispersal and West Bengal Communist governance, it was decided to step up the campaign for resettlement in West Bengal. Contact was made with the Left Front and the Communist Party Marxist (CPM) front organization for refugees,

the United Central Refugee Council. "The exploitative Congress government has fallen and a new popular government has come to power" (Chatterjee 1992, 377). The West Bengal Left Front Minister, Ram Chatterjee, visited the refugee camps and is widely reported to have encouraged them to settle in the Sundarbans, which had been a long-held Left opposition demand. However, what the refugees could not have known was that Ram Chatterjee, who belonged to a smaller party in the Left Front coalition, was speaking for current Left Front policies rather than the forthcoming policy reversal that the Left Front was about to implement now that it was in power. The Left Front was a coalition of smaller parties that included consistent supporters of refugee resettlement in the Sundarbans, and the dominant CPM which effectively decided all government policies. This made for some initially contradictory policy pronoucements on the refugee issue as the parties moved from opposition to governance.

Having sold their belongings to pay for the trip, 15,000 refugee families left Dandakaranya only to discover that Left Front policy had changed now that the coalition was in power, and many refugees were arrested and returned to the resettlement camps. The remaining refugees managed to slip through police cordons, reaching their objective of Marichjhapi island, where settlement began. By their own efforts they established a viable fishing industry, salt pans, a health center, and schools over the following year (Mehta, Pandey, Visharat 1979).

The state government was not disposed to tolerate such settlement, stating that the refugees were "in unauthorised occupation of Marichjhapi which is a part of the Sundarbans Government Reserve Forest violating thereby the Forest Acts" (Refugee Relief and Rehabilitation Department 1979). It is debatable whether the CPM placed primacy on ecology or merely feared this might be a precedent for an unmanageable refugee influx with consequent loss of political support. When persuasion failed to make the refugees abandon their settlement, the West Bengal government started on January 26, 1979, an economic

blockade of the settlement with thirty police launches. The community was tear-gassed, huts were razed, and fisheries and tubewells were destroyed, in an attempt to deprive refugees of food and water.

Journalists were creating a problem for the government by reporting positively on the efforts of the refugees to rehabilitate themselves. The government therefore declared Marichjhapi out of bounds for journalists, a move which only served to alienate the press. An editorial in the Bengali daily Jugantar stated:

> Again today, the leaders of the state made caustic remarks about journalists– the Marichjhapi problem is apparently the creation of a few reporters. But journalists are society's eyes and ears, we are merely witnesses. A journalist has no ability to cause something to occur; s/he can only describe it. But sometimes events are such that an immaculately unbiased description sounds like strong censure.... The mouths of journalists can be stopped but not the flow of history.
>
> (Chatterjee 1992, 312)

However, the Chief Minister, Jyoti Basu, convinced that the media was indulging in sensationalism and contributing to the refugees' militancy and self-importance by reporting on their activities, suggested instead that the press should come out in support of their eviction in the national interest. This was accompanied by attempts at censorship and accusations against the "bourgeois" press for colluding with the refugees and opposition. There was no doubt the issue served to divide the Left Front coalition parties and could potentially alienate them from the 23 percent of the electorate who were Untouchables. However, these Untouchables were largely illiterate and since the radio and TV were government-owned, the resident Untouchable voters of other castes were less of a problem than might be supposed. In this respect

the Untouchables refugees were very different from the upper-caste, middle-class urban refugees of the immediate post-independence period, who were educated, well-connected, and politically influential.

The Chief Minister correctly pointed out that political opponents would find the issue useful for attacking the government, which is precisely what he had done when he was in opposition. The refugee leaders became divided on the extent to which they should rely on the opposition to fight their cause and whether an attempt to soloicit support within the Left Front should be continued. The squatters became split into two factions, with one group under Raiharan Barui opposing negotiations with the government in order to force it into recognizing the settlement, and the other group under Rangalal Goldar favoring talks with the Left to reach a compromise agreement. According to Goldar, "Raiharan antagonized the government by making inflammatory statements in the press, by getting mixed up in Opposition politics. When we invited people from the city to visit, he refused to let representatives of the Left set foot on the island. It was a terrible miscalculation. You cannot live in the water and make an enemy of the crocodile" (Chatterjee 1992, 378). Though we do not have Raiharan's version of events, the polarization seems understandable given the circumstances the refugees faced.

It was unlikely that a centralized party like the CPM could have been dissuaded by argument even if a more conciliatory approach had been taken. To have allowed one settlement would have been an invitation for other refugees to attempt the same thing, or for more migrants to come over from Bangladesh, as the CPM leadership feared. The press generally agreed with this position, but objected to what it considered the excessive use of force. That the CPM and other left parties while in opposition had argued for settlement only to change policies once they were in power was not unusual for politicians, however disappointing it may have been for their refugee supporters. While previous refugees had been allowed to remain and even had

gotten their squatter colonies legalized, this precedent was applied to influential upper castes of middle-class origin with plenty of relations and influence in the Bengali establishment. The Untouchable refugees had no such influence, despite the support of a few officials and intellectuals. Thus, while the traditional elites were accommodated in West Bengal, the much larger number of lower classes and castes which the government knew it could more easily evict would have been a greater imposition on the state.

The refugees were well aware of their inherent disadvantage as Untouchables, so they emphasized the common ethnic origins and refugee experiences that they shared with many elite families.

> Every day countless non-Bengalis come to this state in search of work. The Left Front government does not put them on trains and return them to their own states. Thousands of people live unlawfully on the footpaths of Calcutta and the stations of West Bengal contributing to an unhealthy atmosphere. But the government does nothing about them. Is it because we are Bengalis that there is no place in this state for the refugees of Marichjhapi?... Marichjhapi is not the only squatter colony in the state. The Marichjhapi refugees did not ask for money from the government, nor did they squat on other people's property, they had only wanted the government's scrub and marshy waste lands. So I ask, what harm did the Marichjhapi refugees do to the Left Front government? Caste Hindus live in the other squatter colonies, and there were only Scheduled Castes [Untouchables] at Marichjhapi. Is that why there is no space for the people of Marichjhapi in this state?
>
> (Chatterjee 1992, 356)

The refugees also appealed to the national untouchable federation BAMCEF led by Kanshi Ram, but in those days it was not the powerful organization its offshoot the Bahujan Samaj Party subsequently became (Mendelsohn and Vicziany 1998). In commenting on the plight of the Namasudra refugees, Kanshi Ram observed the uniquely desperate situation this untouchable caste had been subjected to in the aftermath of partition.

> Immediately after the exit of the British in 1947, there was a sharp and steep slump in the Namasudra Movement. The partition of India ruined many a people, but those harmed maximum were the Namasudra. Not only the people and the community were ruined, but also their movement was completely destroyed. Today the Namasudra are the rootless people. Divided in two countries, their roots are in Bangladesh and branches in India. Bangladesh government is always eager to uproot them, whereas the government of India and West Bengal are ever angry and hostile.
>
> The massacre of Marichjhapi and the sad plight of those in Dandakaranya, Andaman, Nicobar and elsewhere tell its own tale. After all this if they are expecting some help or sympathy from the High Caste Hindus, they are hoping against hope....
>
> Unfortunately the CPI(M) Government was unable to see ability in them. They say, they do not believe in caste considerations, they include people in the cabinet on the basis of their ability. And on this consideration, they had not included any Scheduled Caste in the Cabinet of West Bengal. But the Scheduled caste people still cling to CPI(M), perhaps they are helpless and [have] nowhere to go.
>
> (Ram 1982, 4)

With no national party prepared to take up their cause, the Untouchables were indeed without powerful allies. Institutions of the central government such as the Scheduled Castes and Tribes Commission that had an obligation to defend the Untouchables' human rights' did not publicly intervene (Sikdar 1982, 22). The attempt to interest the media and some intellectuals proved partly successful. They were invited to a feast on the island at which refugees who barely managed one meal a day scraped together lavish meals for their influential guests to get their message across. Supporters raised funds and supplies, and some officials colluded in efforts to get these to the refugees. In order to ensure press coverage after the blockade, a refugee, Saphalananda Haldar, evaded police patrols and swam to the mainland where he informed the Calcutta press of police firing in Kumirmari. They published the story along with his name, which resulted in his arrest. Police shooting and killings of the refugees in various places were causing adverse comment in the press. The refugees were not without sympathizers in the outside intelligentsia and even in the government administration and Left Front cabinet itself. Within the ruling CPM there were members who felt the government should have been trying to rehabilitate the refugees in order to develop a party base, rather than resorting to force.

The press reported police tear-gassing of refugees, the sinking of their boats which they needed to obtain rice and drinking water, and arrests of people attempting to work on the mainland or sell firewood from the reserve forest. With starvation deaths occurring amount the squatters the situation was taking a desperate turn. On January 27, 1979, the government prohibited all movement into and out of Marichjhapi under the Forest Preservation Act and also promulgated Section 144 of the Criminal Penal Code, making it illegal for five or more persons to come together at any given time. However, the refugee supporters appealed to the Calcutta High Court, which ruled against interference in the refugees' movements and in their access to food

and water. The government then denied the refugees were subject to any blockade and continued the blockade in defiance of the High Court. Since the police union was under CPM control, the court system had been effectively bypassed in this instance. Though some of their number died of starvation and disease, the refugees would not give up. When police actions failed to persuade the refugees to leave, the State Government ordered the forcible evacuation of the refugees, which took place from May 14 to May 16, 1979. Muslim gangs were hired to assist the police, as it was thought Muslims would be less sympathetic to refugees from Muslim-ruled Bangladesh. The men were first separated from the women. "Most of the young men were arrested and sent to the jails and the police began to rape the helpless young women at random" (Sikdar 1982, 23). At least several hundred men, women, and children were said to have been killed in the operation and their bodies dumped in the river. Photographs were published in the *Ananda Bazar Patrika*, and the Opposition members in the State Assembly staged a walkout in protest. However, no criminal charges were laid against any of those involved nor was any investigation undertaken. Prime Minister Desai, wishing to maintain the support of the Communists for his government,, decided not to pursue the matter. The central government's Scheduled Castes and Tribes Commission, which was aware of the massacre, said in its annual report that there were no atrocities against Untouchables in West Bengal, even though their Marichjhapi file contained newspaper clippings, petitions, and a list with the names and ages of 236 men, women, and children killed by police at Marichjhapi prior to the massacre, including some who drowned when their boats were sunk by police. The refugees themselves complained to visiting Members of Parliament that 1,000 had died of disease and starvation during the occupation and blockade (Sikdar 1982, 23). "Out of the 14,388 families who deserted [for West Bengal], 10,260 families returned to their previous places... and the remaining 4,128 families perished in transit, died of starvation, exhaustion, and

many were killed in Kashipur, Kumirmari, and Marichjhapi by police firings" (Biswas 1982, 19).

The CPM congratulated its participant members on their successful operation at Marichjhapi and made their refugee policy reversal explicit stating that "there was no possibility of giving shelter to these large number of refugees under any circumstances in the State" (CPM West Bengal State Committee 1982, 14). Within the CPM there was some dissatisfaction with the way the party leadership had handled the question. Many CPM cadre felt the leadership had dealt with the problem in a "bureaucratic way" when it could have used the issue to develop a mass movement of behalf of the refugees. The Communists had large refugee organizations which could have organized the refugees and brought them to West Bengal. Instead of utilizing the situation to rehabilitate the refugees and in the process develop a solid Communist base among them, the CPM resorted only to force. The CPM cadre who were unhappy with the policy, however, could do nothing; no one on the CPM State Committee opposed the State Secretary, Promode Das Gupta, on this issue. However, not all Parties and Ministers in the Left Front coalition Cabinet favored the eviction, preferring to support the refugees instead. The Revolutionary Socialist Party (RSP), which had a political base in the Sundarbans and was in the Left Front government, opposed the decision, as did other Left Front supporters. The RSP Minister, Debabrata Bandyopadhyay, was not given a new portfolio after the subsequent election which "did not show the CPI(M) in a commendable light" (Bhattacharyya 1993, 134) His exclusion from the cabinet was attributed to his efforts to eradicate corruption in CPM-controlled village councils, though his opposition in cabinet to the eviction may have been a contributing factor. His successor, the number two CPM Minister, Benoy Chowdhury, years later was not renominated for a party seat after he complained about how corrupt his party had become (Nagchoudhury and Sengupta 1996, 89). After the CPM had come out in opposition to resettlement, the

refugees were unlikely party supporters and the CPM leaders may have felt other leftist parties might take the opportunity to develop a base among the refugees in opposition to them.

> Even if it is admitted that the refugees should not have left Dandakaranya in so sudden a manner after selling out everything they had, the Left Front Government should have shown some consideration for those whose total participation in the Left's struggle against the Establishment and whose kith and kin in West Bengal voting concertedly for the Left Front enabled it to hit the Writers' Buildings [take state power].
>
> (Chakrabarti 1990, 434)

In a final twist to the episode, the CPM settled its own supporters in Marichjhapi, occupying and utilizing the facilities left by the evicted refugees. The issues of the environment and the Forest Act were forgotten. A Professor of Medicine from the All India Institute of Medical Sciences, who visited the refugees in Dandakaranya shortly after their return, told me that those who came back were now dispossessed, having sold their land and belongings to make the trip to West Bengal, while those who had remained behind were better off. An air of gloom hung over the refugee colonies and the people went about their lives in a mechanical way without enthusiasm. Though Indian Administrative Service Secretaries of the West Bengal government, who worked on a daily basis with the Left Front Ministers, revealed to me the killing and raping, the hiring of Muslim gangsters, the resettlement by CPM supporters, and divisions in the Cabinet over the eviction, they did not have the names of the gangsters and policemen who actually committed the atrocities. The failure of the government to investigate what happened meant that this information was never compiled. Had the Left Front government felt it was being

unfairly maligned by the atrocity reports, it could have ordered an independent inquiry to exonerate itself. The accuracy of the allegations and the involvement through acts of commission and omission by the Chief Minister and Prime Minister Desai, among others, make such an investigation unlikely. A journalist of the Bengali daily Jugantar noted:

> the refugees of Dandakaranya are... mainly cultivators, fishermen, day-labourers, artisans, the exploited mass of the society. I am sorry to mention that they have no relation with the elite of society. If it is a matter of anybody of the family of a Zamindar, doctor, lawyer or engineer, the stir is felt from Calcutta to Delhi, but in this classified and exploited society, we do not feel anything for the landless poor cultivators and fishermen. So long as the state machinery will remain in the hands of the upper class elite, the poor, the helpless, the beggar, the prostitutes and the refugees will continue [to be victimized].
>
> (Sikdar 1982, 23)

The subsequent silence in the Bengali academic community about what so many knew happened at Marichjhapi is indicative of the intellectual dominance of certain perspectives and the acquiescence of this intellectual elite in the abuses. For the next thirteen years the only reference to the massacre in the academic literature was in a summary of the West Bengal human rights record by Sajal Basu (1982, 168).

> Both the CPI(M) led left parties and Congress (I) prefer to continue in violence-prone activities, causing casualties and eviction of cadres from localities. As a ruling party, CPI(M) has forcefully evicted middle peasants belonging to non-CPI(M) groups. Police torture on CPI(M-L) [Communist Party of India Marxist-Leninist] and SUC (Socialist Unity Center) cadres,

> violent eviction of Marichjhapi refugees, incidents at Panshila symbolise CPI(M)'s violent orientation. The Congress (I) too has its inner troubles being expressed in street fights, its affiliated mastans are again active in violent activities.

At the time of the killings the opposition made unfavorable comparisons with the British massacre at Jallianwallabagh. Their argument was that the Marichjhapi massacre may have exceeded in numbers the Jallianwallabagh massacre and the massacre of eighty Communists in West Bengal in 1958, but the refugees had no influential backers to publicize their cause in movies and history books. Jallianwallabagh was investigated by the Hunter Commission, but Marichjhapi was soon forgotten, except by the Untouchables themselves. The "crime was white-washed and most culprits went not only unpunished, but remained in service and... in some cases were even rewarded" (Guha 1989, 279). Though M. K. Gandhi refers here to Jallianwallabagh, it could just as easily apply to CPM and Congress massacres. While the massacre of nationalists or communists elicits the reaction of powerful constituencies with an intellectual community to publicize their cause, in this case the refugees had virtually nothing. After the massacre of Communists by the Congress government, Jyoti Basu stated in the Assembly that there was nothing but dead bodies between him and the government benches. This incident has been commemorated ever since on "Martyr's Day." The Communists' own massacre created a much more muted reaction and was soon forgotten. When Congress faced a similar situation with refugees they cut off aid, but unlike the Left Front they did not resort to blockade, eviction, and police firing. In this comparable respect the CPM was more repressive. Whether this reflected a party ideological difference between self-avowed Gandhianism and Stalinism or simply the different personalities of the responsible leaders is difficult to determine. The CPM supported the Tiananmen Square massacre, which has some parallels with its own

practice, but given the marginality and isolation of the refugees there was limited domestic and no international publicity.

> In 1961 when Dr. Roy [West Bengal Congress Chief Minister] ordered the despatch of the camp refugees to Dandakaranya and when 10,000 of them refused to move he did not use force to transport them there although he suspended the payment of cash and dry doles and withdrew the amenities enjoyed by the camp refugees. He did not also force them out of the camps. The refugees continued to live at the ex-camp sites and to fend for themselves without any government help and finally got themselves integrated into the economy of the region. But the Marxist Government had no compunction in driving out precisely those refugees who, according to their own statistical evaluation of the amount of surplus land available in West Bengal, could have been absorbed in West Bengal."
>
> (Chakrabarti 1990, 434)

The CPM succeeded where the Congress Party failed because it was prepared to kill men, women, and children. Neither the Congress or the CPM was a good practitioner of their respective idols' philosophy and practice, but ideology even in the context of Indian politics may make some difference. However, as the record indicates, police killings under Congress regimes were not uncommon, and the numbers who did die through the neglect of Congress regimes may well exceed those killed in the Marichjhapi eviction.

The lack of an investigation means that various estimates of the killings continue to circulate years after the event. While Atharobaki Biswas is very specific in stating that 4,128 families died in transit from starvation, exhaustion, and police firings, Nilanjana Chatterjee indirectly

corroborates this figure. Dr. Chatterjee states that by the time of eviction was completed on May 17, 1979,

> at least 3,000 refugees had secretly left Marichjhapi and scattered across West Bengal.... At the end of July 1979, a spokesman for the Dandakaranya Development Authority announced that of the nearly 15,000 families who had "deserted", around 5,000 families (approximately 20,000 refugees) had failed to return. The final deadline for them to re-register with the project was extended yet again to 31 August 1979 and the matter was considered officially closed.
>
> (Chatterjee, 1992, 300)

From these figures (20,000-3,000) it can be estimated that as many as 17,000 people died, and if based on her calculation of four per family, this represents 4,250 families, which is almost exactly the figure given by Atharobaki Biswas. Though these people are missing and presumed dead, no breakdown of how or where they died was ever undertaken. An IAS Secretary of the West Bengal Government who worked with the Ministers involved in the eviction decision said the bodies of the victims at Marichjhapi were dumped in the river to be washed out by the tide. This will make the exhumation of bodies as was undertaken in Bosnia and Cambodia impossible, and in this macabre sense the refugees selection of the Sundarbans was to prove not only unfortunate in their lives but in uncovering their deaths as well, since there were no human settlements downstream to observe the bodies.

The Marichjhapi massacre raises a number of disturbing ethical and legal questions. As a democratically elected government, the Left Front undoubtedly had the obligation to implement laws and enforce forest protection. As the refugees were not residents of their state, though Indian citizens, the state government was arguably less obligated to the refugees than to their own voters, who had prior demands on the

state's limited resources. However, in ignoring the Calcutta High Court ruling their right to evict might be questioned. It is unlikely anyone would put on paper an order to rape and kill the refugees; however, under the circumstances of West Bengal it was entirely predictable that this could result from an attempted eviction. Certainly the hiring of Muslim gangsters indicated a willingness to use extra-legal methods. As it is common knowledge that the police rape and torture people to death with de facto immunity from prosecution, and over 6,000 political murders have been calculated to have taken place under the Left Front, the likelihood of significant abuses was foreseeable (*India Today*, 31 August 1995, 31; Amnesty International, March 1992, 2). The killings were already occurring and being reported in the press well before the main massacre; there was ample opportunity for the state leaders to stop further abuses had they so desired. As this was an eviction ordered by the CPM state committee and the Left Front cabinet, their failure to ensure proper supervision of the operation so that excess force would not be used makes them morally and perhaps legally culpable for rape and mass murder. Their failure to investigate the abuses after the fact means that not only do the actual rapists and killers remain unpunished, but the cover-up that followed implicates those who ordered the eviction in the first place.

Environmental Priorities

The Chief Minister declared that the occupation of Marichjhapi was illegal encroachment on Reserve Forest land and on the state and World Wildlife Fund-sponsored tiger protection project. Jyoti Basu stated that if the refugees did not stop cutting trees the government would take "strong action." "Enough is enough. They have gone too far" (Chatterjee 1992, 298-99). The World Wildlife Fund (WWF) and other conservationist groups appear not to have taken any official positions on the subject, which was expedient given the controversy that might have arisen from foreign interference. The brutality of the illegal blockade

as well as the self-avowed Stalinism of the ruling CPM (Stalin's rather than Gorbachev's portrait was displayed at their 1989 Congress) made any public declaration of support for the action unlikely.

There appears to be nothing on record indicating any pressure on the government for eviction from any environmental non governmental organizations (NGOs) or other non-state groups. No lobbying seems to have been necessary to make the government undertake the eviction on behalf of interests that included the environmental movement. While not involved in the eviction, the environmental movement nevertheless achieved a victory from the result, though the massacre was not something the environmentalists publicized. It was widely known that indigenous peoples were being evicted by conservation projects, but as this population was estimated at 600,000 (of whom two thirds were uncompensated), it was unrealistic to expect environmental NGOs to provide relief on this scale (Fernandes, Das, and Rao 1989, 78). The West Bengal government had asked the central government for funding to rehabilitate the refugees; the central government refused. Had funding been forthcoming alternate arrangements for the Marichjhapi refugees might have been undertaken. Since persuasion was unlikely to make the refugees leave, vacant land in the state would have been required to induce them, but such innovative solutions appear never to have been seriously considered, perhaps because of the administrative burden this dispersal would have entailed.

That schoolchildren in Britain, Belgium, Holland, and Germany were raising money for Project Tiger was already a matter of some Indian concern. A former Chief Conservator of Forests defended this practice of taking foreign aid for Project Tiger by downplaying its contribution in financial terms while arguing for its political importance. "The WWF's money utilised in India so far is a mere 35 lakhs [U.S.$100,000]; five per cent of the Project's budget. Even this pittance of 35 lakhs was accepted to enable the world community to have a sense of involvement in the campaign to protect a 'World Heritage'" (Shahi 1978, 14). However, the

Chief Conservator noted that the greatest sacrifices were being made by the forest dwellers themselves. "It was therefore laudable for European children to raise funds for saving tiger in another continent but equally praiseworthy, if not more, has been the silent and untrumpeted sacrifice of those who have shifted their century-old villages lock-stock-and-barrel and of the thousands of tribals who forsook their sources of livelihood" (Shahi 1978, 9). Dr. Karan Singh, Chairman of the Project Tiger steering committee, was criticized for putting the interests of tigers ahead of people, as were other supporters of indigenous peoples' displacement. The prosecution of a villager who killed a tiger with an oar when it attacked his companions raised questions of the relative value of human life versus endangered species. That European children were raising money to preserve animals that ate poor Third World children probably escaped the notice of animal rights campaigners. "WWF literature started to blame the poor for being the 'most direct threat to wildlife and wildlands'" (Chatterjee and Finger 1994, 70). "WWF founders originally chose the rhino because they did not want people to think of WWF as just a 'save a cute animal' organization. What they apparently quickly learned was that, although the principle may have been ecologically and ethically correct, it was not politically expedient. The panda and, subsequently, the Bengal tiger, the gorilla, the elephant and many others were necessary to rally attention, call for action, and, not least, support the organization" (Princen and Finger 1994, 150). Inevitably, such organizational imperatives necessitated downplaying and ignoring the human costs paid by poor people for environmental preservation. A typical example was the *National Geographic Explorer* television program, which did not allow the villagers to speak for themselves on this issue. Instead, a narrator states that the man-eating "tiger doesn't just mean death, the tiger means life, because the tiger protects the forests which gives them food for their families. They know the tiger is necessary for the world to be whole, and the tiger is a price to be paid." The fact of the

matter is that the villagers would be better off if the tigers were nonexistent so that the villagers would be able to exploit the forests in safety. Tigers can only provide forest protection against defenceless people who have to go into the forest for their livelihood, regardless of the dangers. Tigers are no match against poachers or the forest contractors. For poor people there is no advantage to having tigers for it is they who pay the price with their lives, while the tourist operators and the politicians they finance reap the benefits. This is not something National Geographic is likely to say on television, so a folklore is invented to pretend there is a mutual dependency that makes the lives lost seem a necessary and accepted price to pay for conservation. It is the poor that pay the price and the rich who benefit, but this is not something that is palatable with western audiences, who like to think only about how much benefit they can provide by saving the tigers in a win-win situation.

Though Marichjhapi was covered in the Indian press, it apparently received no international coverage, and the only academic study came over a decade later in an unpublished doctoral thesis by Nilanjana Chatterjee. The World Wildlife Fund escaped association with the eviction, but the contradictions inherent in its policies subsequently came to international attention when it was found to be aiding Zimbabwean and Kenyan authorities to purchase helicopter gunships and assault weapons to enforce shoot-to-kill policies against poachers. "This case demonstrates that very different standards are proposed in the Third World to those that would be accepted in the NGOs' northern homes. Again, when technical considerations are allowed to displace moral ones, some very contentious policies arise. WWF's actions, once publicized, generated an outcry in Britain" (Yearley 1996, 217).

The practices of environmental organizations do not appear to have been changed by this experience. While "the Burmese army is razing entire Karen villages, killing, raping, enslaving, to make way for the biggest nature reserve of its kind in the world... to attract millions of

tourists," the deaths of thousands of villagers has not prevented environmental organizations from cooperating with the military dictatorship (Levy, Scott-Clark, and Harrison 1997, 5). In defending their work with the Burmese government, the New York-based Wildlife Conservation Society science director stated, "We do not sanction forced relocation, torture or killings. But we have no control over the government." The Smithsonian Institution spokesman has said about their presence in Burma: "We are there to do important conservation work. We may disagree with a regime but it is not our place to challenge it." A WWF director stated "Sometimes we have to deal with repulsive regimes.... We have to weigh up whether the conservation benefit is worth the risk of being seen, directly or indirectly, to be supporting those regimes" (Levy, Scott-Clark, and Harrison 1997, 5). Since all aid supports a regime by providing foreign exchange or substituting for it in goods and services, these programs need to be very carefully considered to determine that the donor interests are not superseding the interests of the poor people must affected by it.

If conservation groups are currently willing to associate with a military dictatorship undertaking massacres and forced labor to create wildlife sanctuaries, it can be assumed that their attitude to the democratically elected government of West Bengal would not have been any different, though in Marichjhapi they managed to avoid international media coverage. As a Bengali newspaper observed, "The lives of the trees in Sundarban are certainly of value but surely the lives of these shelter-seekers are not without value" (Chatterjee 1992, 338-39). The settlers and their supporters questioned the bone fides of the government as a protector of the environment. Any attempt to develop the Sundarbans as a nature preserve and tourist attraction would lead to the usual bureaucratic corruption and inefficiency with "armies of experts, the squandering of World Bank funds and little to show for the effort except mountains of reports" (Chatterjee 1992, 340). Responding to complaints that the refugees were destroying the

experimental coconut plantations on Marichjhapi, they called attention to the Forest Department's "misuse of government funds." In a few months, by contrast, they had by their own efforts created twelve settlements, laid out roads and drainage channels to prevent water logging, as well as built a school, dispensary, smithies, a pottery, cigarette workshops, a bakery, seven fisheries, boat building yards, 170 boats, four market place with 300 stalls, and the beginning of a major dike system to hold back the tide (Chatterjee 1992, 340-41). While this might appeal to those more inclined to development, there was no doubt that the state position was closer to an environmentalist agenda, even if in practice their system was inefficient and corrupted. This conflict between environmental preservation and peoples' rights goes to the heart of the trade-offs between human rights and ecological preservation. There are costs from environmental preservation to people who are displaced as a result or who lose opportunities for life improvements through denial of land access. In the case of Marichjhapi it was the poorest people who paid with their lives, while the benefits went to the animals, tourists, and tourist operators. Tourism, in requiring pristine environments, creates an incentive for big business and the state to set aside areas that might otherwise be used by poor people for subsistence. While this may generate economic benefits they rarely are realized by the people being displaced and certainly not by the Marichjhapi inhabitants. Even this benefit may be debatable since the facilities left by the refugees were later inhabited by followers of the ruling CPM, which means the environmental improvement was not realized, even if a potentially more environmentally detrimental influx of refugees may have been prevented.

The environmentalists have not taken a position on the massacre and were not implicated in it, but on the other hand none are known to have opposed it or taken up the issue. The West Bengal government, which did the unpleasant work on behalf of environmental preservation, were alone in being blamed. That Congress had failed to use force to

evict their predecessors may have encouraged the refugees to think the Left Front would be at least as tolerant. Without attractive alternate settlement arrangements as an inducement, only force could have succeeded in achieving the eviction. It is difficult to remove thousands of families who are prepared to risk death, even when they are unarmed. Such determination, which at one time would have been considered heroic and pioneering, had become anti state subversive, and environmentally unfriendly. As resources diminish there are likely to be more struggles by poor peoples that will place them in conflict with environmentalists. Unless environmentalists are prepared to spread the costs of preservation so that the poorest people are not the only ones to pay the price, there will continue to be resistance to the imposition of alien values on these marginalized people. All too often the environmental movement uses its influence with Third World elites to obtain preservationist policies detrimental to the poorest people dependent on these natural resources. Unless prior arrangements for alternate livelihoods are made and compensation paid, the pursuit of a preservationist agenda will result in human tragedies.

As with Marichjhapi, human rights abuses can result from tourism and environmentalism without direct pressure by these interests on governments for eviction. By developing a business interest in preservation, ecotourism creates a lobby for government policies that place new value on these areas, which would otherwise be seen as wastelands suitable for settlement and more conventional forms of development. Once the West Bengal government recognized their value as a tourist attraction, this potential was certainly more attractive than another refugee influx. The state ultimately failed to realize the tourist potential through poor infrastructure development (Montgomery 1995, 27-28), but even without a significant tourist industry, as an idea for future development it could influence government policy without being implemented. The successful preservation could be seen as an unambiguous victory for environmentalism as long as the massacre was not exposed.

Much of the environmentalist literature portrays indigenous peoples in harmony with nature and resistant to encroachment by big business and government over their livelihoods. This portrayal offers poor people as potential allies for environmentalists against megaprojects. This indigenous eco-consciousness, however, is often more a technological constraint necessitated by poverty. Poor people who degrade the environment do not conform to the way environmentalists need to portray them. and therefore tend to be ignored in the literature. The Marichjhapi refugees were environmentally unfriendly and so offered no campaign opportunity for national or international conservation groups. The government by adhering to an environmental agenda did not have to face the opposition that came from movements such as that against the Narmada dam, which operated within dominant environmental paradigms and could make international environmental linkages (Baviskar 1995). In fact, the tribals to be displaced by the Narmada dam were just as environmentally destructive as the refugees, but the outsiders who organized them against the dam were able to falsely portray them to the outside world as environmentally conscious and therefore suitable allies and victims in the struggle against megaprojects. They were able to tap into in international environmental lobby that ended World Bank funding and whatever influence the Bank might have brought to bear on the Indian government to provide the tribals with adequate compensation. The refugees, despite a resistance that surpassed anything the environmentalist movements mustered, died unknown deaths because they did not conform to external perceptions and interests in Indian society or lobbies in the western world. What they were successfully undertaking in development was insufficient to overcome the stigma in the dominant society over environmental destruction. They were following the traditional path to development, which was no longer considered fashionable in frontier areas. Governments had drawn a border line around the forests and nothing more was to be converted to farmland. In these circumstances

it is difficult to see how the refugees could have "packaged" their cause in terms that could have appealed to dominant domestic and international opinion.

Untouchable Representation

After visiting the Dandakaranya refugees in central India and seeing that they were in no position to make an international protest about the Marichjhapi massacre, I sought to put it on record. However, the United Nations Commission on Human Rights in Geneva told me they were flooded with thousands of complaints, indicating nothing would be done. Amnesty International did not respond to my letters, and Human Rights Watch responded with form letters that gave no indication the material had been read. A visit to the Amnesty International headquarters in London resulted in advice to emulate the strategy of gay rights' activists of enrolling members in the organization to boost its priority, an approach Untouchables and other marginalized Third World peoples are unable to follow. In Washington with the help of a contact I was able to receive a personalized response letter from Human Rights Watch, but still no indication the material was read or action taken. Submitting the case to academic journals did not result in any evaluations or attempts at refutation. The editor of one leading academic journal wrote me "that after all this time... we have yet to obtain one solid outside referee report on your manuscript. We have solicited several referees and some have even accepted the task, only to have the ms [manuscript] returned to us in a few weeks with a terse statement that they felt unable to provide the promised report." After several years the direct approach of exposing the human rights abuse was deferred to placing it within a framework that might appeal to academics through three versions aimed at a range of academic journals. Without a receptive outlet for such material, I had suggested to a Harvard professor, who had researched Untouchable movements, that

since Untouchables numbered 140 million people, representing nearly 3 percent of humanity, a journal on them might be started, but he rightly pointed out that even if funding could be obtained not enough people would write for it to be sustainable. Books offered the alternate venue but when I sent an Untouchable memoir to eight specialists in the field none were willing to facilitate publication. Since 68.6 percent of university press books are subsidized by subventions from outside sources, and the publication rate for unintroduced manuscripts is, according to two surveys, 0.38 and 0.57 percent, "to get a book published, recommendation through an informal circle or network is close to being an absolute necessity" (Powell 1985, 230, 169, 171-72). The obstacles to Untouchable human rights publication are considerable, while what is published by scholars on untouchability is often of little interest or use to Untouchables, raising questions of whether collaboration is worthwhile.

These failed attempts at representation are significant because it indicates the problems in presenting human rights abuses from the point of view of victims rather than of intellectuals. At the same time academic outlets are particularly important in the absence of other forums for redress. It is known that international agencies have been largely ineffective in preventing or punishing human rights abuses, but at least many abuses get put on the record and receive some degree of international publicity. For really marginalized groups such as the Untouchable refugees, without a significant western middle-class diaspora to take up their case, such attention is not forthcoming, even from groups specifically devoted to uncovering human rights abuses.

Scholars are constrained not to criticize regimes that provide them with research access. One scholar of West Bengal noted that his research in that state required not only an Indian government visa but permission from the ruling Communist Party as well. The Shastri Indo-Canadian Institute even warns academic grant applicants that "the

Government of India does not permit research in strategic areas or on sensitive regional, political and social themes" (Shastri Indo-Canadian Institute 1998, 5). There is a history of some intellectuals ignoring the human rights abuses of "progressive" regimes, but in West Bengal press coverage of these abuses makes ignorance or omission less excusable. Rural Untouchable segregation and discrimination is hardly touched on in the Bengal literature. Land redistribution figures are given without mentioning how many beneficiaries subsequently lost their land. A West Bengal government sample survey found more beneficiaries were losing their land than being newly recorded, indicating that the land reform was a fiasco. Though this deficiency is too obvious not to have occurred to scholars, no such survey is undertaken, making their research useless for serious policy implementation purposes, however beneficial it may be for academic careers. If business only reported profits and never their losses they would lose credibility, but analogous land reform research using only cumulative redistribution is undertaken, perhaps because it will be inoffensive to the regime granting access. On the other hand, marginalized peoples have no equivalent influence over scholars since they cannot read their work, unlike the dominant intellectual elites. Frank assessments therefore require acceptance that it may not be possible to continue in the field, an approach many scholars having made a considerable investment in the subject will wish to avoid. Not a few say things privately that appear very differently in print, indicating research may have been compromised.

Human rights abuses may be tangential to academic interests, but without an awareness of these abuses, academic analysis can be untenable. For instance, as recently as 1996 a Princeton professor described the Left Front as providing "good governance" (Kohli 1996, 121). The London School of Economics political scientist, T. J. Nossiter, stated "If, and I believe it, Rajiv Gandhi, did say at his first meeting with Jyoti Basu after becoming prime minister that the chief minister

was more fit for the role, the comment was not only a gracious courtesy but a proper tribute to Basu's standing" (Nossiter 1988, 139). As long as abuses such as Marichjhapi cannot get into the academic literature, this may seem plausible.When justice institutions are largely nonfunctional, academic exposure of injustice is that much more important. With 230,000 cases pending in the Calcutta High Court alone, justice is virtually impossible, with the resulting increase in lynch mob killings (Banerjee 1995, 137). In the absence of interest in the human rights abuses, politicians get away with mass murder. The Marichjhapi massacre was not that much different from Bosnian massacres, but at least in Europe the politicians responsible got indicted and had to go into hiding. The West Bengal Chief Minister makes frequent trips to the West without a question being raised about the massacre in public meetings. In the absence of this issue, Jyoti Basu was able to make a bid for the Prime Ministership of India in May 1996, which was only prevented by his CPM central committee voting 35 to 20, in what he called a "historic blunder," to refuse to lead a minority national government (Nagchoudhury 1997, 29). The CPM has since reportedly had second thoughts, and Jyoti Basu could become Prime Minister if another favourable conjuncture arises.

What eventually tarnished the Left Front image was not a massare at the beginning of the regime but the corruptions that were perhaps inevitable in any long ruling government (Sen Gupta 1997, 905-17). The powerful middle and upper classes did not like to see their taxes misappropriated, and regime image changed more from elite corruption than human rights abuses against the lower classes. A veteran party leader and former Chief Minister of Tripura was expelled for criticizing the Chief Minister's son's business acquisitions in a pattern similar to the business activities of the families of Chinese Communist Party leaders. Press investigations found funds from a Rs. 2,500 crore ($US 757 million) Personal Ledger Account had been appropriated by the Communist Party. Government-subsidized residential plots were illegally

sold at a small fraction of market value of Calcutta High Court judges (Plot No. FD429, FD434, GD346, CL16), relatives of the Chief Minister (FD452), Ministers IA29, FE145, AL210, BH97), and scholars supportive of the regime, including a coeditor of the subaltern series and son-in-law of the Advocate General (Plot No. FE14), and the husband of Jyoti Basu's authorized biographer (EE block, Sector 2, Plot 5) (Banerjee 1997, 22-23). Though these people cannot be expected to investigate their own illegal land occupation, given their subaltern class perspective they could have used their proven government influence to investigate or at least publicize the massacre of fellow illegal land occupants at Marichjhapi. That this elite gets away with what poor people are killed for discredits secular governments and institutions with the electorate and contributes to the rise of caste, regional and religious parties which have come to dominate Indian politics. The post-independence years were marked by not only the dominance of the secular Congress Party in government but the secular Communist Party in opposition. This is no longer the case. The governance problem that corruption presents has been attacked by the Supreme Court and elements in the bureaucracy that have attempted to bring politicians to justice, and the fact that I could get information from senior administrators about the Marichjhapi massacre represents a part of this effort. However, any hopes they may have had that my efforts would result in the attention of international human rights organizations or academic publication having any effect are yet to be realized.

Though every politically informed intellectual in the state seemed to have heard about the massacre, it never appeared in the subaltern series or any other academic publication. Nossiter was informed about the massacre, but most foreign scholars probably never read the Indian press of the period, and local reticence to my questions on the subject indicated most foreigners might not have known. Their praise of the regime is therefore based on ignorance of what went on rather than deliberate deception. This would indicate that when it comes to human

rights and governance the Indian press rather than academic literature is the more informative. The absence from the subaltern series of subaltern voices that expose human rights abuses by the regime indicates that despite a theoretical adherence to granting an autonomous subaltern voice free of intellectual substitutions, in practice only voices that conform to certain dominant intellectual norms are tolerated. The fact that a human rights abuse had to be put within the guise of issues that appeal to scholars is perhaps a fair compromise between subaltern victims and the need to reach intellectuals. Nevertheless, it is a significant shift in perspective that has to be noted. Representing marginalized peoples is fraught with the dangers of misrepresentation, but with human rights abuses these representations can be very clear. However, even the most straightforward example of exposing a massacre in the hope of obtaining justice for victims is no easy matter given the inadequate institutional avenues for redress and the inclinations of scholars with other priorities and perspectives. Academic outlets as publications of record can at most be only a first step to obtain redress, but without the inclusion of human rights abuses in them, much of social science and humanities analysis will misrepresent the societies they study. The virtual absence of reports on human rights violations in the academic literature shows gross misrepresentations of what goes on in the society and serves to discredit the academic community as marginalized peoples become aware of how they are being portrayed. As the All-Bengal Namasudra Association put it to the Simon Commission in 1929, "It has been seen in more than one case that British members of the Indian Civil Service, on account of their living in this country for a long time, and by coming into contact with only a section of the people, are mentally captured by the ideas of those few people who are in the position of social aristocrats" (Simon Commission [1929] 1998, 93-94). This distortion continues to influence the academic community, and those enamored of India have often presented a misleading representation of subaltern groups.

The Marichjhapi massacre was soon forgotten by nearly everyone except relatives of the victims. However, it did have an influence on Untouchable activists who developed an antipathy to the Communists resulting from their failure to desegregate rural areas, to implement successful land reform and educational programs, and their refusal to investigate human rights violations such as Marichjhapi (Mallick 1993, 1994, 1998). Despite much of the academic literature praising Left Front programs, a lot of people outside academic circles came to know better, and the absence of the massacre from the literature did not prevent Untouchable activists in other states from hearing about it. At the time of the massacre the CPM could calculate there would be no consequences from the eviction because no one could have predicted that those Untouchable activists who had most vociferously taken up the cause of the refugees would take power in India's most politically important state of Uttar Pradesh in the 1990s. Though the Untouchable governments were short-lived, the movement retained a vote base that in fractured coalition politics was too important to ignore. The rise of Untouchable caste politics was being widely condemned, but without an understanding of how the secular parties had let down the Untouchables through human rights abuses and corruption, it is not possible to realize one of the reasons for the decline of secular politics in India. Just as other massacres before it were used to symbolize the oppression of colonial or Congress rulers, Marichjhapi was used as a political tool to show the abuses of the Communists and the failures of secular Indian government. A consciousness of the massacre continued among Untouchable activists and in publications which very few in the dominant intellectual elite were aware of, let alone read. That discussion of the massacre did not appear in academically respectable publications did not mean it never happened or was not to become noteworthy in the Untouchable politicization and rejection of secular parties. Untouchables were the most natural allies of secular parties, and the failure of these parties to provide justice contributed to the

rise of caste politics. Until secular parties and institutions are willing to come to terms with their past treatment of Untouchables, they are unlikely to be able to make permanent inroads into the increasingly important and autonomous Untouchable electorate. Given the nature of India and Indian studies this sea change will have to await the Dalit occupation of state power, when state largesse will then be appropriated to further Untouchable objectives. As Kanshi Ram observed, "Those who worship dogs, cats, even stones will lose no time in worshipping social reformers like Periyar, once the Dalits come to power" (*India Today*, 15 October 1995, 11). This cynicism is a result of the treatment Untouchables have received at the hands of secular parties and governments, and by inference of the academic community. The democratization process currently underway in India will bring more of these antagonisms out in open. Until the state and society provide enhanced human rights and life opportunities for these marginalised groups, caste reconciliation cannot be successful. One small step in this process might include investigating the Marichjhapi massacre and sending those responsible for trial to the Supreme Court or International Criminal Court.

References

Amnesty International 1992, *India: Torture, Rape and Deaths in Custody*. New York: Amnesty International.

Bandyopadhyay. Sekhar, 1997, *Caste. Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal 1872-1947*. Richmond, Surrey, England: Curzon Press.

Banerjee, Ruben, 1995, "West Bengal: Law Unto Themselves– A Failing System Leads to a Rise in Mob-led Vigilante Justice." *India Today*, 15 September.

——, 1997. "West Bengal: Loot at Salt Lake – After the PLA Scandal, a Land Allotment Scam Rocks the State Government." *India Today*, 8 September.

Basu, Sajal, 1982, *The Politics of Violence: A Case Study of West Bengal*. Calcutta: Minerva.

Baviskar, Amita, 1995, *In the Belly of the River*, Delhi: Oxford University Press.

Baviskar, B.S. and Donald W. Attwood, 1995, *Finding the Middle Path*. Boulder, Colo.: Westview Press.

Bhattacharyya, Dwaipayan, 1993, "Agrarian Reforms and the Politics of the Left in West Bengal." Ph.D. diss., Cambridge University.

Biswas, Atharobaki, 1982, "Why Dandakaranya a Failure, Why Mass Exodus, Where Solution?" *The Oppressed Indian* 4 (4): 18-20.

Chakrabarti, Prafulla K, 1990, *The Marginal Men: The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal*. Kalyani, West Bengal: Lumiere Books.

Chatterjee, Nilanjana, 1992, "Midnight's Unwanted Children: East Bengali Refugees and the Politics of Rehabilitation." Ph.D. diss., Brown University.

Chatterjee, Pratap, and Matthias Finger, 1994, *The Earth Brokers*. London: Routledge.

Chatterji, Joya, 1994, *Bengal Divided*. Cambridge: Cambridge University Press.

Communist Party of India – Marxist (CPM). 1982. *Rajnaitik – Sangathanik Report* ("Political – Organizational Report") adopted at West Bengal State Conference 14th Plenary Session. Calcutta: West Bengal State Committee.

Fernandes, Walter, J. C. Das, and Sam Rao, 1989, "Displacement and Rehabilitation: An Estimate of Extent and Prospects." *In Development, Displacement and Rehabilitation*. edited by Walter Fernandes and Enakshi Ganguly Thukral, Delhi: Indian Social Institute.

Guha, Ranjit, 1989, *Subaltern Studies VI*. Delhi: Oxford University Press.

India Today. 1995, 31 August.

——, 1995, 15 October.

Khanna, S. N. 1978, "Dandakaranya Refugees Refuse to Budge." *The Overseas Hindustan Times*, 29 June.

Kohli, Atul, 1996, "Can the Periphery Control the Center? Indian Politics at the Crossroads." *The Washington Quarterly*, 19(4): 115-27.

Levy, Adrian, Cathy Scott-Clark, and David Harrison, 1997, Save the Rhino, but Kill the People." *Guardian Weekly*, 30 March.

Mallick, Ross, 1993, *Development Policy of a Communist Government: West Bengal since 1977*. Cambridge: Cambridge University Press.

——, 1994, *Indian Communism: Opposition, Collaboration and Institutionalization*. Delhi: Oxford Unversity Press.

——, 1998, *Development, Ethnicity and Human Rights in South Asia*. Delhi: Sage Publications.

Mehta, Prasannbhai, Laxmi Narayan Pandey and Mangaldev Visharat, 1979, "Report on Marichjhapi Affairs." April 18, mimeographed.

Mendelsohn, Oliver and Marika Vicziany, 1998, *The Untouchables*, Cambridge: Cambridge University Press.

Montgomery, Sy. 1995, *Spell of the Tiger*. Boston: Houghton Mifflin.

Nagchoudhury, Subrata, 1997, "Jyoti Basu: Off to New Pastures." *India Today*, 31 January.

Nagchoudhury, Subrata and Arnab Neil Sengupta, 1996, "Projecting a Cleaner Face." *India Today*, 31 March.

Nossiter, T. J., 1998, *Marxist State Governments in India*. London: Pinter Publications.

Powell, Walter W., 1985, *Getting into Print*. Chicago: Chicago Unversity Press.

Ram, Kanshi, 1982, "Editorial: What Happened to that Nama Sudra Movement?" *The Oppressed Indian*, 4(4):4.

Refugee Relief and Rehabilitation Department, West Bengal Government 1979. "Problems of Refugees from Dandakaranya to West Bengal." Letter from Deputy Secretary to Zonal Director, Ministry of Home Affairs, Government of India No. 323-Rehab/DNK-6/79.

Roy Choudhury, Profulla, 1977. *West Bengal- A Decade 1965-1975*. Calcutta: Boipatra.

Sen Gupta, Prasanta, 1997, "The 1995 Municipal Election in West Bengal: The Left Front is Down." *Asian Survey*, 37(10): 905-17.

Shahi, S. P. 1978, "The Truth about Project Tiger." *The Overseas Hindustan Times*, 6 July.

Shastri Indo-Canadian Institute, 1998. *Programme Guide: 1988-1999* Calgary: Shastri Indo-Canadian Institute.

Sikdar, Ranjit Kumar, 1982, "Marichjhapi Massacre." *The Oppressed Indian*, 4(4): 21-23.

Simon Commission, 1929, *Indian Statutory Commission: Selections from Memoranda and Oral Evidence by Non-Officials (Part II)*. Vol. 17, Reprinted 1988 Delhi: Swati Publications.

Yearley, Steven, 1996, "Campaigning and Critique: Public-Interest Groups and Environmental Change." In *Earthly Goods: Environmental Change and Social Justice*, edited by Fen Osler Hampson and Judith Reppy. Ithaca: Cornell University Press.

The Journal of Asian Studies, Vol. 58, No. 1 (Feb., 1999)

উদ্বাস্তু: তিনটি চিঠি, পর্বে পর্বান্তরে

1. Letter of Sri Jyoti Basu to the State Rehabilitation Minister on the rehabilitation camp refugees

July 13, 1961.
Sri P. C. Sen
Minister, Refugee, Relief & Rehabilitation,
Government of West Bengal

Dear Sri Sen,
Prolonged hunger-strike by the refugees lasting for more than a month in almost all camps in West Bengal has proved beyond doubt strong reluctance on the part of the refugees to accept the proposal of the Government regarding their rehabilitation in Dandakaranya. As a matter of fact there has been no movement of refugees to Dandakaranya though they have been put to serious hardships and untold sufferings due to stoppage of doles. For more than a month refugees in almost all the camps have been on hunger-strike to voice their protest. It is unlikely that there will be a change in attitude of camp refugees if they are subjected to further hardships and sufferings. Such experiment is also fraught with serious consequences. Left to their own fate these camps families will hardly be able to rehabilitate themselves properly and will be a burden on the State, I, therefore, urge upon you to reconsider the policy of the Government in respect of rehabilitation of

camp refugees to prevent further deterioration in the situation.

The primary issues involved now is not continuation of doles to camp refugees for an unlimited period but their early rehabilitation and restoration of doles till that is achieved. We do not think that the rehabilitation of camp refugees in a manner acceptable to them is so very difficult as is often being suggested by the Government. For example, the families now in Sonarpur group of camps may be easily fitted in Herobhanga Second Scheme. Families now in Asrafabad group of camps may also be absorbed in the camp site which is an abandoned rehabilitation colony, the land of which is already in possession of the Government and in Ashoknagar colony if the families are given facility of changing their category. Coopers Camp can be liquidated in its present site if the government implements the present scheme of converting that into a township with some modification. Families now in Gopalpur and Kaksa camps in the District of Burdwan may also be partially absorbed in Durgapur Industrial area and partially in land elsewhere. Families now in the camps in the district of Midnapur may be rehabilitated in Garbeta Scheme. Such illustration may be multiplied. If the refugees are given due facility for rehabilitation through bainanama scheme as well as change of occupational category in addition to the measures suggested above the rehabilitation of all families is now in camps may be completed within a very reasonable period and with much less cost than in places outside West Bengal. The number of such families is now almost half of what it was earlier and many have found rehabilitation in West Bengal although it was stated by the Government that West Bengal has reached a saturation point. I feel, therefore, that the rest may be found rehabilitation here provided there is willingness on the part of the Government. The enthusiasm that will be generated among the refugees if such a policy is accepted will be no mean an asset for their proper rehabilitation. It is needless to dwell upon the necessity of restoration and continuation of doles during the period prior to their rehabilitation.

It has been made clear from our side times without number that despite the policy set out above for rehabilitation in West Bengal, there may be families who may be willing to go to Dandakaranya and we do not object to their going.

My views on the problem have been briefly outlined in the previous paragraphs. I believe that there is a scope for discussion on the matter for finding a proper solution of it. I am, however, going abroad for a short period, I shall try to meet you later when I come back. But in the meantime I request you to have discussion with the representatives of U.C.R.C., who will seek interview with you.

Yours sincerely

Sd. Jyoti Basu

• • •

2. Letter of Shri Samar Mukherji to the Prime Minister on the rehabilitation camp refugees.

Ref No. 24/61 27th July, 1961.

From: Shri Samar Mukherji, M.L.A.,
General Secretary, All India Council of East Pakistan Displaced Persons,
93/1A, Bipin Behari Ganguli Street,
Calcutta-12.

To: Shri Jawaharlal Nehru
Prime Minister of India,
New Delhi

Sub: Rehabilitation of East Bengal Refugees now in Camp.

Sir,

A grave situation has developed due to continued hunger strike by groups of refugees in almost all the camps in West Bengal. The hunger

strike was first started by two batches of refugees of Kalabani and Sarasanka camps in the district of Midnapore on 6th June last. Since then it has spread to almost all the camps and at present there are about 100 refugees on hunger-strike in different camps.

2. We do not propose to deal with the various problems of other sections of refugees which are nonetheless acute. We like to restrict us here only to the problems of camp refugees because their solution brooks no further delay.

3. The hunger strike by the Camp refugees was started as a mark of protest against the measures of the Government to send them to Dandakaranya against their will and under compulsion by service of notice of them with the option of going to Dandakaranya or to quit the camp within a period of 30 days. It is far from truth that the purpose of the present movement is to continue payment of doles eternally and to delay the liquidation of camps. On the contrary, the main aspect of the present movement is for the demand of their quick rehabilitation in different schemes started or proposed in West Bengal by the Government and through bainanama scheme together with the facility of changing their occupational category.

4. Such demands by refugees are not only realistic but also can be implemented within a very reasonable period and at a cost lower than that for schemes outside West Bengal. This will be borne out by the following illustrations. There are about 1000 families now in Sonarpur group of camps. All these families may be rehabilitated in Herobhanga 2nd scheme which was announced by the Govt. long ago but has not yet been implemented for reasons best know to them. About 600 families of Asrafabad Camp may be rehabilitated at the present site of the Camp which is the site of an unsuccessful rehabilitation colony as well as in the nearby Ashokenagar Colony where a large number of plots are lying vacant. Coopers Camp may be liquidated in its present site if the Government implements the proposed scheme of converting the camp into a township with some modification. Families now in Gopalpur

and Kaksa Camps in the district of Burdwan may be absorbed in Durgapore Industrial area. Families now in the camps of Midnapur District may be rehabilitated in Garbeta Scheme where it was proposed to accommodate 1500 families. But only 350 families have been sent there uptil now. It will not be out of place to mention that in reply to a memorandum submitted in 1958 the West Bengal Government said that about 13,000 families may be settled on fallow lands in Garbeta. Such illustrations may be multiplied without any difficulty. We can dare say that if the refugees are given due facility for rehabilitation through bainanama Scheme together with the facility for change of category in addition to the measures stated above their rehabilitation in a manner acceptable to them will not prove so difficult as is often suggested by the Government. It should also be mentioned here that the West Bengal Government stated in 1959 that of the 39,000 bainanamas executed by the camp refugees 21 thousand would be implemented. But not more than 50% of those have been implemented. These along with other measures were suggested to the state Government long ago. If these were adopted in time the camps would have been liquidated long ago and the present undesirable situation would neither have arisen nor the question of rehabilitation of camp refugees in Dandakaranya.

5. It should also be made clear that despite such a policy there might be families who may like to go to Dandakaranya. There can be no objection to that. It will thus be clear that the present movement has nothing to do with opposition to Dandakaranya project as a whole. The movement only opposes sending refugees to Dandakaranya against their will when there is sufficient scope for their rehabilitation in West Bengal in a manner desired by them. It should also be mentioned here that the Chief Minister of West Bengal as well as the Governor of the State gave assurances in categorical terms that no refugee will be sent outside West Bengal against his will.

6. It will be seen that the coercive methods adopted by the Government for sending refugees to Dandakaranya have failed in as

much as only 5% of families served with notices have gone to Dandakaranya. A statement has reached in respect of rehabilitation of camp refugees. Any further experiment with such a policy is fraught with serious consequences. Left to their own fate these camp families will be hardly able to rehabilitate themselves properly and will ultimately be a burden on the meager resources of the State. A rethinking of the whole question has, therefore, been necessary both for the proper solution of the problem and on human considerations.

7. It is high time that you should intervene immediately into the matter to prevent further deterioration in the situation which will result in loss of life of a few refugees and untold sufferings to many others as well as for a satisfactory solution of the problem.

Yours faithfully

Sd. Samar Mukherjee

• • •

3. Memorandum to the Members of Parliament when they visited Marichjhapi

To

Shri Prasannabhai Mehta

Leader, Enquiry Committee

Regarding Police Firing and other inhuman torture on homeless, helpless refugees at Netaji Nagar (Marichjhapi)

Sundarban, 24 Parganas, W. Bengal

Dated: 22nd March, 1979

Sub: Refugees from Dandak to Sunderban

Respected Sir,

On behalf of thirty thousand refugees of Marichjhapi, I beg to submit the following for your kind any sympathetic considerations. For 12 to 15 years, we were forced to live subhuman lives in various transit

camps in Mana under retired Army personnel, were assaulted and tortured brutally by camp authorities and by the state police on various fabricated/concocted grounds lodged by the Army personnel and his pet groups in the local administration. We lost lives in police firing now and then, when we wanted to redress our sufferings and salvation of our longstanding problems through proper enquiry/investigation. From time to time, we were arrested in the mana camp and the modesty of our young girls were molested by the local employees/C. R. P./ Police/S. A. F. and they let loose oppression on ordinary refugees. Even to-day, a large number of refugees is still in jails or has cases in different courts in Dandakaranya area. in rehabilitation centres/sites whether in Dandakaranya or in other states we had to live like cows and buffaloes in slaughter houses having little security of lives.

In Dandakaranya,

i) 3 to 5 acres of land divided into 4 to 5 plots and were allotted to each migrant families at a distance of 4 to 5 km. The villages were completely barren, covered with stony, sandy mud without any water supply facilities.

ii) The offices, markets, hospitals, ration distributing centres, etc., were located in far away places. The distance may be 15 to 20 km. from different villages and rehabilitation centres.

iii) Irregular payments of inadequate cash doles/rations/medicines etc. from places far away from migrant villages reflect the harassment to migrants. The system of paying low wages to the refugees regularly adds to the harassment.

iv) Ill-treatment of local authorities and the hostility of the Adivasis, lack of security and modesty of women and of justice compelled the migrant to desert their respective Rehabilitation sites/centres from February 1978. They took this decision as they were unable to find any way out of redressing their unlimited sufferings and fulfillment of their basic demands of effective resettlement through repeated prayers to the D.R.O. New Delhi.

The Left Front parties longed to resettle East Bengal refugees in Sunderban area from the very beginning after the partition. Now and then, they consoled the migrants outside Bengal thorough mass meetings held for protesting police oppressions and other difficulties facing them with the promises that they would help the migrants to resettle in Sunderban if lime would allow the Left Front to come to power, with the instruction/consent of Shri Jyoti Basu, honourable Chief Minister of West Bengal, Shri Ram Chatterjee, Hon'ble State Minister for Civil Defence accompanied by Shri Ashoke Ghosh, the Secretary of the Forward Block... went to Dandakaranya and other states to visit Migrant's position and conditions with their own eyes and to console them to their future steps of effective resettlement as promised from time to time.

The refugees coming from Dandakaranya gathered in Hasnabad and camped there nearly two months to find out proper way of earnings, livings and the policy and principles of the State Government towards refugees at Hasnabad.

After residing 15/20 days at Kumirmari without any obstruction from local authorities, we entered into plantation, Bagna, Marichjhapi in 24 Pargonas.

We started our new lives with a full arrangement of daily consumption such as living house, school, markets, roads, hospital, tubewells, etc. We managed to findout sources of income, also establishing cottage industry such as Bidi factory, Bakery, Carpentry, Weaving factory etc. and also built embankment nearly 150 miles long covering an area of nearly 30 thousand acres of land to be used for fishing, expecting an income of Rs. 20 crores per year. That may easily help and enable us to stand on our own feet. Moreover, after one or two years washing by rain water, preventing saline water to flow over, these lands will yield a lot of crops such as paddy and other vegetables.

We have distributed lands to Marichjhapi among six thousands refugee families in the shape of paras, villages and anchals. Nearly a

thousand families built their houses in different plots in group system and have been residing there about a year.

Police Attack in Marichjhapi

On 20 August 1978, after long five months to our entry into Marichjhapi, the Government of West Bengal came to Marichjhapi with 30 launches carrying a large number of police to take back refugees to Dandakaranya. Their continued presence for 15 days failed to bring back a single family to Dandakaranya. This led to the attack of police on the refugees (Police launches) ran over 43 boats, breaking into pieces and also opened fire resulting deaths of two young refugee boys. The police with the help of the CPI(M) followers attacked the boats of the refugees. The refugees ran away leaving their 157 boats behind loaded with timber and firewood costing nearly Rs. 3.50 lakhs including the cost of the boats.

The blockade

In the first week of November 1978, a news item published in the Ananda Bazar Patrika that the Government would not disturb the refugees in Marichjhapi. But the Government again rushed to Marichjhapi on 24th January 1978 with more power and means to oust the refugees forcibly, and send back to Dandak as soon as possible before 31 March and seized by imposing Section 144 of I.P.C. all over the river around Marichjhapi, prevented the entry of food grains and other necessary commodities, water, medicine etc. from the nearest village, market, i.e. Kumirmari, Mollakhali, Satjelia etc. making the Marichjhapi completely isolated from all other civilized places.

The Attack

From the morning of 24 January 1979 police started the opression with the help of 30 launches and two steamers of B.S.F. by bursting teargas

shell towards Marichjhapi, arrested people from their living houses in different plots by breaking down and setting fire to the house. They also looted all the articles i.e. food grains, clothing, bell-metal, plates, glass, brass pitches, gold ornaments, iron made articles, hard cash etc. The police also did not hesitate to outrage the modesty of our women including three young girls. The police launches ran over refugee boats carrying food grains and necessary commodities. They beat the drowning passengers severely and prevented them from getting to the shore.

After a strong and strict barricade for 7 days, on 31.1.1979, Refugee women, afraid of starvation death, attempted to cross the Bagna river to collect food and water from Kumirmari, the nearest village. The police with their launches attacked the boats in the river by throwing teargas shells violently, drowned the boats by dashing with the launches and attacked the drowning women by running over them repeatedly. The refugees standing on the otherside (Plantation) became impatient for fear of their painful death... and beating of the police, they rushed to help them by boats and also became the victim of the cruel police attack. By the by, the refugees and the local people gathered there to protest the brutal actions of the police on hungry helpless refugees. The police became angry and opened fire indiscriminately resulting... death of 15 refugees and two local people including one woman.

The police arrested a large number of refugees, wounded persons, beating severely by gun barrels and pressed with boot-soles. The police by day and night strictly barricaded the island, started inhuman torture on the refugees everywhere, resulting arrest of nearly a thousand refugees including 500 persons selling and carrying food grains. Vegetables, clothing, etc. 375 persons died of starvation and diseases from consuming totally unit food, 2 persons committed suicide by hanging, seizing of 100 boats loaded with food grains and other necessary commodities amounting a total loss of Rs. 4,15,142.00.

We protest strongly against some comments of Hon'ble Chief Minister of West Bengal on our activities in Marichjhapi.

(i) We are not establishing any parallel Government in Marichjhapi. We are poor and helpless people in the world having no place to live in. Any person may visit to see our condition from the very beginning we are ready to talk with the Government. We are Indian citizens and are loyal to the Indian Constitution. It is quite impossible on the part of helpless, homeless poor refugees to form a parallel Government. Mr. Jyoti Basu accused us of running a parallel Government having connection with foreign powers only use as a protect to oust the refugees from Marichjhapi. The accusation is a total lie.

(ii) We never demanded homeland. Even we do not know the definition of homeland. We never delivered any speech or published anything regarding homeland. We never brought any person from Khulna of Bangladesh.

Under the circumstances stated above, the Udbastu Unnayan Samity and the homeless, helpless hungry refugees, may we earnestly request you to consider the following demands for immediate implementation.

Demands

1) Immediate removal/withdrawal of all sorts of police barricades including under Section 144 of the I.P.C. relating to reserve forest from all the rivers around Marichjhapi, as it is not a reserve forest.

2) Immediate judicial enquiries are to be ordered in all the past events of police oppression and police firing of refugees on 31.1.1979 with adequate compensation of the lost lives to their relatives and other compensation of foodgrains including boats, breaking down of houses, other valuables looted by the police.

3) Our basic demand is for effective resettlement in our beloved Marichjhapi bearing a lot of good hopes and bright future to the distressed and deprived Topshil (scheduled caste) refugees who have lost so many lives and last farthing of their whole life's earning.

4) An immediate release order may be passed to the refugees in Jail (arrested) under various sections, with the withdrawals of all cases against the refugees including refugee-ladies without any condition.

With best regards,

Yours sincerely,

(Sd/-) Raiharan Baroi, General Secretary

Udbastu Unnayanshil Samity

Netaji Nagar, Marichjhapi, P.O. Kumirmari, 24 Parganas (W.B.)

পরিশিষ্ট চ

একটি 'নিষিদ্ধ' আলোচনা

লজ্জা ও ঘৃণার কালো ইতিহাস

ঝিনুক চক্রবর্তী

'এই উদ্বাস্তুরা অন্য রাজ্য থেকে আসা অবাঙালি অধিবাসীদের মতো কলকাতার ফুটপাথ বা রেল স্টেশন দখল করতে চাননি, তাঁরা সত্যি সত্যিই পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়েই সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হাসনাবাদে না যেতে দিয়ে, বর্ধমানের কাশীপুরে গুলি চালিয়ে ৬ জনকে মেরে, জোর করে অনেক উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠান। বামফ্রন্ট নেতারা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, মাদার টেরেসা, লুথারিয়ান চার্চ— কাউকে সেবাকাজ করতে দেননি। এমনকী শিশু ও বৃদ্ধদের দুধও দিতে দেননি। ফলে হাসনাবাদে প্রায় দেড় হাজার শিশু ও বৃদ্ধ বিনা চিকিৎসায় মারা যান।'— শক্তি সরকার (সুন্দরবনের প্রাক্তন সাংসদ)। সূত্র: *নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত 'মরিচঝাঁপি', পৃষ্ঠা* ৫২-৫৩।

'পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বাস্তুদের থামানো হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশকে বেশ সফলভাবে ফিরিয়ে দেওয়া গিয়েছে। সেই রকম একটি দলকে আমি হাসনাবাদ স্টেশনে দেখি, যারা ফেরত ট্রেনে ওঠার জন্য সরকারি অফিসে লাইন দিয়েছে স্বেচ্ছায়। তারা প্রায় প্রত্যেকেই তিন-চার দিন খায়নি। তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া গেছে স্রেফ ক্ষুধার অস্ত্রে। তারা গোটা পশ্চিমবাংলাকে অভিসম্পাত দিতে দিতে ফিরে গেল।'— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সূত্র: *'মরিচঝাঁপি সম্পর্কে জরুরি কথা'— আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১১.৯.১৯৭৮।

'যে সমস্ত পরিবার আজ ওখানে (দণ্ডকারণ্যে) ফিরে আসছেন, তাঁদের প্রায় সকল পরিবার থেকে শিশু অথবা বৃদ্ধ অথবা দুই-ই তাঁরা পথে পথে চিরদিনের

মতো হারিয়ে এসেছেন। তাঁদের শোক, দুঃখবোধও এই প্রচণ্ড আঘাতে ও প্রতারণায় বিফল। ফেরতগামী ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ২-৩ জন করে অফিসার পাঠানো হচ্ছে শরণার্থীদের তদারকি করার জন্য। তাঁদেরই মুখে শুনলাম, ফিরবার পথে মৃত শিশুদের ও বৃদ্ধদের তাঁরা ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছেন। পরবর্তী কোনও স্টেশনে তাদের সদ্‌গতি করার অপেক্ষা করেনি।'— পান্নালাল দাশগুপ্ত। সূত্রঃ *যুগান্তর, ২৫ জুলাই* ১৯৭৮।

ইতিহাস দাগ রেখে যায়। সে-দাগ মোছে না কখনও। একদিন না-একদিন তা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। করেই। আপাতভাবে আড়াল করে রাখলেও সময়ই তাকে টেনে খুঁড়ে বের করে আনে। মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে, আঁচড় কাটে। চাপা পড়ে থাকা ক্ষত উঠে আসে যখন, শিউরে উঠতে হয়। এমনও হয় তাহলে! অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই। হয়েছে তো এমনই।

সময়ের পরিবর্তনে মানুষ হয়তো অবস্থান বদলায়, কিন্তু ইতিহাস বদলায় না। মানুষ লজ্জিত হয়। ইতিহাসই মানুষকে ধিক্কার দেয় কখনও কখনও। একটি করে পৃষ্ঠা উল্টেছি আর লজ্জায় ধিক্কারে ঘৃণায় ক্ষোভে শোকে অবনত করেছি মুখ। প্রগতিশীল বামপন্থার আড়ালে তবে এত অন্ধকার।

'সমস্ত সরকারি বাধা অতিক্রম করে ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে ৩০ হাজারের মতো নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ মরিচঝাঁপি দ্বীপে পৌঁছান। নিজেদের শ্রম ও সামর্থ্যে তাঁরা ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত থাকতে পারেন! ...দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যে-ভাবে বন্দিদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল, সেই ভাবে মরিচঝাঁপির মানুষদের মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে ঝড় বন্যার মধ্যে ৬, ৭, ৮ সেপ্টেম্বর জ্যোতি বসুর সরকার পুলিশ লঞ্চের সাহায্যে উদ্বাস্তুদের নৌকাগুলি ডুবিয়ে দেয়।... ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ব্লকেড করে পাশের দ্বীপ থেকে খাদ্য ও পানীয়-জল আনা বন্ধ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট রাজত্বে ৩১ জানুয়ারি (১৯৭৯) প্রথম গুলি চলে মরিচঝাঁপির লোকদের পানীয় জল নেওয়া বন্ধ করার জন্য।'

ছাপানো এই অক্ষরমালাকে 'মিথ্যে বানানো পরিকল্পিত কুৎসা' বলে উড়িয়ে দিতে পারলে কোনও কষ্ট হত না। কিন্তু ওই যে ইতিহাস! অমোঘ শক্তি তার। নির্মম সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে সে। গায়ের জোরে অস্বীকার করার চেষ্টা করলেও মনে মনে সত্যের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়।

আমরা তাহলে পেরেছিলাম!

আবাল্য স্বপ্নভূমি-স্বভূমি-বীজভূমি নিজস্ব উঠোনটুকু কেড়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে 'উদ্বাস্তু' করেছিল যে-স্বাধীনতা, তার সব দায় তবে ওই হতভাগ্য

মানুষগুলোর! সাতজন্মের পাপের ফল, নাকি দুর্ভাগ্য ওঁদের! আমরা যারা স্বাধীনতার ক্ষীরটুকু চাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, স্বাধীন গদিতে আপ্লুত হলাম, তাদের কাছে ওই সবহারানো নেই-মানুষগুলো রাতারাতি শরণার্থী হয়ে গেল!

দাঙ্গা-কাটাকাটি সে না-হয় হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র তো পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছে যথাসাধ্য। সুজলা-সুফলা-সবুজ নদীমাতৃক ভূমিপুত্রদের খুলনা যশোর ফরিদপুর জেলার নমঃশূদ্র-পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কৃষকদের পুনর্বাসন দেওয়া তো হল পাথর-কাঁকর-টিলা অধ্যুষিত দণ্ডকারণ্যে।

অহো, সরকার যে করেনি তা-তো নয়।

কিন্তু দণ্ডকারণ্যের এই পুনর্বাসন বাঙালি কৃষক উদ্বাস্তুদের কাছে হয়ে উঠেছিল 'নির্বাসন'। পশ্চিমবঙ্গের শিবিরবাসী এইসব উদ্বাস্তুদের ১৯৬১ সালে দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ডোল বন্ধ করে দিলে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের দাবিতে অনশন করেন। ১৯৬১ সালের ১৩ জুলাই উদ্বাস্তুদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে জ্যোতি বসু অনিচ্ছুক উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো বন্ধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: ...although it was stated by the Government that West Bengal has reached a saturation point, I feel, therefore, that the rest may be found rehabilitation here provided there is willingness on the part of the Govt. (যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারবার বলছেন যে, এ রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য একতিলও জমি নেই, তথাপি মনে করি সরকারের অভিপ্রায় থাকলে অবশিষ্ট উদ্বাস্তুরা এ রাজ্যে পুনর্বাসন পেতে পারে।)

সে-সময় পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু শিবিরগুলি বন্ধ করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারও বদ্ধপরিকর। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কলকাতায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন: 'যদি মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে এবং কলকাতার পথে পথে দাঙ্গাও শুরু হয়, তাহা হইলেও আমরা উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলি বন্ধ করিয়া দিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।' (সূত্র: *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২২.১০.১৯৫৯)।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সেদিন জ্যোতি বসু উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২১ জুন কলকাতায় জ্যোতি বসুর সভাপতিত্বে বামপন্থী দলগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল: 'তাদের (উদ্বাস্তুদের) পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিতে হবে।' *(সূত্র: মরিচঝাঁপি — নিরঞ্জন হালদার, পৃ. ৩৩)*।

জ্যোতি বসুর এই দরদ (!)-এর কথা মাথায় রেখেই ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত উদ্বাস্তু মানুষজন পুনর্বাসিত হবার আকাঙ্ক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের দিকে রওনা দেন।

হায় রে আশা! গদিতে বসলে নেতাকে যে রাজার মতোই আচরণ করতে হয়। এই বুঝি গণতন্ত্রের নিয়ম!

১৯৭৮ সালের ১৮ এপ্রিল ১০ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার সুন্দরবনের কুমিরমারি পার হয়ে মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেন। তাঁরা পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে কোনও সাহায্য চাননি। তাঁদের দাবি ছিল, 'আমাদের শুধু মরিচঝাঁপিতে ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে থাকতে দাও'। তাঁদের ভরসা ছিল, এখানে পাঁচ ফুটের বেশি উঁচু জোয়ার আসে না। এখানকার কাছাকাছি গ্রামের মানুষজন যদি পাঁচ ফুট উঁচু বাঁধ দিয়ে নোনাজল ঠেকিয়ে একশো বছর ধরে চাষ করতে পারেন, তাহলে তাঁরা পারবেন না কেন? তাছাড়া মাছ ধরার সুযোগও তো আছে।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন, তাঁরা তখন জানতেন না, হায়।

সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটি তখন রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'দণ্ডকারণ্যের যে-সব উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, প্রয়োজন হলে, তাদের বল প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরিয়ে দিন।' কমিটির তিন দিনের অধিবেশনের পর দলের সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'এইসব উদ্বাস্তুদের নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে'। (সূত্র: *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২.৭.১৯৭৮)।

এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হতে দেরি হল না। ১৯৭৮ সালের ১৯ আগস্ট বহু পুলিশ ও কুড়িটি লঞ্চের সাহায্যে সামরিক কায়দায় নদীপথ অবরোধ করা হল এবং উদ্বাস্তুরা তাতেও দমে না দেখে ৬ সেপ্টেম্বর সেই সব লঞ্চ চালিয়ে উদ্বাস্তুদের রসদ জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বোঝাই করা ২০০টি নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হল।' (সূত্র: *মরিচঝাঁপি কি মরীচিকা? শৈবাল গুপ্ত। নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত 'মরিচঝাঁপি', পৃ.* ২৬-২৭)।

নৃশংসতার ছবি পাওয়া যায় সমসাময়িক সংবাদপত্রেও: 'উদ্বাস্তুরা যে ঘরগুলি তৈরি করেছিলেন তার সংখ্যা কোনও ক্রমে এক হাজারের কম নয়। ঘরগুলির অধিকাংশই দৈর্ঘ্যে ১০০-১৫০ হাত, প্রস্থে ১২-১৪ হাত। ঘরগুলি শুধু ভেঙে দেওয়া হয়নি, পুড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার, লাঠিপেটা, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজের মাধ্যমে ১০-১৫ দিন ধরে অনবরত

সন্ত্রাস ও ভীতি প্রদর্শন করেও উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ উৎখাত করতে সক্ষম হয়নি।' (*যুগান্তর, ২০ ফাল্গুন, ১৩৮৪*)।

'যেন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছি। অথবা শত্রু দেশের সীমানায়। মাঠে মাঠে সশস্ত্র পুলিশের ছাউনি, পুলিশ চাইলেই আপনাকে হাত উঁচু করে হাঁটতে হবে। খানাতল্লাসি করবে। ক্যাম্পে নিয়ে আটক করবে। জেরা করবে। অথচ জায়গাটি সরকার-ঘোষিত বনাঞ্চল নয়। এই জায়গার নাম কুমিরমারি। মরিচঝাঁপির লাগোয়া এক জনবহুল দ্বীপ।' বামপন্থী দল সিপিআইয়ের মুখপত্র 'কালান্তর' পত্রিকায় 'চার ভাঁটার পথ: নিষিদ্ধ দ্বীপ' শিরোনামে দিলীপ চক্রবর্তী ধারাবাহিক সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে যে বর্ণনা দেন তা পড়লে শিউরে উঠতে হয়।

'...ওখানকার মানুষরা চৌদ্দ দিন এপারে আসেনি। ভাত খেতে পারেনি। জলও পায়নি। পুলিশ ঘিরে রেখেছে দ্বীপ। প্রথম প্রথম ২-৩ দিন বেশি শব্দ হয়নি। এরপর কান্না শোনা যেত রোজ। কুমির আর কামট-ভরা নদী পার হয়ে কিছু লোক লুকিয়ে আসত রাতে— চাল ইত্যাদির খোঁজে। জলের খোঁজে। এরপর তাও বন্ধ হল। জালিপাতা আর যদু পালং খেয়ে থেকেছে ওরা, মরেছেও অনেক। ওদের কান্না এখান থেকে রোজই শুনতে পাই।

'...২৪ জানুয়ারি থেকে সরকার দ্বীপ অবরোধ করে। ৩১ জানুয়ারি গুলি চলে। ৯ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের ইনজাংশন অনুযায়ী জল-অন্ন আনার ওপর থেকে বাধা প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু এর পরেও কড়াকড়ি চলছে।... একমাত্র ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখেই চাল আনতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন অনন্ত মণ্ডল, অরবিন্দ রায়, নিরঞ্জন বাঁড়ে, কার্তিক সরকার, রণজিৎ মণ্ডল, কৃষ্ণদুলাল বিশ্বাস। ...২৪ জানুয়ারি সরকারের পক্ষ থেকে দ্বীপ অবরোধ করার পর ওখানে অনাহারে মারা গিয়েছেন ৪৩ জন!' (সূত্র: *কালান্তর, ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি* ১৯৭৯)।

'ব্লকেডের সময় ওরা তখন কী খেত শুনবে? এক ধরনের ঘাস সেদ্ধ করে তাই দিয়ে সবাই পেট ভরায়। ঘাসের নামটা মনে পড়ছে না— ওখানে ওটা নাকি অপর্যাপ্ত জন্মায়। তখন কাশীকান্ত মৈত্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, তাকে ঘাসটা দেখাতে পেরেছিলাম।' (সূত্র: *সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারকে লিখিত কমলা বসুর চিঠি*)

২৪ জানুয়ারি ১৯৭৯ থেকে মরিচঝাঁপির নেতাজিনগরে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকায় রয়েছেন ১৩৬ জন। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত ব্যক্তির তালিকায় ২৩৯ জন। ধর্ষিতা মহিলাদের তালিকায় ২৩ জন। নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকায় ১২৮ জন। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ গ্রেফতার হয়ে বসিরহাট ও আলিপুর জেলে আটক ব্যক্তিদের তালিকায় ৫২ জন। পরবর্তী সময়ে জেলে আটক

১৩০ জন। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৯ জল সংগ্রহ করতে গিয়ে আটক ৩০ জন। ২৪ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) পর্যন্ত পুলিশ-কর্তৃক ছিনতাই-হওয়া নৌকার সংখ্যা ১৬৩।— এ জাতীয় অসংখ্য প্রামাণ্য তথ্য।

লজ্জায়, অবরুদ্ধ কান্নায় একের পর এক পৃষ্ঠা ওল্টাই, আর কেবলই মনে হয়, কেউ এসে চিৎকার করে বলুক— এ মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে!

মানুষের অমানবিক প্রবৃত্তিতেই সংগঠিত হয় গণহত্যা। সেই কালো ইতিহাস একদিন উঠে আসে সাদা আলোয়। চব্বিশ বছর পরে এভাবে সমস্ত প্রামাণ্য বিশ্বাস্য নথি-সহ উঠে এল মরিচঝাঁপি।

এ লজ্জা কোথায় লুকোব! ইস্ আমিও যে ভারতীয়, এই বাংলারই একজন। আর কী আশ্চর্য, মরিচঝাঁপি এই বাংলাতেই। প্রগতিশীল বাংলায় 'মরিচঝাঁপি' নিয়ে একটা ঝড় উঠবে না!

জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের লেখা 'মরিচঝাঁপি: নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে' প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। প্রকাশক সুজন পাবলিকেশন, ৭বি, লেক প্লেস, কলকাতা ৭০০০২৯। বইটি নিয়ে আলোচনা ছাপা হয় পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'পুস্তকমেলা'-য় ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৯-এ। গিল্ডের সদস্যদের মধ্যে কয়েক কপি বিতরণের পরই অজ্ঞাত কারণে পত্রিকার সব কপি সরিয়ে ফেলা হয়। এক রকম 'নিষিদ্ধ'। হয়তো অতি ক্ষমতাশালী কোনও মহলের চাপ ছিল।